আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম



আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-৮

অনুবাদ
মাওলানা আবু সাকী মাহবুব
মুহাদ্দিস, সম্পাদক ও সাহিত্যিক
ফাযেলে হাটহাজারী

বই ঘর বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১৭৫৫৪৭২৭, ০১৭১১৭১১৪০৯
e-mail: boighorbd@gmail.com; web: www. boighorbd.com

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম–৮
কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

তৃতীয় প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৯

দ্বিতীয় প্রকাশ
জানুয়ারী ২০১৭

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১৬

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0045-0

KHOTOBAT-E-HAKIMUL ISLAM : Translate by Abu Saki Mahbub
Published by : S M Aminul Islam, BhoiGhor : Islami Tower Ground floor
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 First Edition : October 2016 © by the pablisher

Price : 400 Taka only

অ।র্প।ণ

যাঁর ইলম, আখলাক ও স্নেহ-ছায়ায়
কেটেছে আমার কৈশোর-তারুণ্য বেলার
দীর্ঘ ছয়টি বছর, যাঁর সান্নিধ্য পরশে ম্লান
হয়ে গেছে পিতৃশোক, সেই পরম শ্রদ্ধেয়
শায়খ, বিশ্বনন্দিত ইলমী করকায 'দারুল
উলুম মুঈনুল ইসলাম' (হাটহাজারী
মাদরাসা)-এর মহাপরিচালক শায়খুল
ইসলাম আল্লামা **শাহ আহমদ শফী**
দামাত বারাকাতুহুম-এর করকমলে।

– অনুবাদক

পূর্ব কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدًا اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ مُصَلِّيًا عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম সিরিজের ৮ম খণ্ডটি এ মুহূর্তে আপনাদের হাতে, এটি পূর্ব খণ্ডগুলো থেকে বিশেষ মর্যাদা রাখে। এতে এমন কিছু তাকরীর ও বক্তৃতা বর্ণিত হয়েছে যেগুলো রাজনৈতিক বিষয় সম্বলিত। আর রাজনৈতিক বিষয়াবলি সর্বকালেই আবেগ এবং বাস্তবতা হিসেবে একটি স্পর্শকাতর বিষয়। স্বাভাবিকভাবে রাজনীতির অঙ্গনে কাজ করতে হলে উগ্রতা ও শিথিলতার শিকার হওয়ার আশংকা ঘিরে ধরে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করার পরও কখনো কখনো বিরোধীবাদীদের দোষারোপ ও তিরস্কারের কারণে সিরাতে মুস্তাকিম-এ থাকা অসম্ভব নয় তবে দুরূহ অবশ্যই। আলেমদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ উচিত। রাজনীতি নিঃসন্দেহে দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। আলেম সমাজের রাজনীতি করার অর্থ এই নয় যে, তাদের মর্যাদা হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও জিম্মাদারীতে ঘাটতি হবে; বরং তাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে যাবে। আহলে ইল্‌ম তথা আলেমদের রাজনীতি এবং সাধারণ মানুষ ও তাদের নেতাদের রাজনীতি– এই উভয় সমাজের রাজনীতির মধ্যে পদ্ধতিগতভাবে সুস্পষ্ট ভিন্নতা ও পার্থক্য রয়েছে।

অনেক সময় প্রতিবাদসভা এবং কনফারেন্সে বক্তব্য দিতে হয়। আবেগী মানুষদের আবেগকে উত্তেজিত করে অধিক কাজে লাগানো এবং সর্বাবস্থায় বিরোধী দলকে ঘায়েল করতে হয়, যা আহলে ইল্‌মদের শান হতে পারে না। এ জন্য এহেন মুহূর্তে তাদের নিজের শান-মান রক্ষা করা জরুরি। দলিল-প্রমাণ এবং শক্তিশালী ডকুমেন্ট দ্বারা কথার মধ্যে গাম্ভীর্য পয়দা করা আকল

ও বুদ্ধির কাজ যা প্রত্যেক বুদ্ধিমান এর অধিকার এবং এমনটিই আহলে ইলমদের শান।

এ কথা বলা অনর্থ হবে না যে, যারা উলামাদের থেকে আলাদা হয়ে রাজনীতি করে তারা তাতে ধর্মীয় বুনিয়াদকে অগ্রাধিকার দেয়া তো দূরের কথা, তারা ধর্মকে রাজনীতি থেকে মূলোৎপাটন করা জরুরি মনে করে। ফলে রাজনীতিতে মিথ্যা-ধোকা, ভুল বক্তৃতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ, চালবাজি, ডিপ্লোমেসি এবং কথা ও কাজের গরমিল সাধারণ কাজে পরিণত হয়েছে। এ জন্যই সত্য কী তা এখানে বিবেচ্য থাকে না, মানুষ কী চায় সেটাই বিবেচিত হয়। মানুষ যা চায় তাই বলতে হয়, চাই তা নিজ অন্তরের বিপরীত হোক না কেন। এমনটিই বর্তমান রাজনীতির বুনিয়াদী উসুল।

পক্ষান্তরে ধর্মীয় রাজনৈতিকগণ হলেন এদের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃত সত্য কী সেটা তারা সর্বাগ্রে বিবেচনা করেন। সুতরাং তারা সত্য বিষয়টিই বলতে চেষ্টা করেন– চাই মানুষ তা ভাল নজরে না দেখুক।

তাদের প্রথম ও প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি; সর্বসাধারণের সন্তুষ্টি নয়। এ কারণে নিজেদের ইলম ও জ্ঞান মোতাবেক যেগুলোকে হক ও সত্য মনে করেন, আল্লাহ তায়ালার পবিত্র মানশা মনে করেন সেগুলো আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে বলতে থাকেন। অন্য কথায় পানির স্রোতের সঙ্গে সাঁতার কাটা অতি সহজ কিন্তু উল্টোদিকে সাঁতার কাটা অনেক দুরূহ ব্যাপার। তবুও আহলে হক ও উলামাদের উপর যখন উক্ত দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে তখন তারা তা অত্যন্ত পরিপূর্ণতার সঙ্গে আঞ্জাম দিয়েছেন।

জাতীয় ইতিহাসে শতাব্দি অর্ধ শতাব্দি বড় কোন যুগ নয়। অতি নিকটবর্তী অতীতকালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ– রাজনৈতিকভাবে কেমন কার্যকরী দৃঢ় পদক্ষেপ জাহির করেছে, ভারত আযাদীর পূর্বে, হিন্দুস্তান বিভক্তি এবং হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান হাঙ্গামার সময় কি কি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে এবং মুসলিম জাতিকে কিভাবে রাহনুমা করেছে– এগুলোর বিশদ

ধারণা তার বয়ানের মাঝে পাওয়া যাবে। যেগুলো তিনি জমিয়তের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত জলসায় প্রদান করেছেন।

ওই খুতুবাসমূহে চিন্তাধারার পরিপক্বতা দেখা যাবে, সেখানে উলামাদের রাজনৈতিক বিশেষ শান, তাদের বর্ণনাভঙ্গি, বাচনভঙ্গি, আলোচ্য বিষয় ও সমস্যাবলির সমাধানের পদ্ধতি এবং এসবের পাশাপাশি ধর্মের সার-সংক্ষেপও দেখা যাবে। চিন্তাধারা এবং কর্মসূচিতে শুধু নেতৃত্ব এবং অধিকার আদায় সম্পর্কিত রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেয়া যথেষ্ট মনে করেননি। সুতরাং তার খুতুবাত এবং রচনাবলিতে দেখতে পাবেন যেখানে হুকুমাত বা রাজত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং অনেক বিষয়ে ঘৃণা প্রকাশ এবং চিন্তা ও রাগ প্রকাশে হুকুমাতকে টার্গেট করেছেন, সেখানে সর্বসাধারণের সামাজিক ইসলাহ এবং তাদের চারিত্রিক বিষয়াবলির পর্যবেক্ষণের কর্মসূচিও রেখেছেন। বৃটিশ এবং সেকুলার মতাদর্শের হুকুমাতে বর্তমানকালে মুসলিম শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা কী হবে? তাদের বাহ্যিক ও বাতিন ইসলাম ও ঈমান দ্বারা কিভাবে সম্বন্ধযুক্ত এবং পরিপূর্ণ হবে? তারা ধর্মকে আসল মূলনীতি হিসেবে কিভাবে গ্রহণ করবে এবং তার উপর কিভাবে কায়েম থাকবে? এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলির উপর তার খুতুবাতে আলোকপাত করা হয়েছে। মোট কথা, উলামাদের রাজনীতিতে যেখানে জাগতিক কর্মকাণ্ড সামনে থাকে সেখানে পারলৌকিক উন্নতি এবং তার কর্মসূচিও রাখা হয়।

ধর্মীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি দ্বারাই শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী জাতির ইনকিলাব ঘটে। আমাদের ধর্মীয় আকাবিরগণ লিল্লাহিয়্যাতের সঙ্গে যেখানেই পা রেখেছেন সেখানেই প্রভাব বিস্তার করে এসেছেন। আল্লাহ না করুন যদি ধর্মকে রাজনীতি হতে বের করে দেয়া হয় তাহলে উলামায়ে কেরাম কমপক্ষে এহেন রাজনীতির সহযোদ্ধা হতে দূরে থাকতেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. 'রাজনীতিতে ধর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী?' শিরোনামে নিম্নের ঘটনার প্রতি আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন– দু'তিন বছর পূর্বের ঘটনা, সানুয়াল নাকম মিরাঠের হিন্দু কমিশনার দারুল উলুমে

এসে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। এটি ১৯৪৫ সনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক মাস পূর্বের ঘটনা। তিনি আমাকে বললেন, মাওলানা! দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক এবং ভয়াবহ। আমি বললাম, জি হ্যাঁ। পত্রপত্রিকা দ্বারা আমিও এমনটি অনুভব করছি। তিনি বললেন, এহেন পেরেশানি ও ভয়াবহতা কি কারণে? আমি বললাম, কারণ আছে। তিনি বললেন, কী কারণ হতে পারে? আমি বললাম, কারণটি বলা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। কেননা আমি একজন ধর্মীয় মানুষ, আমি প্রতিটি বিষয় ও ঘটনা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভব করি। আর আপনি হলেন একজন রাজনৈতিক এবং নেতৃত্বস্থানীয় মানুষ। তাই প্রতিটি জিনিসকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুভব করবেন। তাই আমার চিন্তাধারা আপনার উপর কোন প্রভাব পড়বে না। তাই কারণ বলাটা অনর্থক। তখন তিনি পীড়াপীড়ি করলেন– কিছু একটা তো বলবেন। আর আমার ইচ্ছাও এমন ছিল যে, জোর দিয়ে বললে বলব। আমি বললাম– শুনুন তবে, আমার দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে, দুনিয়ার কোন জাতি কখনো সম্পদ দ্বারা উন্নতি লাভ করতে পারে না, চাই কোটি কোটি সম্পদ হোক। তেমনিভাবে কোন জাতি জনসংখ্যার আধিক্য দ্বারাও উন্নতি লাভ করতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে শুধু রাজনৈতিক উৎকর্ষতা দ্বারাও কোনো জাতির পক্ষে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। দুনিয়ার জাতি-গোষ্ঠীর উন্নতি সাধিত হয় তাদের কর্ম ও আখলাক দ্বারা।

বর্তমানকালে আমাদের দেশের চারিত্রিক অধঃপতন সর্বনিম্নে পৌঁছে গেছে, সে জন্য পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে না তো কী হবে? তিনি বললেন, সঠিক কথা বলেছেন, কিন্তু এটি একটি নীতিগত কথা, তার দৃষ্টান্ত পেশ করুন। আমি বললাম, উদাহরণ হিসেবে প্রথমে এ কথা বলা যেতে পারে যে, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বে যখন একজন হিন্দু মহিলা ঘর হতে বের হতো তখন পূর্ণ এক গজ কাপড়ের ঘোমটা তার মুখে ঝুলে থাকত এবং লজ্জাবনত হয়ে পথ চলত। বর্তমান সময়ে নারীরা শুধু ঘোমটা থেকে নয় বরং শালীন পোশাক থেকেও বের হয়ে গেছে। এমনকি আরো একটু অগ্রসর হয়ে নিজ সত্তা হতেও বের হয়ে গেছে। অনুভব করুন এমন মায়ের উদর থেকে যে সমস্ত সন্তান

জন্ম নিবে তাদের মধ্যে কেমন লজ্জা শরম এবং আত্মমর্যাদাবোধ হবে।

দ্বিতীয় কথা হলো, কখনো কখনো রেলগাড়িতে যাতায়াত করি তখন দেখতে পাই, কোন বগিতে স্কুল-কলেজের ছাত্র আরোহণ করলে আমার পার্থক্য করা দুষ্কর হয়ে যায় যে, সে কি মানুষ না অন্য কিছু। সে এমন কিছু অহেতুক ও বেহুদা কর্মকাণ্ড করে বসে যা একজন মূর্খ মানুষও করতে পারে না। চিন্তা করে দেখুন, এ জাতীয় মানুষদের কাঁধে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব এলে তারা দুশ্চরিত্রতা ছাড়া কী-ই বা ছড়াবে?

তৃতীয় কথা, রেলের সফরের সময় দেখেছি, যেখানেই শোরগোল ও হাঙ্গামা দেখা যায় সেখানেই ইক্ষুভর্তি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অনেক মানুষ নেমে পড়ে কেউ একশত, কেউ পঞ্চাশ, কেউ আবার গাট্টিভরে ইক্ষু নিয়ে নেয়। তারা মোটেও এ কথা ভাবে না যে, এই আখগুলো কি আমাদের না অন্যের। চিন্তা করে দেখুন, এমন চরিত্রের মানুষগুলোর উপর দেশের দায়িত্ব এলে তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট করা ছাড়া আর কী-ই বা করবে?

চতুর্থ কথা হলো, ব্যবসায়ীদের দিকে তাকান। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর দেশ নির্ভর করে। তাদের মধ্যে কালোবাজারি রয়েছে, রয়েছে চোরাকারবারি, আছে সিন্ডিকেটধারী ও গুদামজাতকারী। অতএব, ব্যবসায়ীদের মধ্যে খেয়ানত ও আত্মসাৎ মনোভাব ছড়িয়ে পড়লে দেশের স্থায়িত্ব কিভাবে হবে?

পঞ্চম কথা হলো, রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের প্রতি লক্ষ করুন। তাদের মধ্যে ঘুষখোরী, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি ব্যাপক হারে বিদ্যমান। ঘুষ তো এমন হয়ে গেছে যে তাকে হক ও অধিকার মনে করা হয়। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের অবস্থা এমন হলে দেশ কিভাবে কায়েম থাকবে?

আমি বললাম, এই হল বাস্তব পরিস্থিতি। তিনি বললেন, একেবারেই সত্য বলেছেন। আমি বললাম, সরকারের প্রথম ফরয ও আবশ্যকীয় কাজ হলো নিজ দেশের এহেন চারিত্রিক

অবস্থা শুদ্ধ করা। আপনারা শুধু সম্পদ এবং বিদেশী মুদ্রা পুঞ্জিভূত করার চিন্তায় থাকেন কিন্তু চারিত্রিক অবস্থা শুদ্ধ করার প্রতি কারো কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

তিনি বললেন, চারিত্রিক শুদ্ধি অসম্ভব ব্যাপার। আমি বললাম কেন? তিনি বললেন; রাষ্ট্রই তো চরিত্র সংশোধন করতে চাইবে না। কেননা চরিত্র সংশোধন হয় ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারা, আর রাষ্ট্র তো সেক্যুলার তথা ধর্মহীন– সে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে পারবে না। আমি বললাম, আমার এবং আপনার চিন্তাধারায় এখান থেকে পার্থক্য হয়ে গেছে। আপনার নিকট সেক্যুলার অর্থ হল ধর্মহীনতা। আর আমার নিকট সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হল সকল ধর্মের হুকুমাত তথা রাষ্ট্র। অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের লোক রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। আর সরকারের উপর গুরু দায়িত্ব হলো প্রত্যেক ধর্মের লোকদেরকে বাধ্য করবে আপন ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করতে, যাতে সবাই চরিত্রবান হতে পারে। তিনি বললেন, হতে পারে না। আমি বললাম, তাহলে আপনি নিজেই চাচ্ছেন যে, দেশে চোর ও ডাকাত সৃষ্টি হোক। তিনি বললেন, আপনি যা ইচ্ছা উদ্দেশ্য বের করুন কিন্তু এমনটি হবে না। আমি বললাম, একটি তদবির বলে দেব? তিনি বললেন, কি সে তদবির? বললাম, দেশ আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। সকল কিছু ঠিক করে দেব। তিনি অনেক হাসলেন। অতএব এ কথা প্রমাণ হলো যে, দেশ ও জাতির উন্নতি হয় আখলাক ও কর্মকাণ্ড দ্বারা। যখন তা খতম হয়ে যাবে তখন সবচেয়ে বড় অবনতির কারণ তাই হবে। [মাসিক আল হক পত্রিকা]

কয়েকটি খুতবায় শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী রহ. সাহেব অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. নিজেই লিখেছেন যে, উত্তর প্রদেশ মুরাদাবাদ জেলা শাখা জমিয়তের সম্মেলনে আমার ন্যায় নিষ্কর্মাকে ডাকা হয়েছিল এবং সভাপতির আসনে আসীন করা হয়েছিল। আমি সেখানে যে বয়ান পেশ করেছিলাম তা পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়েছে। আর আনুমানিক সকল দল ও জামাত তা পছন্দ করেছিল। এমনকি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ ইসহাক

সাহেব মিরাযী রহ. যিনি উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেওবন্দে এসে আমার উপস্থিতিতে হযরত মাদানী রহ. এর সম্মুখে মুখভরে আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে হযরত মাদানী রহ. অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সম্মেলনের একটি বক্তব্যের কারণে হযরতকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল।

আমি জেলে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। জেলার সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি হযরতকে তার অফিসে ডাকালেন। সাক্ষাৎকালে হযরত রহ. হেসে হেসে জেলপ্রধানকে বললেন, সম্মেলনের সভাপতি সাহেব তো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আমার মতো বৃদ্ধকে বন্দি করে জেলে আবদ্ধ করা হয়েছে। আমি বললাম, হযরত! আমিও এখন হযরতের সাথে জেলে তবে আমার জেলের সময় কম আর আপনার বেশি। [দারুল উলুম থেকে সংগৃহীত]

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলামের প্রথম খণ্ডটি যে তারতিবে শুরু করা হয়েছিল তা এমন ছিল না যে, খুতুবাত এবং মাওয়ায়েজ এবং সমষ্টি হতে কিছু খুতবাকে নির্বাচন করে তাকে প্রথম খণ্ড নামে নাম করা হয়েছে, তারপর দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য মাওয়ায়েজ নির্বাচন করা হয়েছে; বরং যে সকল খুতবা হাতে আসতো সেগুলোকে সর্বসাধারণের উপকারের জন্য আহলে ইলম আলেমদের নিকট পেশ করা হতো। বিদ্যমান অষ্টম খণ্ডে একই কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তথাপি অনির্বাচিতভাবেই এই খণ্ডে অধিকাংশ মাওয়ায়েজ এমন এসে পড়েছে যেগুলোর সম্পর্ক রাজনীতির সঙ্গে। সুতরাং অষ্টম খণ্ডটি যেমনিভাবে আলেম, সালেহ, খতিব ও বক্তাদের জন্য পথ প্রদর্শক তেমনিভাবে রাজনীতিবিদদের জন্যও মাইলফলক। বিশেষ করে যাদের রাজনীতিতে আগমনই ঘটেছে ধর্মীয় কারণে। যদি তাদের নাম হতে ধর্মকে সরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তাদের অস্তিত্ব টিকে থাকে না। অন্য শব্দে বলা যায়, আমাদের রাজনীতি ধর্মের জন্য, ধর্ম রাজনীতির জন্য নয়।

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম– একটি সামান্য চেষ্টা যে আমাদের খতিব ও বক্তাগণ যাদের সর্বসাধারণের সঙ্গে কোন প্রকার

মাধ্যম ছাড়া সম্পর্ক রয়েছে। তারা যবান ও বয়ানের সাহায্যে উক্ত কষ্টিপাথরকে অর্জন করেছেন, এগুলো উলামায়ে দেওবন্দের বিশেষ শান। যারা প্রশংসাগ্রাহী এবং সম্পদলোভী উভয় হতে বেনিয়াজ।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দীনি ও ইসলাহী এবং রাজনৈতিকভাবেও সর্বসাধারণ যাদের পবিত্র মাওয়ায়েজ দ্বারা উপকার হয়েছে তারা হলেন উলামায়ে দেওবন্দ।

হযরত হাকীমুল ইসলামকে আল্লাহ তায়ালা একটি বিশেষ আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিলেন– তিনি একই আলোচ্য বিষয়ের উপর ক্লান্তহীনভাবে অনর্গল বলে যেতেন। তাঁর বয়ানে একটি বিশেষ কাইফিয়াত তৈরি হত। তিনি নিজেও ডুবে যেতেন, শ্রোতাদেরকেও ডুবাতেন। তাঁর রাজনৈতিক খুতুবাতের মধ্যেও বাতেনী ইখলাস এবং লিল্লাহিয়্যাতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হতো।

ধর্ম ও রাজনীতি নামে যে বয়ান তিনি জমিয়তে উলামায়ে সিন্ধের আয়োজিত সম্মেলনে দিয়েছিলেন, যে সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন, সিন্ধু প্রদেশের হায়দারাবাদে জমিয়তে উলামার পক্ষ থেকে একটি বিশাল মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল যার সভাপতির সম্মানও এই নিষ্কর্মাকে দেয়া হয়েছিল। তাতে আমার সঙ্গে দেওবন্দের বেশ কয়েকজন উস্তাদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে যে খুতবাহ প্রদান করেছিলাম তা পরবর্তীতে পুস্তাকারের প্রকাশ হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে হযরত উবায়দুল্লাহ সিন্ধি রহ. নিজেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বয়ানের একপর্যায়ে একদম জোশ ও মহব্বতের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গলায় জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে বুক মিলালেন এবং করুণ সুরে কাঁদতে লাগলেন। ফলে তামাম মজলিস কাঁদতে থাকে। [দারুল উলুম]

রাজনৈতিক বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মজলিসের এমন বাতেনী অবস্থা হাকিকত ছাড়া সম্ভব নয়। আর দীন ও ধর্ম হলো এমন বিশ্বস্ততা যা ওই হাকিকতের প্রতি পথপ্রদর্শন করেন।

হায়, রাজনৈতিক রাহনুমা যাদের হাতে, কখনো তাদের হাতে যদি জাতির ভাগ্যের ফয়সালা হতো, তবে কতই না চমৎকার হতো! বাতেনী জগত সম্পর্কে জ্ঞাত হলে হাজারো সমস্যা নিজে নিজে সমাধা হয়ে যেত। আর তা তখনই সম্ভব যখন রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। আর জাগতিক স্বার্থ এবং মিথ্যা সম্মান বাতেনী দৃষ্টিকে যদি বিনষ্ট না করে। হাকীমুল ইসলাম রহ. আকাবিরদের রাজনৈতিক অবদান এবং তাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন– আমার সম্মানিত পিতাকে (হযরত মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আহমাদ সাহেব রহ., মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ) সরকারের পক্ষ হতে শামসুল উলামা খেতাব দেয়া হয়েছিল। হযরতের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী যখন উক্ত আনন্দপূর্ণ সংবাদ নিয়ে তার নিকট এলেন তখন আমি সেখানে ছিলাম। সংবাদ শ্রবণকালে সর্বপ্রথম যে বাক্যটি মুখ থেকে বের হয়েছিল তা ছিল ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি উক্ত খবর শুনে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু দেওবন্দের মুহতামিম হওয়ার কারণ হেতু ব্যক্তিগত রায় পেশ করতে পারেননি। তাই উক্ত বিষয়কে মজলিসে পেশ করলেন। মজলিসে দু'ধরনের অভিমত এলো। এক অভিমত হলো উক্ত খেতাব গ্রহণ করা উচিত। অপর অভিমত হলো তা ফিরিয়ে দেয়া উচিত, যা দেওবন্দি উলামাদের শান এবং রুচিবোধ। স্বয়ং হযরতের অভিমতও একই ধরনের ছিল। তাই কিছুদিন পর উক্ত খেতাবকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিলেন।

তেমনিভাবে সরকারের পক্ষ হতে একটি উপহার পেশ করা হয়েছিল। আর তা ছিল তার ব্যক্তিগত বস্তু। তাই তিনি পরামর্শ ব্যতীতই তা রদ করে দেন।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর সম্পর্কে সুবিদিত যে, হযরত মাদানী রহ. বৃটিশ শাসনকে নিঃশেষ এবং জাতীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা সফলতাও দান করেছিলেন। নতুন সরকার মাদানী রহ.-এর উক্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে আপন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শুধু মাতৃভূমির

মুক্তির চেষ্টা-প্রচেষ্টা মনে করছিল। আর জাতীয় সরকার নেহরু, রাজন্দর পুরশাদের মতো বড় বড় পণ্ডিতদের তাদের ব্যক্তিত্ব মোতাবেক পদমর্যাদা দিলেন। হযরত মাদানী রহ.কেও উচ্চ মর্যাদার খেতাব দান করতে চাইলেন। কিন্তু হযরত মাদানী রহ. এর চিন্তাধারা কি শুধু জাতি ও মাতৃভূমি এবং উক্ত খেতাব ছিল? নাউযুবিল্লাহ, বরং তার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। এ কারণে তিনি উক্ত খেতাবকে ফিরিয়ে দেন যে, মাতৃভূমি স্বাধীনতায় আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা কি পদমর্যাদা এবং উচ্চমর্যাদার জন্য ছিল? আরো অগ্রসর হয়ে বলেন, আকাবিরদের রদ ও কবুল স্রেফ আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দির কারণে হয়, নিজেদের নাফসের কারণে হয় না। সুতরাং একই ঘটনা যদি প্রত্যক্ষকারী এবং শ্রবণকারী একজন আরেফ বিল্লাহ হয় তাহলে তাকে রাব্বানিয়্যাতের দৃষ্টিভঙ্গি দেখবে এবং তাকে ভাল বলবে, আর যদি কোন আত্মপূজারী দেখে তাহলে সে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবে এবং তাকে মন্দ বলবে।

হযরত মাদানী রহ. উভয় কথা হতে অর্ধেক মানুষ ছিলেন। তিনি নিজস্ব চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তার নিকট প্রশংসা এবং নিন্দা একই ছিল।

উস্তাদ যউফ এর বাণী অনুযায়ী–

تو بھلا ہے تو بُرا ہو نہیں سکتا اے ذوق :: ہے بُرا وہی کہ جو تجھ کو بُرا جانتا ہے

اور اگر تو ہی بُرا ہے تو وہ سچ کہتا ہے :: پھر بُرا کہنے سے کیوں اس کے بُرا مانتا ہے

হে যউক! তুমি ভাল, তুমি মন্দ হতে পার না। মন্দ ওই ব্যক্তি যে তোমাকে মন্দ জানে। আর যদি তুমি মন্দ বা খারাপ হও তাহলে সে সত্য বলেছে, অতঃপর তাকে মন্দ বলার দরুন কেন তাকে মন্দ জান। [দারুল উলুম]

মোট কথা, রাজনীতিকে ধর্মের আত্মা থাকলে তবেই তা প্রকৃত রাজনীতি, অন্যথায় প্রাণহীন লাশ, যার দুর্গন্ধ হতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এমনকি সারা দেশ দুর্গন্ধযুক্ত হতে বাঁচতে পারে না। বর্তমান পৃথিবীর রাজনৈতিক লড়াই শুধু মৌখিক বুলির কল্পনা মাত্র যেখানে সম্পদের প্রাচুর্য মানুষের দিল ও দেমাগকে অস্থির এবং পেরেশান করে রেখেছে।

হযরতের বয়ান শ্রবণকারীদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করা, আমলের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং নিজেদের যিন্দেগীকে তার কথা মোতাবেক পরিচালিত করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এগুলো শুধু তার বাহ্যিক কথার কারণে নয়। পূর্বের কোন খণ্ডে আপনি পড়ে থাকবেন যে, হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. বলেছেন– বক্তার আন্তরিক জযবা শ্রবণকারীদের উপর প্রভাব ফেলে। যবান তো শুধু প্রকাশ করার মাধ্যম। এ কারণে অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভীতি, তাকওয়া ও পবিত্রতা এবং তায়াল্লুক মাআল্লাহ থাকলে সাধারণ পর্যায়ের বিষয়বস্তুও শ্রবণকারীদের প্রভাবিত করে। অন্যথায় উচ্চ পর্যায়ের ইলম ও মারেফাত দূরে দূরে সরে থাকে।

আমাদের দেশে যে সমস্ত আলেম এবং সাধারণ মানুষ বিদয়াত ও রুসুমে লিপ্ত তাদের সংশোধনের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা হয় তা দ্বারা সংশোধনের স্থলে শত্রুতা ও বিরোধিতা সৃষ্টি হয়। তারা হক না-হক হতে দৃষ্টিকে সরিয়ে সংশোধনের কথা শ্রবণের জন্য আগ্রহী হয় না। ফলে উভয় দল মাহফিল আয়োজনে গুরুত্ব দেয় কিন্তু বুঝা ও বুঝানোর রাস্তা বন্ধ করে ফেলে।

হিন্দুস্তানের মুম্বাইয়ের পুরো এলাকার মানুষ বিদয়াতে লিপ্ত ছিল। হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য মুম্বাই তাশরীফ নিতেন। প্রথমে সেখানকার অবস্থা কেমন ছিল পরবর্তীতে কেমন হলো সে সম্পর্কে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. নিজেই বলেন, আমি যখন প্রথমবার মুম্বাই গেলাম তো আমার বিরুদ্ধে বিদয়াতীরা বিশাল পোস্টার ছাপল এবং (নাউযুবিল্লাহ) এ কথা প্রচার করল যে দেওবন্দি কাফেরদের মধ্যে এ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কাফের। কেননা তার সাথে দেওবন্দি বড় বড় কাফেরের সম্পর্ক রয়েছে। সে শায়খুল হিন্দের মুরিদ, হযরত থানুভীর ছায়া, হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরির বিশেষ শাগরেদ এ কারণে তার মধ্যে সকল কাফেরদের সম্পর্ক রয়েছে। তাই সুন্নী ভাইদের উচিত তার চেহারাও না দেখা। অন্যথায় ঈমান রহিত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

ঘটনাক্রমে আশ্চর্যজনকভাবে উক্ত পোস্টার হযরতের জলসাতে অস্বাভাবিক লোক জমায়েতের কারণ হিসেবে কাজ করল। মানুষ পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এত বড় কাফেরের চেহারা-আকৃতি কিরূপ হয় অন্তত তা তো দেখার দরকার এবং সে মানুষদেরকে কি কি কুফরী কথা শিক্ষা দেয় তাও তো জানার প্রয়োজন। উক্ত পোস্টারে দেওবন্দি আলেমদেরকে আরো গাল-মন্দ করা হয়েছিল। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ওইদিন ওয়াজের মধ্যে এত লোক জমায়েত হল যে মুম্বাইয়ের ইতিহাসে এত বিশাল জমায়েত আর হয়নি। জলসাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল পুরাতন কবরস্থানে, যতদূর দৃষ্টি পড়ছিল শুধু মানুষ আর মানুষ দেখা যাচ্ছিল। লোকেরা আনুমানিক ধারণায় বলেছিল যে, কমপক্ষে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, তামাম বুম্বাইয়ের লোকজন একত্রিত হয়েছিল।

হযরত রহ. ওই দিন প্রায় তিন ঘণ্টা ওয়াজ করেছিলেন। তিনি নিয়মমাফিক ইতিবাচক বয়ান করেছিলেন। তিনি কুরআনের আয়াত এবং রাসূল সা. এর হাদীসের রেফারেন্সে আল্লাহওয়ালাদের ঘটনা এবং নিজের আসলাফ ও আকাবিরদের দীনি খেদমতের আলোচনা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকরভাবে বর্ণনা করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহে শ্রোতারা অনেক প্রভাবিত হন এবং সমগ্র মুম্বাইয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, যদি উলামায়ে দেওবন্দ এমন হন তাহলে তাদের থেকে উত্তম মানুষ আর কেউ হতে পারে না।

আর পরিণামে ফলাফল এমন হল যে, যে সকল মহল্লাকে দেওবন্দ বিরোধী মনে করা হতো সেগুলো থেকে বহু দাওয়াত আসতে লাগল। পরবর্তী ২৯ দিন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন মহল্লায় ধারাবাহিকভাবে ওয়াজ-নসিহত করেছিলেন– যেগুলোতে সর্বসাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের ঢল নামত। উক্ত ঘটনার পর হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব বালইয়াবী রহ. যিনি দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসীন ছিলেন, তিনি হাকীমুল ইসলাম রহ.কে ফাতেহ মুম্বাই (মুম্বাই বিজেতা) উপাধি দিয়েছিলেন।

মাজালিসে হাকীমুল ইসলাম এবং ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দের সংকলক হযরত মাওলানা মুফতি যফিরউদ্দীন সাহেব রহ. লিখেছেন– উক্ত ঘটনার পূর্বে বিদয়াতীরা মুম্বাইবাসীর অন্তরে দেওবন্দি উলামাদের প্রতি এত পরিমাণ ঘৃণা ছড়িয়ে ছিল যে, যদি কোন দেওবন্দি আলেম তাদের মসজিদে প্রবেশ করত তাহলে মসজিদ ধুয়ে পাক করত। মনে করত মসজিদ নাপাক হয়ে গেছে। কিন্তু উক্ত জলসার পর অবস্থা এমন হল যে, যারা হযরত মাওলানা আবদুশ শাকুর সাহেব রহ.কে পিস্তল দেখিয়ে ভয় দেখাতে চাইত, তারাই হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. এর হাতে বাইয়াত হয়ে অন্যায় ও অহেতুক কর্ম হতে তওবা করলেন এবং আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য চেষ্টায় মনোনিবেশ করলেন।

বেরাদারে মুহতারাম হযরত মাওলানা ক্বারী সাইফুদ্দীন সাহেব মা.জি. যিনি মক্কা মাকাররামে বসবাস করতেন এবং হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. এর রমযান মাসের উমরাকালে মাদরাসা সুলিয়াতে তারাবীর পর সাক্ষাত করতেন। তিনি হযরতের উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বিদয়াতীদের একটি বড় জামাত এবং তাদের একজন সরদার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে স্টেজের কিছু দূরে অবস্থানরত ছিলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিলেন যে, যদি উক্ত ব্যক্তি (হযরত) রাসূল সা. এর শানে কোন প্রকার বেয়াদবীমূলক কথা বলে তাহলে প্রাণ নিয়ে যেতে দিব না। কিন্তু পরিবেশ পাল্টে গেল। কিছুক্ষণ বয়ান করার পর স্টেজের পাশে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ইশারা করতে লাগল। কখনো হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. এর দিকে, কখনো ওই ব্যক্তিদের দিকে যারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বসে আছেন। হযরত রহ. বয়ান বন্ধ করে বললেন, হে সাহেব, যিনি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বসে যান। আপনার কারণে বয়ান করতে অসুবিধা হচ্ছে। আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন, আমি আপনার নিকট যাব, না হয় আপনি আসুন। বয়ানের মাঝে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

লোকটি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, হযরত! আপনি বয়ান চালিয়ে যান। আমাদেরকে বলা হয়েছিল আপনি নাকি রাসূল

সা. এর শানে বেয়াদবী ও গোস্তাখি করবেন। আর আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিলাম যে, আজ যদি আপনি গোস্তাখিমূলক কোন কথা বলেন তাহলে আমরা আপনাকে জীবিত ছাড়ব না। এখন আপনি ভয় ও ভীতিহীনভাবে বয়ান করুন। আর আমি আমাদের মৌলভী সাহেবকে বলছিলাম যে, আপনি তাকে কাফের, বেয়াদব ও গোস্তাখ বলেছিলেন। আমরা সামান্য দশ মিনিট সময় রাসূল সা. এর শানে যে সমস্ত মর্যাদাপূর্ণ কথা শ্রবণ করলাম, এমন কথা দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্তও কারও নিকট হতে শুনিনি।

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. বললেন, ঐ লোকটি বলেছিল, আপনি এক মাস পর্যন্ত দেওবন্দে যেতে পারবেন না, সারা মুম্বাই-এর স্থানে স্থানে আপনি বয়ান করবেন, আমরা আপনার সাথে থাকব।

অতএব মুম্বাইয়ের হালত আল্লাহ তায়ালার বিশেষ ফযল ও অনুগ্রহে পাল্টে গেল। উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আমাদের দেশেও হযরতের খুতুবাত বোঝা ও বোঝানোর পন্থা অবলম্বন করলে বিশাল ও ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব। আর বাস্তবতা হলো, মন্দকে মন্দ দ্বারা নিঃশেষ করা যায় না বরং ভাল দ্বারাই সম্ভব।

মুহতারাম ভাই হযরত মাওলানা ক্বারী সাইফুদ্দীন সাহেব দা.বা. বলেন, একদিন হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. এর খেদমতে আর্জি পেশ করলাম যে, আপনি তো জীবনে অনেক বয়ান ও তাকরির পেশ করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালার ফযল ও করমে অনেক দেশ সফর করেছেন। আপনি বিভিন্ন স্থানে বয়ান করেছেন। সেগুলোর মধ্যে এমন কোনো বয়ান কি হয়েছে যাতে আপনি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছেন?

তিনি বললেন– হ্যাঁ, একটি স্থান এমন রয়েছে যে, বাস্তবেই সেই দিনের কথা স্মরণ হলে আজ পর্যন্ত তবিয়ত ও মন হয়রান ও পেরেশান হয়ে যায় এবং গা শিউরে ওঠে। সে ঘটনাটি আমার জন্য আশ্চর্যের কারণ। তিনি বলেন, একবার ইন্ডিয়ার আযমগড়ে সীরাতুন্নবী সা. মাহফিল হচ্ছিল। সময়টা ছিল ডিসেম্বর-জানুয়ারির শীতকাল। এ সময়ে রাতগুলো অত্যন্ত দীর্ঘ

হয়। এশার পর জলসা শুরু হয়েছিল। বয়ান করছিলাম পবিত্র সিরাত সম্পর্কে। আমিও কিছুটা মস্ত ছিলাম, শ্রোতারাও কিছুটা মস্ত ছিল যে ফজরের আযান ধ্বনিত হতে লাগল। সারা রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। ঘড়ির প্রতি নজর করে ভাবলাম মনে হয় ঘড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু শহরের চতুর্দিক হতে আযানের সুর ভেসে আসায় সবার বিশ্বাস জন্মাল যে রাত শেষ হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত আমার আশ্চর্য মনে হয় যে, এত দীর্ঘ সময় এতটুকু সংক্ষিপ্তভাবে কেমন করে কেটে গেল অনুভব করতে পারলাম না। তিনি আরো বলেন, আজও আমার কাছে উক্ত তাকরিরকে বিস্ময়কর মনে হয়। এশার নামায যদি রাত আটটায় শুরু হয় তাহলে বয়ান শুরু হয়েছে নয়টা হতে। এভাবে আট/নয় ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল যে, কোনভাবেই অনুভব করতে পারলাম না। না শারীরিকভাবে জানতে পারলাম, না সময়ের দীর্ঘতা জানালো। তাই আজও আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। পবিত্র সিরাতের মুজেযা ব্যতীত অন্য কোন কারণ আমার বুঝে আসেনি।

অষ্টম খণ্ড সংকলনে আমার মুহতারাম ভাই হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ হানিফ সাহেব জালন্ধরী (মুহতামিম জামিয়া খাইরুল মাদারিস সুলতান)-এর প্রতি রইল অন্তরিক কৃতজ্ঞতা। চলমান খণ্ডে তার অনেক সাহায্য-সহযোগিতা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম প্রতিদান নসীব করুন। এবং তার সকল ইলমি ও আমলি প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

তেমনিভাবে মুহতারাম ভাই হযরত মাওলানা মনীর আহমদ সাহেব দা.বা. উস্তাদুল হাদীস, জামিয়া রাহমানিয়া জাহানিয়া, জেলা খানীওয়াল। তাকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, তিনি 'মাযহাব ও সিয়াসত' নামের খুতবাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম সিরিজের অষ্টম খণ্ডটি আপনাদের সামনে উপস্থিত। তার শেষের দিকে ইফাদাতে ইলম ও হিকমাতের গ্রহণযোগ্য অংশ সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি আপনারা সম্মানের নজরে দেখবেন। এগুলোর সার্বিক সম্পর্ক হযরত হাকীমুল ইসলামের প্রতি। এ শান ও মান একান্ত তাঁর-ই। আর এ নিষ্কর্মার স্থান তো একজন নাকাম

সংকলক হিসেবে। যে আপনাদের দোয়া প্রার্থী এবং মুহতাজও। নিঃসন্দেহে এ সংবাদটি আপনাদের আনন্দের কারণ হবে যে, খুতুবাতের নবম খণ্ড সংকলনের কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে। দাওয়াতে মুস্তাজাবে স্মরণে রাখবেন যেনো খায়ের ও বরকতের সঙ্গে খণ্ডটি সম্পূর্ণ করে আপনাদের হাতে পৌছানোর নেক কাজটি করতে পারি। আশা করি দোয়া জারী রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা খুতুবাতের সিরিজকে সকলের জন্য খায়ের ও বরকতের কারণ বানান এবং কবুলিয়্যাতের মর্যাদা দ্বারা সম্মানিত করেন। আমিন, ছুম্মা আমিন।

মুহাম্মদ ইদ্রিস হুসিয়ারপুরী
সদরে মুদাররিস, মাদরাসায়ে তাহফিজুল কুরআনিল কারীম
ফয়েজী রোড, মুলতান, পাকিস্তান।
২২ রবিউল আউয়াল, ১৪১১ হিজরী
১২ অক্টোবর ১৯৯০ ঈসায়ী, রোজ শুক্রবার।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

কালিমাতে তাবাররুক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِوَلِيِّهٖ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهٖ

বারাকাতুস সালফ, হুজ্জাতুল খালফ হাকীমুল ইসলাম হযরাতুল আল্লাম মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব সাহেব-এর মতো ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্বের নাম যুক্ত হওয়াই মাওয়ায়েজ ও খুতুবাত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। উলুম ও মারেফাতসম্বলিত এই মর্যাদাপূর্ণ বয়ানসমূহ আহলে ইলম, খতিবগণ, আইম্মায়ে মাসাজিদ, বক্তা ও মুবাল্লিগদের জন্য ইলম ও হিকমতের বিরাট ভাণ্ডার। শিরোনাম যুক্ত করার কারণে বিষয়বস্তু হৃদয়াঙ্গম করা অতি সহজসাধ্য হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, অত্র কিতাবটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করেছি এবং বেশ কিছু স্থানে সংশোধনের জন্য চিহ্ন দিয়েছি।

وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

আমার স্নেহের মৌলভী হাফেজ কারী মুহাম্মাদ ইদ্রিস [ফাযেলে জামিয়া খাইরুল মাদারিস, মুলতান] সাহেব দিন-রাত অবিরাম মেহনত ও অনুসন্ধান করে এটি সাজিয়েছেন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করমে আজ তা কিতাব আকারে পাঠক মহলের সামনে এসেছে। অন্তর থেকে দোয়া করি, আল্লাহ যেনো প্রিয় সংকলকের এই মেহনত ও কুরবানীকে স্বীয় রেজামন্দির মাধ্যম বানান এবং নিজ পক্ষ হতে তাকে অগাধ প্রতিদান প্রদান করেন। সাথে সাথে ইলম ও আমলে, সুস্থতা ও জীবনে বরকত দান করে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে দীনের আরো অধিক শক্তিশালী ও মজবুত সেবা করার তাওফিক দান করুন আর

আমাদের সকলকে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

جَزَاكَ اللهُ يَا اِدْرِيْسَ خَيْرًا

عَلٰى مَا صَنَعْتَ لِاَهْلِ الدِّيْنِ خَيْرًا

سنہ ہجری شمسی
۱۱-۳-۱۴۱۱ھ

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী
১১/০৩/১৪১১ হিজরী

সূ চি প ত্র

বয়ান : ১

মদিনা ইউনিভার্সিটিতে জ্ঞানগর্ভ বয়ান / ৩৯

সবচেয়ে বড় নেয়ামত / ৪১

মুবারক অনুভূতি / ৪২

দারুল উলুমের বিশেষত্ব / ৪৩

দারুল উলূম-এর পরিচয় / ৪৩

সৌদি সরকারের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড / ৪৪

মজবুত সম্পর্ক / ৪৫

বয়ান : ২

ইসলামি সম্মেলন কায়রো-এ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর জ্ঞানদীপ্ত প্রবন্ধ / ৪৬

জামিয়া আযহারের সৌভাগ্য / ৪৭

মিসর ইসলামি শক্তির ঠিকানা / ৪৮

হেজাযে মুকাদ্দাস ইবাদাতের মার্কায / ৪৮

শাম আযমাতে ইসলামের প্রকাশস্থল / ৪৯

মিসরের স্থায়িত্ব আরব জাহানের নিরাপত্তার গ্যারান্টি / ৪৯

আধুনিক সমস্যার সমাধানের বুনিয়াদী উৎস / ৫০

ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি পালনের প্রয়োজনীয়তা / ৫১

ইজতিহাদের উদ্দেশ্য / ৫৩

প্রস্তাবাবলি / ৫৩

ইসলামের তিনটি মার্কাযী সূক্ষ্ম বিষয় / ৫৪

ইসলামের ঐক্যবদ্ধ সুরক্ষা / ৫৬

দায়িত্ব পালন / ৫৬

ফিলিস্তিনের বিভক্তি ও ইসরাইলের অস্তিত্বের ওপর ভারতবর্ষের মুসলিমদের আন্তরিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ / ৫৭

বয়ান : ৩

কায়রো আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন থেকে প্রত্যাবর্তন
পরবর্তী ভাষণ / ৫৯
বাস্তব অবস্থা / ৬০
সম্মেলনের উদ্দেশ্য / ৬১
নিম্নে বর্ণিত কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয় / ৬২
মাসয়ালায়ে ইজতিহাদ / ৬২
ইজতিহাদী মাসায়েলসমূহের সমাধান আমল ও
চিন্তাশক্তি দ্বারা পেশ করা প্রয়োজন /৬৩
প্রতি যুগে নতুন মাসায়েল প্রকাশ হতে থাকবে এবং
তার সমাধানও পেশ করা হতে থাকবে / ৬৪
চিন্তা ও কর্মের একতা উম্মতের একতার কারণ / ৬৫
মানবতা আজ আন্তর্জাতিক ধর্মের খোঁজে / ৬৬
ভূপৃষ্ঠ হতে ইসলামের প্রতি সন্দেহকে রহিত করা / ৬৭
ইজতিহাদ কর্মে আসলাফের অনুসরণ / ৬৭
আরব জাহানের ঐক্যে ধর্মের গুরুত্ব / ৬৮
মিসরের শিল্প ও কারিগরি উন্নতি / ৬৯
দারুল কুরআনের ভিত্তি স্থাপন / ৭১
মদীনাতুল আযহার বা আযহার শহর / ৭১
হাজার বছরের ইলমি আযমত / ৭২
বাদশাহ নাসেরের খেদমত ও কারগুযারি / ৭২
মিসরের ধর্মীয় অবস্থান / ৭৩
মেহমানদারী / ৭৩
মিসরের রাষ্ট্রধর্ম / ৭৪
কমিউনিজমের অপপ্রচার / ৭৪
কুরআনের প্রতি মিসর জাতির প্রেমিকসুলভ মহব্বত / ৭৫
কুরআনুল কারীম হেফাজতে মিসর সরকারের
সোনালী কারনামা / ৭৬
পাশ্চাত্য তামাদ্দুনের প্রভাব দূরীকরণ / ৭৭
দূর করা সম্ভব এমনসব খারাবি / ৭৮
আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্পর্কের কার্যকরি দাওয়াত / ৭৯
হিজায সফর / ৮০
মদীনা ইউনিভার্সিটিতে বয়ান / ৮১
ভিত্তিহীন কথা / ৮২

রাবেতায়ে ইসলামিয়ার কনফারেন্সে অংশগ্রহণ / ৮৩
দারুল উলূমের আন্তর্জাতিক পরিচয় / ৮৪

বয়ান : ৪

ধর্ম ও রাজনীতি / ৮৫
পূর্বকথা / ৮৬
ইখলাসপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ / ৮৭
যুদ্ধকাল এবং যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড / ৮৭
ধর্ম ও রাজনীতি / ৮৮
যুদ্ধের শেষ পরিণতি বা সমাধান / ৮৮
স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র / ৮৯
হিন্দুস্তানের হালচাল / ৯০
ওই ধ্বংসাত্মক রোগের চিকিৎসা কী? / ৯০
মূর্খতা / ৯০
জুলুম / ৯১
গোলামি বা দাসত্ব / ৯১
কুরআনুল হাকীমের ফয়সালা / ৯২
গোলামি সম্পর্কে কুরআনের বিধান / ৯৫
সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আরব জাতি / ৯৫
রহমতে ইলাহীর প্রকাশ, ইলমে নবুওয়াত, মাকারিমে আখলাক ও
উত্তম আদর্শের অবয়বে / ৯৭
মুসলমানদের বিশ্বজয় বা বিশ্বজয়ী মুসলমান / ৯৮
মূর্খতার যুগ / ১০০
মূর্খতার আধিক্য / ১০১
চরিত্রহীনতা / ১০২
দাসত্বের পরিণাম / ১০৩
আমানতদারি ও শুদ্ধ রাজনীতি হারিয়ে যাওয়ার কুফল / ১০৩
তালীমে আহকাম, তাহযীবে আখলাক
এবং তানযীমে আমাল / ১০৬
কুরআনুল হাকীমের ইসলাহী প্রোগ্রাম / ১০৬
শরীয়ত / ১০৭
তরীকত / ১০৭
সিয়াসত বা রাজনীতি / ১০৮
ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয় / ১১০

রাষ্ট্রীয় সংবিধানে দীন / ১১৪
দীন ও সিয়াসতের মাঝে দূরত্ব / ১১৫
ইসলামি সিয়াসত ও প্রচলিত সিয়াসতের মাঝে পার্থক্য / ১১৮
ইসলামে হুকুমাতের নিযাম এবং যুদ্ধের কারণ / ১১৮
আল্লাহর হুকুমত / ১২০
হুকুমত ও জিহাদ / ১২১
ইসলামি জিহাদের উদ্দেশ্য ও ফলাফল / ১২১
ভাবনার বিষয় / ১২২
খিলাফতে রাশেদার পর / ১২৩
ভারতবর্ষে ইসলামি হুকুমতের পতন / ১২৪
হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. / ১২৪
হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. / ১২৪
শায়খুল হিন্দের যুগ / ১২৪
আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান / ১২৫
ইশাআতে দ্বীনে ইলাহী / ১২৫
কাসেমী উলূম ও দর্শন / ১২৬
ইলমি মাকার্য দারুল উলূম দেওবন্দ / ১২৬
ভবিষ্যৎ তালিমী পরিকল্পনা / ১২৬
মসজিদভিত্তিক শিক্ষা / ১২৭
দরসে কুরআন ও বয়স্ক কুরআন শিক্ষা / ১২৭
তাবলীগ / ১২৮
তাবলীগ একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম / ১২৮
মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা / ১২৯
ইত্তিহাদ (ঐক্য)-এর পূর্ণতা / ১২৯
তাবলীগের পদ্ধতি / ১৩০
ওয়াজ-নসিহত / ১৩০
জিহাদী চেতনা / ১৩১
আত্মশুদ্ধি ও জগদ্বাসীর সংশোধন / ১৩২
সুরতের (অবয়ব) প্রভাব সীরাতের উপর / ১৩৩
খানকার কর্মসূচি / ১৩৩
আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ এবং কুরআনুল কারীম / ১৩৫
হুকুমতে এলাহী প্রতিষ্ঠা / ১৩৫
হুকুমতে এলাহী ও কানুনে এলাহী / ১৩৭
জীবনরীতির হেফাজত / ১৩৭

জাতীয় প্রতিরক্ষা / ১৩৯
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পঁচিশ বছর / ১৩৯
ইতিহাসের আয়নায় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ / ১৪০
বুযুর্গানে দেওবন্দ / ১৪১
১৯১৪ ঈসায়ীর মুজাহিদগণ / ১৪১
আমীরুল হিন্দ মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. / ১৪২
হযরত মুফতিয়ে আযম রহ. / ১৪২
গঠনমূলক ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের সারসংক্ষেপ / ১৪৩
কংগ্রেস ও লীগ / ১৪৫
কংগ্রেসের গোড়াপত্তন / ১৪৫
১৯১৬ সালে কংগ্রেস / ১৪৫
একটি বাস্তবিক ধাঁধা / ১৪৬
পাকিস্তান ইস্যু / ১৪৬
পাকিস্তানের বিরোধীরা / ১৪৭
জামাত ও জামাতি প্লাটফর্ম / ১৪৯
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মূল্যায়ন / ১৪৯

বয়ান : ৫

মুসলিম পার্সোনাল ল' / ১৫১
স্থানের সৌন্দর্য / ১৫২
জিহাদ ও শাহাদাতের মার্কায / ১৫৩
মেহমানদের কদর / ১৫৩
হযরত দাউদ আ.-এর শুকরিয়া পদ্ধতি / ১৫৪
নবী করীম সা.-এর পদ্ধতি / ১৫৫
শুকরিয়া জ্ঞাপন / ১৫৬
পার্সোনাল ল'-এর অর্থ / ১৫৭
সমগ্র জগদ্বাসীর কানুন / ১৫৭
পক্ষপাতিত্বের উৎসমূল / ১৫৯
স্বভাবজাত কানুন / ১৫৯
মানবসত্তার ওপর প্রয়োগ হওয়া কানুন / ১৬০
মানবসত্তার উপর কানুন প্রয়োগের রহস্য / ১৬১
তারবিয়াতের কাল / ১৬১
অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের জন্য অত্যন্ত পরিপূরক কানুন / ১৬২
স্বভাবজাত শিক্ষা / ১৬৩

ইসলামিক পার্সোনাল ল' / ১৬৩
পার্সোনাল ল'র সংরক্ষণ / ১৬৪
সংরক্ষণের পদ্ধতি / ১৬৪
হেফাজতের মাধ্যম হওয়া সৌভাগ্যের কারণ / ১৬৫
দীনি ও প্রচলিত আইনে পার্থক্য / ১৬৬
মুসলিম পার্সোনাল ল'র উদ্দেশ্য / ১৬৭
মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর জন্য ধর্মীয় নেতাদের ঐক্য / ১৬৮
সন্তুষ্টির নেয়ামত / ১৬৯
মুসলিম পার্সোনাল ল'র বিরোধিতার নানা উপকারিতা / ১৭০
কানুনের ভিত্তি হাকিকতের উপর / ১৭৩
পার্সোনাল ল'র সেবা / ১৭৪
চিরস্থায়ী কৃতজ্ঞতা / ১৭৫
এক ধ্যান ও এক অন্তর / ১৭৬
সম্মিলিত মাকসাদ ও পরস্পর একনিষ্ঠতা / ১৭৭
বান্দার যিম্মাদারী ও আল্লাহর নুসরাত / ১৭৮
শাহে হাবশার পরাজয় / ১৭৯
পার্সোনাল ল'-এ হস্তক্ষেপের কারণ / ১৮০
মুসলিমদের কর্তব্য ও শুকরিয়া জ্ঞাপন / ১৮১

বয়ান : ৬

ইসলাম ও স্বাধীনতা / ১৮৩
আযাদীর মর্ম / ১৮৪
স্বাধীনতার ইসলামি চিন্তাধারা বা মূলনীতি / ১৮৫
বিবেক ও মনের স্বাধীনতা / ১৮৭
বাকশক্তির স্বাধীনতা / ১৮৮
মতের স্বাধীনতা / ১৯০
বাহ্যিক স্বাধীনতা অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার অনুগামী / ১৯২
অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা / ১৯২
লাঞ্ছনাপূর্ণ গোলামি / ১৯৩
একমাত্র ইসলামই আযাদীর পতাকাধারী / ১৯৪
আযাদীর মাপকাঠি / ১৯৪
ইসলামি স্বাধীনতার প্রভাব / ১৯৫

বয়ান : ৭
উত্থান ও পতন / ১৯৭
উত্থান ও পতনের মাপকাঠি / ১৯৮
শিক্ষক ও জাতির নেতা / ১৯৯
আন্তরিক প্রশান্তি / ২০০
বিশাল উন্নয়নমূলক খেদমত সেবা / ২০১

বয়ান : ৮
তিউনিস ও মারাকেশের আযাদী সংগ্রাম / ২০৩
বাস্তব পরিস্থিতি / ২০৪
আপন ইচ্ছার অধিকার / ২০৪
স্বাধীনতায় সহযোগিতা / ২০৫
তিউনিসের পরিস্থিতি / ২০৫
মরক্কোর পরিস্থিতি / ২০৬
দুটি নতুন রাষ্ট্র / ২০৭
দাবিসমূহ ও সমর্থন / ২০৭
ফ্রান্সের দেউলিয়াত্ব / ২০৮
স্বাধীনতা দাবির ধর্মীয় অবস্থান / ২০৯
মাতৃভূমি স্বাধীনতার চেষ্টা-প্রচেষ্টা অস্বীকারকারীদের উপর
আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি / ২১১
আযাদী, ধর্মীয় ও মানবিক অধিকার / ২১১

বয়ান : ৯
খেদমতের আয়না জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ / ২১৩
আকাবিরদের শুকরিয়া / ২১৪
চিন্তাধারাগত ফেতনার যুগ / ২১৫
ভিন্ন উপাদান ও মতাবলম্বীদের সার্বজনীন রাহনুমায়ী / ২১৫
জমিয়তের রাজনীতি থেকে পৃথক থাকা প্রয়োজন / ২১৬
জাতীয় উন্নয়নের দাবিসমূহ / ২১৭
সেক্যুলার হুকুমাতের তত্ত্বাবধানে মুসলিম শিশুদের
ভবিষ্যৎ শিক্ষার সুরক্ষা / ২১৭
নিসাবে তালীম ও তালীমের মাধ্যম / ২১৮
আরবী ভাষার গুরুত্ব / ২১৯

জনসাধারণের তরবিয়ত / ২২০
ইসলাহে মুআশারাত বা সমাজ সংশোধন / ২২০
জমিয়তের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য / ২২২
ভারত বিভক্তির পর জমিয়তের কর্মসূচি / ২২৩
বেকার ও বেকারত্বের বিষয় / ২২৩
জমিয়তে উলামাকে সাহায্য করা প্রয়োজন / ২২৪
জমিয়তের মূলধন / ২২৫

বয়ান : ১০
সিলেবাস প্রণয়ন / ২২৭
পূর্বকথা / ২২৮
সহীহ তালীমের আসবাব ও আমলকারী / ২৩২
চিন্তাধারা বা মূল উদ্দেশ্যের গুরুত্ব / ২৩৩
কওমী ও সরকারি ইদারার সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি / ২৩৪
নিসাবে তালিম পরিবর্তনের বিতণ্ডা / ২৩৫
বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া / ২৩৭

বয়ান : ১১
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে মূর্তিনির্মাণ / ২৪১
ধ্বংসাত্মক হস্তশিল্প / ২৪২
প্রতিকৃতি শুধু পরিচয়ের মাধ্যম / ২৪৩
শিরক ফিল মাকসুদ / ২৪৪
মূর্তিপূজা / ২৪৫
মূর্তিচর্চা / ২৪৬
মূর্তিপূজার পরিণাম / ২৪৭
সুরতপছন্দীর সর্বশেষ পর্যায় / ২৪৮
অদৃশ্য খাজানা হতে বঞ্চিত হওয়া / ২৪৯
মূর্তি বা ছবির সাথে হাকিকত জ্ঞাতদের আচরণ / ২৫০
মূর্তি বা ছবি নির্মাণকারীর পরকালীন পরিণতি / ২৫০
হাকিকাতুল হাকায়েকের অনুসন্ধান / ২৫১
তাওহীদপ্রেমিকদের ছবি ও মূর্তির প্রতি ঘৃণা / ২৫২
হাকিকত পছন্দনীয় চিন্তা-চেতনা / ২৫৩

বয়ান : ১২

একক ধর্ম / ২৫৫
একক চিন্তা-চেতনা / ২৫৬
মূলনীতি পরিবর্তন / ২৫৭
একক ধর্ম / ২৫৮
সাধারণ সমতা / ২৫৮
সীমাবদ্ধতা দূর করার একটি উসুল / ২৫৯
মহাত্মা বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী / ২৬০
সম্মিলিত ঈমান / ২৬০
ধর্মের বুনিয়াদ / ২৬১
মানবতার সম্মান / ২৬২
একক ধর্ম / ২৬২
খাতিমূলে আম্বিয়ার দীন / ২৬৬

বয়ান : ১৩

দুনিয়া ও আখেরাত / ২৬৭
বাস্তব অবস্থা / ২৬৮
দুনিয়ার আলোচনার উদ্দেশ্য / ২৬৯
আখেরাতের আলোচনার উদ্দেশ্য / ২৬৯
আকল দ্বারা আখেরাত বোঝার ক্ষতি / ২৭০
আখেরাত অস্বীকারকারীদের মতবাদ / ২৭০
দুনিয়াকে শুধু চলার পথ মনে করার মতবাদ / ২৭১
প্রথম মতবাদের জাগতিক প্রভাব / ২৭১
দ্বিতীয় মতবাদের জাগতিক প্রভাব / ২৭২
খ্রিস্টবাদ ও দুনিয়া / ২৭৩
ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি / ২৭৩
দুনিয়াতে বসবাসের পদ্ধতি / ২৭৪
সম্পদ ও ইবাদতে পরস্পর সম্পর্ক / ২৭৫
ইবাদতের উসিলার হুকুম / ২৭৬
দুনিয়া আখেরাতের উসিলা / ২৭৭
কোটিপতি ইমাম / ২৭৮
ব্যবসায় ইমাম আবু হানিফার রহ.-এর সতর্কতা / ২৭৮
ব্যয়ের খাত দ্বারা আয়ের খাতের পরিচয় লাভ / ২৭৯

ইমাম আযমের পক্ষ থেকে আলেমদের বেতন প্রদান / ২৮০
গরিবদের উপর ইমাম সাহেবের ব্যয় / ২৮০
একজন ঋণগ্রহিতার সঙ্গে ইমাম সাহেবের আচরণ / ২৮১
আর্থিক ইবাদাতের তাওফিকের মানদণ্ড / ২৮২
নেয়ামত প্রকাশ করার স্থান / ২৮২
ব্যক্তিগত হালত অনুসরণযোগ্য নয় / ২৮২
নবীজির ব্যক্তিগত জীবনের অনুসরণ / ২৮৩
নবী কারীম সা.-এর ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঝলক / ২৮৪
শরীয়তের উদারতা / ২৮৫
হাল-এর অনুসরণ নয় / ২৮৫
শরয়ী উদারতার সীমারেখা / ২৮৬
দৌলতে দুনিয়ার প্রশংসা ও নিন্দার মাপকাঠি / ২৮৬
জন্মগত মহব্বত / ২৮৭
দীন ও দুনিয়ার সম্পদ / ২৮৮
আল্লাহর বাংলো / ২৮৯
হযরত জাবের রা.-এর সম্পদ এবং অন্তরের কাইফিয়্যাত / ২৮৯
সম্পদ নিয়ে দুই সাহাবীর দুর্লভ ঝগড়া / ২৯০
দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত / ২৯১
কৃষকের দায়িত্ব /২৯২
আখেরাতের অবস্থান / ২৯২
ব্যবসার মাঝে আখেরাত লুকায়িত / ২৯৩
মৃত্যুর মাঝে আখেরাত লুকায়িত / ২৯৪
অন্যের নেক কর্ম উন্নতির মাধ্যম / ২৯৫
অন্যের মন্দ কর্ম উপদেশ গ্রহণের মাধ্যম / ২৯৫
আলেমদের সম্মান / ২৯৬

বয়ান : ১৪

ক্ষুদ্র জগৎ / ২৯৭
জগতের প্রকার ও তার অংশসমূহ / ২৯৮
ধাতুচতুষ্টয়ের কার্যকারিতায় পরিপূর্ণ সাদৃশ্য / ২৯৯
মাটির সর্বপ্রকার সিফাত মানুষের মাঝে বিদ্যমান / ২৯৯
আগুনের সর্বপ্রকার গুণ / ৩০০
পানির সর্বপ্রকার গুণ / ৩০০

বাতাসের সকল প্রকার ভেদ / ৩০১
সকল প্রকার জড় পদার্থ / ৩০১
সকল প্রকার প্রাণীজগত / ৩০২
ভূমিকম্পের প্রভাব-আলামত / ৩০২
বুদ্ধি ও সূক্ষ্মতার প্রভাব / ৩০৩
তারকারাজির প্রভাব আলামত / ৩০৩
ফেরেশতা ও শয়তানি প্রভাব / ৩০৪
আলমে গায়েব তথা অদৃশ্য জগতের সঙ্গে সদৃশ্য / ৩০৪

বয়ান : ১৫

ইল্‌ম ও হেকমতের উপকারিতা / ৩০৭
কুরআনুল হাকীম ও মানবিক উপলব্ধি / ৩০৮
মানুষের মাঝে স্বভাবজাত খারাবির স্তর / ৩১০
গাভী হায়াতের নিদর্শন / ৩১৩
স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীর হাদিস জানা থাকা প্রয়োজন / ৩১৪
স্বপ্নের ব্যাখ্যার সংখ্যা ও গণনার প্রভাব / ৩১৫
রূহানীভাবে রহমাতে নবীর বিশ্বব্যাপী প্রভাব / ৩১৬
সত্তাগতভাবে রহমাতে নবীর বিশ্বব্যাপী প্রভাব / ৩১৯
পরকালে রাহমাতে নববীর বিশ্বব্যাপী প্রভাব / ৩২০
রাহমাতে নববীর চিরন্তন প্রভাব / ৩২২
রাহমাতে নববীর অনাদি প্রভাব / ৩২৩
যিনি সমগ্র জাহানের রহমতস্বরূপ / ৩২৪
তাওয়াসসুল বা মাধ্যম বানানোর হাকিকত / ৪২৫
মীলাদুন্নবী সা.-এর জলসা / ৩২৭
আকমালে দীন তথা দীনের পরিপূর্ণতার পদ্ধতি / ৩২৮
আকমালে দীনের ইশতেহার ঘোষণা / ৩২৯
আকমালে দীন সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন / ৩৩০
খালক ও কাসব / ৩৩২
কুরআনুল কারীম তাসমিয়্যাহ ও তাহমীদ
দ্বারা শুরু করার কারণ / ৩৩৪
অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে মুতাকাল্লিমের অধিকার / ৩৩৭
আরশ হল বিশেষ রহমতের পাত্র / ৩৪০
'ইসতাওয়া'র কাইফিয়্যাত অজানা / ৩৪১

প্রসঙ্গ কথা / ৩৪৩
কবিদের আদব / ৩৪৪
সর্বসাধারণের শিষ্টাচার / ৩৪৫
আদবের বেশ ধারণ / ৩৪৭
পরিপূর্ণ আদব / ৩৪৯
ইলমের অলংকার / ৩৫১
আদবের সীমারেখা / ৩৫২
তাহাফফুজে দীনের তবিয়তগত নিযাম / ৩৫৪
যাওকে আদবের ফলাফল / ৩৫৫
গোপন গোনাহের গোপন শাস্তি / ৩৫৫
ওসায়েলে (মাধ্যম) ইবাদতের উপর সাওয়াব প্রদান / ৩৫৭
আদব পরিহারকারী শরীয়ত পরিহারকারী / ৩৫৮
ফুকাহাদের মারেফতের মাকাম / ৩৫৯
রুচিগত আদব / ৩৬০
শরয়ী কার্যাবলি অনুশীলনে তবয়ী ফলাফল / ৩৬২
আদবের উৎস / ৩৬৩
নামাজ পুরো ইসলামের মাপকাঠি / ৩৬৫
নামাজে ইবাদতের দিক / ৩৬৫
নামাজ সমগ্র কায়েনাতের সমষ্টি ও পরিপূরক / ৩৬৫
সময়সমূহের সমষ্টি পরিপূরক / ৩৬৭
নামাজ দ্বারা নফসের আমিত্ব দূর হয় / ৩৬৯
নামাজের মধ্যে তাসাউফের আলোচ্য বিষয় রয়েছে / ৩৬৯
রূহানী ও আখলাকী মাকামসমূহ / ৩৭০
হায়াতুন্নবী প্রসঙ্গে বিতর্কের অবসান / ৩৭১
সম্মিলিত মাসলাক / ৩৭১
ভুল বোঝাবুঝির ভিত্তি / ৩৭২
সম্মিলিত ক্ষতি / ৩৭৩
প্রশংসিত চেষ্টা-প্রচেষ্টা / ৩৭৪
সম্মিলিত অংশীদারিমূলক বিষয় / ৩৭৬
এই সংক্ষিপ্ত ইবারাতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা / ৩৭৭
সত্যবাদী ও ইনসাফ পছন্দকারী / ৩৭৭
নীরব থাকাই বিচক্ষণতা / ৩৭৮
শাখাগত বিষয়ে ইখতেলাফের অবস্থান / ৩৭৯
আনন্দের ঢেউ / ৩৮০

ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি / ৩৮০
আনন্দের জযবা / ৩৮১
হযরত মাওলানা মাদানী রহ. / ৩৮২
পরিপূর্ণ, সর্ববিষয়ে পারদর্শী / ৩৮২
একটি সুন্দর সমন্বয় ও মিশ্রণ / ৩৮৩
শাইখুল আরব ওয়াল আজম / ৩৮৪
রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি / ৩৮৪
সম্মিলিত চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি / ৩৮৬
আলোর উজ্জ্বল মিনারা / ৩৮৭
বাতেনী বা অদৃশ্য সঙ্গ / ৩৮৮
সাক্ষাৎকার / ৩৯০
পথের প্রদীপ / ৩৯০
ইসলাম বাস্তবায়নের শ্রেণীবিন্যাস / ৩৯১
দীনি ইলমকে ব্যাপক করা আবশ্যক / ৩৯২
ইসলামি নিযাম বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত দায়িত্ব / ৩৯৩
ইসলাম বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের কর্মপদ্ধতি / ৩৯৪
মৌলিক অধিকার ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি / ৩৯৫
মুসলমানদের একতা / ৩৯৫
আকাবিরে দেওবন্দের মিশন / ৩৯৬
ভারতীয় মুসলমানরা উন্নতির রাজপথের উপর রয়েছে / ৩৯৭
হযরত মাদানী রহ. ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা / ৩৯৭
মাওলানা আযাদ রহ. ও পাকিস্তান / ৩৯৮
আল্লাহ হাফেজ / ৩৯৯

https://t.me/islaMic_fdf

বয়ান : ১

মদিনা ইউনিভার্সিটিতে জ্ঞানগর্ভ বয়ান

জামিয়া ইসলামিয়ার ভারতবর্ষের সকল দীনি মাদারিস বিশেষ করে দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে এক প্রকার কুদরতি ও তবয়ী সুসম্পর্ক রয়েছে। কেননা, কোন সম্পর্ক যদি দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত হয়, তাহলে তা হয় শুধু ইলমি সম্পর্ক। এছাড়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক হল অস্থায়ী এবং সীমিত পরিসরে। এ কারণে আমার খায়েশ হলো জামিয়া ইসলামিয়া এবং দারুল উলুমের মধ্যকার ইলমি সম্পর্ক যেন বেশি মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





[হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. মিসর হতে হজ্জের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহ শরীফে নিলেন। অতঃপর রাওজায়ে আতহারে হাজিরা দেয়ার জন্য মদিনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলেন। সেখানে অবস্থানকালে জামিয়া মদিনা মুনাওয়ারার পৃষ্ঠপোষকগণ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. এবং তাঁর সফরসঙ্গী হযরত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেব রাহমানি রহ. সহ সকলকে জামিয়ায় আগমনের দাওয়াত করেন। জামিয়ার বিশেষ একটি মজলিসে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. এ বয়ান পেশ করেন, যাতে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রয়োজনীয় পরিচয়ের পাশাপাশি জামিয়া মদিনা মুনাওয়ারাকে খোশআমদেদ জানান।]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

সবচেয়ে বড় নেয়ামত

এ মুহূর্তটি অত্যন্ত মুবারক যে, আমি আন্তরিক আনন্দের সঙ্গে জামিয়া ইসলামিয়ার দায়িত্বশীলদের সম্মুখে আমার মনের জযবা ও আবেগ প্রকাশ করতে পারছি। আমার অন্তর কৃতজ্ঞতা ও এহসান দ্বারা পরিপূর্ণ। কারণ, আপনাদের ইখলাসপূর্ণ দাওয়াতের মাধ্যমে আমাকে এই আযিমুশ্বান দীনি প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার মর্যাদা অর্জন হয়েছে।

বাস্তবতা হলো, আজ আমার আনন্দ ও খুশি ডাবল হয়েছে। কেননা, আমি একটি মহান ইসলামি উলুমের মার্কায হতে অপর একটি গ্রহণযোগ্য দীনি মার্কাযে পৌঁছেছি। তা অবিকল এমন যে, কোন মৎস্যকে পানি থেকে বের করে পুনরায় পানিতে ফেলে দেয়া। এতে শুধু আনন্দ ও খুশিই অর্জন হয় না বরং তার শরীরে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, নতুন জীবন ফিরে আসে। আমিও এই মুহূর্তে এ ধরনের সজীবতা এবং রূহানি প্রশান্তি অনুভব করছি, যা বাস্তবে একটি নিয়ামতে কুবরা, যার জন্য আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মুবারক অনুভূতি

আমি এশিয়া মহাদেশের একটি বিশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামি প্রতিষ্ঠান হতে উপস্থিত হয়েছি, যার প্রতিষ্ঠাকাল পুরো এক শতাব্দি অতিবাহিত হয়েছে। ১২৮৩ হিজরী সনে বৃটিশ সাম্রাজ্য যখন ভারতবর্ষে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করল এবং পশ্চিমা তাহযিব-তামাদ্দুন-এর তুফান সমগ্র ভারতবর্ষকে ঘিরে ফেলল, তখন উলামায়ে মিল্লাত এহেন আশঙ্কা অনুভব করেন, যা উক্ত তাহযিব-তামাদ্দুনের ফলে উম্মতে মুসলিমাকে আক্রান্ত করে। সুতরাং তারা ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজকে পশ্চিমা তাহযীবের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য এবং দীন দ্বারা সজ্জিত এবং দীনের উপর কায়েম রাখার জন্য একটি এমন দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, যা নিজের বিশেষ তালিম ও তারবিয়াত বা শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা সালেহ ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আলেমদের এমন একটি জামাত সৃষ্টি করতে থাকবে, যারা জীবনের প্রতিটি কোণে এবং প্রতিটি অঙ্গনে পশ্চিমা তাহযিব ও ধর্মীয় দুশমনদের সামনে বুক পেতে উম্মতে মুসলিমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ফরিজা আঞ্জাম দিবেন। সুতরাং উক্ত উদ্দেশ্যকে পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য ওই যুগের আল্লাহপ্রদত্ত বুযুর্গ আলেম শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবী রহ.-এর পবিত্র হাতে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা করান।

হযরত নানুতুবী রহ. কুরআন ও সুন্নাতের একজন বড় মাপের আলেম এবং যুগের ইমাম ছিলেন। তিনি দারুল উলুমের সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস, তাঁর সনদের উপর দারুল উলুমে রেওয়ায়াত ও দেরায়াতের সূত্র চালু হয়েছে।

তখন হযরতের বিশেষ ছাত্র হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব সদরুল মুদাররিসীন ছিলেন। তারপর উক্ত মসনদে হিন্দুস্তানের সর্বপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব রহ. সমাসীন হয়েছিলেন, যিনি

হযরত নানুতুবী রহ.-এর বিশেষ তবকার ছাত্র ছিলেন। তাঁরই মাধ্যমে দারুল উলুমে দরসে হাদিস প্রকাশ পেয়েছে এবং বিশেষ মাকাম অর্জন করেছে এবং তিনিই উক্ত দীনি ইদারাকে উলুমে রাব্বানিয়ার শিক্ষার মাধ্যমে মজবুত করেছেন। আর কিতাব ও সুন্নাতের তালিম দ্বারা উক্ত দীনি ইদারার সকল দরজা ও দেওয়ালকে আলোকিত করেছেন।

দারুল উলুমের বিশেষত্ব

দারুল উলুমের আশ্চর্যজনক ও বিরল শান হলো এই যে, এর সকল উস্তাদ ও ছাত্রগণ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতকে প্রতিটি কাজের উপর অগ্রগণ্য মনে করেন এবং কিতাব ও সুন্নাত অনুসারে আমলকে সজ্জিত করে। তারা কিতাব ও সুন্নাতের খেলাফ আহকাম ও কর্মকে তাবিল ও অপব্যাখ্যা করেন না। এ কারণে বিদআতীরা সর্বদা দারুল উলূম এবং তার শায়েখদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। কিন্তু তাদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও দেওবন্দের শায়েখ ও উলামাগণ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ'র ইল্‌ম প্রচার-প্রসারে সামান্যতম অলসতা করেননি। বরং তারা কিতাব ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার এবং আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারকে নিজেদের যিন্দেগীর ওয়াজিফা এবং অভ্যাস বানিয়ে রাখেন, যার উপর আজ সমগ্র এশিয়া মহাদেশ সাক্ষী।

দারুল উলূম-এর পরিচয়

বর্তমানে অত্র প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রায় দেড় হাজার ছাত্র অধ্যায়নরত আছে। যারা হিন্দুস্তান পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া, তুর্কিস্তান এবং চীন ইত্যাদির বাসিন্দা। অত্র প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদী ইল্‌ম যার তালিম দেয়া হয়, সেগুলো হল তাফসীর, হাদিস, ফিকহ এবং উসূলে ফিকহ। কিন্তু এছাড়া আরো অনেক উলুমে আকলিয়্যা ও নকলিয়্যা তথা যুক্তিগত ও বর্ণনাগত ইলমের তালিম দেয়া হয়। ষাটজন উস্তাদ দরসের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন, যারা সকলেই অত্র ইদারা হতে ফয়েযপ্রাপ্ত এবং ফারেগ।

দারুল উলুমের পরিচালনা বাইশটি শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলো হলো– শিক্ষা, হিসাব, ওয়াক্‌ফ, বোডিং, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যুৎ, নির্মাণ, প্রকাশনা এবং কুতুবখানা বা পাঠাগার। এ ছাড়া দারুল উলুমের প্রবীণদের জন্য একটি শাখা রয়েছে, যা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং বিভিন্ন কর্মে তাদের সাহায্য করে থাকে। দারুল উলূম আপন সুন্দর কর্ম এবং আযিমুশ্বান

ইলমি ও দীনি খেদমতের বদৌলতে এশিয়া মহাদেশে মার্কাযের মর্যাদা লাভ করেছে। এমনকি তাকে আযহারুল হিন্দু বলা হচ্ছে। পূর্ণ এক শতাব্দির মধ্যে তা থেকে বিশ হাজারের অধিক আলেম তৈরি হয়েছে, যাদের মধ্যে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, ফকিহ, ওয়ায়েজ ও মুর্শিদও রয়েছেন, যারা হিন্দুস্তান এবং অন্যান্য দেশে কিতাব ও সুন্নাতের বাতি প্রজ্জ্বালিত করেছেন এবং লাখ লাখ মানুষ তাদের মাধ্যমে নিজেদের হিদায়েতের সামান প্রস্তুত করেছেন।

সৌদি সরকারের ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড

আমি উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন খাদেম হিসেবে আপনাদের জামিয়া ইসলামিয়ায় উপস্থিত হয়ে আনন্দ ও প্রশান্তির এমন কাইফিয়্যাত অনুভব করছি, যা কোন ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ, শব্দাবলি চাই যতই অর্থ প্রকাশক ও শানদার হোক না কেন অনুভূতির আসল ভাষ্যকার হতে পারে না।

বাস্তবতা হলো, জামিয়া ইসলামিয়ার মদিনায়ে মুনাওয়ারাহ এ অবস্থান হওয়া এমন একটি পদক্ষেপ, যার সংবাদ সমগ্র ইলমি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে দারুল উলূম দেওবন্দে অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের সাথে শ্রবণ করা হয়েছে। কেননা, এ মোবারক ভূমিতে কয়েক শতাব্দির পর এমন দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে সৌদি হুকুমত যেখানে হাজীদের আরাম ও প্রশান্তির জন্য সকল প্রয়োজনীয় বস্তু সহজতর করেছেন এবং হজ্বের সকল রাস্তা সহজ করেছেন। আর সৌদি সাম্রাজ্যকে অর্থনৈতিক এবং নির্মাণ ও আবিষ্কারের প্রত্যেক দিকে উন্নতির সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছিয়েছেন। তার পাশাপাশি জামিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠা ও তার গ্রহণযোগ্যতা এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব।

বাস্তবে মদিনা মুনাওয়ারা এমন একটি স্থান, যা এই সোনালি কারনামা আঞ্জাম দেয়ার জন্য উপযোগী। আর এ ভূখণ্ডই নববী মিরাছের প্রচার ও প্রসারের সঠিক হকদার। কারণ, এখান থেকেই নবুওয়তি ইল্মের ঝরনা জারি হয়েছিল, এখান থেকেই এ ইলম নির্ভরযোগ্যতায় পৌঁছে এবং এ জমিন থেকেই খিলাফতে রাশেদার আলো বের হয়েছিল। এ কারণে মুসলিম জাহানের নিকট এ শহর সর্বদার জন্য সুপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। আর তারই উলুমে শরীয়তের খাজানা হতে তারা প্রাচুর্য লাভ করছে। যেমনভাবে মক্কার পাহাড় থেকে ইবরাহীমি আহ্বানের গুঞ্জন পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছেছিল এবং মুসলিমদের অন্তর সেদিকে ধাবিত হচ্ছিল এবং তাদের কাফেলাগুলো তার ডাকে লাব্বায়েক বলে পৃথিবীর সকল অঞ্চল হতে দ্রুতগতিতে এসেছিল। তেমনিভাবে যখন মদিনা মুনাওয়ারার ভূমি থেকে

উলুমে নবুওয়াত এবং তালিমাতে ইলাহীর আহ্বান উচ্চরিত হবে, তখন কে আছে, যে তার দিকে দ্রুতগতিতে আসবে না এবং উক্ত আহ্বানে লাব্বাইক বলে সাড়া দিবে না।

ঘটনা হলো– এই জামিয়া প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্তানের সকল ইলমি এবং দীনি প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তরিক খোশআমদেদ জানাচ্ছে। তারই ভিত্তিতে তারা নিজেদের ইলমপিপাসু সন্তানদের এ জামিয়া ইসলামিয়াতে পাঠানো নিজেদের জন্য সৌভাগ্য জ্ঞান করেন। নিঃসন্দেহে তাদের সন্তানদের জামিয়ার ইলমি ঝরনা হতে ফয়েযপ্রাপ্ত হওয়া তাদের জন্য সৌভাগ্য ও খোশ নসীবের কারণ হবে।

মজবুত সম্পর্ক

জনাব! এটিও একটি বাস্তবতা যে, এ জামিয়ার সঙ্গে হিন্দুস্তানের সকল দীনি মাদারিস বিশেষ করে দারুল উলূম দেওবন্দের বিশেষ ধরনের কুদরতি ও তবয়ী সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, কোন সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত হতে হলে তা হয় ইলমি সম্পর্ক। এছাড়া অন্যান্য অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী এবং সাময়িক হয়ে থাকে। এজন্য আমার খায়েশ হলো জামিয়া এবং দারুল উলুমের এ ইলমি এবং দীনি সম্পর্ক সম্পর্ক অধিক দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত হওয়া, যা উভয় প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও উস্তাদদের মধ্যে আদান-প্রদানের মাধ্যম হবে।

পরিশেষে আপনাদের ভ্রাতৃত্বের আবেগ এবং উত্তম চরিত্রের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং দুআ করছি, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সকলকে উত্তম ও সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বয়ান : ২

ইসলামি সম্মেলন কায়রো-এ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর জ্ঞানদীপ্ত প্রবন্ধ

বর্তমান কালে বস্তুবাদ সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সবাইকে এক চিন্তাধারায় দাঁড় করিয়েছে এবং সভ্য দেশগুলোকে পরস্পর এত নিকটবর্তী করে দিয়েছে যে, সেগুলোকে একটি শহর মনে হয় এবং সকলকে একটি মাত্র ব্যবস্থাপনার উপর চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে দেখা যাচ্ছে। এ কারণে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব। উক্ত মাধ্যম হতে ফাযদা গ্রহণ করে নিজেদের দীনি ও রূহানি একক নিযাম প্রতিষ্ঠা করার কার্যকরী চেষ্টা করব, যা নিজেদের মধ্যমপন্থী মেজাযের বদৌলতে ধর্ম ও বর্ণ, দেশ ও যুগের তফাৎ থেকে ঊর্ধ্বে উঠে সাম্য ও সমতার আচরণ করতে থাকব। এটি যেমন অচলাবস্থা ও দারিদ্র্য দূর করবে, তেমনিভাবে উভয় তাহযীবের বস্তুবাদ থেকেও পবিত্র থাকবে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ•

জামিয়া আযহারের সৌভাগ্য

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আলহামদুলিল্লাহ। আজ আমরা উলামায়ে কেরাম এমন একটি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি, যেখানে আরব গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার সায়্যিদ জামাল আবদুন নাসেরের শাসনকালে জামিয়া আযহারে ইদারায়ে বুহুছে ইসলামিয়ার আহ্বানে বিভিন্ন দেশ হতে সময়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করার জন্য একত্রিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এটি একটি আযিমুশ্বান সম্মেলন যা একটি মজবুত ইসলামি একতার নমুনা পেশ করছে। তা এমন মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন ইসলামের শত্রুরা মুসলিম মিল্লাতের শৃঙ্খলা বিকৃতি করার সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করে চলছে। জামিয়া

আযহারের খোশনসীব এবং বিশাল সফলতা যা এই সায়্যিদ জামাল আবদুন নাসেরের যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, তিনি ইসলামের দুশমনদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে আমাদের এত দীনের সেবকদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক একতার সঙ্গে ইসলামি মিল্লাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের (সমস্যার) সমাধান বের করার জন্য পরস্পর সাক্ষাতের এ মূল্যবান সুযোগ করে দিয়েছেন।

মিসর ইসলামি শক্তির ঠিকানা

বুযুর্গানে মুহতারাম! মিসর ভূমি যেখানে আজ এ আযিমুশ্বান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ অঞ্চল শুধু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এতে শক্তিশালী দীনি গুরুত্বও রয়েছে, যার ফলে মুসলিম বিশ্বে তার মর্যাদা ও আন্তরিক সম্পর্ক অটুট থাকবে। আর মিসরের দীনি গুরুত্ব হাদিসে নববী দ্বারাও প্রমাণিত। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, ইসলাম হেজাযে মুকাদ্দাসকে দীনের কেন্দ্র বানিয়েছে, শামকে ইসলামের আযমত ও মর্যাদার ঠিকানার বানিয়েছে আর মিসরকে বানিয়েছে শক্তির ঠিকানা।

এতে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তায়ালা হেজাযকে ইবাদতের মাকার্য বানিয়েছেন এবং শামকে ইসলামের শান-শওকতের প্রকাশস্থল এবং মিসরকে ইসলামি ফৌজের অবস্থানস্থল ও ইসলাম অনুসারীদের শক্তির প্রদর্শনস্থল বানিয়েছেন।

হেজাযে মুকাদ্দাস ইবাদাতের মার্কায

হেরেমে মক্কা যেহেতু ইবাদতের মার্কায ছিল তাই তাকে নিরাপদ শহর বানানো হয়, যাতে তাতে ইবাদতকারীগণ পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ইবাদতে মগ্ন থাকতে পারে এবং কোন প্রকার ঝগড়া-ফাসাদ এবং মারামারি-লড়াই তার ইবাদতের পরিবেশকে বিনষ্ট না করতে পারে। এ কারণে এ নিরাপদ শহরে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

> নিশ্চয়ই আমার পূর্বে এ শহরে কাউকে হত্যা করার বা যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়নি শুধু আমাকে একটি বিশেষ মুহূর্তে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তবে পূর্বের ন্যায় এখনও হারাম হিসেবে রয়ে গেছে। তার এরিয়ার ভিতরে

গাছ ও ঘাস কাটা যাবে না, তার মধ্যে থেকে কোন শিকারকে তাড়ানো যাবে না।

শাম আযমাতে ইসলামের প্রকাশস্থল

শাম যেহেতু ইসলামি আযমাতের প্রকাশস্থল, সেজন্য তার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

> হে শাম! তুমি আমার রাগের তলোয়ার এবং আমার শাস্তির দোররা। তুমি বিক্ষিপ্তকারী, আমিই একত্রকারী। *[কানযুল উম্মাল]*

শাম সম্পর্কে ২য় হাদিস–

> আমার উম্মতের মাঝে এমন একটি জামাত হবে, যারা দামেশকে, দামেশকের আশপাশে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজাগুলোর সামনে সর্বদা যুদ্ধ করতে থাকবে। কারো অপমান করার চেষ্টা তাদের অপমানিত করতে পারবে না।

তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে–

> কাবার বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা আল্লাহর দুশমনদের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ করতে থাকবে। একটি যুদ্ধ শেষ হবে, সাথে সাথে আরেকটি শুরু হবে।

এতে বুঝা গেল, শাম কাফেরদের জন্য শাস্তির দোররা এবং কষ্টের তলোয়ার যতক্ষণ না তারা বিশেষ বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে।

মিসরের স্থায়িত্ব আরব জাহানের নিরাপত্তার গ্যারান্টি

মিসর যেহেতু ফৌজি মার্কায সেজন্য তার সম্পর্কে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর বর্ণনা হলো, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাকে মিসরের উপর বিজয় দান করবেন, তখন তুমি তা থেকে বেশি বেশি সৈনিক বানাবে। কেননা, সেই সৈনিক সকল বাহিনী হতে উত্তম হবে। হযরত আবুবকর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তা কেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কারণ, তারা ও তাদের স্ত্রীরা কেয়ামত পর্যন্ত হেফাজত ও নিরাপদে থাকবে। *[কানযুল উম্মাল]*

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল, শান্তি ও নিরাপত্তা ততক্ষণ অর্জন হয় না, যতক্ষণ না ইসলামি আযমাত ও শান-শওকত প্রতিষ্ঠা হয়। আর আযমাত ও শান শওকত ফৌজি শক্তি ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। সুতরাং মানতেকি ফলাফল এ দাঁড়াল যে, আরব জাহানের নিরাপত্তা মিসরের স্থায়িত্ব ও তার ফৌজি শক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। আর মিশই একমাত্র দেশ, যা হেজায ও শামকে সুরক্ষা করতে পারে। এজন্য এ তিন দেশ হেজায, শাম ও মিসরের একতাই বাস্তবে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের শক্তির ঠিকানা। এ ব্যাপারে আরব প্রজাতন্ত্রের প্রধান সায়্যিদ জামাল আবদুন নাসের সাহেব যে ইখলাসপূর্ণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তা অবশ্যই সুবিবেচনা এবং প্রশংসার যোগ্য। আর সবচেয়ে বেশি প্রশংসাযোগ্য কাজ হলো, তিনি যেমনভাবে আরব ও মুসলমানদের একতার জন্য মেহনত করছেন, তেমনিভাবে আলেম সমাজকে একই চিন্তাধারায় ঐক্যবদ্ধ করা এবং বর্তমান যুগের দীনি সমস্যাবলির সমাধান অন্বেষণকল্পে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা অবশ্যই খুশির কারণ ও প্রশংসনীয়।

আধুনিক সমস্যার সমাধানের বুনিয়াদী উৎস

বুযুর্গানে মুহতারাম! চলমান সম্মেলনে যে সমস্ত মাসায়েল আলোচনায় এসেছে, সেগুলোর কতক তো এমন, যা মূলনীতির মর্যাদা রাখে। যেমন– ইজতিহাদ ও তালফিকের মাসয়ালা এবং কিছু ইলমি ও আমলি মাসয়ালা। সে বিষয়ে লেখকদের লেখনি অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এমন মাসায়েল ও মাবাহেস যা অতীতকাল থেকে বিভিন্ন পন্থায় মীমাংসাকরণ ও তাহকীক হয়ে এসেছে, সেগুলো ইলমি এবং তাহকীকি গুরুত্ব সত্ত্বেও বর্তমান প্রয়োজন এর বুনিয়াদী মর্যাদা রাখে না। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্ব রাখে এমন মাসায়েলসমূহ যেগুলো দৈনন্দিন জাগতিক বস্তুগত উন্নতির কারণে নিত্যনতুন অবয়বে প্রকাশ পাচ্ছে। সেগুলোর সমাধান বের করা আমাদের জন্য এমন জরুরি, যেমনভাবে পূর্ব যুগে উলামা কেরাম ও উম্মতের চিন্তাশীলগণ নিজেদের সাধারণ মাসায়েলগুলোর সমাধান করেছেন এবং যেমনভাবে ফুকাহায়ে কেরাম নিজ-নিজ দেশে ঘটমান ঘটনাগুলোর ব্যাপারে নিজ-নিজ ফতোয়া ও ফিকহী মাসায়েলের মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমাকে রাস্তা দেখিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে আজ অতি প্রয়োজন যে এমন ফিকহি মূলনীতির উপর চিন্তা-গবেষণা করা, যার মাধ্যমে কিতাব-সুন্নাহের আলোকে উম্মতে মুসলিমার আধুনিক সমস্যার (মাসয়ালার) সমাধান বের করা সহজ হয় এবং উসুল ও কাওয়াইদ যে

দলিলের ভিত্তিতে সংকলন করা হবে, তা যেন কুরআন ও হাদিসের সাহায্যে হয়, যাতে উম্মতে মুসলিমার সামনে ইসলামি শরীয়তের পথ সহজতর হয় এবং কারো জন্য কার্যক্ষেত্রে ওজর-আপত্তি করার সুযোগ না থাকে। পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার এই হুজ্জত যে 'কুরআনুল কারীম সর্বকালে সব বিষয়ের জন্য একটি সুস্পষ্ট বয়ান' এটি তার বান্দাদের জন্য পুরো হয়।

মানসাবে নবুওয়াত তথা নবীর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

> আপনার উপর কুরআনুল কারীম এজন্য নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষদের এমন আহকাম বর্ণনা করেন, যেগুলো তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে।

আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য বান্দাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

> আপনি এমন লোকদের রাস্তা অবলম্বন করুন, যারা আমার প্রতি মনোনিবেশ করে।

তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা সর্বকালের মানুষদের উপর আহলে ইল্‌ম এবং মুফতিদের অনুসরণ ও অনুকরণকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। সুতরাং আধুনিক মাসয়ালার সমাধান জগতে পা রাখার পূর্বে আমাদের উপর জরুরি হলো উক্ত তিনটি বুনিয়াদী বিষয়কে সামনে রাখা। আর যেহেতু আমাদের আবিষ্কৃত সমাধান এবং সংকলন করা উসুল ও কাওয়াইদ এর ভিত্তি হল উক্ত তিনটি উৎসমূল, সেজন্য নিরুপায় হয়ে প্রতিটি মানুষ তার উপর আমল করবে এবং তথাকথিত আলোচনার দ্বার বন্ধ হবে যে, ইজতিহাদের দরজা খোলা আছে নাকি বন্ধ হয়ে গেছে? তেমনিভাবে ইজতিহাদে কুল্লিয়া এবং ইজতিহাদে জুযয়ীর আলোচনাও বন্ধ হবে। সারকথা, হলো বিদ্যমান মাসায়েল ও জিন্দেগীর দুষ্কর বিষয়গুলোকে শরীয়তের সঙ্গে ইলমি ও আমলিভাবে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা অতীব জরুরি কাজ।

ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি পালনের প্রয়োজনীয়তা

বুযুর্গানে মুহতারাম! ইতিহাস সাক্ষী, আমাদের আকাবির ও আসলাফগণ যখন কোন রাষ্ট্রে বা শহরে প্রবেশ করেছেন, তখন তাঁরা ওখানকার তাহযীব-তামাদ্দুন, সংস্কৃতি, আদব, সামাজিকতা ও ভাষা ও জ্ঞান ইত্যাদির উপর নিজেদের নিজস্ব রং ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারা নিজেরা বিজয়ী হয়েছেন, অন্যদের পরাজিত

করেছেন। তেমনিভাবে তারা শুধু দীনের রূহ এবং ইসলামের জাওহারকেই সংরক্ষণ করেননি বরং ইসলামি রূহের বিপরীত প্রতিটি বস্তুর মূলোৎপাটন করেছেন। উক্ত কথা ও কাজের চাক্ষুষ সাক্ষী হলেন হযরত আমর ইবনুল আস রাযি.-এর ঘটনা। তিনি যখন জানতে পারলেন, নীল দরিয়ায় পানি প্রবাহের জন্য একজন রমণীকে বলি দিতে হয়, তখন তিনি সেদিকে নজর দিলেন এবং ভিত্তিহীন কুসংস্কার মূলোৎপাটন করে ইসলামের সঠিক আকিদাকে সংরক্ষণ করেন। তিনি লোকদের বুঝিয়ে দিলেন দরিয়ার প্রবাহ হওয়া ও না হওয়া শুধুই আল্লাহর হাতে। নারী বলিকে দরিয়া জারির উৎস বানানো ইসলামবিরোধী এবং অজ্ঞতামূলক আকিদা।

তেমনিভাবে সাক্ষী হয়ে আছে হযরত হুযাইফা রাযি.-এর ঘটনা। আহারকালে তাঁর হাত থেকে লুকমা পড়ে গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ তুলে নিলেন। তাঁর এ কাজটি তাঁর ফার্সি গোলাম নিন্দনীয় ভেবে বললেন, আমাদের এলাকার এহেন কাজ দূষণীয় এবং অনুচিত ভাবা হয়। গোলামের কথা শুনে তিনি বললেন, ঐ আহম্মক ও নির্বোধদের খাতিরে আমি আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ছেড়ে দিব?

মোটকথা হলো, আমাদের আসলাফ তথা পূর্বসূরী ও আকাবিরগণ কখনো অন্যদের সামাজিকতা এবং রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবিত হননি, বরং তারা নিজেদের আমলি শক্তি দ্বারা নিজেদের সামাজিকতাকে অন্যদের সামাজিকতার উপর বিজয়ী করেছেন। এ কারণে আমরা আজও যদি ইসলামের পূত-পবিত্র এবং ত্রুটিহীন তাহযীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে জগতবাসীর সামনে তার আমলি নমুনা পেশ করি, তাহলে লোকেরা আমাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে বাধ্য হবে। ধরে নেয়া যাক, আমরা যদি উল্লিখিত সকল গুণের উপর আমল নাও করতে পারি, তাহলে কমপক্ষে এতটুকু অবশ্যই করব যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের এমন তাহযীব তামাদ্দুনগুলো গ্রহণ করব, যেগুলো ইসলামি শিক্ষা ও তার রুহ ও মেজাযের পরিপন্থী নয় এবং তাদের সঙ্গে আমাদের কর্মকাণ্ড এমন পরিধির মধ্যে হবে, যা ইসলামবিরোধী নয়। আর আমরা প্রতিটি কাজকর্ম তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে করব না।

ইজতিহাদের উদ্দেশ্য

কেউ যদি নিজকর্মকে বৈধ করার জন্য দলিল-প্রমাণ অন্বেষণ করে, ভ্রান্ত ইজতিহাদ করে, যার উদ্দেশ্য নিজকর্মের উপর কাওয়াইদ ও উসূলে দীনকে উপযোগী করা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এ কারণে জরুরি হল আমাদের ইজতিহাদ হবে শুধু-দীন ও ইসলামের সেবার জন্য; দুনিয়াকে দীনের উপযোগী করার চেষ্টা নয়। যে ব্যক্তি নিজের দীনকে ধ্বংস করে দুনিয়া সাজানোর চেষ্টা করে, তার নিকট দীন থাকে না এবং তার সংশোধনও সম্ভব হয় না।

বুযুর্গানে মুহতারাম! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দীনের পরিধিতে না আছে কোন সংকীর্ণতা এবং না আছে সম্পূর্ণ দুনিয়াত্যাগী বানানোর রুহবানিয়্যাত। কিন্তু ইলমি ও আমলি জীবন-যাপনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলোর তাকাজা হল, তারা প্রতিটি অঙ্গনে সুস্পষ্ট এবং প্রকাশমান থাকবে। শরীয়তে মুহাম্মাদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাস্তবে এমন সকল আদব ও উসূলের সমষ্টির নাম, সেগুলোর মাধ্যমে মানুষ আপন জীবনের প্রতিটি কোণে রাহনুমা ও পাথেয় পাবে। এজন্য নবুওয়াতী যুগে কিছু মুশরিক বলেছিল, তোমাদের নবী কি তোমাদেরকে প্রত্যেক বিষয়ে তালিম দেন? এমনকি পেশাব-পায়খানারও? এ কারণে তারা কোন সাইড ও দিককে অস্পষ্ট রাখেননি। এমন উসুল ও মূলনীতি প্রদান করেছেন, যার আলোকে সকল কর্মকাণ্ডের ভাল ও মন্দ যাচাই করা যাবে। সত্যিকার অর্থে ইদারায়ে বুহুছে ইসলামিয়া উলামায়ে ইসলামকে যুগের সমস্যাবলির উপর চিন্তা-গবেষণার আহ্বান করে একটি আযিমুশ্বান দীনি ও জাতীয় খেদমতের প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে। সেজন্য আমরা উক্ত ইদারা এবং জামিয়া আযহার ও মুত্তাহিদায়ে আরব জমহুরিয়ার শোকারিয়া জ্ঞাপন করছি। এরই ধারাবাহিকতায় আমি কিছু প্রস্তাব পেশ করছি। আশা করি, সেগুলো ইদারার উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্যকারী হবে।

প্রস্তাবাবলি

এক. এমন কিছু মাসায়েল সংকলন করা জরুরি, যেগুলো আমাদের সমাজিকতার অংশ হতে পারে এবং যেগুলো ব্যতীত দিনাতিপাত করা বর্তমান আধুনিককালে অসম্ভব। যেমন– সুদমুক্ত ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স ও বীমার মাসায়েল, মাল আমদানি ও রফতানির মাসায়েল। এ সংক্রান্ত মাসায়েলগুলো বাস্তবিক ধরন ও নমুনায়

সংকলন করা উচিত। এগুলোর জন্য কৃত্রিম ধারণাসমূহ সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই।

দুই. উল্লিখিত বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্বকারী উলামাদের মাঝে বণ্টন করা প্রয়োজন, যাতে তারা তাতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে চিন্তা ও গবেষণা করার পর উত্তরমালা এবং সুনিশ্চিত রচনাবলি পেশ করতে পারেন। অতঃপর যখন সমস্ত উলামায়ে কেরাম কোন একটি বিষয়ে ঐক্যমত হবেন এবং পূর্ণাঙ্গ রায় এর সঙ্গে সংকলন হয়ে যাবে, তখন 'মুজমুয়ায়ে বুহুসুল ইসলামী' উত্তরদাতা উলামাদের দস্তখতসহ সমগ্র মুসলিম জাহানের উপকারার্থে উত্তর ও রচনাগুলো প্রকাশ করবে। এভাবে প্রতিটি দেশের মুসলমানদের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য সমাধান সামনে আসতে পারে।

তিন. আমরা লক্ষ্য করছি, বর্তমানকালে মাদ্দি জীবনোপকরণ সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ এর উপর আধিপত্য বিস্তার করে সেগুলোকে একই চিন্তাধারায় দাঁড় করিয়েছে এবং শৃঙ্খলিত ও সভ্য দেশগুলোকে পরস্পর এত নিকটবর্তী করে দিয়েছে যে, তা এক শহর মনে হচ্ছে। আর সবাই একই সংবিধানের উপর পুরোপুরি চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই আমরা মুসলমানরা কেন পিছিয়ে থাকব। আমরাও উক্ত জীবনোপকরণ থেকে উপকৃত হয়ে নিজেদের দীনি ও রুহানি একক সংবিধান প্রতিষ্ঠা করার কার্যকরী চেষ্টা করব যে, যা নিজের মধ্যমপন্থা মেজাযের বদৌলতে দল-মত, বংশ-ভাষা স্থান-কাল রং ও বর্ণের পার্থক্যের ঊর্ধ্বে ওঠে সমতার ব্যবহার করতে থাকবে। এটি যেমনভাবে দরবেশী-সন্ন্যাসী হতে দূরে থাকবে, তেমনিভাবে উভয় তাহযীবের মাদ্দিয়াত হতেও পাক থাকবে।

ইসলামের তিনটি মার্কাযী সূক্ষ্ম বিষয়

বুযুর্গানে মুহতারাম! ইসলামের তিনটি মার্কাযী নুকতা রয়েছে। ১. আসমানি গ্রন্থ কুরআনুল কারীম, ২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত, ৩. খানায়ে কাবা, যা ইবাদাতের কিবলা এবং উম্মাতে মুসলিমার এক সংবিধানের মাধ্যম। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ

সমগ্র বিশ্বের নসিহতের মাধ্যম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

সমস্ত সৃষ্ট জীবের রহমতের কারণ।

نَذِيْرًا لِّلْعٰلَمِيْنَ

সমস্ত মাখলুককে শেষ পরিণামের ভীতি প্রদর্শনকারী।

আর খানায়ে কাবা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

তামাম জাহানের হিদায়েতের মাধ্যম।

তেমনিভাবে ইসলাম যেন একটি বিশ্ব উম্মতকে উক্ত তিনটি বুনিয়াদের উপর কায়েম করে, তা সমগ্র মানুষের জন্য প্রকাশ করেছে। আর এ কারণে দীনি একতাকে হুজ্জত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

আমার উম্মত গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।

অতএব, এ উম্মতের ভিত্তি যেহেতু ঐ আযিমুশ্বান কার্যাবলির উপর, যা সর্ব প্রকার মাদ্দি, জাতীয়, দেশী এবং বংশ ও বর্ণর বিশেষত্ব হতে উর্ধ্বে, তাই প্রয়োজন হলো সর্বসাধারণের মধ্যে তার দাওয়াত ও তাবলীগের পরিধিকে সুপ্রশস্ত করা।

আশা করি উক্ত প্রয়োজনকে সামনে রেখে মাজমুয়ায়ে বুহুসুল ইসলামী নিজের পরিধিকে সুপ্রশস্ত করবে। আর সেজন্য বিভিন্ন দেশে খ্রিস্টান সংস্থা এবং মিশনারির ন্যায় নিজের দাওয়াতি ও তাবলীগি মিশন এবং প্রতিনিধিদল পাঠাতে থাকবে।

আশা করি, প্রতিটি মুসলমান উক্ত তাবলীগি প্রতিনিধিদলকে শুধু মোবারকবাদই জানাবে না বরং পাশাপাশি উক্ত দাওয়াত ও তাবলীগে নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে সাহায্য-সহযোগিতাও করবে। আর দাওয়াত ও তাবলীগের ফলে মুসলমানদের জীবনের বিভিন্ন শাখায় ইসলামি শিক্ষা এবং ইসলামি রীতিনীতি ও রসুম ও রেওয়াজ পশ্চিমা তাহযীব-তামাদ্দুনকে স্পর্শ করা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম নমুনা ও জীবনাদর্শ।

ইসলামের ঐক্যবদ্ধ সুরক্ষা

মুহতারাম উপস্থিতি! আমাদের আন্তরিক তামান্না এবং খায়েশ যে মাজমুয়ায়ে বুহুসুল ইসলামীর চেষ্টা-প্রচেষ্টা ইসলামের সুরক্ষা এবং হেফাজতের জন্য আরো বেগবান করবে এবং ইউরোপিয়ান এবং ইসলামের শত্রুদের আপত্তি, সমালোচনা ও দাতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। আর আমাদের আরেকটি আন্তরিক তামান্না হলো মাজমুয়ায়ে বুহুসুল ইসলামী এবং বিভিন্ন দেশ হতে আগত ব্যক্তিত্বদের মাঝে একটি স্থায়ী এবং এবং মজবুত সুসম্পর্ক যেন কায়েম থাকে। সেজন্য দুশমনদের পক্ষ থেকে আরোপিত আপত্তি ও সমালোচনাসমূহ এ সকল ব্যক্তিত্বদের নিকট পাঠানো হবে, যাতে তারা নিজেদের চিন্তাধারা মোতাবেক উত্তর লিখে ইদারাতে পাঠাবেন। তারপর ইদারা তা প্রকাশ ও প্রচারের দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে। এভাবে ইসলামের এ প্রতিরোধ নিঃসন্দেহে ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী হবে।

সময়োচিত হবে যদি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হতে কয়েকজনকে নির্বাচন করে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যারা উল্লিখিত প্রকার মাসায়েলের উপর চিন্তা-গবেষণা করবে। অতঃপর কমিটির মাধ্যমে ঐ প্রশ্নগুলো ইদারাতে পাঠাবে। তাহলে এটি ইসলামের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী শানদার নিযাম হতে পারে।

দায়িত্ব পালন

অতএব আমাদের আশা হল, এ ইদারা ঐ সকল মাসায়েলের একটি ব্যাপক ইদারা হিসেবে গণ্য হবে। আর ইনশাআল্লাহ এ ইদারা ইসলামি তাহযীব ও সংস্কৃতির বিষয়ের উপর উপকারী সংকলন বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করবে।

এ কয়েকটি খেয়াল সংক্ষিপ্তাকারে ইদারার দায়িত্বশীলদের সামনে পেশ করার পর, সর্বপ্রথম সায়্যিদ জামাল আবদুন নাসের সাহেবের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তারপর সম্মেলনের সভাপতির এবং জেনারেল সেক্রেটারি জনাব ড. মাহমুদ হাসবুল্লাহ সাহেবের খেদমতে শোকরিয়া হাদিয়া প্রেরণ করছি।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

ফিলিস্তিনের বিভক্তি ও ইসরাইলের অস্তিত্বের ওপর ভারতবর্ষের মুসলিমদের আন্তরিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ

[এই প্রবন্ধটি হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. গাজায় (মিসরে) পেশ করেছিলেন, যাতে ফিলিস্তিনের অবৈধ বণ্টন এবং ইসরাইলের অস্তিত্ব ভারত মুসলিমদের আন্তরিক জযবার প্রকাশ এবং ইহুদীবাদী ইসরাইলের ধ্বংসাত্মক হামলার ধারাবাহিকতায় মিসর ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি ভারতীয় মুসলিমদের হামদর্দী ও তাদের কার্যকরী সাহায্যের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। ইসলামি একতার দাবি হল, সমগ্র বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা পরস্পর একে অপরের সুখ-দুঃখে অংশীদার হবে। তাদের শরীর চাই কোটি ভাগে বিভক্ত হোক কিন্তু আত্মা এক থাকবে। আশা করি, হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর এই রচনাটি ইসলামি একতা এবং ভ্রাতৃত্বের দাওয়াতকে যিন্দা করবে। *[ইদারা]*

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বুযুর্গানে মুহতারাম!

বিশ্ব মুসলিম বিশেষ করে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের জন্য ঐ বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল, যখন বৃটিশ সাম্রাজ্য ইহুদীদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য ফিলিস্তিনকে দু'ভাগ করে ফেলে এবং ইহুদীবাদীদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের স্বপ্ন পূরণ করে। বৃটিশদের এহেন জঘন্য কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সারাবিশ্বের মুসলিম সমাজ প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এমনিক যে সকল মুসলিম জাতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল তারাও বৃটিশবিরোধী প্রতিবাদ সম্মেলন এবং কনফারেন্সের আয়োজন করেন। তারা বৃটিশদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও প্রতিবাদ রেজুলেশন পাশ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ভারতের বুম্বাই শহরে আমার সভাপতিত্বে একটি প্রতিবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমি উক্ত সম্মেলনে বলেছিলাম মুসলিম জাতি ফিলিস্তিন বিভক্তিকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না। ধর্মীয়, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক কোনভাবেই নয়। আজ ইতিহাস পুনরায় এ কথা প্রমাণ করে দেখাল যে, মুসলমান যেখানেই থাকুক তারা একক শক্তি এবং এক জাতি। যাদের একতাকে দেশ ও মানুষের মতানৈক্য খতম করতে পারে না। এ হিসেবে বলতে পারি, ফিলিস্তিন সমস্যা শুধু

আরবদের সমস্যা নয় বরং এটি একটি ইসলামি ও ধর্মীয় সমস্যা, যার সম্পর্ক সকল মুসলমানদের সঙ্গে জড়িত।

অদূর অতীতে আরব প্রজাতন্ত্র মিসরের উপর যে শক্তিশালী ধ্বংসাত্মক হামলা হয়েছে বাস্তবে তা ইসলামি দুমশনদের গোপন ইচ্ছার এবং সমস্ত কুফুর একই জাতি এ কথার বহিঃপ্রকাশ ছিল। উক্ত হামলার উদ্দেশ্য এছাড়া অন্যকিছু নয় যে, আরব দেশগুলোর উপর দ্বিতীয়বার আধিপত্য বিস্তার করা। আর আরব ও মুসলিম দেশগুলোকে কবজা করা এবং ইসরাইলের জন্য রাস্তা পরিষ্কার করার নতুন একটি রাষ্ট্রীয় চাল ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে সায়্যিদ জামাল আবদুন নাসিরকে উক্ত শক্তিশালী হামলার মোকাবেলায় কল্পনাতীত বিশাল সফলতা দান করেছেন। ফলে ইসলামের শত্রুদের এমন লজ্জিত এবং পরাজয়ের চেহারা দেখতে হয়েছে, যা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উক্ত আক্রমণের কারণে সবচেয়ে বড় উপকার হল যে, আরব্য মুসলিম সমাজকে চাঙ্গা করল। তারা সুন্দররূপে বুঝতে পারল, ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য ইসলামি কর্মকাণ্ডের সুরক্ষা তখন পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ-না সকল মুসলমান এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ও একজোট হবে।

আমি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের মহাপরিচালক হিসেবে এবং আমার সফরসঙ্গী মাওলানা সাইদ আহমাদ সাহেব আকবারাবাদী, মুসলিম ইউনিভার্সিটি আলীগড়ের ইসলামী বিভাগের প্রধান এবং মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রাহমানি আমীরে শরীয়ত বিহার প্রদেশ। আমরা ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি, আমরা সবাই ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধানে সর্বদা নৈতিক জাগতিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সব সময় তৈয়ার আছি।

ওয়াসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মুহাম্মদ তৈয়ব

মহাপরিচালক, দারুল উলূম দেওবন্দ

বয়ান : ৩

কায়রো আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন থেকে প্রত্যাবর্তন পরবর্তী ভাষণ

আমরা নিজ নিজ ধারণা অনুপাতে ইজতেহাদী মর্যাদার হকদার প্রমাণ করার জন্য আপন আপন শক্তি ব্যয় করি। ফিকরী শক্তিসমূহ দ্বারা মাসায়েলের কার্যকরী সমাধান পেশ করা যথাযথ হবে, যাতে মাসয়ালাগুলো তাদের নিজস্ব হাকীকী দলিল-প্রমাণসহ প্রকাশ্যমান হতে পারে আর তা গ্রহণ করা বা না করা উভয়ের ফয়সালা করা যেতে পারে। সুতরাং ব্যক্তিদের ইজতেহাদী শক্তিসমুহের উপর চিন্তা-গবেষণার স্থলে মাসয়ালার উপর চিন্তা করা অধিক সহজ এবং সংক্ষিপ্ত পন্থা ও পথ হবে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ.
وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ.
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ
اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

বাস্তব অবস্থা

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব মুহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ। তিনি ১৯৬৪ ঈসায়ীর ৬ মার্চ মিসর গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ওখান থেকে পবিত্র হেজাযে হজ্জ সমাপ্ত করে ১৯৬৪ ঈসায়ীর ১৯ মে দেওবন্দে ফিরে আসেন। দেওবন্দ স্টেশনে হযরতকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য ছাত্র, উস্তাদ, অফিসিয়াল সদস্য এবং শহরবাসীর বিশাল সমাগম ছিল। ছাত্ররা আনন্দে বিভিন্ন রকমের স্লোগান দিচ্ছিল। মুলাকাত-সাক্ষাত, মুসাফাহা এবং দুআর জন্য বিশেষ শৃঙ্খলা করা হয়েছিল। সেগুলো উস্তাদদের তত্ত্বাবধানে কার্যকরী হয়েছিল। দেওবন্দের ছাত্রদের আবেদনের প্রেক্ষিতে দারুল হাদিস কক্ষে একটি আযিমুশ্বান জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। হাদিস কক্ষ মানুষের ভিড়ে ঠাসা ছিল। সেখানে হযরত রা. বয়ান করার আবেদন গ্রহণ করে নেন। উক্ত জলসার সভাপতি নির্ধারণ করা হয়েছিল দারুল উলূমের উস্তাদ হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেবকে। জলসার প্রারম্ভে ছাত্র এবং কয়েকজন শহরবাসীর পক্ষ থেকে সুস্বাগতম জানিয়ে কবিতা আবৃতি করা হয়েছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিপ্লবী কবি আল্লামা আনওয়ার সাবেরীর কবিতা, যা জলসার মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ছড়িয়ে ছিল। পরিশেষে হাকীমুল ইসলাম রহ. আনন্দধ্বনির গুঞ্জনের মধ্যে

একটি অলংকারপূর্ণ ও সারগর্ভ তাকরীর আরম্ভ করেন, যা প্রায় দুই/আড়াই ঘণ্টাব্যাপী চালু ছিল। হযরত রহ. আযিমুশ্বান বিশাল সংবর্ধনার শোকরিয়া জ্ঞাপন করে মিসর ও হিজায সফরের প্রতিক্রিয়া, প্রভাব এবং কায়রো আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলন এবং মদিনা ইউনিভার্সিটির সম্মেলনের চিত্র ও অবস্থা আলোকপাত করেন।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য

হাকীমুল ইসলাম রহ. বললেন, কায়রোর আন্তর্জাতিক ইসলামি মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্যের বিশদ বর্ণনা দাওয়াতনামায় ছিল না। তাতে সংক্ষিপ্তাকারে দাওয়াতে মাকসাদ উল্লেখ ছিল যে, আধুনিক সমাজে সৃষ্ট মাসায়েলের শরয়ী তাহকীক ও সমাধান এবং এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম বিশ্বে উলমাদের পরস্পর সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়েছে, যা দ্বারা বিশ্ব মুসলিমদের মাঝে একতার জযবা অনুভব হয়েছিল। পাশাপাশি মিসরে মার্কাযী শহরগুলোর ভ্রমণ, বিশেষ করে সম্মেলনের অধিবেশন এবং কাজের গতি দ্বারা যে সকল উদ্দেশ্য ও মাকসাদ আমার মেধাশক্তি আয়ত্ত করতে পেরেছে সেগুলোর নির্যাস হল এই যে–

এক. আধুনিক তামাদ্দুন এবং আধুনিক গবেষণালব্ধ মাসায়েল সম্পর্কে জামিয়া আযহারের গ্রহণযোগ্য উলামাদের চিন্তাধারা হতে উসুলিভাবে উপকৃত হওয়া।

দুই. বিভিন্ন দেশের আলেম এবং দীনি জামাতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাশাপাশি সম্মেলন দ্বারা তাদের মাঝে ইলমি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যে সম্মেলন সারা মুসলিম বিশ্বের সাধারণ ঐক্যবদ্ধতার মাধ্যম প্রমাণিত হয়।

তিন. জামিয়া আযহারের নতুন নির্মাণের ভিত্তিস্থাপন এবং জামিয়ার হাজার বছরের অবদান ও আযমতের পরিচয়।

চার. মিসর সরকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দীনি পদক্ষেপের ঘোষণা এবং সুসংবাদ।

পাঁচ. ফিলিস্তিনের অবৈধ বিভক্তির সমালোচনা এবং দখলকৃত ফিলিস্তিন পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক প্রস্তাব অনুমোদন করা।

ছয়. মিসরের আধুনিক উন্নতি এবং মিসরী জাতির চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতি জাগ্রত করা।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও মাকসাদ সামনে রেখে কায়রোর আকাশচুম্বি প্রাসাদে সম্মেলনের বৈঠক শুরু হয়, যাতে আটত্রিশটি দেশের সত্তরজন আলেম প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। মিসরী উলামাগণ উক্ত সংখ্যার বাইরে। বৈঠকে প্রায়

সোয়াশো আলেম প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের সকল প্রতিনিধিগণ ফুযালায়ে দেওবন্দ ছিলেন। বৈঠকের কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ও নিয়মতান্ত্রিক ছিল। প্রথম দিন থেকে আর্ট পেপারের একটি সুন্দর পুস্তিকা প্রোগ্রামের নামে ছাপিয়ে প্রতিনিধিদের সম্মুখে রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রথম দিন হতে শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিধিনের কর্মসূচি ঘণ্টা ও মিনিটসহ লেখা হয়েছে। সে অনুযায়ী কনফারেন্স চলবে এবং প্রতি দিনের কর্মসূচি এবং পঠিত রচনাবলি ও আলোচনাবলি ছাপা হয়ে দ্বিতীয় দিন প্রতিনিধিদের সামনে এসে যেত। ফলে নিজেদের অভিমত পেশ করা সুযোগ পেতাম।

নিম্নে বর্ণিত কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয়

প্রথম উদ্দেশ্যের অধীনে যে সকল বিষয়াবলির প্রতি প্রোগ্রাম গুরুত্বারোপ করেছে এবং যেগুলোর উপর বক্তারা বক্তৃতা করেছেন সেগুলো হলো এই–

এক. ইসলামে সম্পদের বণ্টননীতি।

দুই. আরব ও ইসলাম বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভের স্বভাবজাত কারণগুলো।

তিন. ইসলামে ভূমির ব্যক্তিমালিকানা এবং তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া।

চার. ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অংশের প্রকারভেদ।

পাঁচ. ইসলাম ধর্মে আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের বিধান।

ছয়. ইসলামে ইজতিহাদের অতীত ও বর্তমান।

সাত. ইসলামে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক।

আনুমানিক উক্ত শিরোনামে রচনা পাঠ করা হয়েছে এবং বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছে।

মাসয়ালায়ে ইজতিহাদ

নতুন মাসায়েল ও সমস্যাবলির উপর আলোচনা ও পর্যালোচনার ধারাবাহিকতায় ছয় নম্বর বিষয় ইজতিহাদের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়, যা ছয় নম্বর স্থানে থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিন হতে আলোচনায় ওঠে আসে এবং এ সম্পর্কিত আলোচনায় কনফারেন্সের সম্পূর্ণ সময়ের দুই তৃতীয়াংশ সময় ব্যয় হয়।

চিন্তা-গবেষণার পর এ কথা বের হয়ে এল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত উলামাদের জন্য ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জটিল মাসায়েলগুলোর সমাধান

হবে না। কারণ, বর্তমান সুরতহাল নব আবিষ্কারের কারণে একেবারেই নতুন। তাই পূর্বের পদাঙ্ক অনুসরণ সেগুলোর মীমাংসা করতে পারবে না।

উক্ত আলোচ্য বিষয়ে ইজতিহাদী মাসায়েলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সুদানের মন্ত্রী উস্তাদ আলী আবদুর রহমান আযহারী সাহেব একটি বিশাল জ্ঞানগর্ভ রচনা দ্বারা বৈঠক শুরু করেন। তিনি তাতে ইজতিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। তারপর ইজতিহাদ, তাকলীদ ও তালফীক (প্রতারণা) সম্পর্কে রচনা এবং পর্যালোচনা সামনে আসতে থাকে। আলোচকগণ এত সময় নিলেন যে, কনফারেন্সের অধিকাংশ সময় উক্ত বিষয়ে ব্যয় হল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, কনফারেন্সের মূল আলোচ্য এটিই। পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের প্রধান জামিয়া ইসলামিয়া করাচীর শিক্ষাসচিব হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নুবী রহ. ফায়েলে দারুল উলূম দেওবন্দ এর জবাবী রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ এবং তাহক্বীকপূর্ণ ছিল।

হযরত হাকীকুল ইসলাম রহ. নিজ বয়ান জারি রেখে বলেন, দশম দিন ১৫ মার্চ ১৯৬৪ ঈসায়ী আমার নাম ঘোষণা করা হয় এবং রচনা পাঠ করার খায়েশ করি। তিনি আনুমানিক বিশ মিনিটকাল রচনাটি পাঠ করেন, যা তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের যিম্মাদার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠ করেছিলেন। আর মিসরের পত্রিকাগুলো তার সংকলিত রচনাকে 'ভারতবর্ষ প্রতিনিধি প্রধানের খুতবা' শিরোনামে প্রকাশ ও প্রচার করে। তিনি বলেন, উক্ত রচনাটিতে যথাসম্ভব সমস্ত আলোচনাকৃত বিষয় সম্পর্কে আমি সংক্ষেপ এবং মূলনীতি হিসেবে আপন খেয়াল প্রকাশ করেছি। এখন রচনা পাঠের সময় নেই তা নিজ স্থানে প্রকাশ হবে। কিন্তু তাতে পেশ করা মূল বিষয়বস্তুগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তাতে ভাষা ও শব্দের পরিবর্তনে শিরোনাম এবং বাচনভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারে এবং সংক্ষেপ ও বিশদেও পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু রচনার রূহ ও মূল বিষয় কায়েম থাকবে।

ইজতিহাদী মাসায়েলসমূহের সমাধান আমল ও চিন্তাশক্তি দ্বারা পেশ করা প্রয়োজন

হযরত রহ. উক্ত রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, আমি তাতে বলেছি, এ মুহূর্তে ইজতিহাদ ও তাকলীদ বিষয়ে আলোচনা আমার মতে আলোচ্যবিষয় সম্পর্কিত হয়। তবে পঠিত রচনাগুলো অত্যন্ত মূল্যবান এবং পূর্ণ শিক্ষণীয়, যা আমাদের জ্ঞান নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আমি মনে করি, এ মুহূর্তে তার আলোচনা

উঠানোর স্থান নয় এবং তার প্রয়োজনও নয়। কারণ, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ না খোলা, আর খোলা থাকা অবস্থায় তা কি ইজতিহাদে মুতলাক না ইজতিহাদে খাসের দরজা খোলা এগুলোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলো আজ মুসলিম সমাজে যে সকল নতুন মাসায়েল ও সমস্যা প্রকাশ পেয়েছে এবং সেগুলোকে তারা জটিল মনে করছে, সেই বিষয়গুলো এমন মানুষদের নিকট পেশ করবে, যাদের মধ্যে ইজতিহাদী শক্তি রয়েছে, যাতে উচ্চ পর্যায়ের চিন্তাশীলগণ তাদের ইজতিহাদী শক্তিকে পরখ করে কোন কার্যকরী সমাধানে পৌঁছতে পারে। কারণ, ইজতিহাদে মুতলাক হোক বা ইজতিহাদ ফিল মাযহাব হোক প্রত্যেকটির শর্তসমূহ কিতাবে সংরক্ষিত রয়েছে, যা ইজতিহাদী যোগ্যতা ও অযোগ্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ড। যদি কারো মধ্যে সকল ইজতিহাদী শর্ত বিদ্যমান থাকে এবং সে যদি উসুল ও বুঝ মোতাবেক উক্ত মাসায়েল ইজতিহাদ করে, তাহলে কে জেনে শুনে তা অস্বীকার করবে? আর যদি শর্তসমূহ না পাওয়া যায়, তাহলে কে তা স্বীকার ও মেনে নেয়ার ব্যাপারে বাধ্য হবে?

সেজন্য আমাদের নিজস্ব চিন্তাধারা থেকে নিজেদের জন্য ইজতিহাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রমাণ করার উপর নিজেদের পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা থেকে তা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে যে চিন্তাশক্তি দ্বারা মাসায়েলের কার্যকরী সমাধান পেশ করা, যাতে মাসায়েলগুলো নিজস্ব আসল দলিল-প্রমাণসহ প্রকাশমান হয় এবং সেগুলো গ্রহণ করা বা না করার ফয়সালা করা যেতে পারে। অতএব ব্যক্তি নিয়ে চিন্তা-গবেষণার স্থলে মাসায়েল নিয়ে চিন্তা-গবেষণা অতি সহজ এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি। কিন্তু উক্ত কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল উক্ত মাসায়েলগুলোর মীমাংসাকরণ, প্রশ্নাবলি বাস্তবরূপে সংকলন করে প্রত্যেক প্রতিনিধির সকাশে প্রেরণ করা অথবা এখন দিয়ে দেয়া যদি সেগুলোর বৈধ মীমাংসা সামনে থাকে, যাতে মাসায়েলসংশ্লিষ্ট তথ্য-দলিল একত্রিত করে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন মেধা ও ইলম অনুপাতে অংশ নিতে পারে এবং কনফারেন্স সঠিক বুনিয়াদী ফয়সালায় উপনীতি হতে পারে।

প্রতি যুগে নতুন মাসায়েল প্রকাশ হতে থাকবে এবং তার সমাধানও পেশ করা হতে থাকবে

হযরত রহ. আপন বয়ান জারি রেখে সম্মেলনে পেশ করা খুতবার সেই অংশটুকুও বললেন যে, আধুনিক ঘটনাবলি এবং সেগুলো থেকে সৃষ্টিকৃত আধুনিক মাসায়েল বের হওয়া শুধু এ যুগের বৈশিষ্ট্য নয় বরং ইসলামের প্রত্যেক

যুগ ও শতাব্দিতেই এমনটি হয়েছে এবং নতুন নতুন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন ঘটনা ও পরিস্থিতির জন্য প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রত্যেক যুগে চিন্তাশীল আলেম এবং চক্ষুষ্মান মুফতিগণ নিজেদের ইলমি যোগ্যতা এবং চিন্তাশক্তির মাধ্যমে উসূলে ফিকাহ এবং উপযুক্ত ফিকহী মাসালেকের আলোকে সেগুলোর সমাধান দিয়ে চলছেন এবং উম্মাতে মুসলিমা তা গ্রহণ করে চলছে। প্রত্যেক যুগের ফতোওয়ার বিশাল বিশাল পুস্তকাবলি তারই প্রমাণ। 'হাওয়াদিসুল ফাতাওয়া আউর আলাতে জাদীদাকে শরয়ী আহকাম' নামে পৃথক কিতাব রচনা করে প্রকাশ করেছেন, যাতে আধুনিক মাসায়েলের যথেষ্ট সমাধান পেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি খণ্ডিত মাসয়ালার জন্য পৃথক পৃথক পুস্তিকা রচনা করে প্রকাশ করেছেন, যার উপর উম্মত আমল করছে এবং সেই ধারা আজও চালু রয়েছে।

চিন্তা ও কর্মের একতা উম্মতের একতার কারণ

এই মুহূর্তে প্রয়োজন হল এমন বিধানাবলির প্রচার এবং সমাধান পেশ করা, যা বিশ্বমানের হবে এবং আঞ্চলিক হওয়ার স্থলে আন্তর্জাতিকমানের হবে। কারণ, পরিবহন ও আমদানি রফতানির মাধ্যম সহজ হওয়ার কারণে সমগ্র বিশ্ব একটি খান্দান এবং পরিবারের এত হয়ে গেছে। সেজন্য আজ একটি দেশের ঐক্যবদ্ধ কথাও সমগ্র বিশ্বের তুলনায় ব্যক্তিগত এবং নিজস্ব কথা বলা হচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা আন্তর্জাতিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দলীয় কথা হয় না। এজন্য যথার্থ উপযুক্ত কর্ম হলো আধুনিক ফাতাওয়ার অবস্থান যে কোন দেশে হোক তা সমগ্র মুসলিম জাহানের সম্মুখে নিয়ে আসা এবং বিশ্বব্যাপী চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা উক্ত আহকাম ও ফাতাওয়াকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উম্মতের সামনে পেশ করা।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত কর্ম মজমুয়ায়ে বুহুসুল ইসলামিয়া ব্যতীত অন্য কেউ ভালরূপে আঞ্জাম দিতে পারবে না। তারাই পারবে নিজেদের বিশ্বব্যাপী প্রভাব কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন দেশের আধুনিক ফাতাওয়া, রচনাবলি এবং কিতাবের বিশাল ভান্ডার একত্রিত করে অনুবাদের মাধ্যমে কনফারেন্সের সামনে পেশ করতে, যাতে চিন্তাশক্তির মধ্যে বিশ্বব্যাপিতা এবং একতা সৃষ্টি হয়ে উম্মাতের কাজকর্মেও একতার ঝলক ফুটে ওঠে, যা উম্মতের একতায় একটি প্রতিক্রিয়াশীল মাধ্যম হতে পারে। আর তা মুসলিম জাহানের শক্তিশালী ইত্তেহাদ হবে, যা স্থায়ী বুনিয়াদসমূহে কায়েম হয়ে স্থায়ী প্রমাণিত হবে।

মানবতা আজ আন্তর্জাতিক ধর্মের খোঁজে

তিনি নিজের বয়ান চালু রেখে বলেন, আমি আমার রচনাতে এ কথাও বলেছি যে, তার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি বিষয় হল স্বয়ং ইসলাম দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করা। যখন আজ বাস্তবতাপ্রিয় দুনিয়া নিজেই একটি ফিতরি (স্বভাবগত) এবং দীন ও দুনিয়া সম্পূরক ধর্মের তালাশে চিন্তান্বিত এবং অনুসন্ধানকারী এবং গমন ও বহন মাধ্যমের প্রশস্ততা ও সহজতা হওয়ার কারণে পুরো বিশ্ব একটি খান্দানে পরিণত হয়েছে, যার সকল তামাদ্দুন ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে একতা এসে গেছে। দেশ ও জাতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিঃশেষ হতে চলছে এবং অংশীদারির একটি সুপ্রশস্ত ময়দান সৃষ্টি হতে চলছে, যার দ্বারা পৃথিবীর প্লাটফর্মও এক হতে চলছে এবং সকলের জযবার দৃষ্টিভঙ্গি এদিকে ধাবিত হচ্ছে যে, সকলের তাহযীব ও তামাদ্দুন এক হবে, সামাজিকতা এক হবে। এমনকি রাজনীতিও সবার এক রঙে ও এক নীতিতে এবং এক প্লাটফর্মে চলবে এবং আগে বাড়বে।

সুতরাং কার্যত এমন হতে চলছে এবং সমগ্র বিশ্ব একই বিশ্বব্যাপী তামাদ্দুন এবং দুনিয়াব্যাপী সামাজিকতা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। উক্ত অংশীদারিমূলক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে স্বভাবগতভাবে দুনিয়া আজ সেই দিকে যাচ্ছে যে, সবার ধর্ম ও দীনও এক হবে। ধর্মীয় প্লাটফর্ম সবার এক হবে। আর সবার চাহিদা হল এমন একটি ধর্ম হস্তগত হওয়ার মধ্যে ধর্ম-বর্ণ, দেশ ও জাতি ইত্যাদির কোন সীমারেখা ও ভেদাভেদ থাকবে না বরং তা শুধু মানুষের সংশোধনকারী হবে এবং মানুষের কার্যাবলিকে সারা পৃথিবীজুড়ে স্বাধীন করে দিবে।

এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, এমন গুণাবলি সম্বলিত ধর্ম ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম হতে পারে না। একমাত্র ইসলামই বিশ্বব্যাপী বন্ধন ও ভ্রাতৃত্বের স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে এবং দুনিয়াকে দীনের সঙ্গে সংযুক্ত ও জড়িত করছে। এ কারণে দুনিয়া অন্য ভাষায় পরিবর্তনের জন্য দীনকে আহ্বান জানাচ্ছে এবং তাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের উপর কর্তব্য হলো ইসলামকে বিশ্বব্যাপী দীন বানানোর হিম্মত ও সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

আর প্রকাশ থাকে যে, উক্ত গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদের জন্য যে শক্তি এবং যে মাধ্যম ও উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলো মাজমুয়ায়ে বহুসুল ইসলামীর নিকট বিদ্যমান এবং বিদ্যমান না থাকলে অতিসহজে একত্রিত করতে পারে। কাজের সাহায্য করা সমগ্র মুসলিম জাহান নিজেদের জন্য ফরজ জ্ঞান করবে।

ভূপৃষ্ঠ হতে ইসলামের প্রতি সন্দেহকে রহিত করা

হাকীমুল ইসলাম রহ. রচনার হাওলা দিয়ে বলেন, উক্ত বিষয়ে যেমনভাবে ইতিবাচক দিকের উপর কাজ করা জরুরি, তেমনিভাবে নেতিবাচক আন্দাযে এ কাজটি করাও আমাদের উপর কর্তব্য যে, ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ দশজন চাই ইউরোপিয়ান হোক বা এশিয়ান হোক তারা ইসলাম সম্পর্কে যে সমস্ত সন্দেহ ও কুধারণা এবং অযৌক্তিক আপত্তি ছড়িয়ে মানুষের অন্তরকে অস্থির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং ঘৃণার শিকার বানিয়েছে, সেগুলোকেও আন্ত র্জাতিকভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। নিঃসন্দেহে জামিয়া আযহারের উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মর্যাদাসম্পন্ন খেদমত করে যাচ্ছেন। কিন্তু ভাষা অপরিচিত হওয়ার কারণে সবার সামনে নেই। প্রয়োজন হলো উক্ত খেদমতও আন্তর্জাতিক মানের হওয়া।

যেমনভাবে বিভিন্ন দেশের খ্রিস্টান পাদ্রীরা ওই সন্দেহগুলোকে আন্তর্জাতিকভাবে ছড়াচ্ছে, টিক তেমনিভাবে উক্ত সন্দেহের জবাব ও বিভিন্ন দেশের আলেমদের পক্ষ হতে আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশ পাবে। প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান সময়ে সারা জগতে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মাঝে চিন্তা-চেতনা এবং সাংস্কৃতিক যুদ্ধ চলছে। সেজন্য তাদের মোকাবেলা এমন হাতিয়ার দ্বারা হওয়া প্রয়োজন, যা প্রভাব বিস্ত ার করে এবং কাজে আসে। তাই কনফারেন্সে উক্ত বিষয়টি দফা হিসেবে রাখা প্রয়োজন ছিল। তার জন্য প্রয়োজন হল আমাদের চিন্তাধারা ও ইজতিহাদের পরিধি স্রেফ ফিকহী ও আংশিক মাসয়ালাতে সীমাবদ্ধ রাখা নয় বরং সারা পৃথিবীকে সামনে রেখে ইসলামি শিক্ষার পরিধি প্রশস্ত ও বিস্তার করার ফরজ আদায় করা উচিত।

ইজতিহাদ কর্মে আসলাফের অনুসরণ

হযরত রহ. আপন বয়ান চালু রেখে এবং রচনাসংশ্লিষ্ট বিষয় হতে আরো বলতে লাগলেন, আমাদের ইলমি যোগ্যতা অনুসারে কিছু না কিছু ইজতিহাদী সক্ষমতা আজও রয়েছে। অন্যথায় মুফতিদের ফতোয়া দেয়া এবং মুয়ামালাত এ চিন্তা ফিকির করে ফয়সালা দেয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হতো। সেজন্য বিদ্যমান ইজতিহাদকে ব্যবহার করে তা বৃদ্ধির অপেক্ষায় থাকা জরুরি। কিন্তু পাশাপাশি এও লক্ষণীয় বিষয় যে, আমাদের ইজতিহাদ অন্বেষণ এজন্য না হওয়া উচিত যে আজ আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতি এবং তাদের আবিষ্কৃত তাহযীব হতে প্রভাবিত হয়ে

সেগুলোর সমর্থনে প্রথমে নিজেদের পক্ষ হতে নতুন চিন্তাধারা কায়েম করব। তারপর সেগুলোকে শরয়ী বৈধতা দেয়ার জন্য কুরআন ও হাদিস থেকে দলিল প্রমাণ অন্বেষণ করব। প্রকাশ থাকে যে, এহেন কাজ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ নয় বরং কিতাব ও সুন্নাহর সঙ্গে বেয়াদবীমূলক আচরণ এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড।

তাই আমাদের উপর কর্তব্য হলো চিন্তা-ফিকির বা ইস্তিম্বাত করতে গিয়ে যেখানে উসুল ও কানুনের পাবন্দী করা জরুরি, সেখানে আসলাফদের পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং তাদের রেখে যাওয়া ইলমি মিরাছ থেকে ফায়দা গ্রহণ করাও জরুরি। অন্যথায় তাছাড়া দীনের ওই রং ও ঢং থাকবে না যা ويزكيهم এর অধীনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দান করেছেন। এ কারণে স্বভাবগতভাবে আমরা ইজতিহাদের পরিধিতে থেকেও আকাবির ও আসলাফদের গণ্ডি হতে বের হতে পারি না, যাতে প্রতিটি সুন্নাত এবং প্রতিটি আসলাফদের উসওয়া বা আদর্শ আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ইজতিহাদকর্মে সর্বশেষ ঠিকানা লাভ করে। এ সম্পর্কে তিনি কয়েকটি উদাহরণও পেশ করেছেন, যা আপনি রচনাতে পড়তে পারবেন।

আরব জাহানের ঐক্যে ধর্মের গুরুত্ব

হযরত বয়ান করতে গিয়ে বলেন, বিভিন্ন দেশের আলেমগণ একত্রিত হওয়ার কারণে সুসম্পর্ক ও ঐক্যের একটি সুন্দর দৃশ্য কুদরতিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। আর কনফারেন্সের উদ্দেশ্যও ছিল তাই। হাকীমুল ইসলাম রহ. মুসলিম জাহানের ঐক্যের স্বীকৃতি প্রদান করে আরবদের ঐক্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, বিশেষ করে মিসর ও শাম এবং হেজাযে তিন দেশের ঐক্যের উপর বেশি জোর প্রদান করেন। এ সম্পর্কে তিনি শরয়ী ইশারা থেকে মিসর, শাম ও হিজাযের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, আমরা উক্ত তিন মার্কাযী দেশকে শুধু রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব দেই না বরং দীনি ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব দেই এবং মুকাদ্দাস ভাবি। শরীয়ত হিজাযকে ইবাদতের মার্কায বানিয়েছে। শামকে শান শওকতের মার্কায স্বীকৃতি দিয়েছে। আর মিসরকে প্রতিরোধ বাহিনীর মার্কায বলেছে। হিজাযকে শান্তি ও নিরাপত্তার মার্কায এজন্য বানিয়েছে যে, আমান ও শান্তি ছাড়া ইবাদত হয় না। শামকে প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধের মার্কায এজন্য বানিয়েছে যে, শান শওকত প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর মিসরকে সামরিক বাহিনীর মার্কায এজন্য

বানিয়েছে যে, পশ্চিমা শক্তির রাজনৈতিক আক্রমণ প্রতিহত করা সামরিক শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়।

এই তিন কারণে এ তিনটি দেশ মার্কাযের বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এমতাবস্থায় এদের পরস্পর ঐক্যের সুরত স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাহির হয়ে গেছে। আর তা এভাবে যে নিরাপদ ইবাদাতের জন্য শওকত আবশ্যক এবং শওকত টিকে রাখার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োজন। অতএব মানতিকী ফলাফল এমন বের হলো যে হেজাযের প্রতিরক্ষা ও হেফাজত শাম দেশের শওকত ব্যতীত সম্ভব নয় এবং শামের শওকত টিকে থাকা সম্ভব নয় মিসরের সামরিক শক্তি ছাড়া। এ কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত মিসরের সামরিক শক্তি মজবুত ও শক্তিশালী না হবে এবং শাম ও হেজাযের সঙ্গে মিসরের ঐক্য না হবে ততক্ষণ না শাম ও হেজাযের প্রতিরক্ষা হতে পার না স্বয়ং মিসরের হেফাযত ও প্রতিরক্ষা হতে পারে। আর যেহেতু এই সকল সূক্ষ্ম বিষয়াবলি স্বয়ং হাদিসসমূহে দেখানো হয়েছে, তাই একথা সুস্পষ্ট যে, এ উক্ত সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর আলোচনা শুধু রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক নয় বরং দীনি। এ কারণে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মিসর, শাম ও হেজাযের পরস্পর একতা জরুরি মনে করি। ভিতরগতভাবে আপনারা মুসলিম বিশ্বের একতা চান। তাই আরবদের একতা হলো তার প্রথম ধাপ। আর আরবদের একতার প্রথম পদক্ষেপ হল মিসর ও শাম এবং হেজাযের একতা। আজ আরব প্রজাতন্ত্রের প্রধান সায়্যিদ জামাল আবদুন নাসির সাহেব উল্লিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আরবদের একতার ডাক দিয়েছেন। অন্য কথায় বলা যায় ইসলামি ও ধর্মীয় ঐক্যের সূচনা করেছেন। তাই আমাদের তার আহ্বানের কদর করা প্রয়োজন। এজন্য এ কনফারেন্স নিঃসন্দেহে একটি মোবারক পদক্ষেপ।

মিসরের শিল্প ও কারিগরি উন্নতি

হযরত রহ. তার বয়ান চালু রেখে বলেছেন, কনফারেন্সের বৈঠক চলাকালীন, দু-তিন দিন পর মিসরের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শহরগুলো ভ্রমণ করার প্রোগ্রাম করলাম। কোথাও মটরযান দ্বারা কোথাও উড়োজাহাজ দ্বারা।

সর্বপ্রথম সফর হয়েছে আল মহল্লায় কুবরাতে যা মিসরের শিল্প-কারখানার মার্কায, সেখানে কাপড় বুনন এবং কার্পেট বুনন ইত্যাদির মিল-ফ্যাক্টরি রয়েছে। দ্বিতীয় সফর হয়েছে তানতায়, যা মিসরের একটি বড় শিল্প এলাকা। তৃতীয়বার সফর হয়েছে সুয়েজখাল এবং ফিলিস্তিন এলাকায়, যা মিসরের সামরিক শক্তির

মার্কায তথা সেনানিবাস। এই সফরে প্রথমে আরশী নামক স্থানে এলাম, যা সুয়েজখালের তীরে একটি খোলামেলা শহর। তার এক মাইল সামনে সুয়েজখাল। তার তীরে পথচারী ও পর্যটকদের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুয়েজখাল মিসরের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কুদরতি নমুনা। প্রতি দশ-পনের মিনিট অন্তর এই সামুদ্রিক খাল দিয়ে ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার বাণিজ্য জাহাজ যাতায়াত করছে। এগুলো থেকে রাজস্ব উসুল করা হচ্ছে এবং খোঁজখবর নেয়ার পর নগর শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। সুয়েজখাল হতে বের হয়ে সীনাপ্রান্তর গেলাম। সীনাপ্রান্তর অতিক্রমকালে হযরত মুসা আ. এবং তার সঙ্গে বনি ইসরাঈলের অতিক্রমের কল্পনা করছিলাম আর সেই পবিত্র ভূমির বরকত দ্বারা কালব ও রূহ প্রভাবিত হচ্ছিল। তারপর গাজায় প্রবেশ করলাম। গাজা হল ফিলিস্তিনের সীমান্ত শহর। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। এই শহরে ইমাম শাফী রহ. জন্মগ্রহণ করেন এবং বড় হন। আমাদেরকে ওই বিল্ডিং দেখানো হয়, যেখানে ইমাম রহ. জন্মলাভ করেছিলেন। গাজাতে আমাদেরকে ফিরিস্তিনের আরবরা অনেক আবেগ ও আগ্রহের সাথে স্বাগতম জানিয়েছেন। সেখানে আমরা রাতে পৌঁছি। আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মনোমুগ্ধকর বিশাল এক হোটেলে। রাতের আহারের পর একটি সংক্ষিপ্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। সকালবেলা কয়েক লাখ ফিলিস্তিনীকে আশ্রয় শিবিরের জন্য তৈরি করা তাঁবুতে বসবাস করতে দেখলাম, যাতে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। অতঃপর ফিলিস্তিনী আরবদের পক্ষ হতে বিশাল এক মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সেখানে আন্তর্জাতিক আলেমদের মারহাবা প্রদান করা হয় এবং সুস্বাগতমের স্লোগান দেয়া হয়। সেখানে বক্তব্য হয়েছে। পরিশেষে ফিলিস্তিন বিভক্তির বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক প্রস্তাব পাশ করা হয়।

ওখান থেকে ফিরে এসে কনফারেন্সের দু-তিন অধিবেশনের পর আবার আকাশ পথে আসওয়ান ভ্রমণে গেলাম, যেখানে নীল দরিয়াতে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে এবং আধুনিক আসওয়ান শহর নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে মিসরের টেকনিক্যাল উন্নতির প্রোগ্রাম প্রকাশ পায়। সেখানে আমরা দেখেছি, প্রায় পনের-বিশ মাইল এলাকাজুড়ে লোহা ও সিমেন্টের স্তূপ পড়ে আছে এবং বিশাল বিশাল ফ্যাক্টরি ও কারখানা তৈরি হচ্ছে। এই সফর থেকে ফিরে এসে মুদিয়ীয়াতুত তাহবীর এলাকায় সফর হয়। এ অঞ্চলটি মিসরের কৃষিকর্ম উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ মার্কায। ওখানে সেনাবাহিনী মেহমানদরে স্বাগতমমূলক সালাম প্রদান করেছে, শিশুরা ফৌজি কৌশল ও শারীরিক কসরত প্রদর্শন করেছে। মেহমানদের প্রত্যেক

আতরের বোতল হাদিয়া দেয়া হয়। ওখানকার সমাবেশ পাঁচ-ছয় ঘণ্টাব্যাপী চালু থাকে। সন্ধ্যাকালে ফিরে আসা হয় এবং সকাল থেকে পুনরায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে কনফারেন্স জারি থাকে।

দারুল কুরআনের ভিত্তি স্থাপন

মুবারক ও গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের ফাঁকে ফাঁকে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আযিমুশ্বান জনসভাও কায়েম করা হয়। একটি দারুল কুরআনের ভিত্তিপ্রস্তর রাখার জন্য, যা জামিয়া আযহাবের মাথা; কিন্তু তাকে পৃথক মর্যাদা প্রদান করা হয়, যাতে কুরআনুল কারীমের তালিম কোন নিয়মানুবর্তিতার অধীনে না থাকে। বরং একটি ভিন্ন ও পৃথক উদ্দেশ্যের মর্যাদা প্রকাশ করতে পারে। তার সভাপতি বানানো হয়েছিল সদরে জমহুরিয়ার নায়েব জনার সায়্যিদ হুসাইন শাফী রহ.কে। তেলাওয়াত, বয়ান ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর প্রত্যেককে মিসরে মুদ্রিত কুরআনুল কারীম হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করা হয়।

মদীনাতুল আযহার বা আযহার শহর

দ্বিতীয় আযিমুশ্বান বিশাল সম্মেলন হয় জামিয়া আযহারের ভিত্তি স্থাপনের জন্য মদিনাতুন নসর নামক স্থানে। সম্মেলনের প্যান্ডেল তৈরি করা হয় অসাধারণ প্রশস্ত এবং অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে। সেখানে আনুমানিক বিশ-পঁচিশ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল। প্যান্ডেলটি পতাকা ও শিলালিপি দ্বারা সাজানো হয়েছিল। স্টেজে দাওয়াতী মেহমানদের চেয়ার জাতীয় আসন ছিল। স্টেজের নিচে এক পার্শ্বে মিসরী আমির-উমারা ও উলামাদের বসানো হয়েছিল এবং অপর পার্শ্বে রাষ্ট্রীয় দূতগণের আসন ছিল। সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রপ্রধান সায়্যিদ জামাল আবদুন নাসির এর নাম। কিন্তু তিনি বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি। তার আদেশে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জমহুরিয়ার উপপ্রধান সৈয়দ হুসাইন শাফী। পরবর্তীতে তিনিই জামিয়া আযহারের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তা একটি পূর্ণ শহর। তাকে মদিনাতুল আযহার নামে নামকরণ করা হয়। তাতে জামিয়া আযহারের সকল অনুষদ, ক্লাসরুম, ছাত্রাবাস এবং অফিস সবই এক স্থানে হবে। বর্তমানে যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। উক্ত নির্মাণকর্মের জন্য জামিয়া আযহার ষোল কোটি রুপি বাজেট করেছে।

হাজার বছরের ইলমি আযমত

উক্ত সম্মেলনে সংক্ষিপ্তাকারে জামিয়া আযহারের হাজার বছরের ইলমি আযমত ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর আলোকপাত করা হয়, যা সবাই স্বীকার করে যে, নিঃসন্দেহে জামিয়া আযহার হাজার বছর যাবতকাল বড় বড় ইলমি ও ফন্নি আইম্মা সৃষ্টি করে চলছে। প্রকাশ থাকে যে, যখন তার ফুযালা ও ফারেগীনদের মধ্যে হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতি রহ.-এর এত ইল্‌ম ও হেদায়াতের ইমাম রয়েছেন, তখন তার মূল্যবান খেদমতকে কে অস্বীকার করতে পারবে।

বাদশাহ নাসেরের খেদমত ও কারগুযারি

ওই সময় দেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, নতুন পার্লামেন্ট বোর্ড নির্বাচন করা হয়। তাতে সায়্যিদ জামাল আবদুন নাসিরকে রাষ্ট্রপ্রধান তথা বাদশাহ নির্বাচন করা হয়। নতুন পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন নতুন নির্বাচিত বাদশাহ সায়্যিদ জামাল আবদুন নাসিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপ্রধান প্রায় তিন ঘণ্টা ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি মিসরের আধুনিক যুগের বিগত বাদশাহদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বিস্তারিত বর্ণনা করেন। জাতি রাষ্ট্রপ্রধানের ভাষণকে অত্যন্ত আনন্দ ও করতালির গুঞ্জনধ্বনিতে উপভোগ করেন। তার ভাষণে তারা প্রভাবিত হন। মিসরীয় জনগণ বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানকে অনেক ভালোবাসে। তার খেদমতের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের খেদমত হলো যৌথবাহিনী তথা ইসরাইল, বৃটিশ ও ফ্রান্স বাহিনীর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এবং অভ্যন্তরীণভাবে মিসরকে ধ্বংসাত্মক পুঁজিবাদী এবং জমিদারদের হাত থেকে রক্ষা করেন। পাশাপাশি পুরো জাতিকে এক করে প্রতিটি সম্ভাব্য উন্নতির ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং মিসরকে শিল্প কারিগরি, কৃষি এবং ইলমি শিক্ষা দীক্ষার উন্নতির রাস্তায় দাঁড় করান।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত কর্মের দৃঢ়তা এবং তার সাদাসিধে জীবন মিসরী জাতির উপর বিশেষ প্রভাব পড়ে। তিনি ব্যক্তিগত আরাম ও প্রশান্তির জন্য আজ পর্যন্ত সরকারি ভবন ব্যবহার করেননি। তিনি প্রথাগত রাষ্ট্রীয় জাঁকজমক ও শান-শওকত প্রদর্শন থেকে দূরে থাকেন। আজও তিনি তার ব্যক্তিগত শহরের বাড়িতে সাধারণ মানুষের পরিবেশে বসাবস করেন। তার বাড়ি অন্যান্য বাড়ি থেকে আলাদা নয়। তার ছেলেমেয়েদের স্কুল-বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য পৃথক কোন পরিবহন নেই। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায় সাইকেলে চড়ে স্কুলে যায়। স্কুলের সাধারণ নিয়ম-কানুন তাদের উপর তেমনিভাবে প্রয়োগ হয়, যেমনভাবে

অন্যদের উপর প্রয়োগ হয়। তিনি জুমআর নামাজ সময়-সুযোগে শহরের বিভিন্ন মসজিদে আদায় করেন। তার জন্য মসজিদের কোন স্থান নির্ধারিত নেই এবং পূর্ব থেকে পুলিশ দ্বারাও নামাজের স্থান ব্যবস্থা করা হয় না। মসজিদে যেখানে খালি স্থান পান বসে যান এবং নামাজ পড়ে চলে যান। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাবন্দির সাথে পড়েন।

মিসরের ধর্মীয় অবস্থান

মিসরের প্রতিটি মসজিদ অত্যন্ত শানদার এবং যথেষ্ট আবাদ। কায়রো, তানতা, ইস্কান্দারিয়া ইত্যাদি শহরের মসজিদগুলো দেখার সুযোগ পেয়েছি। ওখানকার মসজিদগুলোর নির্মাণ নকশা, ডিজাইন এবং নির্মাণভিত্তি অত্যন্ত মজবুত ও শান-শওকতপূর্ণ। পাশাপাশি মসজিদের বিছানাগুলো সাধারণ চটের পরিবর্তে দামি কার্পেটের।

ইমাম ও মুয়াযযিনদের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হতে বেতন নির্ধারিত। নামাজের সময় নামাযিদের দ্বারা মসজিদ আবাদ হয়। প্রতি ওয়াক্তে মুসল্লিরা অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে হাজির হয় এবং মসজিদে মুসল্লি দ্বারা ভরে যায়। অধিকাংশ মসজিদে দেখেছি, বাদ মাগরিব ইমামগণ আধা ঘণ্টা বা পৌনে এক ঘণ্টা ওয়াজ-নসিহত করেন। মিসরী জাতির মধ্যে একতা এবং মহব্বত যথেষ্ট পরিমাণ রয়েছে। যতক্ষণ ভাষার অপরিচিত থাকে ততক্ষণ পরদেশী ও অপরিচিত মনে হয়। কিন্তু তা দূর হয়ে গেলে এবং ভাষার অপরিচিতি বাকি না থাকলে সবাই মিসরীর এত হয়ে যায়।

মেহমানদারী

মেহমানদারী ও অতিথিপরায়ণতা মাশাআল্লাহ সকল মুসলিম জাতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আরবদের মেহমানদারীতে বিশেষ শান রয়েছে। মিসরীরাও মেহমানদারীতে সাধারণ আরবদের সমতুল্য। সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী মেহমানদের সেবাযত্ন এবং আতিথ্যে মিসরবাসী কোন ত্রুটি করেনি। মন্ত্রী, আমীর এবং সংস্থার পক্ষ হতে দাওয়াতগুলো সাধারণ হোটেলে হতো। দাওয়াতগুলোতে অংশগ্রহণ করে উপলব্ধি করতে পারলাম, দাওয়াতের জন্য হোটেল নির্বাচন এবং ব্যবস্থাপনা বিশেষ বিবেচনা ও যোগ্যতা অনুসারে হয়েছিল। প্রত্যেক প্রথম দিনের হোটেল দ্বিতীয় বা পূর্বের দিনের হোটেল থেকে অত্যধিক বেশি এবং আলীশান হতো। হোটেল দেখে সবাই ভাবতো এর চেয়ে

উত্তম আর কোন হোটেল নেই। কিন্তু পরবর্তী দিনের হোটেল পূর্বের হোটেলকে আবর্জনা ও মূল্যহীন বানিয়ে ফেলতো। ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু আলেম ও সম্মানিতদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষ যোগ্যতা ও বিবেচনা সব কর্মে লক্ষ্য করা গেছে। তাদের কাজেকর্মে সক্ষমতা এবং দায়িত্ব পালনে ক্ষিপ্রতা ও নিপুণতা প্রদর্শন লক্ষ্য করা গেছে। তাদের ইলমি অনুভূতি ব্যাপকভাবে জাগ্রত রয়েছে।

মিসরের রাষ্ট্রধর্ম

তাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা একনায়কতন্ত্রী নয় বরং গণতন্ত্রী। জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে যে সমস্ত বিশেষ কর্মসূচি বিশেষভাবে প্রতিনিধিদের সামনে পেশ করা হয়েছে, তা ছিল এই যে, রাষ্ট্রীয় সংবিধানে পৃথক দফা রাখা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের ধর্ম হবে ইসলাম এবং ভাষা হবে আরবী।

কমিউনিজমের অপপ্রচার

এটা একটা ভ্রান্ত প্রচার যে, মিসর রাষ্ট্রীয়ভাবে কমিউনিজমকে গ্রহণ করেছে এবং তারা কমিউনিজমের ধারক-বাহক। প্রথমত যেখানে সরকারিভাবে ইসলাম ধর্মকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, সেখানে পরিভাষাগত কমিউনিজম একত্রিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত ইশতিরাকিয়্যাত (অংশীদারিত্ব) শব্দ দ্বারা কমিউনিজমের বুনিয়াদী বস্তু কল্পনা করা জরুরি নয়। ইসলাম ধর্মের মধ্যেও এক প্রকার ইশতিরাকিয়্যাত রাখা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে অনেক বিষয়ে ব্যক্তিগত এর স্থলে জাতির অধিকারকে মেনে নেওয়া হয়। সেগুলোর উপর ইশতিরাক শব্দ প্রয়োগ হবে কিন্তু কমিউনিজম শব্দ প্রয়োগ হবে না।

অতএব এমন ইশতিরাকিয়্যাত ও উমুমিয়াত গণতন্ত্র, যা ইসলামের পরিধির মধ্যে থাকে সেগুলোকে কমিউনিজম বলা যাবে না। বরং আমরা বলতে পারি, যদি কমিউনিজম ও মার্কসবাদে যদি কোন ভাল ও কল্যাণ থাকে, তাহলে তা ইসলামের বিধান থেকে নেয়া হয়েছে। ইসলামে কোন খারাবি থাকলে তা গ্রহণকারী ব্যক্তি অসম্পূর্ণ চিন্তা এবং জযবার কারণে। মিসরও যদি একনায়কতন্ত্র রহিত করার জন্য জাতীয় কাউন্সিলর বা প্রেসিডিয়াম সদস্য নির্বাচন করে, তাহলে তাকে কমিউনিজম বলা যাবে না। কায়রোতে আমার কানে এসেছে, মিসরের এক-চতুর্থাংশ যাকে আধুনিক মিসর বলা হয় যেখানে আনুমানিক দশ লাখ লোকের বসবাস, উক্ত এলাকাটি একজন আলবানী মহিলার

মালিকানায় ছিল। বাদশাহ জামাল আবদুন নাসের তা জাতীয়করণ করে ফেলেন। এখন বলুন তার এমন পদক্ষেপকে ভ্রান্ত বলে তার উপর ইশতিরাকিয়্যাত বা কমিউনিজমের তকমা লাগানো যায়? অতএব ব্যক্তিগত মালিকানার কঠোরতা যা স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করেছে এবং তার প্রভাব জাতীয় জীবনে পড়ে, তাহলে এহেন একনায়কত্বকে খতম করে স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ে আসা ভর্ৎসনাযোগ্য কাজ হতে পারে না এবং তাকে কমিউনিজমের তকমা লাগিয়ে প্রশংসার অযোগ্য বলা যেতে পারে না।

যাহোক, কনফারেন্সে সুসংবাদের নামে এ কথা ঘোষণা করা হলো যে, রাষ্ট্রের ধর্ম হবে ইসলাম; অন্য কোন অনৈসলামিক ইজম নয়।

কুরআনের প্রতি মিসর জাতির প্রেমিকসুলভ মহব্বত

সম্মেলনে ঘোষণা হলো, শুধু কুরআনুল কারীম তেলাওয়াত করার জন্য প্রথম একটি রেডিও সেন্টার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সেখানে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা স্রেফ কুরআন তেলাওয়াত হবে। পরবর্তীতে কুরআনুল কারীমের অর্থ বুঝার ব্যবস্থা করা হবে। সুতরাং উক্ত রেডিও স্টেশন আমাদের উপস্থিতিতে খোলা হয়েছিল এবং মিসরের প্রসিদ্ধ মুজাববিদ কারী মাহমুদ হুসরী তেলাওয়াতও শুরু করে দিয়েছিলেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআনুল কারীমের সঙ্গে মিসরী জাতির শুধু সম্পর্ক নয় বরং ইশ্‌ক এবং প্রেম রয়েছে। তারা তেলাওয়াত করে প্রেমের সাথে, শ্রবণ করে মহব্বতের সাথে। জুমার দিন আবশ্যকীয় কর্ম হলো খুতবার পূর্বে প্রত্যেক জামে মসজিদের জন্য নির্ধারিত একজন প্রসিদ্ধ মুজাব্বিদ এক ঘণ্টা তেলাওয়াত করবেন এবং সেই খুতবার আযান দিবেন, ইমামের সঙ্গে নামাজের তাকবীর দিবেন। সুতরাং জামিয়া আযহারের জামে মসজিদে শায়েখ মোস্তফা ইসমাঈল, জামিয়া শাফীয়ার শায়েখ আবদুল বাছিত, আবদুস সামাদ এবং জামিয়া যায়নাবে অন্য একজন প্রসিদ্ধ মুজাব্বিদ তেলাওয়াতের কাজ করেন। এমনিভাবে সকল জামে মসজিদে একই নিয়ম চালু রয়েছে। কুরআন শ্রবণের জন্য দেড় ঘণ্টা পূর্বে মসজিদ ভরে যায়। কুরআনুল কারীমের সঙ্গে এমন সম্পর্ক অন্য কোন আরব রাষ্ট্রে দেখা যায় না। এমনকি একজন সিপাই যে রাস্তায় পাহারা দিচ্ছে, সেও সামান্য সুযোগ পেলে রেডিও চালু করে কুরআন শ্রবণ করতে থাকে।

জামিয়া আযহারে শিক্ষক নিয়োগে হাফেয শর্ত লাগানো হয়েছে। দারুল কুরআনের ভিত্তি শুধু হিফজুল কুরআনের জন্য করা হয়েছে। এ কারণে মিসরে অনেক হাফেজ দেখা যায়, যা অন্যান্য আরব দেশে দেখা যায় না।

কুরআনুল কারীম হেফাজতে মিসর সরকারের সোনালী কারনামা

মিসর জাতি শুধু কুরআন হেফাজত নয় বরং তাদের কুরআনুল কারীমের সঙ্গে মহব্বত ও জোশও রয়েছে। গযবগ্রস্থ ইহুদী জাতি নিজেদের জালিয়াতি এবং প্রতারণা কর্মের মাধ্যমে আফ্রিকা মহাদেশে যা মিসর জাতির তাবলীগের মার্কায, একটি কুরআনকে বিকৃত ও রদবদল করে ছাপিয়ে সমগ্র আফ্রিকায় প্রচার করে। সেই কুরআন শরীফে কয়েকটি সুরা বাদ দেয়া হয়, কিছু আয়াত পাল্টানো হয় এবং কিছু হাস্যকর কথা সংযোজন করা হয়, যাতে আফ্রিকা মহাদেশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। আর যারা মুসলমান হবে তারা ভ্রান্ত এবং ইসলামবিরোধী আকিদা ও আমল বহনকারী এবং দাবিদার হবে, যাতে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা শুনে মানুষ হাসে অথবা কমপক্ষে আফ্রিকার মধ্যে ইসলাম অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

এহেন শয়তানি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কর্ম মিসর হুকুমাতের কর্ণে পৌছার সাথে সাথে কয়েক লাখ রুপি বাজেট পাশ করেন। তা দ্বারা সহীহ কুরআনুল কারীম ছাপিয়ে এবং তার উপরের পৃষ্ঠায় ইহুদীদের শয়তানি কর্মকাণ্ড জানান দিয়ে মুসলমানদের জাগ্রত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বরং আফ্রিকা মহাদেশে লোক পাঠিয়ে মুসলমানদের ঘর থেকে ভ্রান্ত কুরআন বের করে সেগুলোকে সাগরে ভাসিয়ে, সহীহ ছাপার কুরআন শরীফে প্রতিট ঘরে ঘরে বিনামূল্যে পৌছিয়েছেন। ফলে ভয়াবহ ফেতনা নিঃশেষ হয়েছিল এবং কুরআন হেফাজত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা প্রকাশ্যরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। মিসর হুকুমাতের এই পদক্ষেপ কোন সাধারণ পদক্ষেপ নয় বরং একটি মুসলিম দেশের পক্ষে তা সোনালী হরফে লিখে রাখার যোগ্য পদক্ষেপ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিসর ও মিসর জাতিকে শুধু কুরআনের মহব্বতই তাদের টিকিয়ে রেখেছে এবং যার ফলে মিসর জাতি কিছু বুনিয়াদী কর্মে দুর্বলতা সত্ত্বেও টিকে আছে এবং দ্রুতগামিতার সাথে উন্নতি সাধন করছে।

অতএব কনফারেন্সের বৈঠকে সুসংবাদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, হুকুমতের ধর্ম হলো কুরআন। হুকুমাতের ভাষা হবে কুরআনি ভাষা তথা আরবী।

হুকুমাতের মূর্খ উদ্দেশ্য কুরআনের প্রচার প্রসার এবং হুকুমাতের দায়িত্ব কুরআনের হেফাজত। ফলে সারাবিশ্ব হতে আগত উলামায়ে কেরামগণ অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং তাদের হামদর্দী পূর্বের চেয়ে আরো বেড়ে গেল।

পাশ্চাত্য তামাদ্দুনের প্রভাব দূরীকরণ

কিন্তু আমাদেরকে সকল আনন্দের পাশাপাশি যে জিনিসটি অন্তরে ব্যথা দিয়েছে এবং আঘাত করেছে, তাহলো, মিসর জাতির পশ্চিমা তামাদ্দুনে ডুবে যাওয়া এবং নিমজ্জিত হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তর এবং মনের ভাব বুঝানো যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে কায়রো, ফ্রান্স ও লন্ডনের সামাজিক জীবনে পার্থক্য করা কঠিন হবে। যেখানে মসজিদগুলো নামাজী দ্বারা ভরপুর, কিন্তু শতকরা এক-দু'জন ব্যতীত কারো চেহারা শরয়ী রঙে দেখা যাবে না। নামাজ পড়ে কিন্তু অধিকাংশ টুপিবিহীন, শরয়ী আদবের অনুসরণ প্রায় শূন্যের কোঠায়। অধিকাংশ পুরুষের সঙ্গে শুধু বেপর্দা নয় বরং অর্ধউলঙ্গ মহিলা থাকে। হোটেলগুলোতে আহার্য ও পানীয় বস্তুর কোন সাবধানতা অথবা শরয়ী যাচাই-বাছাইয়ের কোন নিয়মানুবর্তিতা নেই। নারী-পুরুষের অবাধ মিলন স্বাভাবিক। সমাবেশ, হাটবাজার, অফিস-আদালত এমনকি ইসলামি রঙে আয়োজিত মাহফিলসমূহেও মহিলারা প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করে থাকে।

জামিয়া আযহারের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনের আযিমুশ্বান মাহফিলে মহিলাদের পৃথক ব্যবস্থা ছিল। সেখানে তারা হিজাববিহীন অনাবৃত চেহারায় অংশগ্রহণ করেছে। আনুমানিক সবকটি প্রকাশ্য স্পটে মহিলারা পরিপূর্ণ সাজসজ্জার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিজাতিদের তামাদ্দুন প্রকাশ্যে কর্মক্ষেত্রে ও কার্যকরীরূপে গ্রহণ করেছে। তাই তার স্বয়ংক্রিয় প্রভাব ও ব্যক্তির চিন্তা ফিকির ও ধ্যান-ধারণাতে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। এজন্যই ইসলামি শরীয়ত নীতিগতভাবে বিজাতীয় তামাদ্দুন গ্রহণ করতে অথবা নিমজ্জিত হতে বাধা প্রদান করেছে।

তামাদ্দুনের ওই স্বভাবজাত প্রভাব হতে মিসরবাসী বেঁচে থাকতে পারেনি। অনুমান করা যায়, পাশ্চাত্য তামাদ্দুন তারা শুধু গ্রহণই করেনি বরং বৈধ মনে করে থাকে। এই বিষয়ে অপব্যাখ্যার দরজা শুদ্ধ ব্যাখ্যা হতে বেশি উন্মুক্ত। মনে হয় ইজতিহাদ এবং আধুনিক ফিকহী মাসায়েল আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত কারণে অনুভব করছে। কেননা, পুরাতন ফিকাহ নিঃসন্দেহে নতুন খুঁটিনাটি বিষয়ে শর্তারোপ করবে এবং প্রবৃদ্ধি ও প্রশস্ততার মধ্যে মধ্যম পন্থা কায়েম করবে, যা মিসর জাতির উপর ভারী মনে হবে। সে কারণে সেগুলোর

উন্নয়ন ও সংশোধনের জন্য শিরোনাম করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভুল এই যে, ইসলামি সামাজিকতা এবং শান শওকতে বৈপরীত্যকে বিশ্বাস করে নিয়েছে। অথচ এহেন কুধারণা ইতিহাস ও বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন কথা। সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ কথা হলো, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও তাহযীব তামাদ্দুনের প্রভাব দূর করতে হবে, এ ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই।

দূর করা সম্ভব এমনসব খারাবি

উল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণা এবং আমলি বিথপগামিতা দূরীকরণের দায়িত্ব রাষ্ট্র থেকে আলেমদের উপর বেশি আরোপিত হয়। এই প্রশস্ততার মনোভাব বাস্তবে স্বাধীন ও লাগামহীন চিন্তা চেতনা হতে সৃষ্টি হচ্ছে। কবির ভাষায়–

> সামান্য ডিম বাদশাকে গালি দেয়া বৈধ মনে করে, জীবন্ত
> সৈনিক হাজার মুরগি নাশ করে এবং কাবাব বানায়।

সমস্যা প্রকাশ পাওয়ার বৈধতা অনুসন্ধান হচ্ছে বরং বৈধতার আসবাব বেশি রয়েছে। আর সাধারণ গ্রাম্য মানুষের মধ্যে কোন নাজায়েয ও অপছন্দনীয় কর্মকাণ্ড খুব একটা দেখা যায় না।

আর খাবরাবীগুলো দূর করার আশা এজন্য জাগে যে, উপরে উল্লিখিত ভাল কর্মাবলি আসল ও জাতিগত আর মন্দ কর্মগুলো ইউরোপ এবং ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে সর্বদা থাকা এবং তাদের মন্দ পরিবেশের ফলাফল এবং সেগুলোর স্থিতি হেতু সতর্ক ও সংশোধনে অলসতার ফলস্বরূপ। তাদের বুঝালে তারা প্রভাবিত হয় আর চালচলন পরিবর্তনের আশা সেজন্যও করা যায় যে, আমরা নিজেদের রচনা ও বক্তৃতায় উক্ত বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত অমায়িকভাবে ভর্ৎসনা ও নিন্দা করেছি, তাতে নারাজী প্রকাশ ব্যতীত লজ্জা পেতে দেখা গেছে। এজন্য সংশোধনের সম্ভাবনা ও সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সংশোধনের সফলতা শুধু সহীহ আমল দেখানোর দ্বারা হয় না, যতক্ষণ না প্রমাণ ও দালিলিক শক্তি দ্বারা সঠিক চিন্তাধারার রাহবারী হয় এবং তার জৈবিকতাকে সামনে রেখে কোন ইলমি রঙের পদক্ষেপ না নেয়া হয়। আর তাও যদি কোন আল্লাহওয়ালা দ্বারা না হয় এবং দলিল ও চিন্তাধারার পাশাপাশি নিজের আমল ও তাকওয়ার নমুনা তাদের সামনে পেশ না করা হয়, অন্যথায় সংশোধন ও পরিবর্তন অসম্ভব।

পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে কিছু মন্দও থাকে, কিছু ভালও থাকে। তেমনিভাবে মিসর জাতির মধ্যে যথেষ্ট ভাল কর্ম রয়েছে, রয়েছে পরিবর্তনশীল মন্দ কর্মও। তবে শর্ত হলো, সম্মেলনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে তাতে ব্যবহার করতে হবে।

আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্পর্কের কার্যকরি দাওয়াত

হাকীমুল ইসলাম রহ. বয়ান চালু রেখে বলেন, আমি মিসরে তিন-তিনবার সফর করে যা কিছু অনুমান করেছি এবং বুঝাতে পেরেছি, তাহলো ভাল ও মন্দের সংমিশ্রণ এটি একটি সাধারণ ব্যাপার যা পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যে বিদ্যমান। আর পশ্চিমা তামাদ্দুনের প্রভাব শুধু মিসরী জাতির সঙ্গে বিশেষিত নয়, এর প্রভাবে প্রায় সকল মুসলিম দেশ বিশেষ করে আরব দেশগুলো প্রভাবিত ও পরাজিত। কেউ পর্দা করে কেউ করে না কিন্তু তারপরও মিসরীদের সাধারণ চেতনা যা সাধারণ এবং বিনামূল্যে শিক্ষার প্রভাবও ফল। পাশাপাশি তাদের সাধারণ সুস্থতা এবং দৈহিক শক্তি যা ওখানকার কুদরতি আবহাওয়ার ফলাফল, উভয়টির শক্তিশালী সমন্বয় তাদেরকে শক্তিশালী এবং নেতৃত্বের রাস্তায় পৌঁছেছে এবং তারা ইলম ও শরীর উভয়ের সুপ্রশস্ততা অর্জন করে রাষ্ট্র পরিচালনা হকদার বলে গেলেন। আর তারা যেভাবে আগাচ্ছে এভাবে আগানো চালু থাকলে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও দৃঢ়তা প্রতিটি ইসলামি রাষ্ট্রে ব্যাপকহারে পড়বে। বিশেষ করে মিডলিস্ট রাষ্ট্রগুলোর জন্য তাদের একতা হতে দূরে থাকার কোন আপত্তি বাকি থাকবে না।

এমন মুহূর্তে কায়রোতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্পর্ক ও একতা কায়েম করার এই কার্যকরি দাওয়াত নিঃসন্দেহে তাদের সুন্দর দূরদর্শিতা ও প্রশংসাযোগ্য পদক্ষেপ।

হযরত রহ. উল্লিখিত বয়ানের মিসরের হালচাল ও সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। এ সম্পর্কে যেহেতু হযরতের পর্যবেক্ষণ, মিসর ও হিজায হতে আগত পত্রসমূহে উল্লেখ রয়েছে এবং প্রকাশও হয়েছে সেজন্য এখানে পর্যবেক্ষণ লেখার স্থলে রচনাবলি একত্রকরণের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপুর্ণ বস্তু হলো হযরতের ওই রচনাটি, যা তিনি সম্মেলনে পাঠ করে শুনিয়েছেন।

বর্তমান বয়ানে হযরত রহ. নিজের ওই রচনার বুনিয়াদী বা মৌলিক সূক্ষ্ম বিষয়াবলি প্রয়োজনমাফিক সনাক্তকরণ এবং বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। কিন্তু তারপরও উক্ত রচনাতে যে সমস্ত গঠনমূলক প্রস্তাবাবলি এবং প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম বিষয়াবলি, যা সম্মেলনের সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমি প্রয়োজন অনুভব

করছি, ওই রচনাটিকে হযরতের আসল আরবী ভাষা অনুবাদসহ পেশ করি, যাতে উক্ত মতন মূল পাঠের সাথে সাথে মৌখিকভাবে বর্ণনা করা হালচাল এবং পর্যবেক্ষণ বিশদভাবে আলোকপাত হয়ে যায়। উক্ত আরবী বয়ানের সলিট অনুবাদ আমাদের দারুল উলূম আরবী ভাষা বিভাগের প্রসিদ্ধ উস্তাদ হযরত মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান সাহেব করেছেন, যাতে তিনি আসল ও মূল রচনার আত্মা পরিপূর্ণরূপে ঠিক রেখেছেন। হযরতের রচনাটি দারুল উলুমের রচনা ও চিঠিপত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

বিদ্যমান প্রবন্ধে ফিলিস্তিন ও গাজা সফরে তিনি ফিলিস্তিন বিভক্তির বিরুদ্ধে নিজের যে অভিমত দিয়েছেন, তাও তিনি সংযোজন করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু ফিলিস্তিন সম্পর্কিত প্রস্তাবনায় ওই বিষয়গুলো উপস্থিত ছিল, যা এই রচনাটিতে শামিল করা হয়েছিল আর যেহেতু তাতে হযরতের দস্তখতও রয়েছে তাই এ সম্পর্কে হযরতের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই রচনার মধ্যেও পাঠকবৃন্দের জন্য হাদিয়া পেশ করেছে, যা ইতিপূর্বে চলে গেছে।

হিজায সফর

১৯৬৪ ঈসায়ীর পহেলা এপ্রিল হাকীমুল ইসলাম (রহ.) হজ্জের উদ্দেশ্যে কায়রো ত্যাগ করে বাইতুল্লাহর পানে যাত্রা করেন। সেইদিন তিনি জিদ্দা হয়ে উড়োজাহাজযোগে প্রথমে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় পৌছেন। সেখানে ১৪ দিন অবস্থান করে ১৬ এপ্রিল মক্কা মুকাররামাতে পৌছেন এবং ২১ এপ্রিল হজ্জ সমাপণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই বয়ানের মধ্যে হযরত রহ. মক্কা ও মদিনায় অনুষ্ঠিত জলসার আলোচনা করেছেন। যেগুলোর সংক্ষিপ্ত সারমর্ম ইলমি জগতের মনের খোরাক হবে।

তিনি বলেন, এইবার মদিনাতে অবস্থানকালে বিশেষ করে জামিয়া ইসলামিয়ার বেশ কয়েকজন উস্তাদ সাক্ষাতের জন্য আসেন এবং অত্যন্ত প্রশস্ত মনে সাক্ষাৎ করেন।

দ্বিতীয় দিন মদিনা ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার উস্তাদ আশ শায়েখ আবুদ অবস্থানস্থলে এলেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও অনুরাগ প্রদর্শন করলেন। আনুমানিক এক ঘণ্টাব্যাপী তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হয়। পরিশেষে তিনি ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে দাওয়াত পেশ করেন এবং বলেন, আমরা যাচ্ছি। সংবর্ধনা দেয়ার জন্য উস্তাদ ও ছাত্ররা একত্রিত হবে আর আপনি তখন কিছু বয়ান করবেন। হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. এই বলে শুকরিয়ার সাথে কবুল

করে নিলেন যে, আমি তো নিজেই জামিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। নির্ধারিত সময়ে গাড়ি এসে গেল। হযরত রহ. নিজের সফরসঙ্গীদের নিয়ে বিশেষ করে হযরত মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ সাহেব রাহমানি আমিরে শরীয়ত বিহার প্রদেশ সাহেবজাদা মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ সালিম সাহেব উস্তাদ দারুল উলূম দেওবন্দ এবং মাওলানা আবদুল হক সাহেব পেশ করে। মুহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ তাদের নিয়ে ইউনিভার্সিটির দিকে রওয়ানা হন। ইউনিভার্সিটির বিশাল মাঠে উস্তাদ আবুদ এবং অন্যান্য ছাত্র ও উস্তাদগণ তাদের স্বাগত জানান এবং ইউনিভার্সিটির সহকারী প্রধান শায়খ ইবনে বায (রহ.) এর অফিসে নিয়ে যান। তিনি একজন সাগরতুল্য ইলমের অধিকারী আলেম এবং বড় মাপের একজন খতীব ও বাগ্মী ছিলেন।

শায়খ অত্যন্ত সম্মান ও খাতির করলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের কথা উঠালেন। হযরত মুহতামিম সাহেব হালচাল বর্ণনা করতে লাগলেন। ফলে শায়খ অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। তিনি অনেকগুলো কিতাব মুহতামিম সাহেব এবং তার সফরসঙ্গীদের হাদিয়াস্বরূপ পেশ করলেন। অতঃপর শায়খ আবুদ ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন করালেন এবং পরিশেষে ইউনিভার্সিটির হলরুমে নিয়ে গেলেন যেখানে সকল ছাত্র-উস্তাদ এবং শায়খ ইবনে বায পূর্বেই পৌছেছিলেন।

প্রথমে শায়খ ইবনে বায প্রায় আধা ঘণ্টা বয়ান করলেন। অতঃপর বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল আজ হজ্জের বিধিবিধান সম্পর্কে কথা বলব। কিন্তু এখন আমাদের জন্য আনন্দের সময় যে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত মুহতামিম সাহেব দা. বা.। আমরা শত আবেগ ও আকর্ষণ নিয়ে তার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি শোনার আশাবাদী হয়ে আছি। শায়খ ইবনে বাযের কথার পর সম্মেলনের সভাপতি হযরত মুহতামিম সাহেব এর পরিচয় করালেন এবং বয়ান করার ইশারা করলেন।

মদীনা ইউনিভার্সিটিতে বয়ান

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. স্টেজে পৌঁছে স্বরচিত রচনা পাঠ করলেন। তাতে তিনি ইউনিভার্সিটির সদস্যদের শুকরিয়া জ্ঞাপনের পর দারুল উলূম দেওবন্দের হালচাল, তালীম, মাসলাক এবং দীনি রুখ ইত্যাদি আলোকপাত করেন। পরিশেষে মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রশংসা এমন কিছু শব্দাবলি দ্বারা করেন, মদিনা ইউনিভার্সিটি যেগুলোর উপযুক্ত।

দারুল উলুমের হালাত, মুয়ামালাত এবং মাসলাক ইত্যাদির ব্যাখ্যাকারী বাক্যগুলোর উপর স্টেজ ও ছাত্রদের পক্ষ হতে বহুবার আলহামদুলিল্লাহ্, মাশাআল্লাহ ইত্যাদি শব্দ উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ পেয়েছে। এই রচনাটিও দারুল উলুমের রচনাবলিতে গণ্য করা হয়।

ভিত্তিহীন কথা

উক্ত রচনাটি সমাপ্ত করার পর সভাপতি হযরত রহ.-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং সম্বোধিত শব্দের প্রশংসার জন্য দাঁড়ালেন। কিন্তু বয়ান করার অনেক পূর্বে স্টেজে এলেন এবং হযরতের চেয়ারের পাশে এলেন, যা শায়খ ইবনে বায এর চেয়ারের পাশে রাখা ছিল। তিনি আরো ঝুঁকে একটি স্মরনিকা সামনে ধরে তাকে সুস্পষ্ট করার ভঙ্গিতে বললেন–

এই বিষয়টি কেমন যে দারুল উলূম দেওবন্দে আহলে হাদিস ছাত্রদের ভর্তি নিষেধ আর কেউ ভর্তি হয়ে গেলে তাকে বের করে দেয়া হয়? এক বছর এহেন কর্মকাণ্ড প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হয়েছে যে, আট/দশজন আহলে হাদিস ছাত্রকে দেওবন্দ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি এখানে ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ। এর কি কোন ভিত্তি আছে?

হযরত মুহতামিম সাহেব রহ. বললেন, উক্ত কথার কোন ভিত্তি নেই, যা আপনার কানে এসেছে। মতের পার্থক্যের কারণে কখনও আহলে হাদিস ছাত্রদের ভর্তি বাধা দেয়া হয়নি এবং মাসলাকের কারণে কোন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়নি।

যে ঘটনার প্রতি আপনি ইঙ্গিত করছেন, তার বাস্তবতা হলো এমন যে আহলে হাদিস এবং হানাফী ছাত্রদের মাঝে মাসলাক নিয়ে ঝগড়া হয়। সেই সুযোগে একদল অপরদলের বুযুর্গদের ব্যাপারে কঠিন কথা বরং খারাপ মন্তব্য করে। উক্ত ঝগড়ার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দারুল উলুমের সাধারণ নিয়ম ভঙ্গের আওতায় পড়ে। আশঙ্কা ছিল যে উক্ত ঝগড়া ব্যাপক আকার ধারণ করবে। তাই শান্তি-শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য ওই ঝগড়াকারী ছাত্রদের বহিষ্কার করা হয়, যাদের মধ্যে আহলে হাদিস এবং হানাফী মাসলাকের ছাত্র রয়েছে। যদি মাসলাকের পার্থক্যের কারণে বহিষ্কার করা হতো, তাহলে হানাফীদের কেন বহিষ্কার করা হলো। আর যদি মাসলাকের কারণে বহিষ্কার হয়ে থাকে, তাহলে আহলে হাদিস ছাত্রদের ভর্তি করার কী প্রয়োজন ছিল। আর যদি বহিষ্কার কর্মকাণ্ড মাসলাক ভিন্নতার কারণে হতো, তাহলে যে সকল আহলে হাদিস ঝগড়াতে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে কেন মাদরাসায় রাখা হলো? অতএব উক্ত কথা আপাদমস্তক

গলদ যে ওই ছাত্রদের বহিষ্কার মাসলাকের ভিন্নতার কারণে হয়েছিল। হযরতের কথায় সভার সভাপতি অত্যন্ত প্রশান্তি লাভ করলেন এবং তিনি স্টেজে পৌঁছে প্রথমে হযরত মুহতামিম সাহেবের রচনা সম্পর্কে পঞ্চমুখ প্রশংসা করলেন। অতঃপর দেওবন্দের আযমত ও ইহতিয়ামের স্বীকৃতি দিলেন এবং পরিশেষে উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে বললেন, দারুল উলূম দেওবন্দ সম্পর্কে যে কথা প্রসিদ্ধ হয়েছে এবং আমাদের কর্ণে পৌঁছেছে যে সেখানে আহলে হাদিস ছাত্রদের ভর্তি নিষেধ এবং আহলে হাদিস হওয়ার কারণে বহিষ্কার করা হয়, তা একেবারেই গলদ ও ভ্রান্ত। আমরা আজ উক্ত ঘটনা স্বয়ং দেওবন্দের পরিচালকের নিকট হতে যাচাই করলাম। এতে উক্ত প্রসিদ্ধি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলো। আর এহেন মৌখিক ঘটনা প্রচার করা অনুচিত।

হযরত মুহতামিম সাহেব রহ. যখন উক্ত ঘটনার বিশদ বর্ণনা নিজেই দিচ্ছিলেন, তখন জলসার মধ্যে আনন্দ এবং প্রশান্তির ঢেউ খেলে যাচ্ছিল এবং আফসোস করছিল যে, মানুষ ভিন দেশে এবং বিশেষ হেজাযের এত পরিত্র স্থানে পৌঁছেও এহেন ভ্রান্ত কথার অপবাদ হতেও বেঁচে থাকে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি উক্ত গলদ ও ভ্রান্ত অপবাদ রটানোর মুখোশ স্বয়ং দারুল উলুমের দায়িত্বশীল এর বয়ান দ্বারা করিয়েছেন। স্বয়ং মদিনা ইউনিভার্সিটির দায়িত্বশীল এর সামনে স্বয়ং মদিনার ময়দানে। ফলে আসল হাকীকত প্রকাশ পেয়েছে। হযরত রহ.-এর ওই পরিপূরক রচনা যা তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পাঠ করেছিলেন তাও দরুল উলুমের রচনা ও চিঠিপত্রে অন্তভুক্ত করা হয়।

রাবেতায়ে ইসলামিয়ার কনফারেন্সে অংশগ্রহণ

অতঃপর তিনি মক্কা মুকাররামার আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কথা বর্ণনা করেন, যা রাবেতায়ে ইসলামিয়ার পক্ষ থেকে রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি তাতে অংশগ্রহণ করে রাবেতার যিম্মাদারদের রচনাবলি এবং বয়ানসমগ্র শ্রবণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বয়ান হল সায়্যিদ আমিন আল হুসাইনী, মুফতি ফিলিস্তিন এবং উস্তাদ সাঈদ রমযানের বয়ান এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ইরাকের বাসিন্দা একজন সাহিত্যিক কবির ঐতিহাসিক কাসিদা, যার মধ্যে তিনি সমসাময়িক হালচিত্র তুলে ধরে আরব জাহানকে জাগ্রত হওয়ার আহ্বান করেছেন। ফলে পুরো জলসায় তার প্রভাব পড়ে।

জলসার পর জিদ্দায় রাবেতার সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা হয় একটি দাওয়াতী মজলিসে, যা ভারত দুতাবাসের প্রধান সেক্রেটারি সাইয়্যেদ শিহাবুদ্দীন সাহেবের

পক্ষ হতে করা হয়েছিল। রাবেতার সেক্রেটারি হযরত রহ.কে তখন রাবেতার উদ্দেশ্য ও মাকসাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং তার সংবিধান একটি রেশমি রুমালে রেখে প্রদান করেন।

দারুল উলূমের আন্তর্জাতিক পরিচয়

সামগ্রিকভাবে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর সফর শান্দার ও সফলকাম হয়েছিল এবং উক্ত মোবারক সফরে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে যে কাজটি করেছেন, তাহলো দারুল উলুমের আন্তর্জাতিক পরিচয় লাভ করা। তিনি মিডলিস্ট এবং ইউরোপিয়ান আলেম ও আমির-উমারাদের সামনে দেওবন্দের পরিচয় তুলে ধরেন। হযরতের সঙ্গে দেওবন্দের ইমারাতসমূহের এলবাম ছিল তা তিনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের খেদমতে পেশ করেন। সোমালিয়া, কানাডা, লন্ডন এবং অন্যান্য অনেক দেশের বিশেষ বিশেষ আকাবিরগণ উক্ত এলবাম দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন, যার ফলে অনেক মহাদেশ দারুল উলূম সম্পর্কে জানতে পারে।

দারুল হাদিস দেওবন্দের জলসায় ছাত্র এবং শহরবাসীর পক্ষ থেকে হযরতকে ওই সমস্ত কারগুজারির কারণে পদ্য ও গদ্যের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানান। সেজন্য উক্ত জলসা হজ্বের মোবারকবাদের তুলনায় অন্যান্য দেশের অন্তরকে জয় করার কারণে তা হজ্বে আকবারের ধন্যবাদে পরিণত হয়।

দারুল হাদিসের জলসা রাত দেড়টায় সমাপ্ত হয়।

বয়ান : ৪

ধর্ম ও রাজনীতি

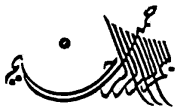
প্রথম শতাব্দিতে ইসলাহী স্কিম ছিল তিনটি বুনিয়াদী উসুলের উপর– ১. ইলমে নাফে তথা চিন্তাধারার হুকুমত, ২. ন্যায়বান চরিত্র তথা চারিত্রিক হুকুমত, ৩. উত্তম আদর্শ তথা আমলি হুকুমত। যারা জাতির জুলুম ও মূর্খতা এবং বিশৃঙ্খলাকে অপারেশন করে পৃথিবীকে একটি নতুন রাষ্ট্রীয় নিযামের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তারা ইল্‌ম দ্বারা দেমাগকে আলোকিত করেছেন, আখলাক আর চরিত্র দ্বারা অন্তরকে উদ্ভাসিত করেছেন এবং উত্তম আদর্শ অনুসরণে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সজ্জিত করেছেন। আর উল্লিখিত তিনটি আলোকিত অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যখন তারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছেন, তখন পৃথিবী তাদের সাদরে গ্রহণ করেছে, স্বাগতম জানিয়েছে। আর ওই শক্তিসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কুরআনি অঙ্গীকার মুতাবেক তাদেরকে জমিনে খেলাফতের শিকড় মজবুতভাবে গেড়ে দেন। দেশের পর দেশ বিজয় হয়, তার বান্দাদের গর্দান নত হয় এবং সংশোধন ও হেদায়েত, আমান ও প্রশান্তি সমগ্র বিশ্বে জারি হয়।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.

পূর্বকথা

এই বক্তব্যটি হযরত ফখরুল উম্মত, আমীরুল বয়ান, হাকীমুল ইসলাম মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব রহ. ১৯৪৪ ঈসায়ীর ১৫, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল সিন্ধু প্রদেশের ঐতিহাসিক শহর হায়দারাবাদে, সিন্ধু প্রদেশ শাখা জমিয়তের পক্ষ থেকে আয়োজিত সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে পেশ করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে প্রদেশের বড় বড় গ্রহণযোগ্য আলেম ও নেতৃবর্গ অশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া মজলিসে আহরার, মুসলিম লীগ ও জামায়াতে খাকসার ইত্যাদির নেতৃস্থানীয় সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

সর্বসাধারণের মধ্যে প্রত্যেক তবকা ও চিন্তাধারার লোকজন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু খুতবা মূল্যবান ইলমি, মারেফতি, ইসলাহী এবং রাজনৈতিক হওয়ার কারণে সবাই একইভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ. এমন প্রভাবিত হলেন যে, খুতবার শেষে তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমি সভাপতির ভাষণ শ্রবণের জন্যই জলসাতে এসেছিলাম। এখন আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করেছে। তিনি তার বংশীয় পয়গাম পৌছিয়েছেন।'



لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا• اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا•

ইখলাসপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আল্লাহ তায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসা, তাঁর সর্বশেষ নবীর উপর দরূদ ও সালাম ও ইখলাসপূর্ণ শোকরিয়ার পর কিছু স্মরণ রাখার এ'ত গোজারেশ এই মোবারক ও পবিত্র মাহফিলে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই, যাতে জাতির আকাবির এবং দেশের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-গবেষণায় সাহায্য করতে পারি।

যুদ্ধকাল এবং যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড

হযরত মুহতারাম!

আজ আমরা ইতিহাসের ভয়াবহ মুহূর্তে একটি ঐতিহাসিক স্থানে একত্রিত হয়েছি। দুনিয়া তার নিজের তৈরি ফাঁদে ফেঁসে যাচ্ছে, দুনিয়ার তদবিরকারকরা

নিজেদের তদবিরগুলোকে উৎসাহ দিচ্ছে। সমৃদ্ধশালী জমিনের ওই অংশসমূহ যেগুলো পরিতৃপ্ত অবস্থায় শয়তান ও তাগুত থেকে খাজনা উসুল করতো, সেগুলো আজ এতই ধ্বংসাত্মক অবস্থায় যে, মানবতা আজ শুধুই অশ্রু প্রবাহিত করছে। মানবতা তার যিয়ারত-চিহ্নের উপর দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করছে। আর মানুষ কেয়ামতের পূর্বেই কেয়ামতের ভয়াবহ নমুনা দেখে কাঁপছে। আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীকে নিজ বান্দাদের জন্য ইবাদতের বাগিচা বানিয়েছিলেন। কিন্তু শয়তান ও তার দোসররা পৃথিবীকে পরাধীনতার যুদ্ধের জাহান্নাম বানিয়ে ফেলেছে। আজ তার উন্মাদনায় সারা পৃথিবী জ্বলছে। আজ ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই আর্তনাদ করছে। তাদের আর্তনাদের আওয়াজ ধর্মের চার দেওয়ালের ভিতর পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, যা ধর্মীয় পথপ্রদর্শকদের আত্মাকে কাঁপাচ্ছে।

ধর্ম ও রাজনীতি

ওই সকল মানুষ, যারা অশান্ত পৃথিবীর পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন এবং ধর্ম ও রাজনীতির ভূমিকায় ধর্মের তরে মৃত্যু ও শান্তি স্থির করে নিয়েছিলেন আজ তারা আল্লাহর নিকট আবেহায়াতের রাস্তা জিজ্ঞেস করছেন। আর যারা আল্লাহর সঙ্গে আকাশে মুকাবেলা করার জন্য ইচ্ছা এবং প্ল্যান করেছিল, তারা তার ছোট-ছোট মাখলুকের মুকাবেলায় হার-জিতের খেলা খেলছে। এতে কোন দেশ, জাতি এবং গোষ্ঠীর কোন বিশেষত্ব নেই বরং ওই সমস্ত জাতি শামিল, যারা আল্লাহর জমিনে নিজেদের অহংকারের প্রভাব-প্রতিপত্তি চালাতে চায়।

বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলো ধর্ম ছেড়ে স্বাধীনতা, সাম্য ও গণতন্ত্রের স্লোগান নিয়ে যাত্রা করেছিল। আজ তারা যখন ফিরে আসছে তো তাদের সঙ্গে কে এসেছে? স্বাধীনতার স্থলে দাসত্ব, সাম্যের স্থনে রাজনৈতিক উঁচুতা-নিচুতা এবং গণতন্ত্রের স্থানে শুধু জবরদখল।

যুদ্ধের শেষ পরিণতি বা সমাধান

যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের আজ পঞ্চম বছর। কেউ জানে না এমনকি চার্চিল, রুজভিল্ট এবং হিটলার প্রভৃতি কেউ জানে না যুদ্ধ কবে বন্ধ হবে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা শুধু যুদ্ধপ্রান্তর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং সারা বিশ্ব তার আগুনে জ্বলছে। শুধু মানুষ নয়, সাথে সাথে দেশও ধ্বংস হচ্ছে। আমার স্মরণ আছে, বৃটিশ সালতানাতের বড় মন্ত্রী ও পৃষ্ঠপোষক মি. বাল্ডুইন নিজের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বলেছিলেন–

যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে শুধু আমরাই ধ্বংস হবো না, আমাদের সাম্রাজ্য এবং তামাদ্দুনও ধ্বংস হবে।

ঘটনাবলি সামনে রেখে পৃথিবী আজ শর্তযুক্ত বাক্যের সত্য-মিথ্যা ফয়সালা করতে পারে। যুদ্ধ চলছে, আজও জারি আছে, আরো চলবে। গোডিল মেইল নিজ রচনা ১৯৪৪ ঈসায়ী ২১ মার্চে লিখেছিলেন–

হঠাৎ যুদ্ধ থেমে যাওয়ার অধিক সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হচ্ছে।

নিঃসন্দেহে উল্লিখিত শব্দাবলি সমগ্র মানবতার আন্তরিক আহ্বান। কিন্তু বাস্তবতা ওই ভবিষ্যদ্বাণী এবং আহ্বানের সঙ্গী হয় না। কারণ, পৃথিবীর দু-কোটি মানুষের যা প্রয়োজন, পৃথিবীর পরিচালকগণ তা তাদের নিকট পৌঁছাতে অপারগ।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র

এক. পৃথিবীর আন্তর্জাতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন, যাতে কোন দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা কেড়ে না নেয়া হয়।

দুই. পৃথিবীতে দেশীয় পার্লামেন্টের স্থলে আন্তর্জাতিক পার্লামেন্ট জরুরি, যা আমজনতার ভাষ্যকার হবে।

তিন. দুনিয়ার সমগ্র উৎপাদিত সম্পদ কোন এক দেশের স্থলে সারা বিশ্বের লোকদের নিকট পৌঁছানোর প্রয়োজন, যাতে সমস্ত হকদার তাদের অধিকার মুতাবেক অংশ পেতে পারে।

চার. পৃথিবীতে একনায়কতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের স্থলে আন্তর্জাতিক আদালত এবং আন্তর্জাতিক কানুন থাকা প্রয়োজন, যা সকলকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করবে। যদি যুদ্ধবাজ জাতিগুলো উপড়ে উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি মেনে না নিতে পারে, তাহলে সর্বদা যুদ্ধ লেগেই থাকবে। যদিও আজ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে; কিন্তু এমতাবস্থায় যুদ্ধ থেমে যাওয়া তার চেয়ে আরো বড় যুদ্ধ হওয়ার প্রস্তুতি হবে।

তবে হ্যাঁ, যুদ্ধের ফয়সালা দুনিয়ার হুকুমত না করে যদি আল্লাহর হুকুমত করেন এবং তার সর্বব্যাপী রাজত্বে যদি উক্ত চারটি দৃষ্টিভঙ্গিকে মানুষের দ্বারা কার্যকর করে রাখেন, তাহলে সম্ভব যুদ্ধ বন্ধ করা।

হিন্দুস্তানের হালচাল

হিন্দুস্তানের অবস্থা পৃথিবীর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ভিন্ন নয়। একদিকে অনিঃশেষ ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় গোলামি, যা নিজের অস্তিত্বে টিকিয়ে রাখার জন্য এক শতাব্দি পর্যন্ত বাহানা তালাশ করছে। অপরদিকে স্বাধীনতার উন্মাদনা, যা এখানকার গোষ্ঠীগুলোকে নিজেদের আন্তর্জাতিক দুর্গে বন্দি করে ফেলেছে এবং সারা পৃথিবীর ন্যায় তারাও উক্ত চারটি বিষয় অন্বেষণে জাতিগুলোর অংশীদার। তার চেয়ে বেশি ওই পীড়াদায়ক হাঙ্গামা, যা আমাদের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের গোলামি শক্তির সামনে পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে। সর্বশেষে ওই সূক্ষ্ম বিষয়াবলি অন্বেষণের তুফান উলামাদের মাথার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। উক্ত সম্মিলিত মসিবতের অগ্নিছায়ায় আজ আমরা এখানে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, যাতে আমরা সর্বব্যাপী দুঃখ-কষ্টের কোন সর্বব্যাপী নিরাময় বের করতে পারি এবং নিজেদের ডুবন্তপ্রায় তরীকে তুফানী আঘাত থেকে উদ্ধার করতে পারি। কবি বলেন–

কখনো তুফান কুদরতি কাজ করে, প্রবল তরঙ্গ থেকে আমাদের তরীকে নদীর তীরে ফেলে দেয়।

ওই ধ্বংসাত্মক রোগের চিকিৎসা কী?

আমি একজন রাজনৈতিক মানুষ থেকে উর্ধ্বে একজন ইল্‌ম অন্বেষণকারী ছাত্র হিসেবে নিজের ইল্‌ম ও বুঝ মুতাবেক যতটুকু চিন্তা-গবেষণা করতে পারি, পৃথিবীর গোষ্ঠীগুলোর জন্য ধ্বংসাত্মক ব্যাধিসমূহ যেগুলো জাতিকে সর্বদা ওলট-পালট করে এবং ঘন বনে তাদের আকাশচুম্বি ইমারতগুলোকে মাটির সঙ্গে পিষে ফেলে, সেগুলো মৌলিকভাবে তিনটি ব্যাধি। তন্মধ্যে দুটি বুনিয়াদী আর একটি দুটির কুদরতি নতিজা। ১. মূর্খতা, ২. জুলুম ও ৩. দাসত্ব।

মূর্খতা

মূর্খতার কারণে বস্তুর সীমা অজানা থেকে যায়, ভাল-মন্দের তমিয পরখ করার ক্ষমতা থাকে না, কোন বিধানসম্মত জীবন সামনে আসে না এবং মানুষ নিজেদের ওই বিশেষ তফাৎকে মিটিয়ে ফেলে, যা তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে আলাদাভাবে দান করেছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, কোন

মানুষ যদি প্রাণীদের সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে মানবসমাজে তাকে মান্য করা হয় না।

জুলুম

জুলুম ইনসাফের বিপরীত। এখানে জুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য আখলাকী জুলুম অর্থাৎ চরিত্র ইনসাফপূর্ণ ও মধ্যমপন্থার উপর স্থির না থাকা এবং স্বভাবজাত শিথিলতা ও কঠোরতা, যা নফসের জুলুম। যেহেতু আখলাক হলো কর্মের শক্তি, সেজন্য অস্বাভাবিক আখলাক থেকে অস্বাভাবিক কর্মই প্রকাশ পাবে। আর ওই অস্বাভাবিক চরিত্রের কারণেই জাতীয় ক্যারেক্টার নষ্ট হয়ে যায়। জাতির প্রতি বিশ্বস্ততা থাকে না। আল্লাহ্ ও তার বান্দাদের দৃষ্টি থেকে ওই জাতি পড়ে যায়। আর পরিশেষে বদ আখলাকের জীবাণু ভরপুর ওই জাতিকে সম্মানিত ও চরিত্রবান জাতির কাতারে দাঁড় করানোর যোগ্যতা থাকে না। তারা তাদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

গোলামি বা দাসত্ব

গোলামির ধ্বংসাত্মক কর্ম ফাওযিয়্যাত (নৈরাজ্য) থেকে শুরু হয়। ফাওযিয়্যাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোন জাতির মধ্যে শৃঙ্খলা না থাকা, কেন্দ্রীয়তা না থাকা, তাদের কোন নির্দিষ্ট নেতা না থাকা, যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক পৃথক বাদশাহ বনে বসে আছে। পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা বিলুপ্ত হয়েছে। এহেন কর্মকাণ্ড দ্বারা (ঐক্যবদ্ধ) একতা শক্তি হারিয়ে যায়। বিভিন্ন দল এবং অনৈক্য কারণে যখন জাতির মধ্যে মূর্খতা ও জুলুমের কারণে প্রাণ থাকে না তখন অন্যান্য শক্তিশালী জাতি বিদ্রোহ করে তাদের উপর জয়ী হয়ে পড়ে। তখন তাদের নৈরাজ্যের ফল গোলামি ও দাসত্বের অবয়বে প্রকাশ পায়। যা একটি জাতির জন্য জাগতিক ভয়াবহ আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ গযব। অতঃপর উক্ত গোলামির কারণে একটি জাতি নিজেদের জাতীয় সম্পদ, কৃষ্টি-কালচার, তাহযীব-তামাদ্দুন এবং নিজেদের ইল্‌ম ও আমলের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। শেষ পরিনামে এই জাতীয় বিশৃঙ্খলা এবং গোষ্ঠীগত অনেক্যের রোগ-জীবাণু, জাতির অস্তিত্বকে এমনভাবে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করে যে কিছুকাল পর পৃথিবীতে তাদের চিহ্নটুকু অবশিষ্ট থাকে না।

কুরআনুল হাকীমের ফয়সালা

কুরআনুল হাকীম গযবগ্রস্থ ইহুদী জাতির ধ্বংসাত্মক ব্যাধির নির্যাস ওই তিনটি বস্তুকে নির্ধারণ করেছে। তন্মধ্যে জুলুম ও মূর্খতাকে আসল ও বুনিয়াদী বলেছে এবং গোলামিকে শাখা বলেছে।

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ ۞ وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ۝

আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত তারা যেখানেই অবস্থান করেছে, সেখানেই তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর তারা অর্জন করেছে আল্লাহর গযব। তাদের উপর চাপানো হয়েছে বেইজ্জতি, তা এজন্য যে তারা অস্বীকার করেছে আল্লাহর আহকাম এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণে তারা নাফরমানি করেছে এবং সীমালংঘন করেছে। *[সূরা বাকারা : ৬১]*

তাদের সর্বোচ্চ বেইজ্জতি ও অপদস্থতা ছিল এই যে তাদের থেকে কেয়ামত পর্যন্ত রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, কিছু রাষ্ট্রের দাসত্ব করার জন্য ওদের জীবন বিশেষীত করা হয়েছে। কখনো ইউনানি এবং কালদানীদের গোলাম, কখনো বুখত নাসরের গোলাম, কখনো ইরানী এবং অগ্নিপূজকদের মাশুরদাতা, ট্যাক্সদাতা, কখনো মুসলমান রাষ্ট্রের অধীন এবং কখনো খ্রিস্টানদের অধীন, কখনো হিটলারের দয়া ও অনুগ্রহে বেঁচে থাকা, কখনো আমেরিকানদের মৌখিক হামদর্দীর উপর বেঁচে থাকা।

মোটকথা, দায়েমী স্থায়ী গোলামি তাদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তারপর তারা যখন যে জাতির গোলাম হিসেবে রয়েছে তারা ওদের একন কোন ইজ্জত-সম্মান করেনি যা সাধারণত একজন মানুষের জন্য প্রয়োজন মনে করা হয়। বর্তমান সময়ে জার্মান জাতি তাদেরকে যেভাবে অপদস্থ করে উচ্ছেদ করেছে তা নজিরবিহীন। প্রত্যেকের মালআসবাব জব্দ করা হয়েছে, শহুরেদেরকে হোটেলগুলো এবং জনগণের সমাবেশে প্রবেশাধিকার বঞ্চিত করা হয়েছে যে ওই স্থানগুলোতে ইহুদী এবং কুকুর প্রবেশ করতে পারবে না। বৃটেন

তাদের জরুরি আশ্রয় দেবে কিন্তু সামান্নতম ইজ্জত ও মর্যাদার প্রতি খেয়াল করবে না কারণ বৃটিশ পরিচালকদের মনোভাব দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, তারাও ওদের সীমাহীন বেইজ্জত অপদস্থ জাতি হিসেবে জানে এবং তাদের পৃথিবীর রক্তচোষা জাতি উপাধিতে স্মরণ করে।

তেমনিভাবে আমেরিকাও তাদের সঙ্গে থাকবে তবে কোন সম্মান দিয়ে নয় বরং গোলামি বানিয়ে। কুরআনুল হাদিস ইহুদী জাতির জন্য সর্বোচ্চ বেইজ্জত ও অপদস্থতা নির্ধারণ করেছে। কুরআন ওদের যিল্লত মিশ্রিত দাসত্বের একটি কারণ ইসয়ান অপবাদ বলেছে। যা আমলি বা কার্যত জালেম। আর তার কারণ বলেছে, দুশমনি ও শত্রুতাকে; যার বাস্তবতা হলো সীমালঙ্ঘন এবং বাড়াবাড়ি। আর তা ওই জুলুম এবং চারিত্রিক উগ্রতা যা দ্বারা সমস্ত জুলুমমুলক কর্মকাণ্ড প্রকাশ পায়। আর প্রকাশ থাকে যে, সীমালঙ্ঘন কর্ম এছাড়া হতে পারে না যে হয়তো সীমা বিষয়ক ইল্‌ম নেই বা আছে কিন্তু না থাকার এত ব্যবহার করে। আর জানা সত্ত্বেও না জানার ব্যবহার করা এমন মূর্খতা যা দ্বারা ভাল-মন্দের তমিয করতে পারে না।

অতএব ইহুদী জাতির যিল্লতি ও বেইজ্জতি লাভের বিন্যাসে এভাবে কায়েম হলো যে তাদের মধ্যে গোলামি এসেছে বদআমলের কারণে, আর বদআমলের উৎসস্থল হলো চারিত্রিক জুলুম এবং ব্যক্তিগত মূর্খতা। কারণ উক্ত তিনটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি বড় বড় জাতিকে ধ্বংস করার দায়িত্ব নেয়। আর সেগুলো হলো জুলুম, মূর্খতা এবং দাসত্ব, উক্ত তিনটিকে এক আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য স্থানে উক্ত তিনটি ব্যাধিকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছে। যার ফলে ঐগুলো মৌলনীতির মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এক স্থানে মানুষকে আমানতে এলাহীর বাহক বানাতে গিয়ে বলেছেন যে, তার বুনিয়াদী শর্ত হল দুটি বস্তু তথা জুলুম ও মূর্খতা। এ দুটি থেকে সংশোধনের জন্য আমানতের জযবা জরুরি। আর মানুষ তার কারণে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য লাভ করবে।

আল্লাহর ইরশাদ–

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

আমি আকাশ, জমিন এবং পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম। অতঃপর তারা তার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার

করল এবং ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তার দায়িত্ব গ্রহণ করল। নিশ্চয়ই সে বড় জালেম ও মূর্খ। *[সূরা আযহাব : ৭২]*

অর্থাৎ তার মাঝে ইলমি শক্তি এবং আমলি শক্তি তত উত্তম চরিত্র বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু আমানতের মধ্যে ইলমি বস্তু এবং আখলাকী ইনসাফের যোগ্যতা ছিল। যা দ্বারা সে বড় ন্যায় বিচারক এবং বড় আলেম হতে পারত।

অন্যত্র এই স্বভাবজাত জুলুম ও মূর্খতা দূর করার জন্য এবং উক্ত আমলি ও ইলমি যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর উপরই পরকালের নেয়ামত লাভ সম্ভব ঘোষণা করে ইরশাদ করেন–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

এই পরকাল আমি ওই সকল লোকদের জন্য নির্ধারণ করি, যারা দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য করতে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়নি। খোদাভীরু মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণাম। *[সূরা কাসাস : ৮৩]*

প্রকাশ থাকে যে, ঔদ্ধত্য ও অহংকার মূর্খতার কারণে হয়ে থাকে যে, মানুষ তার নিজ দুর্গন্ধযুক্ত মূল ভিত্তিকে ভুলে যায়। ফাসাদ হলো সলাহ (শান্ত)-এর বিপরীত। আর সলাহ ও রুশদ (সততা) না থাকাই নফসের জুলুম চাই তা আমলি হোক বা আখলাকী। সুতরাং জুলুম ও মূর্খতার প্রভাব প্রতিক্রিয়া বলে উক্ত ধ্বংসাত্মক দুটি ব্যাধির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

অন্যত্র বলা হয়েছে, মানবজাতির খেলাফত লাভে যদি কোন বস্তু প্রতিবন্ধক থাকে, তাহলে তা হলো তার মূর্খতা ও জুলুমগুণ। অন্য কথায় বলা যায়, যদি কোন জিনিস মানুষের মধ্যে গোলামি, যিল্লতি ও অধঃপতন সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে তা জুলুম ও মূর্খতা। সুতরাং মানুষ যখন খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব লাভ করছিল, তখন ফেরেশতাকুল তার মূর্খ ও জালিম স্বভাব অনুভব করে তার খেলাফত সম্পর্কে নিজেদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, যার বর্ণনা আল্লাহ তায়ালা এভাবে করেছেন–

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ

আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাকুলকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। তখন

ফেরেশতারা বললেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। *[সূরা বাকারা : ৩০]*

এ আয়াতে ওই ফাসাদের কথা বলা হয়েছে, যে সলাহ-এর বিপরীত, যার দ্বারা প্রকাশ্যভাবে ইঙ্গিত করা হলো জুলুম ও রক্তপাতের প্রতি। বাস্তবে মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মানুষ না নিজের মূল্য বুঝতে পারে, না অন্যের প্রাণের মূল্য বুঝতে সক্ষম। অতএব প্রত্যেক ভাল কর্ম হতে বঞ্চিত হওয়ার শিকড় ও বুনিয়াদ হলো জুলুম ও মূর্খতা। এদের কারণে ভাল কর্মের সৌভাগ্য হয় না।

গোলামি সম্পর্কে কুরআনের বিধান

অপরদিকে কুরআনুল হাকীম তৃতীয় ব্যাধি দাসত্বকে জগতের নিকৃষ্ট শাস্তি বলে আখ্যায়িত করেছে, যা বাস্তবে ওই জুলম ও মূর্খতার ফল। বনি ইসরাইলের গোলামি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন, অবশ্যই কেয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। *[সূরা আরাফ : ১৬৭]*

এই নিকৃষ্ট শাস্তি এবং অন্যদের জবরদখলই ওই দাসত্ব ও প্রজাত্ব, যাকে কুরআনুল কারীম নিকট শাস্তি বলেছেন। অতএব উক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল, ইসলামের দৃষ্টিতে জাতির ধ্বংস ও অধঃপতন ওই তিনটি উসুলের উপর অর্থাৎ জুলুম, মূর্খতা ও গোলামির উপর। আর পৃথিবীর ইতিহাসে প্রত্যেক ধ্বংসকৃত জাতিসমূহ এই তিন ব্যাধির দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছিল।

সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আরব জাতি

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে আরব জাতির জাতীয় জীবনে উল্লিখিত তিনটি ব্যাধির জীবাণু প্রবেশ করেছিল। ফলে তাদের পার্থিব জীবনে নেমে আসে অধঃপতন। তারা সামাজিক জাতি তো নয়ই এমনকি সাধারণ জাতি হিসেবেও গণ্য হবার উপযুক্ত থাকেনি। মূর্খতার কারণহেতু তাদের থেকে ভাল-মন্দ পরখ করার যোগ্যতা হারিয়ে যায়। তারা কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়ের মাঝে তমিয

করতে পারে না। জাগতিক বস্তুর সীমারেখা তাদের অন্তর হতে হারিয়ে যায়। ফলে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার মাঝে পার্থক্য করা ভুলে যায়, যার দরুন মাখলুকের গুণাবলিকে আল্লাহর সঙ্গে এবং আল্লাহর গুণাবলি বান্দার সাথে মিলিয়ে কুফরী ও শিরকে লিপ্ত হয়। এতে বান্দার সংখ্যা খোদার চেয়ে বেশি হয়ে পড়ে। তারা কাবাঘরকে হাজারো মূর্তির বাসস্থানে পরিণত করে। এদেরকে নিজেদের জীবনের মালিক কল্পনা ও বিশ্বাস করত। এদের নিকট নিজেদের উদ্দেশ্য প্রার্থনা করত। তাদের সামনে প্রাণীদের বলি দেয়া হত।

তারা পূর্বপুরুষদের মনগড়া রীতি-রেওয়াজকে নবীদের সুন্নাতের এত মর্যাদা দিত আর নবীদের সুন্নাতকে অস্বীকার করতো। তারা দীন ও বদদীন উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য বিধান করতে পরত না। দীনকে বদদীন মনে করে বেদীন হয়ে গিয়েছিল। আর বদদীনকে দীন বানিয়ে বিদআত ও মনগড়া আবিষ্কারে লিপ্ত হয়েছিল। অপরদিকে উগ্র চরিত্রের অধিকারী হওয়ার ফলে স্বাভাবিক চরিত্র এবং উন্নত চরিত্রের ঘ্রাণও অবশিষ্ট থাকেনি। উগ্র ও কঠোর ও মিথিল চরিত্রের হওয়ার কারণে তাদের থেকে লজ্জা উধাও হয়ে গিয়েছিল। তাদের আত্মাভিমান, হামদর্দী ও সহমর্মিতা বাকি থাকেনি। ছিল না তাদের মধ্যে মানবতাবোধ, নিঃস্বার্থতা, আতিথেয়তা, পরোপকার, একনিষ্ঠতা, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা। না ছিল আল্লাহর উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল। তবে তাদের মধ্যে অহংকার, অহমিকা, নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা, আমিত্ব, মাতব্বরি, দেমাগ ও আত্মগর্ব, বর্বরতা, হিংস্রতা উলঙ্গপনা, লাম্পট্য, পাশবিকতা ও আত্মপ্রশংসা ইত্যাদি বদ-আখলাকের মাধ্যমে যে সকল বদ আমল প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলো হলো লুটপাট ও জবরদখল, হত্যা ও ডাকাতি, ব্যাভিচার ও মদ, জুয়া ও ঘুষ, শিশুহত্যা ইত্যাদি। যেগুলো তাদের দীনি ও দুনিয়াবী উভয় জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

অন্যদিকে তাদের ঐক্যের অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ছিল না দলবদ্ধতা, ছিল না রাষ্ট্রীয় তামাদ্দুন, ছিল না নাগরিকত্ব ও নাগরিক অধিকার। জীবন পরিচালনার কোন আইন কানুন বা সংবিধান ছিল না। সমগ্র আরব জাহান উশৃঙ্খল যাযাবর বা ছিন্নমূল দলের ন্যায় ছিল। যারা বিভিন্ন জঙ্গলে ও মাঠে বসবাস করতো। বর্বরতা, অপরাজতা ও বিশৃঙ্খলা ইত্যাদির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অনৈক্য এবং দিন-রাত গৃহযুদ্ধ পরিণামে তাদের যিল্লতি ও অপদস্থতা এবং দাসত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ফলে তাদের জাতীয় অবস্থা এমন হয়েছিল যে, কখনো রোমীয়দের বন্দি, কখনো পারসিকদের গোলাম, কখনোবা অন্য জাতির অধীন, কখনও নিজেদের শিকারে পরিণত হয়েছে। মোটকথা, জুলুম ও মূর্খতা তাদের থেকে নবুওয়াতের আলামত

নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। অন্যৈক ও দাসত্ব তাদের থেকে রাজত্বের বুনিয়াদ ধ্বংস করে দিয়েছিল। অর্থাৎ তাদের মধ্যে দীনদারিও ছিল না, রাজনীতিও ছিল না। এগুলোর ঘাতক ব্যাধি ছিল জুলুম, মূর্খতা ও দাসত্ব।

রহমতে ইলাহীর প্রকাশ, ইলমে নবুওয়াত, মাকারিমে আখলাক ও উত্তম আদর্শের অবয়বে

অবশেষে আল্লাহ তায়ালার রহমত উথলে উঠল এবং অন্ধকার আত্মা, অন্ধকার চিত্র এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতির উপর খতমে নবুওয়াতের আলো প্রজ্জ্বলিত করলেন। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই ধ্বংসাত্মক তিনটি ব্যাধিকে প্রতিরোধ করার জন্য তিনটি দ্রুত আরোগ্যদানকারী চিকিৎসা পেশ করলেন। নিজের দালিলিক ইলম, যা মূর্খতার প্রতিশেধক নিজের উত্তম চরিত্র যা চারিত্রিক অন্ধকারতার চিকিৎসা এবং নিজের সুসজ্জিত উত্তম আদর্শ, যা দ্বারা দাসত্ব কাছেও আসতে পারে না এবং জীবন শৃঙ্খলিত হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত তিনটি শাখাকে তিন স্থানে পৃথক পৃথক শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। একস্থানে পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন–

انما بعثت معلما

নিঃসন্দেহে আমাকে মুয়াল্লিম বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

অন্যস্থানে এই আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন–

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

নিঃসন্দেহে আমাকে পাঠানো হয়েছে উত্তম চরিত্রকে সর্বোচ্চ আসনে আসীন করার জন্য বা পূর্ণতা দান করার জন্য।

কুরআনুল কারীমের একস্থানে আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে (ইলম আখলাক ও আমল) উত্তম আদর্শ রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন অকাট্য ইল্‌মের সূচিপত্রে এমন কার্যকরী নিয়মাবলি পেশ করেছেন, যা দ্বারা আমলের পরিধি সুস্পষ্ট হয়েছে এবং

হালাল ও হারাম, জায়েয ও নাজায়েয, বৈধ ও অবৈধ ইত্যাদির পৃথকীকরণ ইল্‌ম অর্জন হয়েছে। আর নিজের উত্তম চরিত্র দ্বারা আমলের এমন শক্তি পেশ করেছেন, যা দ্বারা জায়েয আমলের দাবি অন্তরে জাগ্রত হয়েছে, আমলের জযবা সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষ কারো প্ররোচনা বা উস্কে দেয়ার কারণে নয় বরং নিজ আগ্রহে আমলি জীবনে প্রবেশ করেছে। আর এই সকল কর্ম সম্পাদন করার জন্য হায়াত নামক নেয়ামত দান করা হয়েছে। আর তিনি নিজের উত্তম চরিত্র দ্বারা ইলমি আখলাকে আপন জীবনে এমনভাবে সাজিয়েছেন, যা সমগ্র জাতির মধ্যে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের একটি পরিপূরক ও শক্তিশালী নেযাম কায়েম হয়েছে, যা দ্বারা কেন্দ্রীয়ভাবে ইলম ও আখলাকের প্রচার ও প্রসার হয়েছে এবং তার অনুসরণ-অনুকরণ এমন বিশেষ বিন্যাসে আমলে আসছে, যা সারা জাতির মধ্যে মর্যাদা ও জন্মগত শওকত ও রূহানি শক্তি এবং প্রাধান্য ও আধিপত্যের প্রভাব আন্তর্জাতিকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সুতরাং প্রথম শতাব্দিতে ইসলাহী স্কীমের বুনিয়াদী উসুল ছিল তিনটি–

১. ইলমে নাফে ততা চিন্তাধারার হুকুমত,

২. ইলসাফগার চরিত্র তথা চারিত্রিক হুকুমত,

৩. উত্তম নমুনা তথা আমলি হুকুমত, যা দ্বারা জাতির জুলুম, মূর্খতা ও বিশৃঙ্খলা অপারেশন করেও দূর করে পৃথিবী একটি নতুন রাষ্ট্রীয় সংবিধান স্থাপন করেছে। ইলম দ্বারা দেমাগকে আলোকিত করেছেন, আখলাক দ্বারা অন্তরকে আলোকিত করেছেন এবং উত্তম আদর্শ অনুসরণে নিজেদের সাজিয়েছেন। আর উল্লিখিত তিনটি আলোকিত অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা যখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন, তখন পৃথিবী তাদের স্বাগতম জানিয়েছে এবং সাদরে গ্রহণ করেছেন আর এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা মোতাবেক জমিনে খিলাফত দানের শিকড়কে মজবুত করেছেন। ফলে বহু দেশ বিজয় হয় এবং আল্লাহর বান্দারা দীন গ্রহণ করে আর ইসলাহ ও হেদায়েত এবং শান্তি ও নিরাপত্তা সমগ্র বিশ্বে জারি হয়।

মুসলমানদের বিশ্বজয় বা বিশ্বজয়ী মুসলমান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় মক্কা, খায়বার, বাহরাইন ও সমগ্র আরব দ্বীপ এবং ইয়েমেন ভূখণ্ড বিজয় হয়। পারস্যের হিজর থেকে তিনি খাজনা আদায় করেছেন। শামের কিছু কিছু এলাকায় ইসলামি নিশান পতপত করে উড়েছে। আর সারা বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে এমন প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল যে, রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াস, মিসর রাজা মুকাউকিস, হাবশার বাদশা নাজ্জাশি এবং

আম্মান রাজাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপঢৌকন পেশ করে নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর খিলাফতে রাশেদার সংক্ষিপ্ত যুগে যখন ইসলামি বিজয়ের ফটক উন্মুক্ত হয়, তখন নবীজির ভবিষদ্বাণী মোতাবেক বিজয় বিস্তৃত হতে থাকে। তারপর অতি স্বল্প সময়ে অর্ধ পৃথিবীর বেশি অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। হযরত আবুবকর ছিদ্দিক রাযি.-এর শাসনামলে সত্যপূজারী হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদের হাতে পারস্য সাম্রাজ্যের অনেক শহরের পতন হয়। তিনি সেগুলোতে ইসলামি বিজয়নিশান উড়ান। হযরত আবু উবায়দার হাতে শামের অনেক শহর বিজয় হয়। আর আমর ইবনুল আস রাযি.-এর হাতে মিসরের অনেক অঞ্চল বিজয় হয়। হযরত ফারুকে আযমের যুগে উল্লিখিত এলাকাগুলোর পূর্ণ বিজয় লাভ হয়। তার যুগে সমগ্র মিসর অঞ্চল, তামাম পারস্য ভূখণ্ড এবং রোম ও ফিলিস্তিন পর্যন্ত ইসলামি সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে এবং ইসলামি নিশানাসমূহ সমুন্নত হয়। হযরত উসমান রাযি.-এর খিলাফতকালে উক্ত বিজয় সয়লাবের রূপ ধারণ করে। তার স্রোত পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের শেষ প্রান্ত গিয়ে পৌছে। পশ্চিম দিকে স্পেন শেষ প্রান্ত, কাবরাস, কিরওয়ান এবং সাবতা অঞ্চল ও বাহরে মুহিত পর্যন্ত। তার পূর্বদিকে ইসলামি মানচিত্রের পরিধি চীন সীমান্ত পর্যন্ত ইরান, মাদায়েন, ইরাক ও খোরাসান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সেই অঞ্চলগুলো হতে খাজনা একত্রিত হয়ে মদিনার অলিগলিতে আসতে থাকে। এ সম্পর্কে রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে ইরশাদ করেছিলেন–

إن الله زَوَى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن مُلْك أُمتي سيبلغ ما زُوي لي منها

আল্লাহ তায়ালা আমাকে সমগ্র ভূখণ্ড দেখালেন। আমি সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দেখেছি। অচিরেই আমার উম্মত ওই ভূখণ্ড পর্যন্ত পৌছবে যতটুকু আমি দেখতে পেয়েছি। *[ইবনে কাসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪০ পৃঃ]*

প্রকাশ থাকে যে, খিলাফতে রাশেদার যুগে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম ভূখণ্ডে বিজয়ের মানচিত্র সুপ্রশস্ত হয়নি। নবুওয়াতের দৃষ্টি সে সকল ভূখণ্ড পর্যন্ত পৌছেছিল এজন্য খিলাফতে রাশেদার পর ইসলামি বাদশাহী আমলেও বিজয়ের স্রোতধারা জারি থাকে। ফলে হিন্দুস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, পূর্ব ভারতবর্ষের

দ্বীপগুলো, মামারা বুখারাসহ ইউরোপ মহাদেশের অনেক দেশ ইসলামি তলোয়ার দ্বারা বিজিত হয়েছে। বিজিত এলাকার কৃষ্টি-কালচার, তাহযীব-তামাদ্দুন এবং মতাদর্শকেও ইসলাম জয় করেছিল। পুরোপুরি বিজয় না হলেও কমপক্ষে তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তারপরও আজ পর্যন্ত নবুওয়াতের দৃষ্টির প্রশস্ততা পর্যন্ত বিজয় অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তবে ওই সময় বেশি দূরে নয়, যখন প্রতিটি ঘর ও তাঁবুতে ইসলামি কালিমা পৌঁছে সমগ্র বিশ্বকে নিজের সর্বব্যাপী প্রশস্তায় শামিল করে নিবে এবং সারা পৃথিবীকে একই প্লাটফর্মে নিয়ে আসবে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِیْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰی وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَی الدِّیْنِ كُلِّهٖ ؕ وَ كَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا•

তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যাতে একে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন (দলিল প্রমাণ দ্বারা, শান শওকত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা, যা প্রথম শতাব্দিতে নমুনাস্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল আর শেষ শতাব্দিতে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে)। আর সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহই যথেষ্ট। *[সূরা আল ফাতাহ : ২৮]*

অতএব এই সকল মাদ্দি ও রূহানি বরকতসমূহ ওই পবিত্র জাতির পবিত্র হাতে প্রকাশ পেয়েছিল, যারা নবুওয়াতের বরকত থেকে বরকত লাভ করে নিজেদের অন্ধকারত্ব ও জুলুমকে সুন্দর চরিত্র দ্বারা এবং মূর্খতাকে উপকারী ইলম দ্বারা আর আমল ও কার্যাবলিকে উত্তম আদর্শ এর শৃঙ্খলিত কর্ম দ্বারা আলোকিত করেছিলেন।

মূর্খতার যুগ

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, তের শতাব্দি পর বর্তমান সময়ের অনেক অধিকাংশ মানুষ ওই জাহেলী যুগের তিন বুনিয়াদী উসুল জুলুম, মূর্খতা ও গোলামির শিকার হচ্ছে ও গ্রহণ করছে, যা নবুওয়াতের সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে ছিল।

মূর্খতার আধিক্য

অধিক মূর্খতার পরিস্থিতি এমন যে, আজ মুসলমানদের সাধারণ জীবন যাপন মূর্খতার ফেতনায় ভরপুর। ইলমি আসবাব-সামগ্রী যতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর চেয়ে বহু গুণ বেশি উম্মতের মূর্খতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান মূর্খতা সহজ সরল দীনকে কঠিন ও জটিল বানিয়ে ফেলেছে। এমনকি আকিদা-বিশ্বাসের মৌলনীতিতে সন্দেহ ও আশঙ্কার জীবাণু অনুপ্রবেশ করেছে। কেউ আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলছে, কেউ তার সিফাত ও গুণাবলি নিয়ে কথা বলছে, কেউ নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলছে, দুঃসাহস দেখাচ্ছে। কেউ নবুওয়াতের আলামাত অর্থাৎ কুরআনুল কারীম আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া নিয়ে কথা তুলছে। কেউ খতমে নবওয়াত নিয়ে মনগড়া কথা বলে যাচ্ছে। কেউ সাহাবা জামায়াতের আদল ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সমালোচনা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করছে। কেউ আবার নবী ও রাসূলদের মধ্যে আল্লাহর গুণাবলির পূর্ণতা ও বেষ্টনী এবং হাজির ও নাজির, আর তারা মানুষ নন এহেন জঘন্য আকিদা পোষণ করছে। আবার কেউ আল্লাহর বৈশিষ্ট্যাবলির অস্বীকৃতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমভাবে ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ পুনরুত্থান স্বশরীরে হওয়াকে অস্বীকার করছে আবার কেউ একে অন্তরের প্রতারণা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত বুনিয়াদী আকিদাসমূহে যদি ইলমের কমতি এবং মূর্খতার আধিক্যের অবস্থা এমন হয়, তাহলে শাখাগত আকিদা ও আমলের মধ্যে মূর্খতার পরিমাণ কেমন হতে পারে তা সহজেই বোধগম্য।

মুসলমানদের ইলমি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্ব সম্পর্কে সবাই অবগত। জনসংখ্যা হিসেবে দশ কোটি ধরলে তাহলে কতগুলো মাদরাসার প্রয়োজন আর বর্তমানে আছে কতটি। তারপর যে পরিমাণ আলেম হচ্ছে তাদেরকে জাতি কি পরিমাণ স্বাগত জানিয়ে গ্রহণ করছে। যদি লাখের মধ্যে একজনকে সম্মান করে, তাহলে শতকরা ৯৯ জন আলেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। কেউ আবার বিরোধী আইন প্রতিষ্ঠা করে ইলমি সিস্টেমকে খতম করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছে। কেউ মৌলবীগিরিকে ভ্রান্ত ধর্ম বলে তাকে অতি দ্রুততার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। কেউ কেউ আলেমদের প্রভাবকে নষ্ট করার প্রচেষ্টাকে সর্বোচ্চ সফলতা মনে করছে। কেউ আবার হাক্কানী আলেমদের কাফের বলা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মাকসাদ ধারণা করে আছে।

মোটকথা, বিধর্মীরা তাদের সমষ্টিগত শক্তি ব্যয় করেও যা করতে পারেনি, মুসলমান আজ যা করছে তা অজ্ঞতার কারণে নয় বরং ইলম আলেমদের সাথে

শত্রুতা এবং অপছন্দতার ধ্বংসাত্মক ব্যাধি, যা মুসলমানদের মাঝে আজ প্রবেশ করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে মূর্খতা তার ভয়ানক অবয়কে আত্মপ্রকাশ করবে না তো কী করবে? এহেন পরিস্থিতিতে জাতির উপর শরয়ী মাকসাদের আলো কিভাবে আলোকিত করবে? উক্ত কঠোর মূর্খতার ফলাফল এমন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব কল্পনায় তার মাসলাক বা মতাদর্শ হয়। আর যেহেতু খেয়ালের মধ্যে কুদরতি বা জন্মগত পার্থক্য রয়েছে, তাই ধ্যান-ধারণার ভিন্নতায় কারণে মাসলাক ভিন্ন হয়, মাসলাক গ্রহণকারী ভিন্ন ও সাংঘর্ষিক হয়। ফলে জাতির ভিতর দলাদলি এবং গোষ্ঠীগত ভিন্নতার প্রভাব পড়ে। আর এতে দলবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

চরিত্রহীনতা

অপরদিকে চরিত্রহীনতা ইলমি বিপর্যয় হতেও ভয়াবহ। অধিকাংশ চরিত্র সংশোধন প্রতিষ্ঠান প্রথাগত গদি এবং তহসিল আদায়ের অফিস হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এমন প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামি কার্যাবলির জযবা নিয়ে বের হওয়ার পরিবর্তে ইসলামি সুন্নাত হতে সরানো এবং দীনি ও ধর্মীয় নিদর্শনাবলির সাথে বিদ্রোহ করার মন-মানসিকতা নিয়ে বের হয়। ফলে তাদের মধ্যে কুরআন ও হাদিসের ইলমের রুচি তাকে না, তাদের মধ্যে আলেম বিদ্বেষী মনোভাব ফুটে ওঠে। নবীদের সুন্নাতের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি হয়। অভ্যাস ও ইবাদতে বিদআতী মনোভাব উথলে ওঠে। পরিশেষে নতিজা এই যে, ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত ব্যক্তিদের দীক্ষা দ্বারা মুসলমানগণ শুধু কয়েকটি ইসলামি রীতি-রেওয়াজ পালনকে সম্পূর্ণ ইসলাম মনে করে থাকে এবং প্রকৃত ইসলামকে কুফর আর সমগ্র মুসলমানকে কাফের বুঝে এবং বুঝানোর কাজে লিপ্ত হয়ে আসল ও মৌলিক ইসলাম থেকে বঞ্চিত থাকে। তার মধ্যে আল্লাহপ্রদত্ত চরিত্র থাকে না, চারিত্রিক অবস্থা ও সুরতও থাকে না এবং মর্যাদা ও জন্মগত সহীহ কথাও থাকে না। অতঃপর অসৎ চরিত্র হিংসা ও গর্ব, অপব্যয় ও কৃপণতা, ভীরুতা ও হিম্মতহীনতা, মর্যাদাপূজারী ও মর্যাদাপ্রিয়তা ইত্যাদি বদ চরিত্রতাবলি কর্ম তার মাঝে মজবুতভাবে অনুপ্রবেশ করে। এতে তার মধ্যে পূর্ণতা আসে না, আসে না মধ্যপন্থা যা, নবুওয়াতের মাকসাদ ও উদ্দেশ্য।

এর পরিমাণ এই হয় যে, আসলের স্থলে জৈবিক চাহিদা এবং এর আত্মপ্রকাশকেই বড় সফলতা জ্ঞান করা হয়। আর যখন চতুর্দিকে হতে উক্ত জযবা ও মনোভাব প্রকাশ পেতে থাকে। তখন স্বাভাবিকভাবে অনৈক্য এবং

রক্তক্ষয়ী ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। দুয়ের মাঝে পার্থক্য এতটুকু যে, ইলমি ফেতনা দ্বারা জামাতবদ্ধ মতানৈক্য এবং গোষ্ঠীগত ফেতনা ছড়িয়ে পড়ে। আর চারিত্রিক ফেতনা দ্বারা ব্যক্তিগত ঝগড়া, পরস্পর তিক্ততা, একে অপরের অমিল এবং কুসম্পর্ক ছড়িয়ে পড়ে। আজ মুসলিম সমাজ উভয় ফেতনায় নিমজ্জিত। বিশেষ কিছু ব্যক্তিত্ব যাদের প্রতিটি কাজকর্মে ইখলাস অগ্রগামী থাকে। তাদের ব্যতীত সর্বসাধারণ গোষ্ঠীগত দলগত ও ব্যক্তিগত ঝগড়া ও তর্কে লিপ্ত। আর ঐক্য ও একতার জন্য সহানুভূতিশীলতা, অন্যদের মন জয়ের জন্য হামদর্দী ও দরদী এবং অন্যদের কথা মেনে নেয়ার, মহব্বত ও নিঃস্বার্থতা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে।

দাসত্বের পরিণাম

অপরদিকে অরাজকতা এবং তা থেকে সৃষ্ট দাসত্বের পরিস্থিতি এই যে, সত্যিকারের স্বাধীনতার প্রতি ঘৃণা, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য হতে সম্পর্কহীনতা জাতির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান। জাতির মাঝে চারিত্রিক শক্তির কোন নিযাম নেই, ইলমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন নিয়ম-কানুন নেই, চারিত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও কোন নিযাম নেই। সামাজিক জীবন ও উপার্জন কর্মে কোন নিযাম নেই, নেই কোন শৃঙ্খলা, না আছে জাতীয় একতা। জাতিগত অনৈক্য ধোঁয়ার ন্যায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং রাজনৈতিক দলসমূহে পার্টিগত ভিন্নতা ও অনিষ্টতার উঁচু উঁচু ইমারাত বাঁধা দাঁড়িয়ে আছে। এ কারণে সবার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শুধু কর্মপদ্ধতিতে ভিন্নতা ও মতভেদ দেখা দেয়। আর যেহেতু সবার ইলমি ও চারিত্রিক অবস্থা দুর্বল তাই উক্ত মতভেদ ও ভিন্নতা ঝগড়া ও হাঙ্গামার রূপ ধারণ করে। আর এই মতপার্থক্য কোন মৌলনীতিগত হয় না বরং ব্যক্তিগত অভিমত ও নেতৃত্বের কারণে হয়ে থাকে। আর প্রতিজন ব্যক্তির দস্তুর এবং ফর্মুলা তারই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর লেখা হয়। এজন্য স্বভাবত তাতে ইসলামি রং পাওয়া যায় না এবং ভিন্নভাবে ঝগড়া ও বিতর্ক সৃষ্টি করে।

আমানতদারি ও শুদ্ধ রাজনীতি হারিয়ে যাওয়ার কুফল

সুতরাং জাতির ইলম ও আখলাকের নিযাম যার সমষ্টি হলো আমানতদারি ও দীনদারী একদিকে তা বিনষ্ট হচ্ছে অপরদিকে স্বাধীনতা নিযাম যা রাজনীতির নির্যাস তাও আজ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য আজ মুসলমানদের দীনদারী ও

রাজনীতি উভয় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে স্বয়ং তাদের হাতে। আর উক্ত দুটি বুনিয়াদের পদস্খলনে যে খারাপ প্রভাব প্রকাশ হওয়ার কথা তা প্রকাশ পাচ্ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফেতনা ও ফাসাদ, মারামারি এবং অমানবিক যুদ্ধ পৃথিবীকে চতুর্পাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে। নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বাসস্থান, শহর, অঞ্চল এমনকি সারা পৃথিবী হতে লাপাত্তা হয়ে গেছে। অশান্তি, পেরেশানি ও দুর্ভাবনা ইত্যাদি পৃথিবীর চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। মানবতা আজ বেইজ্জতি ও হীনতার শেষপ্রান্তে পৌঁছেছে। যে সকল বস্তু মানুষের খাদেম ও গোলামি করার জন্য ছিল আজ তা তাদের মাথার উপর জল্লাদ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। আর যে জিনিস মানুষ নিজেদের আরাম আয়েশ ও শান্তির জন্য আবিষ্কার করেছিল, সেগুলো আজ তাদের প্রাণ নাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ মানুষের না আছে ভূপৃষ্ঠে কোন আশ্রয়স্থল। ভূপৃষ্ঠে রয়েছে আকাশপথে ব্যবহারযোগ্য বোমা, জমিনের বিষাক্ত গ্যাস, যা দম ভরে নিঃশ্বাস নিতে দেয় না। না পারে মজবুত দুর্গে আশ্রয় নিতে। কারণ, দুর্গে কামানগুলো খোলা রয়েছে, যাদের ধোঁয়া ঘর ছেদনকারী বৃষ্টির ন্যায় তাদের নাকে পৌঁছে দেয়। আর মানুষের গভীর সমুদ্রে শান্তি নেই, ওখানে জাহাজ নিমজ্জকযন্ত্র জাহাকে আরো গভীরে নিমজ্জিত করে। তাদের জন্য খোলা আকাশও নিরাপদ নয়, উড়োজাহাজবিধ্বংসী কামান রয়েছে। মোটকথা, জড়পদার্থ, তরল পদার্থ ও প্রাণিজগত সবই মানবজাতির সঙ্গে দুশমনি করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে।

তারপর মানুষ আজ নিজেদের ঘরের চার দেয়ালে আশ্রয় নেয়। এখানেও বিভিন্ন রকম রোগ-ব্যাধি ও মসিবত তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তা থেকে পলায় করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে; কিন্তু দুশমনদের ভয়, বিভিন্ন ধরনের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর সংশয় তাদের নাজাত দেয় না। মোটকথা, আজ মানুষ মানুষের তরে কাজে আসে না এবং অন্যান্য প্রাণীও কাজে আসে না।

সারকথা হলো, মানুষ আজ নিজেদের কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ করছে এবং নিজের শরীরে নিজেই ছুরি চালাচ্ছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে ইরশাদ করেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ও বালা-মসিবত ছড়িয়ে পড়েছে। তাদেরকে আল্লাহ কর্মের শাস্তির

আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। *[সূরা রুম : ৪১]*

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

তোমাদের উপর যেসব বিপদাপদ আসে, তা তোমাদের কর্মেরই ফল। *[সূরা আশ-শূরা : ৩০]*

একথা সুস্পষ্ট যে, যখন তারা নিজেরা নিজেদের আশ্রয় দেয় না, তাহলে তাদের মালিকের নিকট আশ্রয়ের দরজা কখন উন্মুক্ত করবে? অতএব, নিয়ম ভঙ্গের ফলাফল এমন প্রকাশ পাবে যে, আল্লাহর বানানো সকল বস্তু তাদের দুশমন হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টি তাদের বিরুদ্ধে লেগে যাবে। সুতরাং যারা নিজেদের মালিককে কি ভুলে যাবে, তারা তো নিজেদেরই ভুলে যাবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

তোমরা তাদের এত হয়ো না, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের আত্মভোলা করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য ও নাফরমান। *[সূরা হাশর : ১৯]*

প্রকাশ থাকে যে, এ সকল নিধন ও ফাসাদি বস্তুর বুনিয়াদী শিকড় হলো ওই তিন ভ্রান্ত জিনিস, যা জাহেলী যুগের ধ্বংসকর্মের উপযুক্ত প্রাণ ছিল। অর্থাৎ মূর্খতা, জুলুম ও দাসত্ব। অন্য কথায় বদদীনি, অরাজকতা ও নৈরাজ্য বলা যায়। সেজন্য যে চিকিৎসা জাহেলী যুগের আরবদের উপর ক্রিয়াশীল ও অব্যর্থ হয়েছিল, ওই চিকিৎসাই বর্তমান যুগের জাহেলিয়াত দূর করতে পারে।

হযরত ইমাম মালেক রহ. বলেন–

لا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها

এই উম্মতের শেষ মানুষদের সংশোধন ওই বস্তু দ্বারা সম্ভব, যার দ্বারা উম্মতের প্রাথমিকদের ইসলাহ হয়েছিল।

সুতরাং যখন আরব জাহেলিয়াতের তিন ধ্বংসব্যাধি মূর্খতা, জুলুম ও দাসত্বের চিকিৎসা এদের বিপরীত তিনটি বস্তু যথা ইলমি বিধিবিধান, ইনসাফগার চরিত্র এবং উত্তম আদর্শের অনুসরণ দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। আজও এই তিন ব্যাধির

চিকিৎসায় ওই তিন বস্তু উপকারী প্রমাণিত হবে। আর উক্ত তিনটি বস্তুকে রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ঘোষণা কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ

তিনি আল্লাহ, যিনি উম্মিদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট তেলাওয়াত করেন তার আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। *[সূরা জুমুআহ : ২]*

তালীমে আহকাম, তাহযীবে আখলাক এবং তানযীমে আমাল

উপরের আয়াতে কুরআন তেলাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন, যার সম্পর্ক কুরআনের শব্দাবলির সঙ্গে। এখানে কুরআনের তথ্যাবলির তিনটি মাকাম উল্লেখ করেছেন। এই তিনটি হলো উম্মত সংশোধনের বুনিয়াদী উসুল–

১. তালীম– যার অর্থ হলো সমস্ত আহকাম তুলে ধরা এবং শেখানো, যার উপর উম্মতের ইলম ও ফিকির (চিন্তাধারা) পুরো হওয়া ও উন্নতি লাভ করা নির্ভরশীল।

২. তাযকিয়া বা চরিত্র সংশোধন, যার অর্থ অন্তরের বাতেনি অবস্থা ও মাকাম সামনে রেখে অন্তরকে সংশোধন করা, যার উপর অন্তরের স্থায়িত্ব নির্ভর করে সেগুলো ঠিক করতে হবে।

৩. তালকীনে হেকমত। এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী তার অর্থ হলো, শরীয়তপ্রণেতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমষ্টিগত জীবন উত্তম আদর্শ উম্মতের সামনে পেশ করা, যার সমষ্টির উপর উম্মতের জীবনের শৃঙ্খলা নির্ভর করে।

কুরআনুল হাকীমের ইসলাহী প্রোগ্রাম

কুরআনুল হাকীমের ইসলাহী স্কীমের তিনটি বুনিয়াদী উসূল বা মৌলনীতি হলো– ১. তালীমে আহকাম, ২. তাহযীবে আখলাক, ৩. তানযীমে আমাল। মানবসমাজে প্রথমটির উপাধি হলো শরীয়ত, দ্বিতীয়টি তরীকত আর তৃতীয়টির লকব হলো সিয়াসাত। যেন এই তিনটি মূল উপকরণ, যা দ্বারা দীনি জগৎ গঠিত

হয়েছে ইসলাম ধর্মে এই তিনটি বিষয় আবশ্যকীয় বস্তু। আর একটি ব্যতীত অপরটি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

শরীয়ত

শরীয়ত রাস্তা দেখায়। আর রাস্তা অপরিচিত থাকলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছা কিভাবে সম্ভব হবে? তরীকত দ্বারা পথ চলার আখলাকী শক্তি ও যোগ্যতা কিভাবে পয়দা হয়। যদি পথিকের শক্তি না থাকে, তাহলে শুধু রাস্তার স্থায়িত্ব দ্বারা কি হবে? আর সিয়াসাত (রাজনীতি) দ্বারা রাস্তার প্রতিবন্ধকতা দূর হয়, রাস্তা পরিষ্কার হয়। রাস্তা যদি কণ্টকাকীর্ণ হয়, তাহলে শক্তিইবা কী কাজে আসতে পারে। তারপরও যদি রাস্তা অতিক্রম করতে চায়, তাহলে সর্বশক্তি রাস্তায়ই ব্যয় হয়ে যাবে, গন্তব্যস্থলে পৌঁছা দুঃসাধ্য হবে। সুতরাং শরীয়ত হলো পথ আর তরীকত হলো পথিকের শক্তি। আর সিয়াসাত হলো রাস্তা পরিষ্কার করা, বাধামুক্ত করা। শক্তি একটি অদৃশ্য বস্তু আর রাস্তা একটি প্রকাশ্যমান বস্তু। আর রাস্তা পরিষ্কারের কার্যাবলি শুধু প্রকাশমানই নয় বরং তাতে যথেষ্ট শোরগোল, চিৎকার ও প্রচার প্রসার করা হয়।

তরীকত

তরীকত ও তাসাউফের ভিত্তি হলো একনিষ্ঠতা ও একাকিত্বের উপর। বিধায় তরীকত নিজের ভিত্তিমূলে, মূলনীতি এবং অর্থ ও শাখা-প্রশাখা হিসেবে মানুষকে স্বভাবগত একাকিত্ব ও আলাদা এবং একনিষ্ঠতার দিকে টেনে টেনে নিয়ে যায়। একজন সুফী ব্যক্তি সুফী হিসেবে সমগ্র পৃথিবী হতে একাকী ও পৃথক হয়ে যায়। তিনি স্রেফ নিজ সত্তার ইসলাহ ও সফলতা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তিনি যদি অন্যের সঙ্গে মিশেনও, তাহলে তাকে নিজের এত করে মাখলুক থেকে পৃথক করে ফেলেন। ফলে তাকে একাকিত্বের মহব্বত থেকে কোন শক্তিই সরাতে পারে না যতক্ষণ না তার উপর তরীকত প্রাধান্য থাকে। অপরদিকে শরীয়তের ভিত্তি হলো অধিকহারে সম্পর্ক এবং অধিকার আদায়ের উপর। হেদায়েত ও উপদেশ এবং পথ প্রদর্শনের খাতিরে মানুষের মাঝে প্রবেশ করা, তাদের বাধা ও রুক্ষতা সহ্য করা এবং প্রজ্জ্বলমান আগুনে প্রবেশ করে জ্বলন্ত মানুষকে উদ্ধার করা।

তরীকতে যে সকল মাখলুক থেকে পৃথকতা অবলম্বন করা হয়, শরীয়তে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করা হয়। ওখানে মাখলুক হতে ফেরারী অবলম্বন করা হয় আর এখানে (শরীয়তে) মাখলুকের দিকে ধাবিত হয়।

সুতরাং একজন শরীয়তপাবন্দ ব্যক্তি যার উপর শরীয়ত প্রবল সে একজন শরয়ী ব্যক্তি হিসেবে সমগ্র মানবজাতির দিকে ধাবিত হয়ে তাদের ইসলাহ ও হেদায়েতের ফিকির করবে। তার চিন্তা থাকবে প্রথমে আপন ঘর ও পরিবার, তারপর আপন গোত্র প্রতিবেশী, তারপর শহরের বা এলাকার সাধারণ জনতা, অতঃপর সমগ্র জগতের মানুষদের নিয়ে। অতএব এমন মিলনপ্রিয় মানুষকে কোন শক্তিই তা থেকে হটাতে পারবে না যতক্ষণ না তার মধ্যে শরয়ী রং ও কার্যাবলি প্রবল থাকবে।

সিয়াসত বা রাজনীতি

অপরদিকে রাজনৈতিক মহলে সম্পর্কের ধরন আরো অধিক গভীর ও দীর্ঘ হয় এবং সর্বব্যাপী ও আন্তর্জাতিক হয়। শরীয়তের মধ্যে মানুষ নিজের থেকে বের হয়ে লোকসমাজে আসে আর রাজনীতির মধ্যে মানুষকে বার করে শহর পর্যন্ত, গ্রাম পর্যন্ত। শুধু তাই নয় বরং মাঠে-ময়দানে, পাহাড়-পর্বতে, ভূমি ও উৎপন্ন বস্তু এবং সমুদ্র ও তার প্রভাব, প্রাণিজগত ও তার উপকারিতা, মোটকথা, কায়েনাতের সর্বক্ষেত্রে এবং সেগুলো পরিচালনায় একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে অংশগ্রহণ করতে হয়। রাজনীতিতে অধিকার প্রদান, অত্যাচার প্রতিরোধ, কিসাস ও শাস্তি প্রদান, জিহাদ ও আত্মত্যাগ, গনিমত সংরক্ষণ, যুদ্ধবন্দি ইত্যাদি বিষয়াবলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন।

মোটকথা, একদলের শক্তিকে ভেঙ্গে ফেলা, অপর দলের পতাকা উত্তোলন করা, ফ্যাসিস্ট ও ফেতনাবাজদের পরাস্ত করা এবং মুসলেহ ও নেককারদের ক্ষমতায় বসানো, বিজয়ী করা, বাতিল অপশক্তির কোমর ভেঙ্গে ফেলা এবং হকপন্থীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। নির্যাস কথা হলো, রাজনীতি হলো জন্মগত ও আধ্যাত্মিক (রুহানি) শক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন পন্থায় বিপ্লব ঘটিয়ে সরকারকে উৎখাত করা এবং নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে সমগ্র বিশ্বে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা।

সুস্পষ্টত রাজনীতির মধ্যে একাকিত্ব ও একাগ্রতা কোথায় থাকবে?

রাজনীতিতে জনতাকে অতিক্রম করে শহর-মানুষকে ডিঙ্গিয়ে প্রাণিজগত, প্রাণিজগত হতে উদ্ভিদজগত এবং সবকিছু অতিক্রম করে প্রতি বিঘত ভূমির

জন্য নিজেদের মূল্যবান সময়কে ব্যয় করতে হয়। আর তরীকরতের মধ্যে শুধু একাতিত্ব, আর শরীয়তের মধ্যে একটি বিশেষ গণ্ডির ভিতরে সম্পর্ককে সীমাবদ্ধ রাখা। তাই তরীকতের মধ্যে স্রেফ একাকিত্ব আর রাজনীতির মধ্যে শুধু উন্মুক্ততা ও বহিরাঙ্গন। আর শরীয়ত হলো উভয়ের মাঝামাঝি একটি স্তর, যা উভয়টিকে এক করে একতা সৃষ্টি করে।

এতে প্রমাণিত হয়, শরীয়তের একাকিত্ব সাংগঠনিকরূপে তখনই প্রকাশ পাবে, যখন তার ডান পার্শ্বে একাকিত্বের ভাণ্ডার তথা তরীকত থাকে এবং বাম পার্শ্বে সংগঠনের উৎসস্থল তথা সিয়াসত বা রাজনীতি থাকে। অন্যথায় পৃথক সংগঠন এবং মনের প্রবল আগ্রহ কখনো পূরণ হবে না। প্রকাশ্যমান যে, এহেন অবস্থায় যদি উক্ত তিনটি মৌলিক উপাদানকে আলাদা আলাদা করে ফেলা হয়, তাহলে এদের পরস্পর সম্মিলিত ফায়দা বন্ধ হয়ে একেকটি বিশেষ ক্ষতি সাধিত হবে। যদি শুধু তরীকত থাকে, যাতে শরীয়ত ও সিয়াসত নেই, তা হবে নির্জনতা ও অনুতাপ। আর যদি শুধু শরীয়ত থাকে, যাতে তরীকত ও সিয়াস না থাকে, তাহলে তাতে শুধু কঠোরতা ও জোরপূর্বক বন্ধকরণ থাকবে। তেমনিভাবে সিয়াসত বা রাজনীতিতে শরীয়ত ও তরীকত না থাকলে তাতে শুধু অহংকার ও জবরদখল থাকে। আর সুস্পষ্ট কথা হলো, উক্ত তিনটি ক্ষতিকর গুণসমূহে কোন সফলতা নেই। কোন পূর্ণতা নেই। এগুলোর মধ্যে পূর্ণতার শান আসতে পারে একতার মাধ্যমে, জমিয়তের মাধ্যমে। এদের প্রত্যেকটি একটি অপরটির পরিচালক এবং সংশোধনকারী। এ কারণে দীন এ সকল বস্তুকে সমাবেশ করে নিজের নাম দীন রেখেছে, অর্থাৎ পরিপূর্ণ দীন। যেমনটি হাদিসে জীবরাঈলের মধ্যে স্পষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং তরীকতের নির্জনতার ও একাকিত্বের পরিচালক হলো শরীয়তও সিয়াসত, যার সংমিশ্রণে সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া এবং নিজেদের তারবিয়াত প্রকাশ পায় এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব দৃশ্যমান হয়ে নফসের ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ ও উগ্রতা-কঠোরতা ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর শরীয়ত ও তরীকতের অসহায়ত্ব ও নিঃস্বতার পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক রাজনীতি, যার জন্মগত শান-শওকত এদের উভয়ের জন্য মর্যাদা ও সংরক্ষণের সমান হয়। অতএব যখন একা তরীকত এবং তাহযীবে আখলাক দ্বারা অন্তরে ইনসাফ সৃষ্টি হলো আর শরীয়ত দ্বারা ইলমি আহকাম এবং অন্যদের শিখানোর উদারতা সৃষ্টি হলো এবং সিয়াসত ও শক্তির মাধ্যমে ওই ইলমি আহকাম ও উত্তম চরিত্র বাস্তবায়ন করার শক্তি অর্জন হলো, তখন সিয়াসত ও রাজনীতি থেকে অহংকার ও জুলুম-জবরদখল বের হয়ে গাম্ভীর্যতা, অল্পেতুষ্টতা এবং নির্ভীকতা সৃষ্টি হবে।

আর তরীকত হতে প্রথাগত নির্জনতা বের হয়ে আসল নির্জনতা তথা আল্লাহর আহকামের পাবন্দীর যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। অপরদিকে শরীয়ত হতে রুক্ষতা, স্থবিরতা, সংকীর্ণমনা এবং সন্ন্যাসগিরি দূর হয়ে প্রশস্ত চিন্তাধারা, সর্বব্যাপী ঐক্য, পরস্পর সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক একতার জযবা উথলে উঠবে। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতির মাদ্দি ও রুহানি উন্নতির নকশা সামনে ভেসে উঠবে। এগুলোর সমষ্টিকে দীন বলে।

উপরের বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, উক্ত তিনটি উপকরণ একত্র করা ব্যতীত দীন পরিপূর্ণ হয় না। আর দীনের সেবকগণ সঠিক অর্থে দীনের সেবা করতে পারে না যতক্ষণ না সে একজন শরীয়তপাবন্দ সুফী ও রাজনৈতিক হয়। কিন্তু আমাদের আফসোস আর পরিতাপের বিষয় হলো, আজ তিনটি বস্তু পৃথক পৃথক বস্তু গণ্য করা হয় এবং এগুলোর বাহকদের পৃথক পৃথক জামাত হিসেবে গণ্য করা হয়। তেমনিভাবে শরীয়ত, তরীকত ও সিয়াসতকে ভিন্ন ভিন্ন পথ মনে করা হয়। আর শুধু ভিন্ন ভিন্ন মনে করেই থামেনি বরং একজন সুফী নিজের সুফীত্বের পূর্ণতা মনে করে হকপন্থী আলেমদের বিরোধিতা করাকে। আজ পরস্পর আলেম ও সুফী একে অপরের বিরোধী আর একজন রাজনৈতিক তাদের দুজনের বিরোধী। আর আলেম ও সুফী উভয়ে রাজনীতিকদের বিরোধী।

সে কারণে জাতি আজ তিন ভাগে বিভক্ত। ফলে একতার পরিবর্তে এমন এক শক্তির মোকাবেলা করে যাচ্ছে, যা ইলম ও আমল উভয়কে ভুল পথে পরিচালিত করছে। আর নিজেদের শক্তিকে নিজেদের লেনদেনে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। পরিণামে মতভেদপূর্ণ শক্তি আরো শক্তিশালী এবং দুঃসাহসী হয়। আমার ধারণামতে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ তিন তবকা না মিলবে এবং শুধু ব্যক্তির মিলনে নয় বরং তিনটি বিষয় এমনভাবে মিশ্রিত হবে যে, জাতির প্রতিটি সদস্য নিরেট শরীয়তপাবন্দ, স্বচ্ছ সুফী এবং নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতিকে পরিপূর্ণ ঐক্যবদ্ধ জাতি বলা যাবে না আর ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সফলতার মুখও দেখবে না।

ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা নয়

ইসলাম ধর্মে দীন ও সিয়াসত ভিন্ন বস্তু নয়। কারণ, ইলমে দীন এবং সুন্দর চরিত্র, দীনদারীর বুনিয়াদী শাখা। আর শৃঙ্খলা ও একতা সিয়াসত বা রাজনীতির বুনিয়াদী শাখা। সিয়াসতকে যখন দীনদারী থেকে পৃথক করা হবে, তখন হাকীকী সিয়াসত ও দীনদারী ঠিক থাকবে না। আর দীনদারী না থাকলে

রাজনীতি হবে একটি দংশনকারী এবং জোর-জুলুমকারী মুলুক। আর রাজনীতি না থাকলে দীনদারী অকার্যকর এবং তুচ্ছ হয়ে যাবে দীনের সম্মান স্বঅবস্থায় থাকবে না। শুধু আইন ও অলস রাজনীতি দ্বারা পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তার মুখ দেখতে পারবে না। আর মানবজগতের ইসলাহ-শৃঙ্খলাও হবে না। যদি হতো, তাহলে বর্তমান দুনিয়ার ইউরোপ সবচেয় বেশি পুণ্যবান, সবচেয়ে বেশি বন্ধুপ্রতীম এবং সমগ্র বিশ্ব হতে বেশি নিরাপদ ও শান্তশিষ্ট থাকতো। কেননা, ওখানে রাজনৈতিক আইন-কানুনের দফা বর্ষাকালের পোকা-মাকড়ের সংখ্যা হতে কম নয়। বহু আইনপ্রণেতা দল আইন প্রণয়নে লিপ্ত থাকে বার মাস। আইনি আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় রয়েছে। নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে আর নতুন নতুন কানুন হচ্ছে এবং পূর্বের সংবিধান পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু যত বেশি রাজনৈতিক কানুন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তত বেশি পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাটতি হচ্ছে। দিন দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতার শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। মানুষ হিংস্রতা, বিলাসিতা ও যৌনতা উত্তেজক কানুনের আওতাধীন থেকে সাংবিধানিক অরাজকতা ও আইনি অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার বহু গুণে শিখে নিচ্ছে। ফলে সমগ্র ইউরোপ জগত হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ এবং ব্যভিচারের একটি জাহান্নামে পরিণত হয়েছে।

অতএব শুধু রাজনীতি এবং রুক্ষ আইন ও কঠোর আইন দ্বারা যদি মানবতার সংশোধন ইসলাহ ও শৃঙ্খলা সম্ভব হতো, তাহলে ইউরোপের ভাগ্যে এহেন বিপদাপদ নেমে আসতো না। কারণ, ওখানে সিয়াসতের কমতি নেই, আইন-কানুনের অভাব নেই। তবে তাদের মধ্যে একটি জিনিসের কমতি রয়েছে। তাহলো দীনদারি। অর্থাৎ তাদের সিয়াসতের মধ্যে আল্লাহপ্রদত্ত আখলাক নেই, মাকসাদে ইলাহীর ইলম নেই এবং এগুলোর উপর আমল করার কোন নমুনা নেই। যদি সিয়াসতের মেরুদণ্ড শুদ্ধ না হয়, তাহলে অলস ও অন্ধ রাজনীতি এবং স্রেফ পড়া পানি ও ঝাড় ফুক দেয়া দ্বারা মনের প্রশান্তি এবং বিশ্বের শান্তি কেমন করে ভাগ্যে জুটবে।

সুতরাং বর্তমানকালে ইউরোপে ধ্বংসযজ্ঞ ও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ (বিশ্বযুদ্ধ) এবং মানবতার অধঃপতন, যিল্লতি ও নিকৃষ্টতা সিয়াসত না থাকার কারণে নয় বরং দিয়ানতদারিতা না কারণে। মানুষ যখন চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণীর ন্যায় হয়ে যায়, তখন শুধু সিয়াসত তার দিল-দেমাগকে পরিবর্তন করতে পারবে না। চিন্তাধারার পরিবর্তন একমাত্র উত্তম চরিত্র এবং কিতাবুল্লাহ দ্বারাই সম্ভব, যার সমষ্টি হলো দিয়ানতদারী। তেমনিভাবে সিয়াসতবিহীন দিয়ানত এবং শওকতবিহীন ইলম ও আখলাক। অসহায়ত্ব ও নিঃসঙ্গ এবং সাধারণ দৃষ্টিতে মর্যাদাহীন হওয়ার কারণে

ব্যাপকহারে গ্রহণযোগ্য হয় না। শুধু তাই নয়, বরং নিঃস্ব ও অসহায় হওয়ার কারণে সেগুলোর তুচ্ছতা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রকট হয়। ফলে শান-শওকতের পূজারি লোকেরা সেগুলোর গ্রহণ করা তাদের মাকসাদ ও নিশানায় পরিণত হয়। ফাসিক ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যারা ধর্মের দাপটের কারণে থেমে থাকে, তারা তখন নির্লজ্জ ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং ওই তুচ্ছতা ও বিদ্রূপকে আরো বৃদ্ধি ও মজবুত করে। সাথে সাথে যারা ফাসিক ও দুষ্ট প্রকৃতির নয়, যারা তাকওয়া ও নেক কর্মের প্রতি বেশি উৎসাহী নয়, তারাও ওই লোকদের দুষ্ট কর্মের প্রবণতা দেখে সেই দিকে ধাবিত হয়। পরিণামে খালেস হকপন্থী গ্রুপ যারা ইলম ও আখলাকের সামান নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা অসহায় ও নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে যারা দুর্বলমনা, তারা নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত হয়ে পরিশেষে তাদের দলে যোগ দেয়। ফলে সিয়াসতবিহীন দীনদারী আস্তে আস্তে নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে এবং দাসত্ব ও গোলামী গ্রহণ করে শান-শওকতের সকল আগ্রহ-জযবাকে নিঃশেষ করে নিজেই নেতা সেজে পড়েন। গোলাম রাষ্ট্র হিন্দুস্তানে দীনদারি ও ঈমানদারীর কমতি নেই, বরং স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলো হতে এখানে বেশি দীনি আসবাব রয়েছে। কিন্তু তাদের দীনদারি নিঃসঙ্গ ও সহায়হীন হওয়ার কারণে তারাও ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপের পাত্র। বলা হয় মৌলবাদীদের ভ্রান্ত ধর্ম, এটি মোল্লাতন্ত্র, হকপন্থীদের কুফরীর অপবাদ, উলামাদের প্রভাব নষ্টে প্রচেষ্টা এবং এর বিপরীত নাস্তিকতা ও শিরক-বিদআত, ধর্মে নব আবিষ্কার, মুনকারাত ও কুকর্ম এবং পাপ-পঙ্কিলতা হতে আহলে দীনদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা। তার ফলাফল হলো তারা মনে করে, দীনদারি আমাদের আর রাজনীতি অন্যদের। অর্থাৎ মসজিদ আমাদের আর তার চাবি অন্যদের হাতে। যখন মনে চায় খুল দিবে, যখন মন চায় বন্ধ করে দিবে।

সুতরাং পশ্চিমা সিয়াসত এ কারণে ধ্বংসাত্মক যে, তার সঙ্গে দীনদারি নেই। আর প্রাচ্যের দীনদারী এ কারণে অস্থায়ী এবং দুর্বল যে তার পেছনে সিয়াসি শক্তি নেই। ওখানে দীনদারির অনুপস্থিতির কারণে মাদ্দি বিপদাপদ, মৃত্যু, ধ্বংস, তুফান ও ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রকাশ পাচ্ছে। আর মুসলিম বিশ্বে সিয়াসতের অনুপস্থিতির কারণে রূহানি (আধ্যাত্মিক) বিপদাপদ অনিষ্ট, নাস্তি কতা, ধর্মত্যাগ, বদদীনি, শিরক ও বিদআত ইত্যাদি প্রকাশ পাচ্ছে। অতএব, পরিষ্কার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত দিয়ানতের সাথে রাজনৈতিক শক্তি এবং সিয়াসতের সঙ্গে ইলমি ও আখলাকি দীনি শক্তি না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবী নিরাপদ ও প্রশান্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবে না।

এ কারণে ইসলাম ধর্মীয় বৈরাগ্যকে খতম করে তার সঙ্গে সালতানাত তথা রাজত্বকে সংমিশ্রণ করেছে। আর সালতানাতের রাজতন্ত্রকে খতম করে তাকে ইসলামি খিলাফতের পোশাক পরিয়েছে। ফলে দিয়ানত ও সিয়াসতের মাঝে একটি দার্শনিক সম্পর্ক কায়েম হয়েছে যে, দিয়ানতের নিঃসঙ্গতা সিয়াসত দ্বারা খতম হয়ে গেছে। আর সিয়াসতের জবরদখল ও জুলুম দিয়ানত দ্বারা পদদলিত হয়ে গেছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত একতার প্রতি প্রকাশ্য ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন–

الملك والدين توامان

রাজ্য ও দীন একটি জমজ শিশুর মত, যা পরস্পর পৃথক হতে পারে না।

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

بعثت مرحمة وملحمة

আমাকে রহমত বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং যোদ্ধা বানিয়েও পাঠিয়েছেন।

অন্য স্থানে ইরশাদ করেছেন–

انا الضحوك القتال

আমি বেশ হাসিখুশিও আবার যুদ্ধবাজও।

এক স্থানে চিরস্থায়ী দিয়ানতের ওয়াদা করা হয়েছে এবং এক স্থানে চিরস্থায়ী সিয়াসতের ওয়াদা করা হয়েছে।

ইরশাদ করেছেন–

لا يزال من امتى امة قائمة بامر الله حتى يأتى امر الله

আমার উম্মতের একটি জামাত কেয়ামত পর্যন্ত দীনকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখবে, দাঁড় করিয়ে রাখবে।

ইরশাদ হয়েছে–

الجهاد ماض الى يوم القيامة

আমার উম্মতের মাঝে জিহাদ (সিয়াসত) কেয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।

কুরআনুল কারীম নবুওয়াতেরও প্রশংসা করেছে, যা রূহানি নেয়ামতরাজির উৎসস্থল এবং সালতানাতেরও প্রশংসা করেছে, যা জাগতিক ও মাদ্দি নেয়ামতসমূহের উৎস।

ইরশাদ হয়েছে–

وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّ اٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۞

যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক পয়গম্বর বানিয়েছেন এবং তোমাদেকে রাজ্যের মালিক বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা জগতের অন্য কাউকে দেননি। *[সূরা মায়েদাহ : ২০]*

রাষ্ট্রীয় সংবিধানে দীন

ইসলাম যেমনভাবে দিয়াতের বুনিয়াদ রেখেছে পাঁচটি বস্তুর উপর যা কালিমায়ে তাওহীদ নামাজ, যাকাত, রোজা ও হজ্ব, তেমনিভাবে সিয়াসতের বুনিয়াদও পাঁচটি মৌলিক বস্তুর উপর কায়েম করেছে। যথা– একতা, আনুগত্য, হিজরত ও জিহাদ।

ইসলাম যেখানে আখলাকি নিযাম কায়েম করেছে, যা দ্বারা মানবাত্মা, মানবিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও অন্তরাত্মার সংশোধন হয়। এগুলোর জন্য আদাত (অভ্যাসগত কর্মসমূহ) আখলাকিয্যাত এবং মুয়ামালাত (লেনদেন) ইত্যাদির আলাদা আলাদা অধ্যায় কায়েম করেছে, তেমনিভাবে সিয়াসি নিযামও কায়েম করেছে, যা দ্বারা জাতীয় জীবন সংশোধন হবে। ফেতনার মূলোৎপাটন হবে, আল্লাহর আইন জারি হওয়ার ক্ষেত্রে কোন শক্তিশালী বা দুর্বল বাধা সৃষ্টি হবে না। এগুলোর জন্য ইসলাম হুদুদ (দণ্ডবিধি) ও কিসাস (প্রতিদণ্ড), তাযিয়াত (লঘু শাস্তি), কাফফারাত, জিহাদ ও সাদ্দে সাগুর (সীমান্ত প্রাচীর) এর অধ্যায়সমূহ কায়েম করেছে। ইসলাম আমিরুল মুমিনীনকে যেমনভাবে সিয়াসি আহকাম (বিধান) বাস্তবায়নের ইমাম ও দায়িত্বশীল বানিয়েছে, তেমনিভাবে আখলাকি এবং ধর্মীয় বিষয়াবলির মুহাফেজ ও ইমাম বানিয়েছে। সুতরাং আদালতে ফৌজদারি, দেওয়ানি, সামরিক শৃঙ্খলা এবং প্রতিরক্ষার পাশাপাশি, নামাজের ইমামতি, জানাযার ইমামতি এবং আখলাকি তারবিয়াত (চরিত্র গঠন) আমিরুল মুমিনীন

সম্পর্কিত কর্ম। এজন্য খলিফাতুল মুসলিমীন যেমনভাবে মুসলিমদের বাদশাহ, তেমনিভাবে তিনি তাদের পিতা, মুরুব্বী এবং উস্তাদও, যাতে তিনি তাদের দিয়ানত ও সিয়াসত উভয় বস্তুর দেখাশোনা করতে পারেন, তত্ত্বাবধান করতে পারেন। এ কারণে কুরআনুল কারীমের যে স্থানে সিয়াসি কানুন বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানেই আগে বা পরে, যে কোন শিরোনামে খাওকে ইলাহী, খাশিয়াতুল্লাহ (আল্লাহর ভয়), তাকওয়া, পবিত্রতা এবং আল্লাহর প্রতি তাওয়াজ্জুহ ইত্যাদির প্রতি মনোনিবেশ করা হয়েছে, যাতে সিয়াসি কর্মে ছড়িয়ে পড়ে দিয়ানত কর্ম ভুলে না যায়। তেমনিভাবে যেখানে দিয়ানতের কোন শাখার বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে কোন না কোন সিয়াসি ধমকি এবং ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, যাতে দিয়ানতে নিমজ্জিত হয়ে সিয়াসত হতে গাফেল বনে না যায়।

দীন ও সিয়াসতের মাঝে দূরত্ব

ইসলামে ধর্ম ও সিয়াসত আলাদা কোন বস্তু নয়। ধর্ম সিয়াসত থেকে পৃথক কোন বস্তু নয় আবার সিয়াসতও ধর্ম হতে পৃথক কোন বস্তু নয়। এ দুইয়ের মাঝে পার্থক্য এমন ধর্মের মধ্যে করতে পারে, যে ধর্মে শুধু সম্পর্ক মাআল্লাহর কিছু মৌলনীতির উপর তাসাউফের সুরতে অথবা জাগতিক তাহযীবের সুরতে নিজেকে (আত্মা) সাজানোর চেষ্টা করা হয়। এবার মানুষকে সম্পর্ক (পরস্পর সম্পর্ক) ও দুনিয়ার স্বাদ থেকে পৃথক করে আল্লাহর সঙ্গে মিলানোর পদ্ধতি রাখা হয়েছে। ওই সমস্ত ধর্মে দুনিয়া ত্যাগ এই অর্থে আসল যে, মানুষ জগতের সকল মুয়ামালা, লেনদেন, তামাম স্বাদ ও মজা এবং সর্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করে ঘরে বাইরে সন্তান ও পরিবার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে একাকী হয়ে পাহাড়ের গর্তে বা দরিয়ার তীরে অবস্থান করে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকা। প্রকাশ থাকে যে, ওই সমস্ত ধর্মে অধিক সম্পর্ক এবং বিশ্বব্যাপী সম্পর্ক কখনো সহ্য করা হয়নি। কিন্তু যে ধর্ম সম্পর্ক মাআল্লাহর সাথে সাথে সম্পর্ক মাআলখালক এবং সম্পর্ক মাআননফসের শাখাগুলোকেও একইভাবে বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। এই ধর্মে সম্পর্ক পরিহার এবং স্বাদ-মজা পরিত্যাগকারী বৈরাগ্যকে অসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গণ্য করে থাকে। আর এখানে দুনিয়া ত্যাগকে নির্জনতা অবলম্বন মনে করে না বরং দুনিয়ার জ্যামের মাঝে বসবাস করে অধিকার আদায় করবে। এমন ধর্মের মানুষ নিজেকে সিয়াসত ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে দূর রাখতে পারে না, বৈরাগ্যকে কখনো মেনে নিতে পারে না।

সুতরাং এই ধর্মে যেমনভাবে দিয়ানতদারী ধর্মের বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তেমনিভাবে সিয়াসতও ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অতএব ধর্ম এবং সিয়াসত পৃথক হওয়ার কোন অর্থ হতে পারে না। ধর্ম ও সিয়াসতকে আলাদা আলাদা করে দেখা এমন ভুল যেমনটি আজ সাইন্স ও ধর্ম সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে সাইন্স ধর্মের বুনিয়াদকে দুর্বল করে ফেলেছে। এই দু'টি পরস্পর একত্রিত হতে পারে না। অথচ সাইন্স এমন ধর্মের সঙ্গে একিভূত হতে পারে না, যেখানে তামাদ্দুনকে ধ্বংস করে দুনিয়াতে বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু যে ধর্ম তামাদ্দুনিক অধিকার, তামাদ্দুনিক প্রয়োজনাদি এবং সমসাময়িক তাকাজা বা যুগের চাহিদা অনুপাতে, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাবলি পূরণে পৃষ্ঠপোষকতা করে, তাদেরকে সাইন্স ক্ষতি করতে পারে না বরং সাইন্স তাদের সাহায্যকারী খাদেম হিসেবে কাজ করে।

তেমনিভাবে সিয়াসতও দীনের একজন নিরলস খাদেম এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে সিয়াসত বলতে প্রচলিত সিয়াসত উদ্দেশ্য নয় বরং শরয়ী সিয়াসত, যার ভিত্তি হলো ইলম ও আখলাক, তাকওয়া ও পবিত্রতা এবং ফাযায়েলে আমালের উপর এবং যাকে দুশ্চরিত্র ও কুকর্ম মিটানোর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এগুলোর শক্তি যোগানো ও বল বৃদ্ধির জন্য পাঠানো হয়নি। অন্য কথায় বলা যায়, এর দ্বারা সিয়াসতে নবুওয়াত উদ্দেশ্য, সিয়াসতে মুলুকিয়্যাত তথা রাজতন্ত্র উদ্দেশ্য নয়।

এই সিয়াসত ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তা থেকে কোন অবস্থায় নজর ফিরানো যাবে না। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দুটির মধ্যে দিয়ানতদারী হলো আসল এবং মূল উদ্দেশ্য। আর সিয়াসত হলো এদের স্থায়িত্বেরও দৃঢ়তার মাধ্যম ও উসিলা। এ কারণে হাজার হাজার নবীকে দিয়ানত তো দেয়া হয়েছে; কিন্তু রাজত্ব ও জিহাদের হুকুম কতককে দেয়া হয়েছে আর কতককে দেয়া হয়নি। উভয় মাকসুদ যদি একই পর্যায়ের হতো, তা হলে এদের পৃথক করা সম্ভব ছিল না। তেমনিভাবে যে সমস্ত জাতিকে দিয়ানত ও সিয়াসত উভয়টি প্রদান করা হয়েছে; যেমন বনি ইসরাঈলকে, তাদের মাঝেও এতটুকু পার্থক্য লক্ষণীয় যে, নবীদের সিলসিলা আলাদা, বাদশাহদের সিলসিলা ভিন্ন। দুর্লভ হিসেবে এক-দুই স্থানে উভয়টি একত্রিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও দিয়ানতকে আসল উদ্দেশ্যের মর্যাদায় রাখা হয়েছে যে, দিয়ানতের হুকুম নবীদের পক্ষ হতে হয়। আর এগুলোর বাস্তবায়ন হয় ইনসাফগার বাদশাদের হাতে। কিন্তু আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উভয় মর্যাদা একত্র করে দান করা হয়েছিল। তিনি একই সময় খলিফাতুল্লাহ ফিল আরদ ছিলেন এবং বিশ্বজাহানের দীনি

মুরুব্বী ছিলেন। কিন্তু দীন ছিল আসল ও মূল, যা তার সালতানাতের মেরুদণ্ড ও কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ তার সমগ্র ইসলামি সিয়াসত দীনের মেরুদণ্ডের উপর ঘূর্ণমান থাকতো। আর তা এজন্য ছিল যে, তার শক্তির মাধ্যমে দীনের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন হতে থাকবে এবং দীন প্রচার ও প্রসারে কোন প্রতিবন্ধক হবে না। এতে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, দীন হলো আসল উদ্দেশ্য আর সিয়াসত হলো দীনের জন্য মাধ্যম ও উসিলা। কুরআনুল কালীম উক্ত কথাটিকে সুস্পষ্ট করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

তারা এমন মানুষ, যদি আমি তাদের দুনিয়াতে হুকুমত দান করি, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের শেষ পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। *[সূরা হজ্ব : ৪১]*

এ আয়াতে তামকীন ফিল আরদ তথা সালতানাতের উদ্দেশ্য ও মাকসাদ দিয়ানতের শাখা-প্রশাখাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয়, সালতানাত হলো দীনি কর্ম বাস্তবায়নের মাধ্যম। তার রহস্য হলো, নবীদের উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে আমানত ছড়িয়ে দেয়া। যে পৃথিবী ঈমানি ও আমলের চারণভূমি। যে আমানতকে মানুষ ব্যতীত জগতের কোন বিশাল বিশাল বস্তু অংশগ্রহণ করেনি, তারা কান ধরে তওবা করেছিল। এই আমানতের বিপরীত হলো ফেতনা, যা আমানতের জন্য প্রতিবন্ধক। এই ফেতনা কখনো ইলমি পথে এসেছে, কখনো আমলি পথ বেয়ে এসেছে।

ইলমি ফেতনার নাম ফেতনায়ে শুবহাত তথা সন্দেহের ফেতনা আর আমলি ফেতনার নাম ফেতনায়ে শাহওয়াত তথা জৈবিকতার ফেতনা। প্রকাশ থাকে যে, ফেতনায়ে শুবহাত যেহেতু ইলমে নাফে তথা ইলমে দ্বীনে প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে তা মূর্খতার প্রকারসমূহে অন্তর্ভুক্ত। আর ফেতনায়ে শাহওয়াত যেহেতু আমলে সালেহ তথা সৎকর্মে বিঘ্নতা ঘটায়, তাহলে তা জুলুম কিসিমের ফেতনা। কারণ, ফেতনার সমষ্টি হলো জুলুম ও মূর্খতা। আর আমানতের সমষ্টি হলো ইলম ও আখলাক। নবীদের উদ্দেশ্য ছিল আমানত ছড়িয়ে দেয়া। অতএব যে সকল পথে উক্ত ফেতনা বাধা সৃষ্টি করেছিল সেগুলো বন্ধ করা প্রয়োজন মনে করা হলো। আর এই ফেতনা অর্থাৎ জুলুম ও মূর্খতা যেহেতু মানুষের মধ্যে জন্মগত

ছিল, তাই জন্মগত স্বভাবকে পাল্টানো এবং মানুষদের তাদের তবিয়তবিরোধী শাহওয়াত ও শুবহাত থেকে বের করে আনা কোন মানুষের সহজসাধ্য ছিলো না যে, শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত ওয়াজ-নসিহতের দ্বারা হয়ে যাবে। সেজন্য সিয়াসি শক্তির প্রয়োজন ছিল, যাতে তা দিয়ানত শক্তি সুদৃঢ় করে এবং তাতে নববী ইলম ও আখলাক পয়দা করার মাধ্যম হতে পারে। ফলে আল্লাহর মাখলুক নিরাপদ ও স্থিরতার সঙ্গে এই ইলম ও আখলাকের মাধ্যমে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য তথা আনুগত্য ও ইবাদতের ফরিযাকে আঞ্জাম দিতে পারেন।

ইসলামি সিয়াসত ও প্রচলিত সিয়াসতের মাঝে পার্থক্য

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা আবশ্যকীয়ভাবে বেরিয়ে আসে যে, ইসলামি সিয়াসত এবং মুসলমানদের সিয়াসি রাজনৈতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এমনটি কখনো হতে পারে না, যা বর্তমান প্রচলিত সিয়াসতে উদ্দেশ্য এবং মূল মাকসাদ হিসেবে দেখা হয়। এগুলোর সারনির্যাস হলো তিনটি বস্তু–

১. ভূমি দখল,

২. সম্পদ কুক্ষিগতকরণ এবং

৩. জাতিগত কর্তৃত্ব লাভ।

বর্তমান জঙ্গী পদক্ষেপের আখেরী মাকসাদ এবং অধিকার অন্বেষণের সর্বশেষ মানদণ্ড এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, অমুক অমুক ভৌগোলিক ভূখণ্ড যা অমুক রাজা বা জাতিগোষ্ঠীর অধিকারে হস্তগত করতে হবে। অথবা অমুক অমুক সংরক্ষিত জমিনে অমুক জাতির বাণিজ্যনীতি, এগুলোর মধ্যে জাতিগত, বংশগত অথবা দেশীয় অধিকারের অধীনে আসা উচিত। অথবা অমুকের রাজত্বে অমুক শাহেনশাহর কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত, অন্যথায় যুদ্ধ।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম সুরতে ভূমিদখল, দ্বিতীয় সুরতে অর্থ আহরণ তৃতীয় সুরতে জাতির জাতিগত কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়, যা দ্বারা যুদ্ধের বৈধতার উপর যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ মিলে। বর্তমান বিশ্বে দুই তৃতীয়াংশ জনবসিত উক্ত তিনটি বৈধ কারণে মারদাঙ্গা ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত।

ইসলামে হুকুমাতের নিযাম এবং যুদ্ধের কারণ

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে উক্ত কারণগুলো যুদ্ধ বৈধ করে না বরং যুদ্ধকে অবৈধ করে। এখানে যুদ্ধ বা লড়াই কোন অঞ্চল দখল, কোন বাণিজ্যিক ফায়দা অথবা

কোন মানবিক নেতৃত্ব অর্জনের জন্য হতে পারে না। এ সকল উদ্দেশ্য ইসলামে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন। ইসলামে সম্পদ অথবা মানুষের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কোন জাতি বা গোষ্ঠীর হক নয় যে, তারা তাতে হস্তক্ষেপ করবে।

ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ

নিঃসন্দেহে জমিনের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে চান তার উত্তাধিকারী বানান।

এ আয়াতে ভূমির মালিকানা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। মানুষের জন্য নয়। তারা শুধু মিরাছ মোতাবেক অংশ পেতে পারে।

এক স্থানে ইরশাদ হয়েছে–

إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً

আমি জমিনে আমার প্রতিনিধি বানাবো।

এখানে মানুষের জন্য জমিনের প্রতিনিধি সাবেত করা হয়েছে। জমিনের মালিকানা সাবেত করা হয়নি। জমিনের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মানুষ হলো তার পক্ষ থেকে নায়েব। তার পক্ষ থেকে জমিনে হস্তক্ষেপ করতে পারে– ব্যক্তিগতভাবে নয়। সম্পদ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْ اٰتَاكُمْ

আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে মানুষকে দাও।

উক্ত আয়াতে সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহকে বলা হয়েছে। মানুষ শুধু আমানতদার ও উকিলমাত্র। আল্লাহর অনুমতি ও বৈধতার দ্বারা নিজের জন্য এবং নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারবে। জাতিগত কারণে নয়।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

আমার দেয়া সম্পদ থেকে ব্যয় কর।

এখানে রিযিকদাতা হিসেবে আল্লাহকে প্রমাণ করা হয়েছে, যা তার মালিকানা লাভের প্রমাণ। আর মানুষকে শুধু ব্যয়কারী বলা হয়েছে, যা তাদের স্রেফ কোষাধ্যক্ষ হওয়ার দলিল।

আল্লাহর হুকুমত

তেমনিভাবে হুকুমত ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে–

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

এ আয়াত দ্বারা এক আল্লাহর হুকুমত সাবেত হলো আর গাইরুল্লাহর হুকুমত নিষিদ্ধ হলো।

অন্যত্র এসেছে–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا•

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও মহিলার সে কাজে কোন ইখতিয়ার নেই। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ অমান্য করবে, সে অবশ্যই প্রকাশ্য গোমরাহিতে লিপ্ত হবে। *[সূরা আহযাব : ৩৬]*

উল্লিখিত আয়াতে একচ্ছত্র হুকুমত স্রেফ আল্লাহর জন্য বিশেষত করে মানুষের জন্য আমরিয়্যাতকে শুধু নাফী করা হয়নি বরং আল্লাহর হুকুমের পর তাদের ওজর আপত্তি করা এবং কেন ও কিভাবে বলার সুযোগ রাখা হয়নি। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ অমান্য করার তো দূরের কথা তাতে চিন্তা-ফিকির করা গোনাহ এবং প্রকাশ্য পথ ভ্রষ্টতা বলা হয়েছে।

কুরআনুল কারীমের উক্ত তিনটি মাকাম– মালিকিয়্যাত (রাজস্ব), আমরিয়্যাত (একচ্ছত্র হুকুমত) এবং ইকতিদার (কর্তৃত্ব) দ্বারা সুস্পষ্ট হলো হুকুমত শুধু আল্লাহর জন্য। আর সমগ্র ভূমণ্ডল ও তার সম্পদ সবই তাঁর মালিকানা। এই শিক্ষা লাভ করার পর কোন মুসলিম জাতি, যারা এই স্বভাগত শিক্ষার সাথে পরিচিত, তাদের অধিকার নেই যে, উক্ত উদ্দেশ্যের জন্য কোন রাজনৈতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা অথবা যুদ্ধের কর্মকাণ্ড করা। তবে যদি কোন ভূখণ্ড দখল করতে চায় বা কোন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে তা নিজের জন্য করবে না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে।

হুকুমত ও জিহাদ

সুতরাং প্রথম শতাব্দির জিহাদী কর্মকাণ্ডের বৈধতার কারণ এই ছিল না যে, অমুক অঞ্চল আরব ভূখণ্ডে ভৌগোলিক মানচিত্রে শামিল হওয়া দরকার অথবা অমুক দুর্গের উপর আরবদের কর্তৃত্ব অর্জন করা প্রয়োজন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অমুক নৌবন্দর আরবদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় যুদ্ধের ঘোষণা। বরং কোন ভূখণ্ডে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তিনটি বিষয় পেশ করা হতো–

এক. আল্লাহর মনোনীত ধর্ম গ্রহণ করে নাও, ইসলামে প্রবেশ কর যা দিয়ানত ও সিয়াসত এবং ইলম আখলাকের উৎসসমষ্টির নাম।

দুই. তা না হলে আল্লাহর দীনের শান-শওকত গ্রহণ করে নাও এবং নিজেদের ধর্ম ঠিক রেখে আল্লাহর বিধানের নেতৃত্বে চলে আস। আর এমনটি তাদের উপর কষ্টদায়ক ছিল না। কারণ, অমুসলিমদের মধ্যে কারো মাঝে ধর্ম ও সালতানাত একত্রে নেই।

তিন. তা না হলে আল্লাহর বিধানএত মর্যাদাপূর্ণ সন্ধি করে নাও। আর নিজ দেশে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাক। এগুলোর মধ্য হতে কোনটি গ্রহণ না করলে আল্লাহর হুকুমের সঙ্গে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করা এবং যুদ্ধের ঘোষণা দেয়ার শামিল। আর আল্লাহদ্রোহীদের জন্য তাঁর প্রতিনিধিদের নিকট কোন প্রকার রেয়াত অথবা জান-মালের হেফাজতের কোন সামান্য পরিমানও যিম্মাদারি নেই।

ইসলামি জিহাদের উদ্দেশ্য ও ফলাফল

ইসলামি জিহাদ ও ইসলামি সিয়াসত অথবা সিয়াসী পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ভূমিদখল, সম্পদ আহরণ অথবা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি কোনটিই হয় না। এমনকি নিজেদের হুকুমত প্রতিষ্ঠা করাও হয় না। বরং উদ্দেশ্য থাকে ইশাআতে দীন এবং আল্লাহর বিধানকে পৃথিবীতে জারি করা, তাঁর কালিমাকে সমুন্নত ও উড্ডীন করা আর তার অলঙ্ঘনীয় বিধিবিধানকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া এবং জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে জাতির নিযামের শওকত প্রতিষ্ঠা করা, যাতে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয়।

এখন চিন্তা করে দেখুন, এমন পবিত্র ও বিশ্বব্যাপী উদ্দেশ্য ইশাআতে দ্বীনে ইলাহী, ইকামাতে হুকুমতে এলাহী এবং হিফাজতে নিযামে ইলাহী ইত্যাদির ন্যায় উদ্দেশ্যাবলিকে জগতের কোন বুদ্ধিমান জাতি প্রত্যাখান করতে পারে কি?

এখানে তো নির্দিষ্ট কোন জাতির নেতৃত্ব বা উপকারের প্রশ্ন নেই বরং তাতে শুধু আল্লাহর কর্তৃত্বই বুনিয়াদী মাকসাদ। দূরত্ব ও পৃথকীকরণ সৃষ্টি হয় তো কোন জাতিকে কোন জাতির অধীনে নিয়ে আসার দ্বারা। আর তা দ্বারা দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। অতএব যখন সকল মানুষ এবং জাতি-গোষ্ঠী সবাই বরাবর; তাহলে এক জাতি অপর জাতির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করার অথবা গোলাম বানানোর কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু যখন কোন জাতি নিজেদের কর্তৃত্বের নয় বরং নমনীয়তার সাথে যদি ঘোষণা করে এ কথা সুস্পষ্ট করে যে, এই যুদ্ধ কোন জাতিগত উদ্দেশ্যে বা জাতিগত ফায়দার জন্য নয় বরং আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালার সঠিক এবং সনদযুক্ত ইলম এবং তার পুত-পবিত্র আখলাক দ্বারা পৃথিবীকে সাজানো, তাতে রাষ্ট্রক্ষমতা, লোভ-লালসা ও ইজ্জত-সম্মান, কর্তৃত্ব লাভের কোন সম্পর্ক নেই। বরং হাজারো দেশ জয় করার পরও নিজেদের ব্যাপারে দরবেশী এবং সাদাসিধা অভাস অবলম্বন করা চাই। তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ, হীরা-জহরত অর্জন করা নয় বরং যুহদ ও অল্পে তুষ্টতার দ্বারা পৃথিবীকে একাকার করা। তাদের উদ্দেশ্য স্বয়ং আল্লাহকে পাওয়া। অতএব এতে কোন জাতির বা গোষ্ঠীর নিজস্ব কর্তৃত্ব অর্জনের প্রশ্নই হতে পারে না। কোন জাতির নিজস্ব নেতৃত্ব অর্জনের সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং বান্দার হুকুমত বান্দার উপর হলে তা ঝগড়া-ফাসাদের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর হুকুমত বান্দার উপর তখনই ঝগড়া-ফাসাদের কারণ হতে পারে যখন আল্লাহকে মেনে নেয়া অস্বীকার করা হয়।

ভাবনার বিষয়

সেজন্য আজও যদি মুসলমানরা নিজেদের জাতিগত হুকুমত, জাতিগত কর্তৃত্ব অথবা বিশেষ কোন ভূখণ্ডে বিশেষ কর্তৃত্ব বা সম্পদ হস্তগতকরণ এবং অর্থনৈতিক নিযাম অথবা নির্দিষ্ট কোন দেশের ভৌগোলিক অঞ্চল দখল ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে উক্ত মাকসাদগুলো অবশ্যই ইসলামি মাকসাদ হবে না। আর কোন গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে ওই সমস্ত প্রশ্নাবলিকে কারো জোর করে মানানো যাবে না। আর সঠিক অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেরাও প্রশান্তি লাভ করতে পারবে না। আর সফলতা-ব্যর্থতা তো আল্লাহর হাতে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা যদি সঠিক হয় এবং ইতমিনান ও প্রশান্তির কারণ হয়, তাহলে প্রতিটি পদক্ষেপ পরিপূর্ণ সফল এবং পুরোপুরি প্রশান্তময় হয়। আর মানুষ নিজে ইতমিনান লাভ করে অন্যকে ইতমিনান করতে পারে। এ কারণে যদি আমরা

আমাদের মূল উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারা প্রথম শতাব্দির চিন্তাধারা মোতাবেক কায়েম করতে পারি অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের প্রচার-প্রসার এবং হক শক্তির এশাআত, দীনি নিযামের সমুন্নতি ইত্যাদি যাদের সারনির্যাস হলো ওই তিনটি বিষয় যথা– তালীমে আহকাম, তাহযীবে আখলাক এবং তানযীমে আমাল অর্থাৎ ইত্তেবায়ে উসওয়ায়ে হাসানাহ; তাহলে আমাদের প্রতিটি দাবি অর্থবহ হবে আর আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ জাতিগত ফায়দার অপবাদ থেকে পবিত্র হয়ে জগদ্বাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। পাশাপাশি সফলতার মঞ্জিলও নিকটবর্তী হবে।

খিলাফতে রাশেদার পর

আমি ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু অনুধাবন করতে পেরেছি, তাহলো, প্রথম শতাব্দির পর খিলাফতে রাশেদার সোনালী যুগের অবসান ঘটার পর বার থেকে ষোল বছরের মধ্যে মুসলিম জাতির মধ্যে যে পরিমাণ জাতীয় অবনতি ও অধঃপতন অথবা পদক্ষেপসমূহে যে পরিমাণ অসফলতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, তার সবগুলোই তাদের মাঝে উক্ত বুনিয়াদী তিনটি বস্তুর ঘাটতি অথবা জাতির মেজাজ-তবিয়ত উক্ত তিনটি বস্তুর সংমিশ্রণ হতে খালি থাকা অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধতা না থাকা। অর্থাৎ জাতির অসফলতা, ইলমের স্বল্পতা অথবা আখলাকী দুর্বলতা বা নিযামের বিশৃঙ্খলার দ্বারা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং খিলাফতে রাশেদা এবং এর পরিসমাপ্তি অর্থাৎ উমর ইবনে আবদুল আযিয রা. পরে (যা উক্ত তিনটি মূল উপাদানের সংমিশ্রণে একতার পরিপূর্ণ নকশা এবং দ্রুতগতিতে দেশ বিজয়ের আসল যুগ ছিল) মুসলিম জাতির অধঃপতনের ধারাবাহিকতার প্রথমে দেশ বিজয় থেমে যায়, তারপর বিজিত দেশ হাতছাড়া হতে থাকে। ভিতরগত দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। তারপর পরিণামে দিন দিন অপদস্থতা এবং অধঃপতন আসতে থাকে।

আর তা এ কারণে যে, মুসলমানদের সামনে মঞ্জিলে মাকসুদ ছিল না অথবা থাকলেও মাকসুদ অজানা ছিল অথবা জানা ছিল কিন্তু তাতে চলার জন্য চারিত্রিক শক্তি ছিল না। অথবা তাও ছিল; কিন্তু কেন্দ্রীয় কোন পরিচালক এবং নেতা ছিল না, যিনি নিজের ইলম ও আখলাক দ্বারা উক্ত নির্দিষ্ট নিযামের উপর তাদের পরিচালনা করবেন। আর যদি এমন ব্যক্তি থাকেও কিন্তু গোষ্ঠীগত দলাদলিল কারণে তাকে অনুসরণ করার এজাজত দেয় না। মোটকথা, উক্ত তিনটি উপকরণ ইলমি শক্তি, আখলাকি শক্তি এবং ইন্তিজামি শক্তির অধঃপতনের কারণে মুসলমানদের অধঃপতন।

ভারতবর্ষে ইসলামি হুকুমতের পতন

এখানে বিস্তারিতভাবে বলার সুযোগ নেই, কিন্তু মূলনীতিগতভাবে চিন্তা ফিকির করা ব্যতীত সবার এখন এ কথা মেনে নেয়া উচিত যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতার লাগাম উক্ত তিন মৌলিক উপকরণ পতনের ফলে হাতছাড়া হয়েছে। বাদশা আলমগীরের যুগ এবং তার ফতোয়ায়ে আলমগীরির ফিকহী নিযামের পর আস্তে আস্তে উক্ত তিনটি বুনিয়াদী উপকরণে ক্ষতি আসতে থাকে এবং ধীরে ধীরে দেশের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব ঢিলে হতে থাকে। শেষ পরিণামে ১৮শ' শতাব্দিতে দেশের দীক্ষাহীন মূর্খতা এবং বিশৃঙ্খলার কারণে সমগ্র দেশ একেবারেই হাতছাড়া হয় এবং ইসলামি হুকুমাতের সূর্য ডুবে যায়।

হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ.

১২৪৬ হিজরি সনে আল্লাহ তায়ালার কয়েকজন মুখলিস বান্দা হযরত মাওলানা সৈয়দ শহীদ বেরলভী রহ. এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শাহিদ রহ. দ্বয়ের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে আগে বাড়লেন। তারা যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। কিন্তু সমগ্র জাতির মূর্খতা ও দীক্ষাহীনতা পরাজয়ের কারণ হলো– তারা নিজেদের কারণে পরাজিত হয়েছে।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.

১৮৫৭ ঈসায়ী সালে ইসলামি হুকুমত পুনরুদ্ধারের চেষ্টা প্রচেষ্টা করা হয়। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী রহ. ও হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. তাঁদের শায়েখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহ.-এর নেতৃত্বে আগে বাড়লেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা বিজয়ীও হন। কিন্তু জাতির অদূরদর্শিতা, অনভিজ্ঞতা এবং অপ্রস্তুতি সামনে আসে। দেশ ও জাতি তালিম ও তারবিয়্যাতশূন্য ছিল বিধায় আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং ফলাফল শূন্যের কোটায় নেমে আসে।

শায়খুল হিন্দের যুগ

১৩৩৯ হিজরি সনে হযরত মাওলানা শায়খুল হিন্দ রহ. প্রকাশ্যভাবে আন্দোলনের ময়দানে নামেন। জাতির পক্ষ থেকে তাঁকে উষ্ণতাপূর্ণ সংবর্ধনা

দেয়া হলো। হারানো সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য সমগ্র জাতি হাকীকি উন্মাদনার সঙ্গে আন্দোলনে শামিল হলো। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের ঘাটতির কারণে সুফল পর্দার অন্তরালে হারিয়ে গেল আর ফেতনা ও বিপদাপদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আজ কুদরতি ইনকিলাবের মাধ্যমে জাতির ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে। কোন জাতির উন্নতি হচ্ছে, কারো অবনতি হচ্ছে। আজ অধিকাংশ মুসলমান ইল্‌ম ও আখলাক এবং সুশৃঙ্খলা হতে এত দূরে অবস্থান করছে, যা আজ হতে শত বছর পূর্বে ছিল।

আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, আগ্রহ, সহানুভূতি ও পরস্পর অন্তরঙ্গতা ইত্যাদির মধ্যে অবশ্যই পরিবর্তন এসেছে। যুগের পরিবর্তন তাদের জাগ্রত করেছে। আর মানুষ গাফলতের নিদ্রা ত্যাগ করে জাগ্রত হচ্ছে। কিন্তু নিদ্রা থেকে শুধু জাগ্রত হলেই চলবে না। এতটুকু যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না জাগ্রত হয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার রাস্তা অবলম্বন ও কঠিন পরিশ্রম করবে। এজন্য প্রয়োজন হলো পূর্বে উল্লেখ করা তিনটি বুনিয়াদী বস্তু, যেগুলো প্রথম শতাব্দির প্লান সেগুলো দৃঢ়ভাবে মজবুতির সঙ্গে আঁকড়ে ধরা অর্থাৎ তালীমে কিতাব (কুরআন শিক্ষা), তাহযীবে আখলাক চরিত্র গঠন এবং তামিলে উসওয়ায়ে হাসানাহ (উত্তম আদর্শ গ্রহণ) এইগুলো মজবুত করে গ্রহণ করা।

এগুলোকে আরো একটু ব্যাপক শিরোনামে এভাবেও বলা যায় যে– ১. ইশাআতে দ্বীনে ইলাহী, ২. ইকামাতে হুকুমতে এলাহী বা আল্লাহর বিধান জারি করা, ৩. তানযিমে হায়াতে ইনসানী বা মানুষের সুশৃঙ্খল জীবন।

ইশাআতে দ্বীনে ইলাহী

ইশাআতে দীন বা দীনের প্রচার-প্রসার ও হেফাজতে দীনের প্রথম বস্তু হলো তালীম। যে মাযহাব বা ধর্মের তালীম বাকি না থাকবে, সেই ধর্ম কখনো বাকি থাকবে না। পরিপূর্ণ তালিমী ব্যবস্থাপনা দ্বারা অভিজ্ঞ আলেম তৈরি হবে, যারা সার্বিকভাবে ইসলামকে হেফাজত করতে পারবে এবং বিধর্মীদের অপবাদ খণ্ডন করতে পারবে। এমন তালীম মাদরাসার মাধ্যমেই সম্ভব। এমন তালীমের জামিনদার হয়েছে মাদরাসার পরিচালক ও উস্তাদরা। এমন মাদরাসা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু সংখ্যায় অনেক কম। আর কম হওয়ার কারণ হলো, হিম্মত ও সাহস কম থাকা। যদি জাতি তালীমের প্রয়োজন অনুভব করত,

তাহলে শহরের জনবসতি হিসেবে দীনি মাদারিস প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন মনে করত। এতে অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম দরস প্রদান করে মুসলিম সন্তানদের কুরআন ও সুন্নাহ এবং উভয়ের ফিকহী কানুন সম্পর্কে অবগত করাত, ফলে তারা সকল ফেতনার প্রতিরোধ করতে পারত।

কাসেমী উলূম ও দর্শন

এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই বলব যে, তালীমের পুরাতন পদ্ধতি ঠিক রেখে আধুনিক প্রয়োজনাদির প্রতি মনোনিবেশ করবে না। কিন্তু এগুলোকে সামনে রেখে তালীমি প্লান-প্রোগ্রাম নির্ধারণ করবে। উক্ত প্লানের ধরন এমন হবে যে, দাবি পুরাতন হবে আর দলিল হবে নতুন, যাতে পুরাতন দাবি আধুনিক জগতের দেমাগে প্রবেশ করতে পারে।

ইলমি মাকার্য দারুল উলূম দেওবন্দ

আমি আমার অভিজ্ঞতা ও বহু বছর চিন্তা ও গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারি, হযরত কাসেম নানুতবী রহ. আধুনিক যুগে এমন আধুনিক ফিকির (চিন্তা-গবেষণা) পেশ করেছেন, যার মধ্যে প্রথমে মানকূলে ইসলামকে (বর্ণিত) মাকুল (বোধগম্য) করেছেন। অতঃপর মাকুলকে মাহসুস (অনুভবযোগ্য) করে দেখিয়েছেন, যা ওয়ালী উল্লাহ খানদানের হেকমতসমূহের সারনির্যাস। আর এই হেকমতকে যদি প্রাসাদ মনে করা হয়, তাহলে এতে প্রবেশের দরজা রয়েছে, যা শরীয়ত, তরীকত ও সিয়ামত এই তিনটির সমন্বয় ও সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে। এই নমুনা ও পদ্ধতির অনুকরণ করলে চিন্তা-চেতনায় ইসলামের পূর্ণ কল্পনা ও আকৃতি প্রতিষ্ঠিত হবে। আর পরিপূর্ণ কল্পনার ইলমি মার্কায হলো দারুল উলূম দেওবন্দ। তার সাধারণ ফিকিরের পাশাপাশি বিশেষ কিছু কিতাব রয়েছে যেমন হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ও মনোমুদ্ধকর বয়ান ইত্যাদিও পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।

ভবিষ্যৎ তালিমী পরিকল্পনা

এই হেকমতে শরঈয়্যার পাশাপশি দেওবন্দের দায়িত্বশীলদের এমন পরিকল্পনাও রয়েছে যে, আধুনিক যুগের হেকমতের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু উদাহরণস্বরূপ প্রাচীনকালের ইলমে সিয়াসত, সাইন্সের মূল উপকরণ, বর্তমান সিয়াসতের উসুল (বিধান) অর্থনৈতিক বিষয় ইত্যাদি বিষয়কে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে

ছাত্ররা নিজেদের নির্ধারিত ইলম ও হেকমতের সাথে সাথে যুগের চাহিদা অনুপাতে উক্ত বিষয়াবলিতে পারদর্শিতা অর্জন করে, সঠিকভাবে তার উপর নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারে।

অতএব উক্ত কাজ আর প্লান হলো মাদরাসাগুলোর জাতির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আন্তরিক উৎসাহ দেয়া উচিত, যাতে বেশি বেশি সহীহ চিন্তাশীল এবং সহীহ আস্থাশীল আলেম তৈরি হতে পারে। আর জাতির পথ প্রদর্শনের রাস্তার পরিধি প্রশস্ত থেকে প্রশস্ত হয়।

মসজিদভিত্তিক শিক্ষা

এ কথা সুস্পষ্ট যে, মাদরাসা শিক্ষার পরিধি এক প্রকার সীমাবদ্ধ, সবাই পরিপূর্ণ আলেম হতে চায় না। আর সবার আলেম হওয়ার প্রয়োজনও নেই। এজন্য মাদরাসাভিত্তিক তালিম ব্যতীত এমন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন বাকি থেকে যায়, যা দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের ছেলেমেয়েরা উপকৃত হতে পারে এবং দীনের প্রয়োজনীয় ইলম সকল মুসলমানের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। উক্ত বিষয়ের সমাধানকল্পে ইবতিদায়ী মক্তবসমূহ যেগুলো প্রত্যেক মহল্লার মসজিদগুলোতে প্রাচীন পদ্ধতিতে চালু থাকবে। আর এগুলো বড় বড় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। এমন মক্তব শুধু শহর ও শহরের মহল্লাতেই নয় বরং পল্লি গ্রামের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করা উচিত। মুসলিম দায়িত্বশীলগণ নিজেদের প্রভাব ও সহায়তায় পল্লি গ্রামের সকল মসজিদসমূহে এমন মক্তব প্রতিষ্ঠা করবে, যাতে কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষায় লিখিত এমন ছোট ছোট পুস্তিকা পাঠ্যসূচিতে রাখবে, যাতে দীনের প্রয়োজনীয় বিষয়, আবশ্যকীয় আকিদা, আখলাক, মুয়ামালা, মুআশরাত (সমাজনীতি) ও প্রাথমিক গাণিতিক বিষয়াবলির উপর মোটামুটি ধারণা সৃষ্টি হয়।

দরসে কুরআন ও বয়স্ক কুরআন শিক্ষা

বিশেষ পার্সনদের তালিম মাদরাসা থেকে আর শিশুদের তালিম মক্তব থেকে পুরো হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ জনগণ তালিমবিহীন থেকে যায়। এজন্য তাদের জন্য প্রতিটি মসজিদে দরসে কুরআন নামে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, তাতে কুরআনুল কারীমের সাধারণ বুঝ এবং সঠিক তরজমা শুনাবে এবং তরজমার পাশাপাশি ইলমে ফিকহের আমলি মাসায়েলগুলো সময়-সুযোগে পড়াবে, যাতে

সর্বসাধারণও দীনি ইলম থেকে গাফেল না থাকে। তাদের মধ্যেও দীনি ইলমের আগ্রহ ও আমলের জযবা সৃষ্টি হয়।

তাবলীগ

তালিম চাই মাদরাসাভিত্তিক হোক বা মক্তব ও মসজিদভিত্তিক সর্বাবস্থায় এক প্রকার সীমাবদ্ধতা থাকে। এগুলোর মধ্যে এ ধরনের পরিপূর্ণতা রয়েছে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে আসে এবং কিছু আহরণ করে নিয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, এমন ব্যবস্থাপনা দ্বারা জাতির সাধারণ শিক্ষা এবং দীনের গণদাওয়াতের মাকসাদ পুরোপুরি হয় না। সেজন্য শিক্ষার পাশাপাশি এই কাজটি অতীব জরুরি যে, দীনের মুয়াল্লিমগণ (ধর্মীয় শিক্ষক) মানুষদের আগমনের অপেক্ষা না করে তিনি নিজেই তালীমে দীনের তলব নিয়ে বের হয়ে যাবেন এবং মানুষের দ্বারে দ্বারে বারে বারে গিয়ে তাদের কর্ণকুহুরে সত্যের বাণী পৌছাবেন। শরীয়তের পরিভাষায় একেই তাবলীগ বলে, যা দীন ও ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আম্বিয়া (আ.)দের আসল ও সত্যিকারের উত্তরাধিকার সম্পদ।

তাবলীগ একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম

তাবলীগ এমন একটি বিষয় (মিশন), যার মাধ্যমে সর্বদা সংখ্যালঘু ও সংখ্যাধিক্যের ফায়সালা হয়েছে। মক্কাবাসী পুরোপুরি কাফের ছিল। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবলীগের ফলে প্রথম পর্যায়ে মুসলিমদের সংখ্যালঘুতা তৈরি হয়েছে। তারপর সংখ্যাঘরিষ্ঠ। তারপর মুসলিমদের সংখ্যা একশোতে পৌছেছে। মদীনাতেও সবাই অমুসলিম ছিল। প্রথম পর্যায়ে জামরায়ে উলাতে ইসলাম গ্রহণকারীগণ সংখ্যালঘুতা সৃষ্টি করেন। তারপর আস্তে আস্তে সংখ্যাধিক্যতা লাভ করে পরবর্তীতে মুসলিমদের সংখ্যা পরিপূর্ণতা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে সমগ্র হেজাযেও সংখ্যালঘু ও আধিক্যতার প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকেনি। তাবলীগ কর্ম কুদরতিভাবে উক্ত বিষয়টিকে সমাধান করে দেন।

ইরান ভূখণ্ডে ইসলামি বিজয়ের মাধ্যমে তাবলীগ প্রবেশ করে। সেখানেও মুসলিম জনসংখ্যা সংখ্যালঘু থেকে ধীরে ধীরে গরিষ্টতায় পৌছে। তারপর পূর্ণতায় পৌছে। মোটকথা, যে সকল দেশে ইসলাম বিজয়ী বেশে পৌছেছে এবং দীনি তাবলীগ ও প্রচার-প্রসারের মাকসাদ অগ্রে রাখা হয়েছে, সেখানকার মুসলমানরা অমুসলিমদের টানাহেঁচড়া থেকে নাজাত পেয়েছে। আর যেখানে

ইসলাম শুধু প্রকাশ্যে বিজয় অর্জন করেছে। রুহানি বিজয়ের প্রতি লক্ষ্য করেনি এ ব্যাপারে চশমপুশি করেছে, যা তাবলীগি প্রক্রিয়ায় করা সম্ভব ছিল, সে সকল দেশে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাধিক্যের টানাহেঁচড়া রয়ে গেছে।

মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা

হিন্দুস্তানের মুসলিম সুলতানগণ যদি দাওয়াত ও তাবলীগের বিষয়টির অগ্রাধিকার দিতেন, তাহলে প্রাদেশিক জনসংখ্যার লঘিষ্ট ও ঘরিষ্ঠের ঝগড়া হতো না, যে ঝগড়া আজ সর্বত্র হচ্ছে। তারা শুধু মুসলিম ও অমুসলিমদের ঝগড়াই বাঁধাইনি বরং মুসলমানদের পরস্পর ঝগড়া বিবাদের বিশাল এক সমুদ্রতুল্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে ফেলেছে।

ইত্তিহাদ (ঐক্য)-এর পূর্ণতা

ইত্তিহাদ সংখ্যালঘু বিষয়ে আলোচনা দ্বারা অর্জন হবে না। বরং তাবলীগ দ্বারা অর্জন হবে। তাবলীগি কর্মকাণ্ড আরম্ভ করালে তার বরকত ও ফলাফল স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রকাশ পাবে। হায়! মুসলিম সমাজ যদি এই একটি কাজকে সম্মিলিতভাবে করতো এবং সবাই মিলে তাবলীগি কাজে লেগে যেত। আর ইত্তিহাদ পয়দা হয় কোন ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দ্বারা। যদি মুসলমানদের তালীম ও তাবলীগের বিষয়টি সর্বসম্মতিক্রমে হতো, এতে কোন ব্যক্তি বা দল দ্বিমত পোষণ না করতো, তাহলে পূর্বে আলোচ্য বিষয়গুলো কি ইত্তিহাদের ভূমিকা ও অবতরণিকা হতে পারে না? আমার খেয়ালে হতে পারে। আর এগুলোকে গ্রহণ করা হোক এবং এগুলোর দ্বারা জাতির শৃঙ্খলা ও একতার কার্যক্রম শুরু করা হোক, যা ভবিষ্যতে অন্যান্য বিষয়েও ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের পথকে সুগম করবে।

মুবাল্লিগদের জীবনকে যদি স্বনির্ভর করে দেয়া যায়, তাহলে দাওয়াতি কর্ম অনেক প্রভাব ফেলবে। নবীদের দাওয়াতি কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এ কথার ঘোষণা হতো যে–

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

আমি তোমাদের নিকট তাবলীগের প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিবেন।

এজন্য জাতির বিত্তবান ও সম্পদশালীগণ তালিমী মক্তবের পাশাপাশি কিছু কারিগরি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে, যাতে মুসলিম জনসাধারণ এমন কারিগরি বিদ্যা অর্জন করতে পারে, যা তাদের অঞ্চলে সামাজিকভাবে প্রয়োজন। আর তা দ্বারা নিজেদের স্বনির্ভরতা রক্ষা করতে পারে। সাথে সাথে উক্ত কারিগর প্রতিষ্ঠানে যদি বাণিজ্যিক নিয়ম-কানুন চালু করা হয় এবং ক্রমান্বয়ে তার আমদানি ও রফতানি কর্মে এ বিষয়টি রেওয়ায়েত করা হয় যে, কোন মুবাল্লিগ কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে বের হলে এবং তার যদি পুঁজির প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানের ফান্ড থেকে এত পরিমাণ পুঁজি তাকে করজে হাসানা হিসেবে দেয়া, যা দ্বারা সে নিজের ব্যবসা সংক্ষিপ্ত পরিসরে চালিয়ে যেতে পারে। আর তার পাশাপাশি তাবলীগি কর্ম করে যাবে। এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে তাবলীগ কর্মে সহযোগিতা হবে এবং মুবাল্লিগদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা হবে।

তাবলীগের পদ্ধতি

তাবলীগ কর্মে উত্তম আদর্শের অনুসরণকে পাথেয় করা উচিত, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র জীবনে কার্যকরিরূপে গ্রহণ করেছিলেন আর কুরআনুল কারীম যাকে মৌলনীতি হিসেবে পেশ করেছে। অর্থাৎ আল আকরাবু ফাল আকরাব (নিকটাত্মীয়তার বিবেচনায়)-এর পদ্ধতি তো প্রথমে নিজেকে ইসলাম ও শরীয়ত দ্বারা স্বীকৃত করবে, তারপর নিজ পরিবারকে, তারপর নিকটাত্মীয়দের, তারপর শহর বা গ্রামবাসীদের, তারপর শহরতলি ও তার আশপাশ এলাকাকে। তারপর দেশকে তারপর সারা বিশ্বকে এই পদ্ধতিটি এভাবে সহজ ও আসানতর হতে পারে যে, মুসলমানদের প্রত্যেক জনপদে এই পদ্ধতি পৌঁছাতে হবে এবং প্রত্যেক মুবাল্লিগ উক্ত তাবলীগি মৌলনীতিকে গ্রহণ করবে, তাহলে সর্বত্র উক্ত তাবলীগি উসুল ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাবলীগি কর্মকে বিশ্বব্যাপী কর্মে পরিণত করবে। আর এমন কোন মাহফিল বা প্রকাশ্যভাবে হবে না বরং তার ধরন হবে নীরব এবং ঘরে ঘরে।

ওয়াজ-নসিহত

তাবলীগের সাথে সাথে ওয়াজ-নসিহত হতে মুখ ফিরাবে না বরং ব্যাপকহারে মাহফিল কায়েম করে, ওয়াজ ও নসিহতের মাধ্যমে আসল মাকসাদ ও উদ্দেশ্য বারবার স্মরণ করাবে, ওয়াজ ও নসিহতের বাজারকে সরগরম রাখবে। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ-

فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

বারবার স্মরণ করাও। কেননা, স্মরণ করানো ঈমানদারদের উপকার করে।

এই বারবার ওয়াজ-নসিহত ও স্মরণ করানো কর্ম চাই মাদরাসাভিত্তিক হোক বা মক্তব, মসজিদ ও তাবলীগভিত্তিক হোক। সর্বাবস্থায় তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় বিষয় রাখা জরুরি। তা হলো মুসলিম জাতিকে তাদের গৌরবময় অতীত স্মরণ করানো আর তাদেরকে তাদের শান্দার উত্তরসূরীদের সম্পর্কে পরিচিত করানো। আর তার মার্কায ও মেরুদণ্ড হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সীরাত। সাথে সাথে সাহাবাদের পবিত্র জীবনের চিত্র তুলে ধরতে হবে। উল্লিখিত কর্ম মুসলমানদের অন্তর ও আত্মার মাঝে ইনকিলাব সৃষ্টি করবে। আর তাদের মধ্যে সামনে বাড়ার জযবা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উথলে উঠবে। তবে শর্ত হলো, স্বয়ং মুয়াল্লিমগণ ওই সীরাত দ্বারা প্রভাবিত হতে হবে স্বয়ং এবং বুনিয়াদী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বিশেষ করে যা শিশু ও বৃদ্ধদের তালিম-তাবলীগ এবং দরস ও ওয়াজ নসীহতে শিখাতে হবে, তাহলো এই– ১. পৃথিবীতে ইসলাম কিভাবে সম্প্রচারিত হয়েছে, ২. ইসলামি প্রচার ও প্রসারকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য পৃথিবীতে কী কী উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

উল্লিখিত বিষয়দ্বয় দ্বারা এক প্রকার কুদরতি ফলাফল এই হয় যে, তরুণদের মাঝে ইশাআতে ইসলামের জযবা সৃষ্টি হয়। আর সাথে সাথে ইশাআতে দীনের তরীকা ও তাবলীগের বুনিয়াদী বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং সাথে সাথে তাবলীগের প্রতিবন্ধকগুলো বিশদরূপে পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে সেগুলোকে অতি সহজে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

জিহাদী চেতনা

দীনের অন্যান্য বিষয়াবলি শিখানোর পাশাপাশি মাদরাসা ও মক্তব্যগুলোর মধ্যে এর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইশাআত ও প্রচার করতে হবে, এমনকি আমলি মশ্ক ও শারীরিক ব্যায়াম করানো অত্যন্ত জরুরি। আর তাহলো জেহাদী চেতনার টেনিং, যা মুসলিম জাতির প্রাচীন ও অতীত ঐতিহ্য। কিন্তু আজ আয়েশী সমাজব্যবস্থা ও বিরোধী শক্তির কূটকৌশল তাকে দুর্বল ও অস্তিত্বহীন করে ফেলেছে। মুসলিম সমাজ থেকে জিহাদী চেতনা হারিয়ে গেছে।

জেহাদী কর্মের ধারাবাহিকতায় যেখানে শারীরিকভাবে, শারীরিক ব্যায়াম, যুদ্ধকৌশল, লাঠি চালনা, বল্লম নিক্ষেপ, তীরন্দাযী, কুস্তি ও শরীরচর্চার কৌশল ইত্যাদি শিখানো যেমন জরুরি, তেমনি চিন্তা-চেতনাগতভাবে চিন্তাশক্তির অস্ত্রের ব্যবহার ভালোরূপে শিখাতে হবে। কারণ, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ যুদ্ধই স্নায়ুযুদ্ধ। চিন্তাধারার উপর প্রভাব ফেলে যুদ্ধ ও সন্ধির পথকে সুগম করা হয়। সেজন্য নওজোয়ানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও চিন্তাধারার দৃষ্টিকোণ থেকে এমন অনুভূতি ও চেতনা সৃষ্টি করা আবশ্যক, যাতে তারা বিজাতীয় চিন্তা চেতনায় প্রভাবিত না হয়ে সেগুলোর উৎসস্থল অনুধাবন করতে পারে এবং পরখ করতে পারে যে, কোন চিন্তাধারা কোথা হতে আমদানি হচ্ছে আর কোন প্রপাগাণ্ডা কোথা হতে আসছে। আর তার উদ্দেশ্য কী, এর দ্বারা মুসলিম জাতিকে কোন দিকে নিতে চায় আর এহেন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার উপায় কী ইত্যাদি যাতে বুঝতে পারে।

সুতরাং বর্তমানকালে জিহাদী মনোভাবের জন্য যেখানে সামর্থ্য অনুযায়ী যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করা বা দৈহিক শক্তি সঞ্চয় করা জরুরি, সেখানে চিন্তা-চেতনার যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়াও জরুরি। বর্তমান আধুনিক যুগের পরিভাষায় যাকে কূটনীতি বলে। আর ইসলামি পরিভাষায় যাকে 'খদাআ' বা ধোঁকা দেয়া বলে। প্রকাশ থাকে যে, এই বিষয়টি রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জন করলে হাসিল হয় আর এর সক্ষমতা এবং সংশোধন অর্জন হয় ইসলামি ইতিহাসের যোগ্যতা অর্জনে। এ সম্পর্কে সকল মুয়াল্লিম, মুবাল্লিগ, বক্তা ও উস্তাদগণদের কিছুটা ধারণা থাকা জরুরি। এটি শিক্ষাবিষয়ক সংক্ষিপ্ত চিত্র, যা দ্বারা কুরআনি চিন্তা-চেতনা উম্মতের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ইলম অর্জনের পর আমল অর্জন হয় আখলাকী শক্তি দ্বারা।

আত্মশুদ্ধি ও জগদ্বাসীর সংশোধন

সেজন্য তাহযীবে আখলাক তালীম থেকেও জরুরি। যদি আখলাকী কারিগর উন্নত চরিত্রের না হয়, তাহলে ইলমের আলো কী উপকার করতে পারবে? আখলাক হলো আমলের অদৃশ্য শক্তি। যদি তা না থাকে বা দুর্বল থাকে, তাহলে আমলহীন ইলম কী কাজে আসতে পারে? সেজন্য আখলাকি তারবিয়্যাত অবশ্যকর্তব্য। তা অর্জনের জন্য মুসলমানদের মুজাহাদা ও সাধনা করা আবশ্যক। মধ্যমপন্থী আখলাক হাসিলের জন্য মেহনত, কষ্ট ও সাধনা প্রয়োজন। আর এগুলোর নিয়ম-নীতি ইলমে তাসাউফ তথা সুফীদর্শন

কিতাবসমূহে রয়েছে। আর এগুলোকে একমাত্র হাক্কানী পীর ও বুযুর্গগণ কাজে লাগাতে পারেন। যেহেতু তারা নিজেদের অন্তরকে পবিত্র রাখেন এবং নিজেরা আত্মশুদ্ধির পথে চলেন এবং তা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মুসলমান, তাবলীগ ও ইশাআতে দ্বীনে যতটুকু অশগ্রহণ করেছে, তা তাদের আখলাকি কর্মের কারণে। মুসলমানদের সততা ও পরহেজগারি, লিল্লাহিয়্যাত ও স্বার্থহীনতা, আত্মদান, নমনীয়তা ও তাদের লেনদেনে স্বচ্ছতা দেখে অন্যদের মন আপনা আপনিই তাদের দিকে ঝুঁকে যেতো। হিন্দুস্তানের মধ্যে আপনাদের এ সিন্ধু প্রদেশে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রবেশ করেছিল।

সুরতের (অবয়ব) প্রভাব সীরাতের উপর

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সাহাবা ও তাবেঈগণ যখন সিন্ধুর বাজারে ঘুরতেন, তখন তাঁদের চেহারা ও সুরত প্রত্যক্ষ করে মানুষ ইসলাম কবুল করে ফেলতো এবং বলতো এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।

এজন্য ইশাআতে দীনের আসল কারিগর হলো আখলাক। তাহযীবে আখলাক ব্যতীত ইশাআতে দীন সম্ভব নয়। এদিকে দেশ ও রাজ্যের পরিবর্তনও আসলে আখলাক পরিবর্তনের কারণে হবে। যদি মস্তিষ্ক থেকে গোলামি মনোভাব বের হয়ে যায়, তাহলে বাহ্যিক দিক থেকেও গোলমি দূরীভত হবে। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। *[সূরা রাদ : ১১]*

খানকার কর্মসূচি

'মানবতার সংশোধনই পৃথিবীর সংশোধন' এ কথার অর্থ হলো মানবচরিত্রের তাহযীব এবং শুদ্ধকরণ, যার জন্য প্রয়োজন হলো মোজাহাদা ও রিয়াযত। এ কাজ খানকার মধ্যে সমাধা হতো। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজ হাতেগোণা কয়েকটি খানকা ব্যতীত সকল খানকা ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে চলছে। শুধু প্রথাগত গদি বসানো আছে আর মুরিদদের থেকে চাঁদা উসুল করা ব্যতীত কোন প্রকার তারবিয়্যাতি কর্মসূচি চালু নেই। হযরত

পীর মাশায়েখদের জন্য জরুরি হলো প্রথমে তাঁরা নিজেদের নফসকে পৃথিবীর সকল মাদ্দী অপবিত্রতা থেকে পরিচ্ছন্ন করে নিজেদের মুরিদ ও শাগরেদদের হাকীকী তাহযীব দ্বারা সাজাবে। কিন্তু সাধারণ পীর-মাশায়েখগণ যদি উক্ত কাজের জন্য তৈরি না থাকেন, তাহলে আমি জনসাধারণকে পরামর্শ দিব, তাঁরা তাদের হাদিয়া নিয়মমাফিক জারি রাখবে, যা তাদের বুযুর্গদের প্রাপ্য যে তাদের সন্তানাদির খেদমত করবে। জনতা এমন হক্কানী পীর-মাশায়েখদের দ্বারস্থ হবে, যারা আত্মশুদ্ধি ও তাহযীবে আখলাকের কাজ করেন। অর্থাৎ নজর মান্নত তো ওই পীর সাহেবদের দিবে। কিন্তু তরীকরত মাসায়েল হাকীকী (আসল) পীর সাহেবদের নিকট জিজ্ঞেস করে নিজেদের কলবকে সংশোধন করবে এবং বাইয়াত ও ইরশাদ কর্মের সিলসিলাকে কায়েম করবে। তারা যেন যিকরুল্লাহ্ থেকে গাফেল না থাকে। তাওবা ও ইস্তিগফারকে সাহাবাদের নমুনায় করবে। নিজেদের আমলের জযবা বৃদ্ধি করবে এবং নফসের হিসাব-নিকাশ নিবে।

স্বার্থপরতা থেকে আত্মাকে পবিত্র করবে, যাতে জাতির চলন শক্তির উন্নতি ঘটে। অন্যথায় বর্তমানকালের দীনি ইলমের আধিক্য সত্ত্বেও চারিত্রিক দুর্বলতা, ইজ্জত ও পদমর্যাদার লিপ্সা, কপট খোশামোদী, চাটুকারিতা ও তোষামোদীর বদস্বভাব পুরো জাতিকে গান্ধা বানিয়ে রেখেছে। সেজন্য তাহযীবে নফসের কর্মকে সাধারণ কর্ম মনে করা যাবে না বরং সঠিক মানদণ্ডে তা আঞ্জাম দিতে হবে। কারণ, এটিও একটি তালিমে কিতাবুল্লাহর শাখা এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি আবশ্যকর্তব্য। কিন্তু প্রাথমিক ও আন্তর্জাতিকতা লাভ করে আমরে বিল মারুফ তথা সৎ কাজের আদেশ দ্বারা। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান নিজের ও অন্য মুসলমানের ঈমানকে বৃদ্ধি করবে এবং হেফাজত করবে, শাখাগত ছোট ছোট খারাবিগুলোকে বন্ধ করবে, প্রতিরোধ করবে। শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড দেখে স্রেফ সবর করবে না, সহ্য করবে না বরং স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-সোহাগ দিয়ে নসিহত করবে, উপদেশ দিয়ে ফেরাতে চেষ্টা করবে। তাদের অন্তরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে অস্বীকৃতি জানাবে না। এ ধরনের আমরে বিল মারুফ কর্ম এবং দেখাশোনা আমার মতে একজন মুসলিম রাজনৈতিক ব্যক্তির রাজনীতির অংশ ও সংশোধিত চরিত্র। অন্যথায় তারা সিয়াসত ও আসল ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। এ কারণে ফেলুসূফী সংস্কারক ব্যক্তিরা যারা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বাস্তবে সিয়াসত করেছেন, তারাও নিজেদের রাজনৈতিক প্রোগ্রামসমূহের প্রাথমিক অধ্যায় আকাঈদ ও আখলাকের সংশোধন স্থির করেছেন। এটি ভিন্ন বিষয় যে, তারা ইসলাহী পদ্ধতিতে ইলহামের স্থলে স্রেফ নিজেদের আকল-বুদ্ধিকে যথেষ্ট

মনে করেন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাহযীবে নফস ব্যতীত অন্য কোন উপায় তারাও দেখতে পায়নি।

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ এবং কুরআনুল কারীম

ওই সকল শাখাগত বস্তুই এশাআতে দ্বীনে ইলাহীর শিরোনামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলোর ভিত্তি তালীমে কিতাবুল্লাহর সাথে। কুরআনুল কারীম ويعلمهم الكتاب দ্বারা তালীমের প্রয়োজনীয়তা, بلغ ما انزل اليك আয়াত দ্বারা তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ দ্বারা ওয়াজ-নসিহতের প্রয়োজনীয়তা, واعدوا لهم ما استطعتم দ্বারা জেহাদী যোগ্যতা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আর

وعلمناه صنعة لبوس لكم ও ويعلمون له ما يشآء من محاريب وتماثيل وجفان

দ্বারা কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যা আজ সাইন্সের কার্যকরী আলোচ্য বিষয়। দ্বারা বাতেন পবিত্রকরণের প্রয়োজনীয়তা, وأمر بالمعروف وانه عن المنكر দ্বারা সৎ কাজের প্রচার প্রসার এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা। আর হাদিস শরীফ الدين والنصح لكل مسلم (দীন সকল মুসলিমদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী) দ্বারা ছোটখাট কর্মের প্রতিবন্ধক এবং নসিহতের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ্যভাবে বলে দিয়েছে। এগুলোর উপর এখন শুধু আমল করা প্রয়োজন, প্রোগ্রাম তো বানানো রয়েছেই। তবে প্রোগ্রামের জন্য সর্বপ্রথম লক্ষ্যবস্তু ঠিক করতে হবে, যাতে অন্তরের জন্য কোন নির্ধারিত চিন্তাধারা ঠিক হয়ে যায় এবং তা নিষ্ঠার সাথে কাজে পরিণত হতে পারে।

হুকুমতে এলাহী প্রতিষ্ঠা

এ কথা সুস্পষ্ট যে, প্রতিটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে দুটি অভিমত (রায়) হতে পারে। কিন্তু এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যের একটি ব্যীতত দ্বিতীয়টি হওয়ার সুযোগ নেই। আর তা হলো আমাদের সকলের হাকীম ও বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ। এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনাকে কেবল এমন ব্যক্তিরাই অস্বীকার করতে পারে, যারা আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। সেজন্য জাতীয় ইত্তেহাদের (ঐক্যের) প্রোগ্রামের পরিপূরক মার্কায এ ছাড়া অন্যটি হতে পারে না। এ কারণেই ইসলাম সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার একক সত্তাকে অন্তরসমূহের মার্কায

হিসেবে পেশ করেছে, যাতে সমস্ত অন্তর সবকিছু হতে পৃথক হয়ে এ কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে যে, তাওহীদই হলো সবচেয়ে বড় ইত্তেহাদের মার্কায।

বর্তমান সময়ের অনৈক্য মূলত তাওহীদে ইত্তেকাদী (একত্ববাদ বিশ্বাস) অথবা তাওহীদে আমলির দুর্বলতার কারণে সৃষ্টি হচ্ছে। আজ যদি সকল মানুষ সবকিছু থেকে বিমুখ হয়ে স্রেফ এক আল্লাহর জন্য নিজের মরণ ও জীবনকে নির্ধারণ করে নেয়, তাহলে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে এবং অন্যরাও তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। অন্যথায় যে পরিমাণ শিরক হবে, সেই পরিমাণ দ্বিধা ও সংশয় মানুষের মাঝে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কারণ, অন্তরের মার্কায এক থাকবে না। সেজন্য তার একক সত্তা, তাঁর একক কালাম (কুরআন) তাঁর একক কাবা, তাঁর এক রাসূলের দিকে সকল উম্মতকে আমলি (কার্যকরী), ইতেকাদী ও ইলমি দাওয়াত দেয়া হয়েছে, যাতে অন্তরসমূহের উপর তারপর তা থেকে বের হয়ে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে এক আল্লাহর হুকুমত কায়েম হয়ে যায়। অতএব সকল অন্তর ও দেমাগ এক সত্তার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া, হুকুমতে এলাহীর প্রথম পদক্ষেপ হবে, যা ছাড়া ইকামাতে হুকুমতে এলাহীর দাবি শুধুই মৌখিক দাবি হবে, যার কোন ভিত্তি নেই।

অতঃপর কানুনে ইলাহী তথা কুরআনুল কারীমের অনুসারী এবং আখলাকে ইলাহীর দ্বারা আখলাকী হয়ে সেই কানুনের উপর চলা এবং চালানো হুকুমতে এলাহীর দ্বিতীয় পদক্ষেপ। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশার কর্তৃত্ব এবং কানুনের ইলম না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হুকুমত অন্তরে সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হতে পারে না। আর তা জিন্দেগীর প্রতিটি শাখায় পথের মশাল হতে পারে না। তার পাশাপাশি ফের নিজেদের মামলা-মোকাদ্দমা ও ঝগড়া-বিবাদসমূহে তাকেই হাকেম বানানো হুকুমতে এলাহীর তৃতীয় পদক্ষেপ। এর শিকল ও বাস্তব নমুনা হলো প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় ইসলামি আদালত গড়ে তোলা। একজন গ্রহণযোগ্য সদনপ্রাপ্ত আলেম যিনি ইসলামি ফিকহে পারদর্শী তিনি আমাদের দৈনন্দিন ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করবেন। এমন ইসলামি ব্যবস্থার দ্বারা যখন আমরা মালিকুল মুলককে হাকেম নির্ধারণ করলাম, তখন অনুমেয় যে, এমন ফয়সালা কেমন মনঃতুষ্টি ও নিশ্চিন্ত হবে, কত সহজসাধ্য হবে। আর কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় এবং কোর্ট কাচারির দৌড়-ঝাঁপ হতে পবিত্র হবে? তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত সমাধা হবে না, সেগুলোর বিষয়ে সরকারের নিকট আদালতের দাবি করা যেতে পারে। আর এর জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এটি হলো হুকুমতে এলাহীর চতুর্থ পদক্ষেপ।

হুকুমতে এলাহী ও কানুনে এলাহী

আমাদের উপর কি ফরজ ও অবশ্য কর্তব্য নয় যে, যখন আমরা হুকুমতে এলাহীর দাবিদার, আমরা কানুনে ইলাহীকে যা হুকুমতে এলাহীর পরিপূর্ণ উৎসস্থল, নামাজ, রোজা, বিবাহ ও তালাক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখব না; বরং নিজেদের ঘরে-বাইরে ধন-সম্পদে মালিকানা এবং সামাজিক ও চারিত্রিক কার্যাবলিতেও এই পবিত্র কানুনকে জীবন চলার মশাল বানাব? আর এগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত রেওয়াজি ও প্রথাগত মূর্খতাসমূহে লিপ্ত থাকব না? হুকুমতে এলাহীর দাবিদার হওয়ার পরও যদি আমরা নিজেদের পক্ষ হতে মনের খায়েশ ও প্রথা-ফ্যাশনের অনুসরণ এবং শরয়ী কানুনের প্রতি উদাসীনতা বাকি রাখি, তাহলে কোন কারণ থাকতে পারে না যে, এহেন কাজকে আল্লাহর কানুন হতে বিদ্রোহ বলা হবে না?

সুতরাং এমতাবস্থায় যখন কোন জাতি-গোষ্ঠী নিজেদের বাদশাহর কানুন হতে প্রত্যাহৃত হয় এবং বিদ্রোহ করতে থাকে, তারা হুকুমতে এলাহীর শিরোনামের দাবিদার কোন মুখে করতে পারে? এই চারটি বিষয় হুকুমতে এলাহী প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ। এগুলোর মাধ্যমে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভবিষ্যতে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শনবলির আযমত পৃথিবীতে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক কথায় রহস্য থাকে আর প্রত্যেক রহস্য স্থানীয় হয়।

জীবনরীতির হেফাজত

'আযাদী' এই মূলনীতির (হুকুমতে এলাহী) আনুগত্যে এখন প্রশ্ন জাগে জীবন যাপনের। এবার এর জন্য সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ বস্তু হলো আযাদীর জযবা স্বাধীনতাপ্রিয়তা, যা অন্তরের রগ ও স্নায়ুতে রক্তের ন্যায় দৌড়াচ্ছে। কারণ, গোলামি ও পরাধীনতার জযবা অথবা এতে সন্তুষ্ট থাকার দ্বারা কোন চিন্তাধারা এবং মূলনীতিকে কাজে লাগানো যায় না। জযবায়ে আযাদীর পর স্বাধীন জীবন, স্বাধীন মন এবং আমলকে প্রতিটি প্রথাগত পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মুক্তকারী প্রোগ্রাম প্লান হলো ওই উসওয়ায়ে হাসানাহ (উত্তম আদর্শ) যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র এবং শৃঙ্খলিত জীবনের একটি শরয়ী শিরোনামে এই পবিত্র যিন্দেগী (জীবন) হুকুমতে এলাহীর কার্যকরী ও বাস্তব নমুনা এবং এক সত্তার গোলামী করে সবকিছু থেকে স্বাধীনতা অর্জন করার বরং সবার মনিব ও মালিক হওয়ার একটি পরিপূর্ণ নকশা। পুরোপুরি স্বাধীনতা হতে

লুকায়িত রয়েছে। স্বাধীন মনের প্রথম ধাপ যে কালবের ভিতর গাইরুল্লাহর কোন প্রকার ভয়-ভীতি এবং সামান্য সংশয় অবশিষ্ট থাকবে না।

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا•

সেই নবীরা আল্লাহর পয়গাম প্রচার করত, তাঁকে ভয় করত। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করত না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। *[সূরা আল আহযাব : ৩৯]*

অতঃপর সত্য বলা এবং সত্যের উপর চলার প্রকাশ করার ব্যাপারে কারো ভর্ৎসনার সংশয় বাকি থাকবে না (তারা আল্লাহ ও হকের দুশমনদের সামান্যতম ভয় অনুভব করতেন না)।

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর আর পরস্পর সহানুভূতিশীল।

অতএব সেলায়ে রেহমী (সুসম্পর্ক) তাআবুনে বাহামী (পারস্পরিক সহযোগিতা) ইছার ও মুরুওয়াত (অপরকে প্রাধান্য দেয়া ও মানবতা প্রদর্শন) হামদর্দী ও মহব্বত, দরিদ্র ও গরিবদের সাহায্য, তাহিয়্যাহ ও সালাম (অভিবাদন ও সালাম), বড়দের সম্মান প্রদর্শন, আলেমদের প্রতি লজ্জা দেখানো, আল্লাহওয়ালা রাব্বানীদের তাযীম করা, মেহমানদারি, রোগীদের সেবা-চিকিৎসা, ছোটদের স্নেহ করা, ইবাদাতে ইলাহী (আল্লাহর দাসত্ব), সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন, প্রতিবেশীর খোঁজখবর, এতিম-মিসকীনদের সাহায্য, জানাযায় অংশগ্রহণ, মজলুমদের প্রতি ন্যায় বিচার দেখানো, জালেমদের নির্মূল করা, অধিকার আদায়, জুলুম প্রতিরোধ, সরলতা অবলম্বন, কানাআত ও যুহদ (অল্পেতুষ্টি ও সংযম), আখেরাতের ভালবাসা, সত্য অন্বেষণ, ইনসাফ ও হকপূজা, উম্মাতে মুহাম্মাদীর ঐক্যবদ্ধ স্বার্থের পুরোপুরি হেফাজত ইত্যাদি অধ্যায়গুলো হলো উসওয়ায়ে হাসানা এবং পবিত্র জীবনের মোটামুটি বড় শিরোনাম, যার ফল হলো আযাদী ও তানযীম বা শৃঙ্খলা।

এই উসওয়ায়ে হাসানার বৈশিষ্ট্য এমন যে, এর দ্বারা জাতীয় মর্যাদা ব্যক্তিগত ও দলগত বিচ্ছিন্নতা হতে রক্ষা পায় এবং গোলামী ও দাসত্ব দূরীভূত হয়। আর ধর্মীয় স্বাধীনতা, মনের স্বকীয়তা এবং আমল ও ইলমের স্বাধীনতা অর্জন হয়।

উসওয়ায়ে হাসানার আলেম যারা উলামায়ে উম্মত থেকে হয়ে থাকে, তাঁরা যদি জামাতবদ্ধ শক্তি দ্বারা উম্মতিকে শৃঙ্খলিত করতে চায়, তাহলে এই উসওয়ায়ে হাসানাকে সামনে রেখে অতি সহজে করতে পারে। এই আদর্শই পারে সত্যিকার শৃঙ্খলার নকশা পৃথিবীতে প্রকাশ করতে দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরতে। যদি এই জীবননীতির সাথে প্রাথমিক দুটি শিরোনাম ইশাআতে দ্বীনে ইলাহী এবং ইকামাতে হুকুমতে এলাহীর পেশকৃত দফাগুলোকে শামিল করে নেয়া হয়, তাহলে জাতি তেমনভাবে উন্নতি লাভ করতে পারবে, যেমনিভাবে প্রথম শতাব্দির মানুষগুলো লাভ করতে পেরেছিল।

প্রোগ্রামের এই অংশটি গঠন ও নির্মাণশীল যার সবটুকু শরয়ী রঙ্গে সাজানো। কিন্তু সময়ের সকল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান তা থেকে হতে পারে যদি তাকে সামনে রাখা হয় বা অনুসরণ করা হয়।

জাতীয় প্রতিরক্ষা

জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি পৃথক বিভাগ। এর দ্বারা আজও কাজ হচ্ছে। ১৯১৯ ঈসায়ী যখন থেকে খিলাফত আন্দোলন রাজনৈতিক শক্তি পরীক্ষা করা শুরু করেছে, আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিরক্ষা প্রেগ্রাম সংগঠিত হয়েছে এবং এগুলোতে প্রতিরক্ষা বিভাগ কাজে এসেছে। বিশেষ করে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম কোনকালেই উম্মতে মুসলিমার রাহনুমা হতে বিমুখ হয়নি। তার এক চতুর্থ শতাব্দির কর্মসূচি সবার সামনে সুস্পষ্ট।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পঁচিশ বছর

সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবতকাল এমন কোন আন্দোলন নেই, যাতে জমিয়তে উলামার মুজাহিদগণ অংশগ্রহণ করেননি। আর সর্বোপরি তারা কারা ছিলেন যারা ১৯২২ সালে খিলাফত আন্দোলনকে চট্টগ্রাম থেকে ইয়াগিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার করেছেন, যারা কংগ্রেসের সম্মেলনসমূহে আযাদীর আত্মা স্বাধীনতার মনোভাব ফুঁকে দিয়েছেন এবং সুদীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত কংগ্রেসকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, যারা সর্বপ্রথম ইসলামি অধিকারের সঠিক আওয়াজ বুলন্দ করেছেন, যারা শুদ্ধি আন্দোলনের সংঘটনের হাঙ্গামা, নেহরুর বেঈনসাফী এবং স্যার দাবেলের ইসলাম ধর্মে অন্যায় অনুপ্রবেশকে প্রতিরোধ করেছেন? তারা কী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ছিল না?

যেহেতু এটি একটি পৃথক দল ছিল, এর মূলনীতি ও চিন্তাধারা ভিন্ন ছিল, এর কর্মসূচি পৃথক ছিল, সেজন্য কংগ্রেস ও হুকুমতে উভয়ের কর্মসূচি ও চিন্তাধারাকে নিজেদের উসুল ও বিধান মোতাবেক যাচাই করে নিজেদের অভিমত প্রতিষ্ঠা করেছে। কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের আনুকূল্য বা প্রতিকূলতা, কারো অনুসরণ বা আনুগত্যের মাপকাঠিতে কখনো হয়নি বরং নিজেদের উসুলি মাপকাঠি দ্বারা হয়েছে। তারা যেমনভাবে কংগ্রেসের এমন সংবিধান মেনে নিতে প্রস্তুত থাকতো, যেগুলো শরয়ী উসুলের পুরোপুরি মোতাবেক হতো, তেমনিভাবে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের এমন সব উসুল মেনে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করতো, যেগুলো তাদের দৃষ্টিতে শরয়ী উসূলের বিপরীত না হতো। এমন উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবত সফলতার সাথে কাজ করেছে এবং এখনো সাধ্যএত কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে যখন তাদের কার্যাবলিকে দাফন করার ফিকির চলছে।

সুতরাং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নতুন কোন জমিয়ত নয়। এর গঠন-আকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু এর অবস্থান ও মূল উপাদান বর্তমান কালের সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন থেকে প্রাচীন।

ইতিহাসের আয়নায় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দু দিল্লীর লাল কিল্লার বিধ্বস্ত হওয়া পরিত্যক্ত ও জীর্ণ অট্টালিকায় একটি সবুজ শ্যামল সতেজ বৃক্ষের ন্যায়, যার ফুল ও ফলসমূহ দ্বারা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যাবলি এবং আযায়েমগুলোর আল্লাহর সাহায্যে নবহায়াত লাভ হয়। এ জামাতের প্রাথমিক বুযুর্গরা যাদের যুগ আধুনিক আকৃতি ও গঠনের পূর্বে ছিল তাঁরা বালাকোটের প্রান্তরে ইসলামবিরোধী শক্তির মোকাবেলা জিহাদের মাধ্যমে করেছেন এবং শাহাদাতের প্রথাগত কাহিনীকে জীবন দান করে অমর হওয়ার সনদ অর্জন করেছেন। তিনি এই জামাতের আকাবির ছিলেন, যিনি ১৮৫৭ সালের ভয়াবহ হাঙ্গামায় আপন হৃদয়োত্তাপে নিজেই দগ্ধ হয়েছেন, আসবাবপত্র ধ্বংস হয়েছে। তখন জেলের কষ্ট সহ্য করেছেন, যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে জেল নামক চিহ্ন ছিল না। এটি নিকট অতীতের ঐতিহাসিক অবস্থার উত্তরাধিকার। কারণ, বর্তমান ও অতীত আমাদের একই ধারার ইতিহাসের দু'টি শাখা। আমরা একটির কারণে অন্যটিকে উপেক্ষা করতে পারি না।

বুযুর্গানে দেওবন্দ

হাঙ্গামা ও গোলযোগপূর্ণ সময় এবং নিজেদের সম্পর্কহীনতার কষ্টসহিষ্ণু অনৈক্য ও বিরোধিতার ভিড়েও আমরা বালাকোটের ওই প্রান্তরকে ভুলতে পারি না, যেখানে ওয়ালী উল্লাহী বংশের চক্ষু ও চেরাগতুল্য কিছু জানবাজ ব্যক্তিত্ব শাহাদাতের চাদর পরিধান করে আরাম ও শান্তিতে শুয়ে আছেন। আর না আমরা ওই বিধ্বস্ত বস্তিকে ভুলতে পারি, যেখানে হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেমুল উলূম ওয়াল খায়রাত বানিয়ে দারুল দেওবন্দ ১৮৫৭ সনের ভয়াবহ দাঙ্গার সময় গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হওয়ার পর গোয়েন্দাদের নজর থেকে আত্মগোপন করেছিলেন। আমরা মুজাফফরনগরের কারাগারকেও ভুলে যেতে পারি না, যেখানে শামসুল উলূম হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী রহ. বন্দি ছিলেন। না আমরা শায়খুল হিন্দু মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু-এর ন্যায় মুজাহিদ ব্যক্তিত্বকে ভুলে যেতে পারি, যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ পাঁচ বছর কাল মাল্টার দ্বীপে বন্দিজীবন কাটিয়েছেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আধুনিক ধর্মীয় রাজনীতির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, যা বর্তমানে জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দু নামে আপনাদের মাঝে উপস্থিত। যার আত্মা অনেক মৃত বা বিলুপ্তপ্রায় ও নির্জীব দলকে জাগ্রত করেছে।

১৯১৪ ঈসায়ীর মুজাহিদগণ

১৯১৪ সালের মুজাহিদীনরা ইলম ও আমলে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর বিশ্বস্ত গোপন রহস্য ছিলেন। হযরত মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব রহ. নিজেই আপনাদের সিন্ধু প্রদেশের পবিত্র স্মৃতিসৌধ। তাঁর চেহারা সেই যুগের ভয়াবহ মসিবতের সাক্ষী আপনাদের আরামপ্রিয় অন্তর শান্তির প্রকোষ্ঠে বসে ওই মসিবত অনুভব ও কল্পনা করতে পারবে না, যা তিনি আফগান সীমান্ত থেকে ইউরোপ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে যাত্রা করে কাবা গৃহের পাথরের উপর মাথা রেখে সহ্য করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমার সম্মানিত ভাই এবং হযরত শায়খুল হিন্দু রহ.-এর অতি প্রিয়তম শাগরেদ, মুজাহিদ মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া মানসুর আনসারী সাহেব আজও কাবুলে দেশান্তরের কষ্টদায়ক রাতগুলো অতিক্রম করছেন। তিনি হিজায, আফগানিস্তান এবং বুখারার ইনকিলাব স্বচক্ষে দেখেছেন। রাশিয়ার ইনকিলাব মস্কোতে পৌঁছে দেখেছেন। যখন তুর্কিস্তানে ইনকিলাব হচ্ছিল, তখন তিনি আঙ্কারার হেমন্তকালে পাতাঝরা বৃক্ষের নিচে অবস্থান করছিলেন। আমি বলতে পারি, হযরত শায়খুল হিন্দু রহ.-এর

সৈনিকদের মধ্য হতে স্রেফ একজন সৈনিকের একটি মুহূর্ত সমগ্র সিয়াসতের জবাব, যার কারণে অনেক রাজনৈতিক রাহমুনা আলেমের অস্তিত্বকে নিঃশেষ করে দেয়ার চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে।

আমীরুল হিন্দ মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.

হযরত শায়খুল হিন্দু রহ.-এর রাজনৈতিক সন্তান এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দায়িত্বশীল রাহবারদের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি রয়েছে। আপনারা আমিরুল হিন্দ মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.কেও তালাশ করছেন। আর আপনাদের মন-দিল তার সত্তার সঙ্গে লেগে আছে। তিনি বহুবার কারাভোগ করার পর আজও নৈনিতাল কারাগারে বসে আল্লাহ তায়ালার সুনিশ্চিত ভাগ্য তথা মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। তিনি বর্তমানে জমিয়তের প্রধান এবং মুসলিমদের স্বাধীনতা কাফেলার সিপাহসালার ও কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করছেন।

হযরত মাদানী রহ. এই মুহূর্তে হযরত শায়খুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.-এর সৃষ্টি করা জযবাসমুহের বিশ্বস্ত আমানতদার। আর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী রহ.-এর মুজায। হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী রহ.-এর খলিফা ও হযরত শায়খুল হিন্দু রহ.-এর জগদ্বিখ্যাত শাগরেদ ও জানেশীন। তাঁর ইচ্ছা ও কুরবানী সম্পর্কে কেউ বেখবর নন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার ব্যাপারে মতভেদ করা যেতে পারে; কিন্তু তার ইখলাস ও আত্মত্যাগের ব্যাপারে তাঁর দুশমনরাও অস্বীকার করতে পারে না।

হযরত মুফতিয়ে আযম রহ.

হযরত আল্লামা মুফতি কিফায়াতুল্লাহ সাহেব (দা. বা.) আমাদের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। তিনি রাজনৈতিক আধারসমূহের ইলম ও তদ্বিরের আলোক উজ্জ্বল মিনার, যাকে দেখে আমাদের হিম্মত বুলন্দ হয় এবং তাঁর পথনির্দেশিকা থেকে আমরা সময়ের রাজনৈতিক সমস্যাবলিতে পথ খুঁজে পাই। হযরতের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে জমিয়তে উলামার এক চতুর্থাংশ শতাব্দির ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিভিন্ন যুগ তাঁর খেদমতকে আড়াল করতে পারবে না।

জমিয়তে উলামার প্রথাগত ও অপ্রথাগত ইতিহাস এক শতাব্দির পূর্বে শুরু হয়েছিল, যার সূচনাকারী হলেন হযরাতুল ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে

দেহলভী রহ.। আর শেষ প্রান্তে দায়িত্বশীল হলেন যুগের পুত-পবিত্র উলামায়ে কেরাম। জমিয়তে উলামা ও এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দের জামাত সেই সময় থেমে আযাদীর জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ করে আসছেন, যখন থেকে মুসলমানদের আযাদী গোলামির রূপ ধারণ করেছিল। আর জমিয়তের খেদমতের ধরন প্রতিটি যুগের চাহিদা অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। বর্তমানকালে তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা সামরিক রঙের পরিবর্তে ইলমি ও আন্দোলনিরূপে আমাদের সামনে বিদ্যমান। এজন্য আমার নিকট আমার মতে সামগ্রিক প্রতিরক্ষার বিশদ বর্ণনা দেয়ার পরিবর্তে বেশি উত্তম ছিল জমিয়তে উলামার দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বিভিন্ন কারগুজারি তুলে ধরা এবং বিবদমান রচনাটিতে গঠনমূলক প্রোগ্রামকে অগ্রাধিকার দেয়া। আর এটিও জমিয়তের সামনে পেশ করার জন্য, যাতে জমিয়তের দায়িত্বশীলগণ তার উপর চিন্তা-গবেষণা করে উপযোগী অংশ নির্বাচন করতে পারেন। প্রোগ্রামের এই অংশটি গঠনমূলক। আর শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র রাজনৈতিক মাসায়েলের জন্য এতে পথনির্দেশ মিলতে পারে, যার নির্যাস হলো এই–

গঠনমূলক ও শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের সারসংক্ষেপ

ইশাআতে দ্বীনে ইলাহীর ধারাবাহিকতায় তালীমে খাস (বিশেষ শিক্ষা), দরসে কুরআন, তারীখে সাল্‌ফ পূর্বসূরীদের ইতিহাস, যুদ্ধবিদ্যা, যুগের রাজনৈতিক শিক্ষা, ইশাআতে ইসলামের পথ ও পদ্ধতি শিক্ষা, তাবলীগি মাসায়েল, যিকির ও ওয়াজ-নসিহতের মাসায়েল, আখলাক সাজানো এবং তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মশুদ্ধির মাসায়েল, ব্যক্তিগত তারবিয়্যাত দীক্ষা এবং আমরে বিল মারুফ ও নাহী আনীল মুনকারের শিক্ষা।

ইকামাতে হুকুমতে এলাহীর ধারাবাহিকতায় মূলনীতি ও চিন্তাধারা নির্ধারণ, আকিদা ও আমলগত তাওহীদ, কানুনে ইলাহীর বাস্তবায়ন, মামলা-মোকাদ্দমার জন্য শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা।

হেফাজতে নিযামে হায়াতের ধারাবাহিকতায় স্বাধীন তলবের উম্মাদনার সাথে সাথে উসওয়ায়ে হাসানার অনুসরণ, তাওহীদের সাধারণ শাখা-প্রশাখাগুলোর প্রচার ও প্রসার যার দ্বারা বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য দূর হবে ইত্যাদি বিষয়। আমি মনে করি, পরিশেষে সমগ্র মুসলমানদের উক্ত প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করতে হবে, তারা নিজেরা স্বেচ্ছায় না এলে যুগের চাহিদা টেনে নিয়ে আসবে। কিন্তু এগুলোর পরিচালনার শক্তি একমাত্র মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ এবং অংশীদারি কর্মশক্তি দ্বারা হতে পারে। আর একতা এ ছাড়া সম্ভব নয় যে, আমরা ইখতিরায়ী

(উদ্ভাবনাময়) এবং কিয়াসী প্রোগ্রাম পরিহার করে এমন কোন মূলনীতি ও চিন্তাধারার আঁচলকে আঁকড়ে ধরব, যা উদ্ভাবনাময় পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বিশ্বাসের অকাট্যতা নিয়ে আছে। আর সমগ্র পৃথিবীর সকল প্রোগ্রাম ও প্লানকে নিজের আয়ত্তে গুছিয়ে নিতে পারে।

এমন চিন্তাধারা একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত চিন্তাধারাই হতে পারে। কারণ, প্রতিটি মানবিক চিন্তাধারার মধ্যে অন্যান্য মানুষের চিন্তাধারা ভিড় করতে পারে। কিন্তু ইলাহী চিন্তাধারার অর্থ হলো এটি প্রতিটি মানুষের উর্ধ্বের বস্তু। সেজন্য সমস্ত মানুষ তাতে একত্রিত হতে পারে যে, এখানে নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার কোন প্রকার দখল নেই। ইসলাম নিজের চিন্তাধারা ও মূলনীতি আল্লাহপ্রদত্ত কানুন ও ইলাহী প্রোগ্রামকে স্থির করেছেন। ইসলাম সকল বুনিয়াদী (জন্মগত) ইজম উদাহরণস্বরূপ ন্যাশনালিজম, ফ্যাসিজন (পুঁজিবাদ), কমিউনিজম ইত্যাদিকে রদ করে শুধু এক ইজম অর্থাৎ খোদায়ী ইজম বা ইসলামিজমকে রেখেছে, যার প্লাটফর্মে সমগ্র পৃথিবীর সকল জাতি একত্র হতে পারবে। এ কারণে ইসলাম কওমিয়ত তথা জাতীয়তার ঘোষণা দেয়নি যে জাতি জাতি বরাবর; তাই এ নামে জাতি একত্রিত হতে পারে না। তেমনিভাবে বাশাহীয়তের (রাজতন্ত্রের) ঘোষণা দেয়নি যে মানুষ মানুষ সব বরাবর। ফের তাদের মধ্যে রাজা ও প্রজার পার্থক্য কিভাবে? যদি ঘোষণা করা হতো, তাহলে ওই শ্রেণী ও প্রজারা কিভাবে পরস্পর চলত? তাই ইসলাম অসীম শক্তির অধিকারী অর্থাৎ হুকুমতে এলাহীর ঘোষণা দিয়েছে, যার কানুন হলো ইসলাম এবং এই প্রোগ্রাম। সুতরাং মুসলমানদের ঐক্যের জন্য এর চেয়ে উত্তম মাধ্যম আর কী হতে পারে?

এজন্য মুসলমান যদি একনিষ্ঠ অন্তরে একত্র হতে চায়, তাহলে উক্ত শিরোনামগুলোর ছায়াতলে একত্র হোক এবং নিজেদের শক্তিসমূহকে সুবিন্যস্ত করে কিছু একটা করে দেখাক।

আর মুসলমানদের প্রতি দয়াপরবশ হোক এবং আবিষ্কৃত ও ঝগড়াটেপূর্ণ মূলনীতিকে প্রকাশ করে মুসলিম জাতিকে শতভাগে বিভক্ত না করুক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্লান-প্রোগ্রাম যতই যুক্তিসঙ্গত ও আন্তর্জাতিক মানের হোক না কেন তাকে পরিচালনার জন্য দল এবং এর পাশাপাশি প্লাটফর্মের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা তাকে কোন প্লাটফর্মে সোপর্দ করতে পারি। প্রকাশ থাকে যে, এই সম্পর্কে যদি দৃষ্টি দেয়া হয়, তাহলে দৃষ্টি পড়বে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রতি।

কংগ্রেস ও লীগ

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই বৃক্ষের দুটি শাখা। ইংরেজ ও বৃটিশরা কংগ্রেসের আবিষ্কারক। মধ্যমপন্থী হিন্দু ও মুসলিমরা তাকে সফলতায় পৌঁছিয়েছে। খিলাফতপ্রিয় মুসলিম ও স্বাধীনতাপ্রিয় হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ কর্মের ফলে তাতে ফল ও ফুল এসেছে। গান্ধীজির মস্তিষ্ক একে সন্দেহযুক্ত, অস্পষ্ট এবং অপরিচ্ছন্ন আযাদী ব্যতীত শুধু বর্শার আগা পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আর পরিশেষে একে পণ্ডিত মালবিয়া ও স্বামী শর্ধানন্দ উভয়ে তাতে বিভক্তির জাল ছড়িয়ে অন্ধকার সমুদ্রে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলে।

কংগ্রেসের গোড়াপত্তন

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা মূলত ১৮৫৭ সালের অকৃতকার্য ইনকিলাবের সফলকাম বদলা ছিল। বৃটিশ হুকুমত সর্বোচ্চ শক্তিশালী হতে চেয়েছিল। আর সেই উদ্দেশ্য লাল কিল্লার শাহী শক্তির স্থলে এমন একটি শক্তি দাঁড় করানো প্রয়োজন ছিল, যা হিন্দুস্তানবাসীর বৈপ্লবিক অনুরাগ ও ঝোঁকের রুখ চিন্তা চেতনাকে আইনী ও অফিসিয়াল আন্দোলনের দিকে ফিরিয়ে দিবে। এতে সঠিক ফলাফল লাভ হলো। চার কোটি জনসংখ্যার শ্বেতাঙ্গ চেহারার জাতি ইংরেজরা চল্লিশ কোটি জনসংখ্যাওয়ালা ভারতবাসীর উপর হুকুমদাতা বনে গেলেন। আর কংগ্রেস ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আইনী প্রক্রিয়ায় প্রস্তাব অনুমোদন করতে থাকে।

১৯১৬ সালে কংগ্রেস

১৯১৬ সালে কংগ্রেসের শিরা-উপশিরায় নতুন রক্ত প্রবেশ করে, চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয়। ১৯২০ সালে মুসলিম জাতি একে নিজেদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য স্থির করে এবং স্বাধীনতার তেজ ও উদ্যম প্রদান করে। মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে বৃটিশ ভূমির রাজনীতির পেট হতে জন্মলাভ করে। কংগ্রেসকে যদি বৃটিশদের মেয়ে (সন্তান) মনে করা হয়, তাহলে ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের মেয়ে এবং বৃটিশদের নাতিপুঁতি বলা অহেতুক হবে না। মুসলিম লীগ হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক মাপযন্ত্রের দ্বিতীয় পাল্লা ছিল। আর তা মুসলিম লীগের আবিষ্কারকের কামালতি (যোগ্যতা) ছিল যে তার উভয় পাল্লা অর্ধ শতাব্দি অতিবাহিত হওয়ার পর এবং শতবার পাসঙ্গ (যে বস্তু উভয় পাল্লা সমান করার জন্য ব্যবহার হয়) করার পরও বরাবর হয়নি।

১৯২০ সালের পর ভারত আযাদীর জন্য কংগ্রেস দল যে সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছে, তার রাজনৈতিক মূল্যায়ন ও সম্মান অবশ্যই স্বীকার করি। আর অপরদিকে মুসলিম আধুনিক যুগে মুসলমানদের অধিকার আদায়ে এবং শৃঙ্খলিত করার ক্ষেত্রে যে নাম-জশ সৃষ্টি করেছে, আমি তাও অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাকে প্রকাশ্যে বলতে হয় যে, উক্ত দুটি ঐতিহাসিক দলের মেহনতের নির্যাস ও মূল হলো এই যে, বৃটিশ ও আমেরিকা তার ফল ভোগ করছে আর হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানবাসী উভয়ে ফলের চামড়া-ছিলকা নিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যিকারের ফলের ফিকির কেউ করছে না।

একটি বাস্তবিক ধাঁধা

এটি কেমন আশ্চর্যজনক কথা যে, এক দিকে হিন্দুস্তানি সৈন্যবাহিনী বৃটিশ পতাকাতলে দীর্ঘ এক শতাব্দি ধরে তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুনিয়াজুড়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আর অপর দিকে হিন্দুস্তানী জাতি স্বাধীনতার ময়দানে পরস্পর বন্ধু ও অন্তরঙ্গ দুস্ত। অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে ওই জাতি একতা প্রদর্শন করছে, যারা জাতীয়তার ময়দানে পরস্পর যুদ্ধ করছে।

এতে এ কথা অনুমান করা কোন মুশকিল নয় যে, এই ভিন্ন উপাদানের জাতির মাঝে সমতা ও একতা সৃষ্টি অসম্ভব নয়; কিন্তু তারপরও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে এই সম্ভব যদি অসম্ভব হয়, তাহলে তার অর্থ হবে এমন যে, হিন্দুস্তান এমন একটি বৃক্ষ, যার শাখাগুলো বিভিন্ন বাতাসের কারণে নিজে নিজে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত। অন্যদের জন্য নিজের ফল উজাড় করে দিচ্ছে আর স্বয়ং নিজে ফল ভোগ করতে পারছে না। অথবা হিন্দুস্তানী রাজনীতি এমন একটি দোলনা, যার একপার্শ্বে হিন্দু সম্প্রদায় অপরপার্শ্বে মুসলিম সম্প্রদায়, আর সেই দোলনা বৃটিশদের স্বার্থে দুলতে থাকে। কিন্তু যখন ভারতবর্ষের স্বাধীতার সময় আসে, তখন তা থেমে যায়। তার একপাশে হিন্দু দেখা যায় অপরপাশে মুসলিম দেখা যায়। আজ সেই দোলনা পাকিস্তানের উপর এসে থেমে গেছে।

পাকিস্তান ইস্যু

পাকিস্তান একটি চিন্তাধারা, একটি রাজনৈতিক কল্পনা এবং একটি স্কীমমাত্র। কোন ইলহামী বিষয় নয়। পৃথিবীতে যখন কোন স্কীমের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তখন কখনো তাকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়, কখনো বাতিল ও নাকচ করা হয়। নিঃসন্দেহে পাকিস্তান বিষয়টি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিশেষে একটি

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত এটি শুধু কল্পনা ও স্বপ্ন ছিল। আজ তা বাস্তব এবং আকিদা ও চিন্তাধারায় পরিণত হয়েছে। মুসলিম লীগের অনেক সদস্য একে ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে নিজের অন্তরে গেঁথে নিয়েছেন। তাদের নিষ্ঠা একনিষ্ঠতা সর্বাবস্থায় সম্মানযোগ্য। কিন্তু আমি একজন তালীমি খাদেম হিসেবে একথা বলতে দ্বিধা করি না যে, অন্তত আমার জন্য পাকিস্তান একটি অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন কল্পনা। বর্তমান সময়ে তার বিরোধিতা করা এবং পক্ষাবলম্বন করা উভয়টিই খতরনাক।

তারপরও আমি পাকিস্তানকে বৈধতা দানকারীদের বলব, অস্পষ্ট পাকিস্তান বিষয়কে কষ্ট করে সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন করে এর সকল দফাগুলোকে প্রকাশ করুন। তারপর সেগুলো শুধু নিজেদের বোধগম্যের উপর যথেষ্ট করবেন না, বরং মুসলমানদের সকল দায়িত্বশীল জামাতের বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে, পৃথক একটি মুসলিম কনভেনশন ডেকে সেই দফাগুলোতে চিন্তা-ফিকির ও আলোচনা-পর্যালোচনা করার জন্য পেশ করুন, যাতে যে সকল মুসলমান হিন্দুস্তানের উন্নতি ও সফলতার জন্য ভিন্ন চিন্তাধারা লালন করেন, তারাও তা বুঝতে পারেন এবং প্রশান্তি লাভ করে তার জন্য কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

পাকিস্তানের বিরোধীরা

অপরদিকে পাকিস্তান বিরোধীদের বলবো, যখন মি. আয়মারী ও লর্ড হালিফক্স ও মি. চর্চিল সবাই হিন্দুস্তানের নিন্দা করছে আর লর্ড আরুন তো প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছেন যে, আযাদী ও স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হলো হিন্দুস্তানের অনৈক্য ও মতভেদ। যতক্ষণ তামাম হিন্দুস্তানি ঐক্যবদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা হিন্দুস্তান ছাড়তে রাজি নই। এহেন পরিস্থিতিতে যদি বাস্তবে একতার মূল্যবান খাজনা যা দ্বারা আমরা স্বাধীনতার অমূল্য সওদা অর্জন করতে পারি, যা পাকিস্তান দাবিকে মেনে নিলে পেতে পারি, তাহলে কোন প্রকার খটকা ও সংশয় ছাড়াই আমাদের উক্ত শিরোনামকে গ্রহণ করা উচিত। বাস্তবে এই চিন্তাধারার মধ্যে পা বাড়ানোর যোগ্যতা থাকলে পা বাড়ানো উচিৎ। আর এভাবে চলতে দেখলে মাননেওয়ালাদের কোন প্রকার লজ্জায় পড়া লাগবে না।

আর যদি তা শুধু শব্দই শব্দ থেকে যায়, যার মধ্যে অর্থ নেই, তার মধ্যে আগে বাড়ার কোন শক্তি সামর্থ্য না থাকে, তাহলে তা নিজেই নেমে যাবে। আপনাদের মেনে নেয়ার দ্বারা তার কোন শক্তি কায়েম হবে না। যতক্ষণ না তাতে নিজেস্ব কোন বুনিয়াদী মজবুতি ও দৃঢ়তা থাকবে। অথবা তার কোন বিশদ ব্যাখ্যা

প্রকাশ করা, যাতে ঐক্যবদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির কষ্টিপাথর দ্বারা তা যাচাই বাছাই করা যায় অথবা তার অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও তার কোন প্রকাশ্য অর্থের উপর ভরসা করে, ওই মতানৈক্যের সমুদ্রকে বন্ধ করা যায়, যাতে মঞ্জিলে মাকসুদ পরিষ্কার হয়, প্রকাশ পায় এবং তার হাকিকতকে নিজে প্রকাশ করা ব্যতীত তারই উপর ছেড়ে দেয়া যে, তা নিজে নিজে প্রকাশ পেয়ে দুনিয়াবাসীর সম্মুখে চলে আসে অথবা তাদের পায়ে পিষ্ট হয়ে যায়। শুধু একটি অস্পষ্ট শব্দের উপর বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে আগে বাড়ার উন্নতির রাস্তা বন্দ করে দেয়া, শুধু মানা না মানার জিদ ও বৈরিতার কারণে এহেন কাজকে অপবিত্রকরণ শিরোনাম ব্যতীত আর কোন শিরোনামে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

তারপরও বলব, উক্ত উভয় সুরতে যিম্মাদারি পাকিস্তান বৈধতা দানকারীদের উপর আরোপিত হবে। কেননা, যদি পাকিস্তানকে উক্ত অস্পষ্টতার সাথে শুধু পাকিস্তানের খাতিরে বা বৃহৎ ঐক্যের খাতিরে মেনে হয়, তাহলে এ কথা সুস্পষ্ট যে, ভবিষ্যতে তার লাভ ও ক্ষতির তারাই যিম্মাদার হবে, তাদের উপর বর্তাবে, যারা তাকে প্রকাশ করতে চায়নি। আর যদি তাকে অস্পষ্টতার কারণে রদ ও প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে উক্ত রদ গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত হওয়ার পরও যিম্মাদারী তাদের উপর পড়বে, যারা তাকে সুস্পষ্ট করতে চায়নি এবং তাকে খোলা বাজারে প্রকাশ্যে রাখতে চায়নি যে, লোকেরা তার ভাল-মন্দ দিকগুলো যাচাই করে দেখবে। তবে যদি সকল মুসলমান দলগতভাবে একতার সঙ্গে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে দলগত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে অবশ্যই যিম্মাদারী ভাগ হবে। ফলে অপবাদ ও অভিযোগ একা পাকিস্তান বৈধতা দানকারীদের উপর আরোপিত হবে না। এমতাবস্থায় পাকিস্তান বৈধতা দানকারীদের তার কারণ প্রকাশ করা অথবা অস্পষ্ট রাখা ব্যাপারে অতিরিক্ত চিন্তা-ফিকির ও গবেষণা করা প্রয়োজন। তবে মাতৃভূমির স্বাধীনতার আসল উদ্দেশ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে।

কিন্তু মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস যদি পাকিস্তান ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ হয়েও যায়, তাহলে জাতির ইসলামি প্রাসাদ এবং ধর্মীয় রাজনীতির পূর্ণতা ইস্যু তারপরও সমাধা হবে না। আর ওই প্রোগ্রাম যাকে গঠনমূলকভাবে পেশ করছি, তাও নিয়মমাফিক পূর্ণতা মুখাপেক্ষী রয়ে যাবে। যার মধ্যে পাকিস্তান মেনে নেয়া এবং না নেয়া কোন অবস্থায় প্রভাব পড়বে না। অথবা অন্য শব্দে বলা যায় যে, সত্যিকারের আযাদী ও সঠিক অর্থে মুসলিম জাতির স্বাধীনতার উজ্জ্বল মনোভাব তারপরও চালু থাকবে, যা পাকিস্তানি আয়না দ্বারা দেখা যাবে না।

জামাত ও জামাতি প্লাটফর্ম

সেজন্য অনিবার্যভাবে এই শরয়ী বিনির্মাণমূলক প্রোগ্রামের পূর্ণতার জন্য জামাত ও জামাতগত প্লাটফর্মের প্রশ্ন তারপরও বাকি থাকে। প্রকাশ থাকে যে, এর পূর্ণতা ওই জামাতই করতে পারে, যে জামাত সর্বদা মুসলিম জাতির ইসলামি নির্মাণ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে জামাত এই মুহূর্তে পূর্ণ স্বাধীনতাকে মুসলমানদের শরয়ী ও ধর্মীয় অধিকার আখ্যা দিয়ে কার্যকরী পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছে, যখন দেশের অন্যান্য জামাত স্রেফ প্রথাগত ও রাজনীতিগতভাবে আযাদীর কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে। আর যে জামাত ভারতবর্ষের মুসলিম জনসাধারণকে ধর্মীয়ভাবে এজন্য উৎসাহিত করছে যে, দেশ স্বাধীনের নেয়ামত যদি আজ সামরিক জিহাদ দ্বারা অর্জন করা না হতো, তাহলে রাজনৈতিক জিহাদ দ্বারা অর্জন করা যেতো। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত জামাত শুধু জমিয়তে উলামা ভিন্ন আর কোন জামাত হতে পারে, যারা এই মাকসাদের শরয়ী সমাধানের হকদার? কারণ, অভিজ্ঞতা ও কাজের ধারাবাহিকতা এই জামাতে আছে। আর এজন্যও যে, মুসলমানদের প্রতিটি প্রোগ্রাম কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে নেয়া হয় না। আর কিতাব ও সুন্নতের সহীহ ইলমের জন্য এই জামাতকে আল্লাহর পক্ষ হতে তাওফীক দেয়া হয়েছে। এ কারণে আমি আমার এ সামান্য মূলধনকে এই পবিত্র জামাতের সামনে কল্যাণার্থে পেশ করছি যে, তারা একে ভালরূপে যাচাই বাছাই করে উপযোগী মনে করবে এবং বর্ণণাকৃত ইসলাহী উসুল ও ইসলাহী প্রোগ্রামের ওপর মুসলমানদের উন্নয়নের খেদমত আরম্ভ করে দিবে। আর সঠিক অর্থে এই জামাতই মুসলমানদের দীনি ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান করতে সক্ষম। এই জামাত এখন পর্যন্ত যেভাবে জাতীয় প্রতিরক্ষার মূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে, যেগুলোকে ইতিহাসের পাতা থেকে কখনো মিটানো যাবে না, তেমনিভাবে আজ সময় ও কল্যাণে এই উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ধারা ছেড়ে দিয়ে নিজের পুরাতন নেতৃত্বের জযবাকে কাজে লাগাচ্ছে।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মূল্যায়ন

প্রথমে উলামায়ে হকের তানযীম খালিস কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর উসুল মোতাবেক হওয়া প্রয়োজন। অতঃপর সেই তানযীমের অধীনে উল্লিখিত উসুলের উপর জনসাধারণের তানযীম করা। নিঃসন্দেহে এমন তানযীমের মধ্যে দাবি হতে প্রতিবন্ধক বেশি। কিন্তু যখন এমন তানযীমের জন্য জামাতের উদ্যম সর্বদা প্রতিবন্ধকতার ভিড়ের মধ্যে কাজ করেছে এবং পরিশেষে মুখলিস সদস্যদের

লিল্লাহিয়্যাত ও নিঃস্বার্থতার প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। অতএব কোন কারণ থাকতে পারে না যে, আজকের প্রতিবন্ধকতাকে সামনে রেখে আমরা এই পবিত্র জাতির পূর্ব ইতিহাস ভুলে যাবো। এই পয়গাম আমি এমন একটি প্রদেশে দিচ্ছি, যা হিন্দুস্তানে ইসলামের সর্বপ্রথম বাগান। আর হিন্দের ইসলামের পরিপূর্ণ ও কামেল দৌলত সিন্ধুর বদৌলতে নসীব হয়েছিল। এখান থেকে হিন্দুস্তানি মুসলিমদের ইসলামি রাজনীতি সংস্কার এই প্রদেশ থেকে হোক এবং এখান থেকে ইসলামের উন্নয়নের প্রোগ্রাম ফলদায়ক হোক আল্লাহর নিকট তা সহজসাধ্য। পরিশেষে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, জমিয়তে উলামা সিন্ধু শাখার সম্মানিত সদস্যদের তারা আমার এত নাচিজ ব্যক্তিকে সুযোগ করে দিয়েছেন ছাত্রসুলভ কিছু কথা বলার জন্য। অন্যথায় কোথায় আমি এবং কোথায় উম্মতের চিকিৎসার ইলমি ময়দান। এটি তাদের অনুগ্রহমাত্র যে তাদের সুপ্রশস্ত পাত্র থেকে সামান্য দান এই উঁচু চূড়া দেখতে পারছি।

আল্লাহ তায়ালা এই পবিত্র জামাতকে তার শরয়ী উদ্দেশ্যগুলোকে কামিয়াব করুন এবং আমাদের সকলকে ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুক। আর আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা ও তার খারাপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে হেফাজত করুন–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ • اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ۭ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ •

অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। মনে রেখো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে তা আল্লাহর। তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাজে ফিরে যাবে, সেদিন তিনি বলে দেবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ই জানেন। *[সূরা আন নূর : ৬৩-৬৪]*

মুহাম্মদ তৈয়ব গুফিরা লাহু
মোহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ
১৫ই এপ্রিল ১৯৪৪ ঈসায়ী

বয়ান : ৫

মুসলিম পার্সোনাল ল'

আজ সবাই যদি এ কথার উপর ঐক্যবদ্ধ হই যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা ইসলামি মুআশারাত তথা সমাজব্যবস্থাকে নিজেদের মাঝে কায়েম করব আর সকলে মিলে যদি আমল করা শুরু করি, তাহলে স্বয়ং আমলের মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যে, অন্যদের আমলের চাক্কা আপনা আপনি চলতে শুরু করবে– যবান দ্বারা দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকবে না। আমার-আপনার কাজ হলো প্রথমে আমল আমদানি করা, ফের আমলের ঘোষণা করা। অতঃপর এ কথা পূর্ণরূপে জানিয়ে দেওয়া যে, এই কানুন ও বিধানের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না। আর আমরা সামান্য সময়ের জন্য একথা পছন্দ করবো না যে, আমাদের জান-প্রাণ চলে যেতে পারে; কিন্তু এতে সামান্য আঁচ লাগবে তা আমরা মেনে নেব না।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا

স্থানের সৌন্দর্য

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আপনাদের এ আজিমুশ্বান শহরটি যা আপন সৌন্দর্য ও সৌকর্য, সুপ্রশস্ত প্রান্তর, আরামদায়ক আবহাওয়া এবং সুন্দর দৃশ্যের অনুপাতে হিন্দুস্তানের অন্যান্য শহর হতে একটি বিশেষ শহর। কুদরতিভাবে তার প্রতি অন্তর ও তবিয়ত ঝুঁকে পড়ে। পণ্ডিত জাওহার লাল নেহরু একদা বলেছিলেন, যদি আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অবসর হই, তাহলে 'বাঙ্গালোর' গিয়ে বসবাস করব। হিন্দুস্তানে এর চেয়ে উত্তম দ্বিতীয় কোন শহর নেই। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি একটি ভিন্নধর্মী শহর।

জিহাদ ও শাহাদাতের মার্কায

সুলতান টিপুর এই মাতৃভূমি তাঁর জিহাদী কর্মকাণ্ডের মাকার্য। তিনি এখানে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। একথা সুস্পষ্ট যে একজন সুলতানের শাহাদাত শুধু একজনের শাহাদাত নয়। জানা নেই তারা কতজন মানুষকে শাহাদাতের অমীয় শুধু পান করিয়েছে এবং কত লোক এখানে শহীদ হয়েছেন। আপনারা ওই শহীদগণের সন্তান। এমনটি সম্ভব নয় যে, তাদের জযবা আপনাদের মাঝে নেই।

এই উদ্যম, এই জিহাদী জযবা, এই শাহাদাতের অভিরুচি পৈতৃক সম্পদ, যা আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান। চাই আপনাদের অনুভূতি না হোক, কিন্তু = পিতার জযবা কুদরতিভাবে সন্তানের মাঝে স্থানান্তরিত হয়। অতএব আপন সত্তাগতভাবে এই ভূমি জোশ, জযবা ও দীনি উদ্যম বহন করে।

মেহমানদের কদর

এর পাশাপাশি আমরা যে বিষয়টি দেখতে পেয়েছি, তাহলো আপনাদের চারিত্রিক সুপ্রশস্ততা। আমরা উপস্থিত হয়েছি। বাস্তবে এখানকার মানুষ মেহমানদের সেবাযত্নে, আতিথ্যে, সম্মান প্রদর্শনে এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনে যে জযবা ও আগ্রহ প্রদর্শন করেছে, তা এক প্রকার বিশেষ জযবা। যেমনটি হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তার উচিত মেহমানদের সম্মান করা।

এই নববী শিক্ষার কারণে আপনারা সর্বোচ্চ আতিথিয়েতা প্রদর্শন করছেন। আনন্দ অনুভূতির সঙ্গে এবং সুন্দর শৃঙ্খলার সঙ্গে মেহমানদের উপস্থিতি তার প্রমাণ। এমনটি সম্মান প্রদর্শনের বিশেষ একটি পদ্ধতি।

এখানে তার চেয়ে বড় ও মহান উৎসাহের কথা হলো, আপনারা আগত ব্যক্তিদের শুকরিয়াও জ্ঞাপন করছেন শুধু লোক দেখানোভাবে নয় বরং আন্তরিক জযবার সাথে। হযরত মাওলানা আবু আস সৌদ সাহেব যিনি অভ্যর্থনার প্রধান, তিনি তার স্বাগত ভাষণে আপনাদের পক্ষ থেকে এবং নিজের পক্ষ থেকে ভরণপোষণের শব্দাবলি দ্বারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। অতএব আশ্চর্য বিষয় হলো, আর্থিক কুরবানি আপনারা দিয়েছেন, শারীরিক মেহনত আপনারা

করেছেন, মেহমানদের সর্বোচ্চ আরাম আপনারা দিয়েছেন, তারপরও আপনারা শুকরিয়া জ্ঞাপন করছেন। এমনটি সর্বোচ্চ মহানুভবতা ও সম্মান প্রদর্শন যে, মানুষ সবকিছু করবে, তারপর বলবে আমি কিছুই করিনি। আমাদের এলাকায় একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে– "মেঘ তাকেই বলে যা বর্ষে এবং উষ্ণ করে।" অর্থাৎ বর্ষে গরম করে যে, সে দ্বিতীয়বার বর্ষিত হতে প্রস্তুত। তার জযবা এমন যে আমি মাখলুককে পানি দেবো এবং সাথে সাথে জীবনও দেবো। প্রবাদের দ্বিতীয় অংশ হলো দানশীল ওই ব্যক্তি যে দান করে এবং লজ্জা করে। অতএব আপনারা সবকিছু দিচ্ছেন এবং লজ্জাও পাচ্ছেন। আর অনুতাপ ও লজ্জাও প্রকাশ করছেন। এই কাজ তো আমাদের ছিল যে, আমরা আপনাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করব। কিন্তু আমাদের দায়িত্বও আপনারা আদায় করে দিচ্ছেন। এখন আমরা ভাবছি, কি আদায় করব। আর যদি আদায় করি, তাহলে বাস্তবতা হলো এই যে, আপনারা যেমনভাবে পরিপূরক পদ্ধতিতে অতিথেয়তা করেছেন, মাহফিলকে সফলকাম করেছেন। আমাদের নিকট এমন পরিপূরক ও সমন্বয়কারী শব্দ নেই যা আপনাদের শুকরিয়াকে পরিবেষ্টন করতে পারবে।

হযরত দাউদ আ.-এর শুকরিয়া পদ্ধতি

যখন পুরস্কার ও নেয়ামত হয় সীমাহীন আর শুকরিয়ার শব্দ হয় সীমাবদ্ধ, তখন শুকরিয়া জ্ঞাপনের পদ্ধতি কেমন হবে। এমন পরিস্থিতিতে স্বয়ং শরীয়ত আমাদের বাতলে দিয়েছে, সীমাহীন নিয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করবে। একটি পদ্ধতি তো হযরত দাউদ আ. বাতলে দিয়েছেন যখন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করলেন–

اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا

হে দাউদ! আমার নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন কর।

ঘটনা এমন যে, আল্লাহর কালামকে নবীদের তুলনায় বেশি কেউ বুঝতে সক্ষম হয় না। আল্লাহর হাকিকত অনুধাবনের যে শক্তি-সক্ষমতা নবীদের দেয়া হয়, তা অন্য কাউকে দেয়া হয় না। বরং যত কথা ও বিষয় প্রকাশ পায়, তা তাদের জুতা মুবারকের বরকতে আসে। তাদের দানের বরকতে আসে। তো হযরত দাউদ আ.কে আদেশ করা হলো, আমার শুকরিয়া জ্ঞাপন কর। তিনি আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! তোমার শুকরিয়া কিভাবে জ্ঞাপন করবো তা বুঝতে পারছি না। কারণ, যখন শুকরিয়া আদায় করতে বসব, তখন এই শুকরিয়া আদায়ের

তাওফীক তো তুমিই দিবে। তাহলেই তো শুকরিয়া আদায় করতে পারব। শুকরিয়া জ্ঞাপনের শক্তিও তো তুমিই দিবে।

অতএব এই তাওফীক দেয়া, শক্তি দেয়া, স্বয়ংসম্পূর্ণ আরেকটি ভিন্ন নেয়ামত হয়ে গেল। ফের তার শুকরিয়া আদায় করব এবং এর শুকরিয়া যখন আদায় করব তখন তার তাওফীকও তো তুমিই দিবে। তাহলে পুনরায় আরেকটি নিয়মত বের হয়ে এলো, আর আমি পুনরায় শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। এভাবে প্রত্যেক নিয়ামতের শুকরিয়ার পূর্বে একটি শুকরিয়া বের হয়। সুতরাং আমি শুকরিয়া শুরু করতে অপারগ যে, কিভাবে শুকরিয়া শুরু করব এবং কিভাবে আদায় করব। প্রত্যেক শোকরের পূর্বে আরেক শোকর। অতএব, শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে আমি অপারগ।

আল্লাহ তায়ালা বললেন–

> হে দাউদ! যখন তুমি নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নিলে এবং তুমি শুকরিয়া প্রকাশে অক্ষম। সুতরাং এমনটিই আমার শুকরিয়া আদায়। কে আছে শুকরিয়ার হক পুরা করতে পারে।

নেয়ামত সীমাহীন আর আমাদের শুকরিয়া সীমাবদ্ধ, শক্তি আমাদের সীমিত। অতএব আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, আল্লাহ তায়ালার পুরোপুরি শুকরিয়া জ্ঞাপন করা এজন্য সুরত একটাই যে আমরা নিজেদের অক্ষমতা, অপারগতা প্রকাশ করব এবং নিজেদের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করব যে, ভাই! আমরা শুকরিয়া আদায় করতে পারব না। তা হলে এটিই শুকরিয়া আদায় হবে। এটি হলো হযরত দাউদ আ.-এর তরীকা যা তিনি ইরশাদ করেছেন যে, যখন অনেক শুকরিয়া আবশ্যক হয় এবং আদায় করতে অক্ষম হয়, তখন স্বীকার করে নাও, ভাই আমি অক্ষম। শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে জানি না, তাহলে এটিই শুকরিয়ার স্থলাভিষিক্ত হবে।

নবী করীম সা.-এর পদ্ধতি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একটি পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, নেয়ামত যদি অপরিসীম হয়, তাহলে তুমিও অপরিসীম শুকরিয়া আদায় কর। কিন্তু মানুষ পরিসীম, সে অপরিসীম শুকরিয়া আদায় করতে পারে না। তিনি এমন শব্দাবলি বাতলে দিয়েছেন যে, ওই শব্দ শুকরিয়াকে সীমাহীন ও অপরীসিম বানিয়ে দিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম যখন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা এবং শোকর করতেন, তখন এভাবে করতেন যে–

اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك

হে আল্লাহ! তোমার জন্য হামদ ও দায়েমী হামদ, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি দায়েম থাকবে।

আর তোমার দাওয়াতের (স্থায়িত্ব) কোন সীমা-পরিসীমা নেই তো আমার হামদেরও কোন পরিসীমা নেই। তিনি আরো বলেন–

ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك

আর তোমার জন্য হামদ, যতক্ষণ তুমি থাকবে, আর তুমি সর্বদা থাকবে।

অতএব আমার হামদ ও তোমার সাথে সর্বদা থাকবে। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন–

ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك

এবং তোমার জন্য হামদ, এমন হামদ, যা তোমার ইচ্ছার সাথে সাথে চলবে। তোমার ইচ্ছার কোন সীমা-পরিসীমা নেই, আমার হামদেরও কোন সীমা পরিসীমা নেই।

সুতরাং মানুষ যখন পরিপূর্ণ হামদ ও এবং পুরোপুরি শুকরিয়া জ্ঞাপন না করতে পারবে, তখন অক্ষমতা স্বীকার করার পর এ কথাও বলেছি যে, এই হামদ দাওয়ামি। তাহলে আল্লাহ তায়ালা ওই শব্দগুলোকে দাওয়ামি বানিয়ে দিবেন আর শোকর ও দাওয়ামি (স্থায়ী) বনে যাবে।

শুকরিয়া জ্ঞাপন

এ কারণে যদি আমরা আপনাদের মেহমানদারী, যোগ্যতা ও সৌন্দর্য এবং মাহফিলকে সফলকাম করার জন্য শুকরিয়া আদায় করি, তাহলে হযরত দাউদ আ.-এর সুন্নাত হিসেবে প্রথমে এ কথা পেশ করব যে, আমরা আপনাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে অক্ষম। আরো বলব, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা থাকবেন, আপনাদের সন্তানরা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শুকরিয়া আপনাদের সঙ্গে থাকবে। তাহলে এই শুকরিয়া দায়েমী হয়ে যাবে। আপনাদের পক্ষ থেকে

অক্ষমতা প্রকাশ হলো এবং দায়েমি শুকরিয়াও আদায় হলো। ইনশাআল্লাহ সর্বদা আপনাদের সাথে থাকব।

পার্সোনাল ল'-এর অর্থ

এই আজিমুশ্বান শহর, যার মাঝে জাহেরী ও বাতেনী বৈশিষ্ট্যাবলি রয়েছে, যার বাসিন্দাদের মধ্যে চারিত্রিক উচ্চতা রয়েছে, যারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী। এই আজিমুশ্বান সামিয়ানার নিচে এই আজিমুশ্বান জলসা অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে, যার আলোচ্য বিষয় হলো 'মুসলিম পার্সোনাল ল'। এই সম্মেলন ভারতবাসী মুসলিমদের পার্সোনাল ল'-এর সম্মেলন। আমি আপনাদের বড়দের থেকে জিজ্ঞেস করেছি, পার্সোনাল শব্দের মূল অর্থ কী? কারণ, শব্দটি ইংরেজি ভাষার। আমি ইংরেজি ভাষা ভালরূপে অবগত নই। অতএব আমি পার্সোনাল শব্দটির অনুসন্ধান করেছি এবং বুঝতে পেরেছি, বিশেষ কানুন যা কোন জাতি-গোষ্ঠীর সাথে বিশেষিত তাকেই পার্সোনাল ল' বলে। কিন্তু বলা হয়ে থাকে, পার্সোনাল অর্থ জাতি অর্থাৎ মুসলমানদের জাতি কানুন, মুসলমানদের ব্যক্তিগত কানুন। তাদের ব্যক্তিগত অবস্থার উপর ধর্মীয় হিদায়েতের উপর বুনিয়াদকৃত কানুন। এতে জাতি কানুন অন্তর্ভুক্ত এবং জাতিগত কর্মকাণ্ড ও পরিস্থিতি (অবস্থা) সম্পর্কিত বিষয়াবলিও অন্তর্ভুক্ত। বংশীয় ও গোষ্ঠীগত বিষয়গুলোও শামিল বিবাহ হোক, তালাক হোক, হেবা হোক, মিরাস হোক এমন সব কর্মাবলি শামিল। সুতরাং মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর অর্থ এমন বের হয়ে আসে যে, মুসলমানদের ব্যক্তিগত কানুন, জাতিগত কানুন, বংশীয় ও গোষ্ঠীগত কানুন। যেগুলোর হেফাজত করা আপনাদের উদ্দেশ্য। তাকে মুসলমানদের কানুনও বলা যায়।

সমগ্র জগদ্বাসীর কানুন

কিন্তু আমি বলবো, মুসলমানদের জাতি হিসেবে কোন পৃথক কানুন নেই। কানুন মূলত ইসলামের। মুসলিম জাতির পৃথক কোন কানুন নেই। যারা ইসলামের কানুন মানবে তাদেরকে মুসলিম বলা হবে আর যারা মানবে তা তাদের গাইরে মুসলিম বলা হবে। কিন্তু কানুন স্বয়ং মুসলমানদের ব্যক্তিগত নয়। তারা কোন কানুন রচনা করেনি, এবং তাদের সঙ্গে কোন কানুন বিশেষিতও নয়। কানুন হলো ইসলামের আর ইসলামি কানুন সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতির জন্য পাঠানো হয়েছে। কোন বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর জন্য পাঠানো হয়নি। এই কানুন

আপনাদের নয় বরং পৃথিবীর সকল মানুষের। মুসলমানদের কানুন শব্দ দ্বারা পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি এবং এক ধরনের সীমাবদ্ধতা ফুটে ওঠে। তখন অমুসলিমরা বলবে, আমাদের এর সাথে কী সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো তো মুসলমানদের কানুন। এর ফলে পক্ষপাতিত্ব চলে আসবে, তারা চিন্তা-গবেষণার প্রতি মনোনিবেশ করবে না। কারণ, এগুলো মুসলমানদের কানুন, আমাদের নয়। অতএব এতে আমার চিন্তা-ফিকির করার কী প্রয়োজন। কিন্তু যখন আমরা এই কথা বলবো যে, মুসলিম জাতির জাতি হিসেবে কোন কানুন নেই। এই কানুন তো আল্লাহর। যেমনভাবে আমাদের জন্য এসেছে, তেমনভাবে তোমাদের জন্যও এসেছে।

হাদিস শরীফে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً

> প্রত্যেক পয়গম্বরকে আপন আপন জাতির নিকট পাঠানো হতো। কোন নবীর আমলের পরিধি বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। যেমন বনী ইসরাঈলের নবীগণ বনি ইসরাঈল বংশের জন্য প্রেরিত হতেন। অন্যদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল না।

হযরত ঈসা আ. বলতেন–

"আমি বনি ইসরাঈল জনতাকে একত্র করার জন্য আগমন করেছি, অবশিষ্ট জগতের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি শুধু ইসরাঈলীদেরকে ইসলাহ করার জন্য এসেছি, অন্যান্য জাতি আমার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং কতেক নবীদের শুধু বংশ ইসলাহ করার জন্য পাঠানো হতো এবং কিছু নবীকে নিজ দেশ ইসলাহ করার জন্য প্রেরণ করা হতো। যেমন হযরত ইউনুস আ.কে চারটি শহরের ইসলাহের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল।

অতএব প্রত্যেক পয়গম্বরকে নিজ নিজ কওমের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, আমাকে পৃথিবীর সকল কওমের জন্য পাঠানো হয়েছে। সকল মানুষের ইসলাহের জন্য, সংশোধনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ কারণে কুরআনুল কারীমের স্থানে স্থানে যেখানে আম ইবাদাতের হিদায়েত করা হয়েছে বা ঈমান গ্রহণের হিদায়েত করা হয়েছে, সেখানে 'ইনসান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ

হে জগতের মানুষ! আপন রবের ইবাদত কর।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

হে পৃথিবীর মানবজাতি! যারা বর্তমানে বিদ্যমান আছ এবং ভবিষ্যতে তোমাদের যে বংশধরগণ আসবে আমাকে সকলের জন্য পয়গম্বর বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

অতএব তিনি বিশেষ কোন জাতির গোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত হননি, কোন নির্দিষ্ট দেশের জন্য নয় বরং পৃথিবরি সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

পক্ষপাতিত্বের উৎসমূল

এতে প্রতীয়মান হয়, দুনিয়ার জাতিসমূহে যে পক্ষপাতিত্ব ও গোড়ামি রয়েছে, তার ভিত্তি হলো তাদের দীন ও মতাদর্শ, যা তাদের জন্য বিশেষিত হয়ে এসেছে। অতএব তারা আপন দীন নিয়ে বসে আছে। অন্যান্য বংশের লোকেরা বলবে আমাদের তাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক তাদের দেশে ভিন্ন এক কানুন সংবিধান, তারা তার উপর আমল করছে। কিন্তু যখন এ কথা ঘোষণা করা হলো যে, আমি কোন বিশেষ দেশ অথবা নির্দিষ্ট কওমের জন্য আসিনি। আমি তো পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এসেছি। তখন দুনিয়ার সকল জাতি পেয়ে গেল চিন্তা-ফিকির করার যে, যখন আমাদের জন্যও এই কানুন তখন আমরাও তাতে ফিকির করব এবং আনুগত্য করব। এখন কেউ আনুগত্য করুক বা না করুক এটি তার জন্য বঞ্চিত হওয়ার লক্ষণ। পয়গাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আমভাবে পৃথিবীর সকল জাতি গোষ্ঠীর জন্য চায় সে যে জাতি-গোষ্ঠীর হোক।

স্বভাবজাত কানুন

অতএব আমি বলব, মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় ব্যক্তিগত কানুন, তাহলে বলব মুসলমানদের জাতি হিসেবে ব্যক্তিগত কোন কানুন নেই, জাতিগত কোন কানুন নেই। এই কানুন আল্লাহ তায়ালার। আমরা এই কানুনকে জগদ্বাসীর সামনে পেশ করব। মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর উদ্দেশ্য মূলত এমন নয় যে, আমরা আমাদের কানুনকে শুধু হেফাজত করব। আমরা তার হেফাজতের পাশাপাশি দুনিয়ার সকল জাতিকে দাওয়াত দিব যে তোমরাও এর উপর আমল কর, চাই তা ব্যক্তিগত হোক চাই তা গোষ্ঠীগত হোক। কারণ, এই কানুন ফিতরত মোতাবেক। এগুলো মানুষের তবিয়তের চাহিদা ও জযবা

মোতাবেক। এগুলো কোন জবরদস্তিমূলক কানুন নয় যে, আকল গ্রহণ করবে না, অন্তর সায় দিবে না। এই কানুন দ্বারা কারো উপর জবরদস্তি করা হবে না। বরং মানুষ যখন এতে চিন্তা-ফিকির করবে, তখন তাকে তবিয়ত ও ফিতরত মোতাবেক পাবে। কেননা, এতে প্রতিটি মানুষের জীবনব্যবস্থা রয়েছে। এই কানুনকে যারা মানে, তাদেরকে মুসলিম বলে আর মুসলিমদের জীবন মায়ের ক্রোড় থেকে নিয়ে গোর পর্যন্ত এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে যত কর্মকাণ্ড এবং অবস্থাদি রয়েছে সবকিছুর উপর ইসলামের কানুন জড়িত। আর যত হিদায়েত ও উপদেশ রয়েছে সবই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। এগুলো কোন আবিষ্কৃত কানুন নয় যে, আমরা নিজ হাতে গড়ে নিয়েছি।

মানবসত্তার ওপর প্রয়োগ হওয়া কানুন

কার্যাবলিতে নয় স্বয়ং মানুষের জাতিসত্তার সঙ্গে এই কানুন তখন থেকে প্রয়োগ হয়, যখন তার মাঝে আকল না থাকে, অনুভূতি না থাকে এবং বিবেচনাশক্তি না থাকে। সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু যে একেবারেই একটি গোস্তের টুকরো, না তাতে আকল আছে, না আছে বিবেচনাশক্তি। কিন্তু ইসলামি কানুন তার সঙ্গেও লাগে যে, জন্ম নেয়ার সাথে সাথে তাকে গোসল করাও এবং ডান কানে আযান দাও আর বাম কানে তাকবীর বল। সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম তার কানে পৌঁছাও এবং বলো আল্লাহু আকবার আল্লাহই সবচেয়ে বড় অন্য কারোর মাঝে বড়ত্ব নেই। তার অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করে দেয়া হয় যে, আল্লাহর আযমতই তোমার মূল পদার্থ।

اشهد ان لا اله الا الله

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

اشهد ان محمدا رسول الله

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সত্য রাসূল।

যখন মানুষ এই বুনিয়াদী আকিদাসমূহ মেনে নিবে এবং এই কথাগুলো একজন শিশুর অন্তরে বসে যাবে, তখন আমলের কথা আসবে। বলা হবে حی علی الصلاۃ সবচেয়ে বড় আমল আল্লাহর ইবাদত কর। যখন এগুলোও অন্তরে বদ্ধমূল হবে, তখন তাকে সাধারণ জীবনের কথা বলা হবে যে حی علی الفلاح সাধারণ কামিয়াব ও উন্নতির দিকে আস।

মানবসত্তার উপর কানুন প্রয়োগের রহস্য

এখন কথা হলো, শিশু বুঝে কিনা ডান কানে আযান বাম কানে তাকবীর বলাতে আপনার উপর কী। এটি তো এমন যে আপনি দেওয়ালের সামনে ওয়াজ করলেন, এতে উক্ত দেয়াল কী বুঝবে। কিন্তু এমন ধারণা ভ্রান্ত। নিঃসন্দেহে শিশুর আকল-অনুভূতি নেই। কিন্তু তার অন্তর একটি সাদা কাঠের ন্যায়; তাতে যা অংকন করা হবে তা অংকিত হয়ে যাবে, যা ছাপানো হবে তা ছেপে যাবে। যখন তার হুঁশ-বুদ্ধি আসতে থাকবে, তখনও সে ওই কালিমাগুলো বলতে বলতে বড় হবে, যা তার অন্তরে অংকন করা হয়েছিল। সুতরাং যদিও তার মাঝে আকল, অনুভূতি নেই, অনুভূতি নেই; কিন্তু গ্রহণ করার যোগ্যতা রয়েছে। যে কালিমা তার কর্ণে দেয়া হবে, তা অংকিত হয়ে যাবে তার অন্তরের সাদা কাষ্ঠে। যেমন এই রেকর্ডিংযন্ত্র আমি যা বয়ান করছি তার সবই তাতে অংকিত হচ্ছে। তার কোন আকল নেই, অনুভূতিও নেই। এটি একটি জড় পদার্থ। কিন্তু সারা বয়ান এতে একত্রিত হবে। যখন আপনি তার বাটন অন করবেন, তখন তার ভিতর থেকে সবকিছু ঢেলে দিবে, যা তার মাঝে একত্রিত হয়েছিল।

অতএব একজন মানবশিশুর অন্তর কি এই মেশিন থেকেও নিম্ন মানের দুর্বল যে, মানুষ তার আকল দ্বারা একে আবিষ্কার করেছে। তাহলে সেই আকল কত বড় হতে পারে। একজন শিশুর মাঝে তো আকল রয়েছে। তবে তা লালন-পালন দ্বারা বৃদ্ধি পায়নি; কিন্তু মূল পদার্থ তো বিদ্যমান রয়েছে। অতএব আপনি তার কানে যা কিছু ঢেলে দিবেন, তাই অংকিত হয়ে যাবে।

তারবিয়াতের কাল

এ থেকে ইমাম গাজ্জালি রহ. এই মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন যে, শিশুর তারবিয়াত কাল এই নয় যা আমরা নির্ধারণ করে থাকি যে, পাঁচ বছর বয়সে উপনীত হয়েছে তো একন মক্তবে পাঠাও, এখন থেকে তারবিয়াত শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, জন্মের সাথে সাথে তারবিয়াত শুরু হয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, শিশু মুখাতাব বা সম্বোধিত ব্যক্তি হয় না। কিন্তু মাতা-পিতার দায়িত্ব হলো তার ভিতর এমন বস্তু প্রবেশ করাবে, যা হক ও সত্য হবে।

ইমাম গাজ্জালি রহ. তাঁর রচনাবলিতে লিখেছেন, মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুদের সামনে কোন খারাপ কথা উচ্চারণ করবে না, যা বলবে তা তার অন্তরে অংকিত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে এগুলো ক্রমবিকাশ হয়ে উথলে উঠবে এবং মুখ থেকে

বের হবে। সেজন্য শিশুর সামনে হক ও সত্য কথা ব্যতীত কোন কথা বলবে না, যাতে তার অন্তরে ভাল কথা ও সত্য কথা অংকিত হয়। তেমনিভাবে তাদের চক্ষুদ্বয় একটি আয়নার ন্যায়। তার অন্তরে তো অনুভূতি ও অনুভব শক্তি নেই কিন্তু চোখ তো খোলা। অতএব ইমাম লিখেছেন, মাতাপিতা শিশুর সামনে কোন প্রকার লজ্জাহীন কর্ম সম্পাদন করবে না। যদি এহেন কর্মকাণ্ড করে, তাহলে তা তার চোখের পথে বেরিয়ে অংকিত হয়ে যাবে। আর যখন সে হুঁশ-বুদ্ধি পাবে, তখন তার থেকে লজ্জাহীন ও অভিমানবর্জিত কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেতে থাকবে। অতএব কানে ভাল কথা প্রবেশ করাও এবং চোখের সামনে ভাল চিত্র পেশ কর। তার অন্তরে ভাল ধ্যান-ধারণা পুঞ্জিভূত কর, যাতে হুঁশ-বুদ্ধি পাওয়ার পর সে ভালো হয়, তার কথাবার্তা ভালো হয়, কাজকর্ম ভালো হয়। সুতরাং তারবিয়াতের কাল ওই নয় যা ৫/৬ বছর পর আসে বরং তা জন্মের সাথে সাথে শুরু হয়।

অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের জন্য অত্যন্ত পরিপূরক কানুন

পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এখানে মুখাতাব হলো মাতা-পিতা। কারণ, শিশুর ভিতর মুখাতাব হওয়ার যোগ্যতা নেই। উক্ত কথার সারনির্যাস হলো, ইসলামি কানুন একজন ব্যক্তির শুধু কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়; বরং জাত ও সত্তার সাথেও সম্পৃক্ত। কারণ, এই শিশুটি কর্ম সম্পাদনের যোগ্য নয় কিন্তু তার সত্তা তো বিদ্যমান। ইসলামের কানুন তার সত্তার উপর এসেছে। অতএব এই কানুন শুরু জীবন থেকেই শুরু হবে। আপনি আযান দিবেন, তাকবীর দিবেন, এখন শুধু বাকি থাকবে নামাজ। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, জাযানার নামাজ ওই নামাজ যার আযান ও ইকামত ভূমিষ্ঠের সময় দেয়া হয়েছিল। আজ জন্মের সময় আপনি আযান ও তাকবীর দিলেন আর মরণের সময় নামাজ পড়ে বিদায় জানালেন। অতএব একজন মুসলমানের জীবন আযান ও নামাজের মধ্যস্থলে। তাকে জীবনের শুরুতে আল্লাহর নাম বেষ্টন করে রাখে এবং শেষ হয় আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে। সুতরাং তার জীবন শুরু কর আযান এবং তাকবীর দ্বারা আর সমাপ্ত ঘটাও নামাজ দ্বারা। তাহলে তার পুরো জীবন আযান ও নামাজের মধ্যস্থলে এসে যাবে। তার জীবনের শুরু হবে আল্লাহর আযমত, তাঁর তাওহীদ ও রিসালতকে স্বীকার করে ও নামাজের জযবা ধারণ করে আর ইতি হবে নামাজের মাধ্যমে।

এতে সুস্পষ্ট হয় যে, জানাযার নামাজ তো আপনারা আদায় করবেন মৃত ব্যক্তি তো জানতে পারে না যে কী হচ্ছে, সে তো কাফন পরিধান করে শুয়ে আছে কিন্তু সত্তা তো বিদ্যমান, নফস তো বিদ্যমান। অতএব ইসলামের কানুন তার জাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো কর্ম তো দ্বিতীয় পর্যায়ের বস্তু। সুতরাং যে কানুন জাত সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হবে তা কর্মের সাথে হবে না কেন তা কথাবার্তাকে ইসলাহ ও পরিশুদ্ধ কেন করবে না তা আমলকে কেন ইসলাহ করবে না। অতএব ইসলামি কানুন মানুষের সত্তা ও কর্ম সবকিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

স্বভাবজাত শিক্ষা

প্রকাশ থাকে যে, এই কানুন যদি অমুসলিম তথা সকল মানুষ মেনে নেয়, তাহলে এমনটি কোন মন্দ কর্ম হবে না যে জীবনের প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তার আযমত অন্তরে বদ্ধমূল হবে। এটি তো প্রত্যেক জাতির চিন্তার বিষয় যে, এটি কত পুত-পবিত্র শিক্ষা যে, জন্ম হওয়ার সাথে সাথে তাওহীদে ইলাহী এবং রিসালাতের সাক্ষ্য তার অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়। আর حَيَّ عَلَى الصَّلَاة বলে তাকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়। নাউযুবিল্লাহ! এমনটি কোন মন্দ বস্তু হতে পারে না।

চিন্তা করলে ফুটে উঠবে যে, এটি একটি ফিতরাত মোতাবেক শিক্ষা। আর তা শুধু মুসলিম জাতির সঙ্গে বিশেষিত নয় বরং সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য। কেউ যদি চিন্তা-গবেষণা না করে, তাহলে তা তার জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ। কিন্তু ইসলাম সকলের জন্য চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু যখন আপনারা বলবেন, এটি আমাদের কানুন, ওটি আমাদের কানুন, আমার কওমের কানুন পৃথক। তাহলে তারাও তাই বলবে। আর যখন আপনারা বলবেন, এটি না আমাদের কানুন না তোমাদের তা তো আল্লাহর কানুন, যার মুকাল্লাফ আমরা সকলেই। এখন তাদের সুযোগ আসবে চিন্তা-ফিকির করার তারা ভাববে এই পয়গাম যেহেতু আমাদের জন্যও তাহলে আমরাও এর উপর চিন্তা করব, গবেষণা করব।

ইসলামিক পার্সোনাল ল'

এজন্য আমি এ কথা বলি যে, আনুগত্যের বিবেচনায় এটি মুসলিম পার্সোনাল ল' আর হাকিকত ও মৌলিকতার বিবেচনায় এটি ইসলামিক পার্সোনাল ল', ইসলামি

ল', আল্লাহর কানুন যা সবার জন্য ব্যাপক। শিশুকাল হতে মরণ পর্যন্ত, মরণ থেকে কবর পর্যন্ত, কবর থেকে ময়দানে হাশর পর্যন্ত এবং সেখান থেকে জান্নাত পর্যন্ত। এবং জান্নাতে প্রবেশ করার পর অনন্তকাল পর্যন্ত এই কানুন চলতে থাকে। আর কানুনের মাঝে উন্নতি হতে থাকবে, হাশরে উন্নতি হবে, জান্নাতে আরো উন্নতি হবে। কিন্তু বুনিয়াদীভাবে এই কানুনও থাকবে। আর মানুষের উন্নতি তার দ্বারা হতে থাকবে।

পার্সোনাল ল'র সংরক্ষণ

মুসলিম পার্সোনাল ল'র আসল উদ্দেশ্য হলো এটি একটি গোষ্ঠীগত কানুন, যা তাদের জাতের উপর প্রযোজ্য, সেগুলোকে হেফাজত করা। হাকিকত হলো এই যে, আমাদের কারো সাথে যুদ্ধ নেই, আর আমরাও কারো সঙ্গে লড়াই করি না। আমরা চাই এই কানুনকে তোমরাও গ্রহণ করে নাও। যদি গ্রহণ না কর, তাহলে কমপক্ষে আমাদের আমল করতে দাও। তোমরা এতে কেন বাধা প্রদান কর? এহেন প্রতিবন্ধকসমূহকে দূর করা আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। যদি তোমরা বঞ্চিত থাকতে চাও, আমল করতে না চাও, তাহলে আমলকারীদের উপর শর্ত আরোপ কর কেন? কেন তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর। অতএব আসল মাকসুদ হলো কানুনসমূহকে সংরক্ষণ করা।

এখন সংরক্ষণের ধারাবাহিকতায় যদি শুধু শব্দাবলি দ্বারা চাপ প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে করেন। অন্যথায় প্রভাব সৃষ্টির জন্য যদি আরো কোন প্রস্তাব থাকে, তাও গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কানুনকে হেফাজত করা এ কথা আমাদের বুঝতে হবে। আমরা যেন আসল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত না হই। এ কথা আমাদের অনুভব করা উচিত। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, হেফাজতের উদ্দেশ্য এমন নয় যে কানুন কোন মূর্তি বা ছবি যা কোথাও রাখা আছে, আপনারা চিৎকার ও হৈচৈ করে বললেন, হে সাহেব! এই নিন পার্সোনাল ল' এগুলোর হেফাজত করেন।

সংরক্ষণের পদ্ধতি

কানুন হেফাজতের পদ্ধতি হলো, কানুন ব্যবহার করা শুরু করুন, তাকে জিন্দেগীতে প্রয়োগ করুন; তাহলে কানুন সংরক্ষণ হয়ে যাবে, আপনারা হেফাজত হয়ে যাবেন। আর যদি হৈচৈ শুরু করেন যে কানুন রাখা আছে, এগুলো হেফাজত করুন, তাহলে মনে হবে কানুন মনে হয় কোন মূর্তি, যাকে

হেফাজত করতে হবে অথবা কোন ছবি। সবচেয়ে বড় হেফাজত হলো আপনারা তাকে নিজেদের ভিতর ফিট করে ফেলুন, তার উপর আমল করা শুরু করুন, তাহলে কানুন দেহধারী বনে যাবে।

হেফাজতের মাধ্যম হওয়া সৌভাগ্যের কারণ

পার্সোনাল ল' মুছে যাওয়ার এত বস্তু নয়, কেউ মিটানো চেষ্টা করলে নিজেই মিটে যাবে। কারণ, পার্সোনাল ল'র কানুনের শিকড় হলো কুরআন ও হাদিস। অন্য কথায় বলা যায় তা স্বয়ং ইসলাম। আর ইসলাম এসেছে দাওয়াতী (স্থায়ী) জীবন নিয়ে– মিটে যাওয়ার জন্য আসেনি। কারণ, তার হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমি এই যিকির (কুরআন) নাযিল করেছি আর আমিই তার হেফাজতের যিম্মাদার।

অতএব হেফাজত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এতে কেউ বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে পারবে না। হেফাজতের মাধ্যম ও উসিলা হওয়া আমাদের সৌভাগ্য। আসল সংরক্ষণকারী তো মহান আল্লাহ। কিন্তু যদি আমরা মাধ্যম হতে পারি, তাহলে কল্যাণ লাভ হবে, আমরা সৌভাগ্যশালী হবো। অন্যথায় আমরা যদি আমল না করি এবং হেফাজত না করি, তারপরও মুছে যাবে না, ধ্বংস হবে না।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

যদি তোমরা সবাই মিলে এই দীনের হেফাজত থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তোমাদেরকে দীন থেকে বের করে দেয়া হবে এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এরপর তারা তোমাদের এত হবে না। *[সূরা মুহাম্মদ : ৩৮]*

সুতরাং দীনের হেফাজত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা করবেন। সেজন্য আমাদের সৌভাগ্য যদি আমরা হেফাজতের উসিলা ও মাধ্যম হতে পারি। আমরা স্বয়ং হেফাজতকারী নয় যে তাকে হেফাজত করব। তাকে হেফাজত করনেওয়ালা হেফাজত করবেন।

এই কানুনের বিরুদ্ধে অনেক বড় বড় মসিবত, অনেক প্রভাবশালী দুশমন দাঁড়িয়েছিল। আজ তাদের কোন নাম নিশানা নেই। আর কানুনে ইলাহী আজও বহাল তবিয়তে রয়েছে। কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে, হাদিস ও ফিকাহ ও সংরক্ষিত রয়েছে। সবকিছু স্ব-অবস্থায় আছে। অস্বীকারকারীরা ধ্বংস হয়েছে। আজ কোন ভাস্কর্যবিদ ও তাদের ঠিকানা বলতে পারে না। এই কানুন আল্লাহর হেফাজতে স্বস্থানে থাকবে। আমরা যদি তার হেফাজতের মাধ্যম হতে পারি, তাহলে আমাদের কল্যাণ অর্জন হবে। আঙ্গুল কেটে, আঘাত পেয়ে বা নিহত হয়ে শহীদগণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অন্যথায় ইসলামি কানুন তো সংরক্ষিত থাকবেই। আমরা যা হৈচৈ করছি তা মূলত নিজেদের হেফাজতের জন্য- পার্সোনাল ল' হেফাজতের জন্য নয়। তা তো হেফাজত রয়েছেই। আমরা তার আঁচল যতটুকু ধারণ করবো, ততটুকু মাহফুজ হবো। কারণ, মাহফুজের আঁচল ধরে মানুষ নিজে মাহফুজ হয়। আপনাদের দ্বারা পার্সোনাল ল' হেফাজত হবে না বরং পার্সেনাল ল' দ্বারা আপনাদের হেফাজত হবে। অতএব নিজেদের হেফাজতের জন্য আমরা তাকে মজবুত ও দৃঢ়ভাবে ধারণ করি। আমরা তো চাই না তাতে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটুক। আমরা তার বিরোধীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। অতএব তাতে কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করতে দেয়া যাবে না। এমনটিই আল্লাহর নির্দেশ।

সুতরাং সুস্পষ্ট হয়ে গেল, পার্সোনাল ল'-এর কানুন ইসলামি কানুন। বিশেষ কোন কওমের কানুন নয়। মাননেওয়ালাদের নাম মুসলিম। অতএব তাকে মুসলিম কানুন বলা হবে। আর অমান্যকারীদের নাম অমুসলিম। অতএব তা অমুসলিমদের কানুন রয়নি। অন্যথায় তা মূলত মানুষের কানুন। মানুষের উন্নতি, তাদের হেফাজত এবং তাদের মঙ্গল আর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য এই কানুনকে পাঠানো হয়েছে।

দীনি ও প্রচলিত আইনে পার্থক্য

এই কানুনসমূহের শেষ ফল শুধু এই নয় যে, কিছু প্রথাগত কর্ম আদায় করে নিবেন। বরং কানুনের হেফাজত ও সংরক্ষণের শেষ ফলাফল হলো সেগুলোকে কাজে প্রয়োগ করে আপনি প্রকাশ্য কর্মে বাস্তবায়ন করবেন। তবে প্রত্যেক কর্মের প্রারম্ভে দৃষ্টি থাকবে আল্লাহর নৈকট্য এবং তায়াল্লুকের প্রতি। দীনি ও রসমি কানুনের মাঝে পার্থক্য এতটুকু।

রসমি কানুনাবলি যা রাজা-বাদশাগণ রচনা করেন সেগুলো শুধু কর্মের উপর প্রয়োগ হয়। আর আল্লাহপ্রদত্ত কানুন অন্তরের উপর রোগ হয়। কাউকে যদি চুরি করার অপরাধে পাকড়াও করা হয়, তাহলে আইনগতভাবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তার অন্তর থেকে চুরির জযবা বের করা এই কাজটি জাগতিক আইন করতে পারবে না। জেলখানায় যাওয়ার পর তার চুরি করার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাবে যে, পাঁচ/ছয় মাস কারাভোগের পর এর চেয়ে আরো বড় চুরি করব। তারপর ধরা খেয়ে আবার ছয় মাস জেল কেটে পুনরায় ভয়াবহ ডাকাতি করব। অতএব মানবরচিত জাগতিক কানুন তো জযবার সঙ্গে লাগতে পারে না, তাহলে জাতের সঙ্গে কিভাবে লাগবে– জাত তো আরো উর্ধ্বের বস্তু। তা শুধু কর্মের উপর প্রয়োগ হয়। বাহ্যিক দৃশ্যপটে এই আইন প্রয়োগ হয়। কিন্তু দীনি কানুন এবং আম্বিয়াদের কানুন শুধু চুরিকে ফিরায় না এবং অন্তরে চুরির প্রতি ঘৃণা পয়দা করে। তা শুধু ডাকাতি কর্ম থেকে ফিরায় না বরং ডাকাতির নাপাকি তার সামনে এমনভাবে তুলে ধরে মলমূত্রের নাপাকির ন্যায়। সুতরাং অপরাধসমূহের প্রতি ঘৃণা জন্মানো এবং সেগুলোর প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করা আল্লাহ প্রদত্ত কানুনের কাজ।

মুসলিম পার্সোনাল ল'র উদ্দেশ্য

মুসলমানদের ব্যক্তিগত কানুন হোক বা গোষ্ঠীগত হোক মূলত তার মানশা হলো এই যে, প্রকাশ্যে এই আমল করব আর বাতেনীভাবে (অদৃশ্যে) আল্লাহর প্রতি রুজু হব। কেননা, কানুন উভয় বস্তুর উপর প্রয়োগ হয়। অন্তর, জিহ্বা, হাত-পা এবং চেহারার উপরও প্রয়োগ হয়। শুধু দিল-অন্তর হাত-পা এবং যবানের ইসলাহ নয় বরং সমষ্টিগতভাবে মানুষের ইসলাহের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। মানুষের হাত-পা ঠিক হবে, তার অন্তর ঠিক হবে, তার জাহের বাতেন দুরস্ত হবে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে। অতএব এই হৈচৈ এজন্য নয় যে, কিছু প্রচলিত রীতিনীতি রয়েছে সেগুলো আমরা পুরো করতে চাই অথবা কিছু প্রথাগত বিষয় আছে সেগুলো আমরা হেফাজত করতে চাই। বরং মানশা এই হওয়া চাই যে, এটি আল্লাহর দীন, যার উদ্দেশ্য মানুষের উন্নতি ও সফলতা। আমরা তার হেফাজত করে নিজেদের হেফাজত করতে চাই। আর জগদ্বাসীকে অবগত করাতে চাই, তোমরাও এই কানুনকে আপন করে নাও এবং পরিমাপ ও তুলনা করে দেখে নাও জাতিগত জীবন হোক, কর্মগত হোক এই জীবন উত্তম না ওই জীবন উত্তম, যা তোমরা স্থির করেছ।

মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর জন্য ধর্মীয় নেতাদের ঐক্য

পার্সোনাল ল'-এর বিরুদ্ধে স্লোগান উঠল, এতে ভারতবাসী মুসলিম সমাজ চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। আমি মনে করি, উক্ত হৈচৈ ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়নি যদিও তা বস্তু হিসেবে কোন ভাল বস্তু মনে করা হয় না। যারা পার্সোনাল ল'-এর বিরোধিতা করেছে, তারা বাস্তবে অনেক বড় ভুল করেছে। তারা একটা মন্দ কর্ম করেছে, যা আমাদের জন্য কল্যাণরূপে আবির্ভাব হয়েছে।

প্রথমে এই কল্যাণ হলো যে, সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, আমাদের তা রক্ষা করতে হবে। আজ আপনাদের সামনে ধর্মীয় নেতারা একসঙ্গে বসে আছেন। এখানে প্রত্যেক ফেরকা ও প্রত্যেক দলের উলামায়ে কেরাম উপস্থিত আছেন। প্রতিটি তানযীমের পৃষ্ঠপোষকগণও উপস্থিত আছেন। আজ সবাই একটি প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। অতএব তাদের মন্দ কর্ম থেকে এই ভালো কর্ম বেরিয়ে এলো। যদি পার্সোনাল ল' বিরোধিতাকারী না দাঁড়াতো, তাহলে আমাদের অন্তরে এ কথা কোথা হতে উদয় হতো যে, আমাদের এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অতএব ইত্তেহাদের ন্যায় বিশাল এক নেয়ামত উক্ত হৈচৈ আমাদের প্রদান করল। সুতরাং ঐ প্রতিবাদ আমাদের ক্ষতিকর প্রমাণিত হলো না। যারা পার্সোনাল ল'-এর বিরোধিতা করছেন, তাদের আমি এক ধরনের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করি। কারণ, তাদের বিরোধিতার ফলে আমাদের মধ্যে ইত্তেহাদের জযবা সৃষ্টি হয়েছে। কবি বলেন–

'অনেক সময় মন্দ প্রকাশ পায় কিন্তু তার ভিতর থেকেও মঙ্গল বের হয়ে যায়।'

তেমনি আমাদের জন্যও কল্যাণ বের হয়ে এসেছে যে, আমাদের ইত্তেহাদের নিয়মত অর্জন হয়েছে।

এমন নয় যে, শুধু নীতিগতভাবে আমরা ইত্তেহাদ ও একতা ভাল কাজ মনে করছি বরং তা আল্লাহ তায়ালার বিশাল এক নেয়ামত। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ইত্তেহাদকে নেয়ামত নামে উল্লেখ করেছেন। জাহেলী যুগে মানুষ পরস্পর যুদ্ধ করত, তাদের দুশমনি বৃদ্ধি পেত। একে অন্যের দুশমন ছিল। যুদ্ধ লেগে থাকত, সামান্য কথার কারণে হাত ব্যবহার হত। পশুকে প্রথমে কে পানি পান করাবে তা নিয়ে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ হত। কোন কোন যুদ্ধ পঞ্চাশ বছর, একশ বছর জারি থাকত। মৃত ব্যক্তিরা অছিয়ত করে যেত, যুদ্ধ যাতে বন্ধ না হয়। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যাতে বংশের অসম্মাননা হয়, কান, নাক, কাটা না যায়।

ছোট ছোট বিবাদে বড় বড় ও ভয়াবহ লড়াই হতো। শত্রুতা ও ঝগড়া ব্যাপকতা লাভ করেছিল। সবার মেজাজ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। ইসলাম এসে তাদেরকে একতাবদ্ধ করেছে। এই ইত্তেহাদকে আল্লাহ তায়ালা এক আয়াতের মধ্যে নেয়ামত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে–

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً

স্মরণ কর ওই সময়ের কথা, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, পরস্পর নাখোশ ছিলে।

فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ

অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি ঢেলে দিয়েছেন।

فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا

ফলে আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ
[সূরা আল ইমরান : ১০৩]

তা ছিল আল্লাহ তায়ালার দান করা নেয়ামত, অন্যথায় তোমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারতে না।

সন্তুষ্টির নেয়ামত

এই ইত্তেহাদ ও সম্প্রীতিকে আল্লাহ তায়ালা নেয়ামত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, অন্তর মিলানো আল্লাহর হাতে; অন্য কারো হাতে নয়। অন্য সকল কাজ করতে পারবেন; কিন্তু অন্তর মিলানো আল্লাহর কাম।

স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় জাত তার প্রমাণ। তার চেয়ে শক্তিশালী সত্যায়নকারী অন্য কেউ হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে বলেছেন–

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ

হে নবী! যদি আপনি যমিন ভরে সোনা রূপা ব্যয় করতেন, তবু তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতেন না, অন্তর

জোড়া লাগাতে পারতেন না। অন্তর জোড়া লাগানো আল্লাহর কাম। *[সূরা আনফাল : ৬৩]*

এখানে বিভিন্ন মতের ও ফেরকার সম্মানিত বুযুর্গগণ একসঙ্গে বসে আছেন। আমি মনে করি, তারা শুধু কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে বসে আছেন, তা নয়; বরং তাদের অন্তরও পরস্পর মিলে আছে। সবার আন্তরিক জযবা ও তামান্না যে বাস্তবে আমরা আমাদের দীনকে হেফাজত করবো। অতএব অন্তর মিলানো, এটি আল্লাহর কাম ছিল আর বাস্তবায়ন হলো যখন অকল্যাণ প্রকাশ পেল এবং পার্সোনাল ল'-এর বিরুদ্ধে স্লোগান উঠল। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা আমাদের ঐ মন্দের কারণে বিশাল একটি নেয়ামত প্রদান করলেন। আর ইসলামের চিরাচরিত তবিয়ত হলো, যখনই তার উন্নতি হয়েছে, তখন প্রতিবন্ধক ও বিরোধিতার মাঝেই উন্নতি হয়েছে। যদি বিরুদ্ধবাদীরা না থাকে, তাহলে মোকাবেলা হবে না। ফলে বরকতও জাহির হবে না। তার মধ্যে খায়ের ও ভালোর যতগুলো দিক আছে তা প্রকাশও পাবে না।

মুসলিম পার্সোনাল ল'র বিরোধিতার নানা উপকারিতা

গভীর চিন্তা করলে বুঝে আসে, উন্নতি হলো সংঘর্ষের নাম। পৃথিবীতে সংঘর্ষ না হলে উন্নতি হতো না। উদাহরণস্বরূপ পানি হাজারো বছর ধরে সমুদ্রে পাহাড়সম উর্মিমালা তৈরি করছে। তাতে কোন উন্নতি হয়নি যে, প্রথমে পাহাড়সদৃশ ঢেউ ছিল আর এখন ফুলের তোড়া হয়ে আসে, ফুলের টুকরো বনে যায়। বরং ওই তরঙ্গমালাই রয়ে গেছে, যা দশ হাজার বছর পূর্বে ছিল। তেমনিভাবে আগুন; তাতেও কোন উন্নতি নেই। প্রাচীনকালে যেভাবে শিখা বের হতো, তাপ সৃষ্টি হতো, আজও তা-ই হচ্ছে যে, ফুলদানি বানাতে পারছে না। তদরূপ ভূমি; একা ছেড়ে দিলে তাতে কোন প্রকার তারাক্কী হবে না। যেমন– পূর্বে পদদলিত ছিল আজও আছে। আপনি যেভাবে তাকে পিষতে চান সেভাবে পিষতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি পানিকে মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করেন, সংঘর্ষ করান, তাহলে কাদা বনে যাবে, তারপর কখনো পাত্র হবে, কখনো ইট হবে, কখনো অন্যান্য সামগ্রী গঠন হবে। সুতরাং এতে তারাক্কী শুরু হয়ে যাবে।

তেমনি আগুন-পানির ঘর্ষণে তারাক্কী হয়, পৃথক পৃথক থাকলে কোন প্রকার তারাক্কী হয় না। আগুনকে বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষ করালে খোলা আকাশ প্রান্তরে বিভিন্ন আশ্চর্যজনক বস্তু সৃষ্টি হবে, কখনো গর্জন ও বজ্রপাত সৃষ্টি হবে, কখনো মেঘ দেখা দেবে, কোথাও বিদ্যুৎ চমকাবে। যদি বাতাস ও আগুন আলাদা

আলাদা থাকে, তাহলে কোথাও বিজলি দেখা যাবে না, বজ্রপাত নজরে আসবে, বৃষ্টি বর্ষিত হবে না। সুতরাং সংঘর্ষ ও মোকাবেলার মধ্যে উন্নতি রয়েছে।

একজন বড় মাপের আলেম যিনি হাজার হাজার মাসায়েল জানেন, তারপরও তার মধ্যে তারাক্কী হবে না। কিন্তু যদি তার সঙ্গে কোন মূর্খ ব্যক্তি টক্কর দেয় এবং সে বিভিন্ন প্রশ্ন করে, তাহলে প্রশ্নাবলির উত্তরে নতুন নতুন বিষয় প্রকাশ পাবে এবং নতুন ইলম জাহের হবে। এভাবে একজন আলেমের ইলমের তারাক্কী আরম্ভ হবে। অতএব মূর্খতাও একটি নেয়ামত। তার টক্কর ও সংঘর্ষ ব্যতীত ইলমের মাঝে উন্নতি সৃষ্টি হয় না। কোন এক পণ্ডিত বলেন–

القلب ميت وحياته بالعلم والعلم ميت وحياته بالمناظرة

অন্তর মৃত; তার জীবন হলো ইলম। এবার ইলমও মুর্দা; তার জীবন বাহাস, মুনাজারা ও সংঘর্ষ।

ইলমের টক্কর মূর্খতার সঙ্গে হবে, ইলমের টক্কর ইলমের সাথে হয় না। অতএব মূর্খ যত পরিমাণ টক্কর দিবে, প্রশ্ন করবেম আলেমের ইলমের মধ্যে তত পরিমাণ উন্নতি হবে।

একজন শক্তিশালী পাহলোয়ান যে হাজারো কুস্তি কৌশল জানে, যা তার ঝোলায় সংরক্ষিত রয়েছে। যদি তার সাথে কুস্তি লড়তে আসে, তাহলে কুস্তির কলাকৌশলে তারাক্কী হবে। সে নিজেকে রক্ষা করার এবং জয়ী হওয়ার জন্য নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করবে, নতুন নতুন সুরত সৃষ্টি করবে। অতএব যতক্ষণ দুই পাহলোয়ানের মাঝে তারাক্কী না হবে, ততক্ষণ কুস্তিবিদ্যায় তারাক্কী হবে না। সুতরাং তারাক্কী হলো দুই বস্তুর সংঘর্ষের নাম। যদি সংঘর্ষ না হয়, তাহলে উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা এই সংঘর্ষকেও আল্লাহর অনুগ্রহ আখ্যা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٢٥١

আল্লাহ যদি এক কওম দ্বারা অপর কওমকে প্রতিহত না করতেন, টক্কর না লাগাতেন, তাহলে সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা একান্ত দয়ালু। *[সূরা বাকারা : ২৫১]*

মানুষের উন্নতি থেমে যাবে, কিন্তু আল্লাহ সংঘর্ষ বাঁধান। সংঘর্ষের পর নতুন নতুন সামাজিক আশ্চর্য বস্তু সৃষ্টি হয়। যখন কোন যুদ্ধ হয়, তখন যুদ্ধের পর

নতুন নতুন চিন্তাধারা পয়দা হয়। সামাজিক উন্নতি ঘটে, দেশকে নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়। যদি কোন জাতি শক্তিধর হয়, তখন তাদের সাথে সংঘর্ষের দ্বারা তাদের অহংকার ধূলির সাথে মিশে যাবে, ভেঙে যাবে। আর দুর্বল হলে সংঘর্ষের দ্বারা গাফলতের নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে। অতএব উভয় দলের কল্যাণ আর উন্নতি সংঘর্ষ ও যুদ্ধের ভিতর নিহিত। টক্কর না হলে কোন প্রকার তারাক্কী সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষ পার্সোনাল ল'র সংঘষ বাঁধাল, তার বিরোধিতা করল, প্রশ্ন উত্থাপন করল।

ফলে সকল ফেরকার আলেমগণ দলমত নির্বিশেষে তার পক্ষাবলম্বন করলেন। প্রত্যেক ইসলামি সংস্থার প্রধানরা এগিয়ে এলেন। তারা ওদের প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন। এতে মুসলিম পার্সোনাল ল'র ইস্যুটি সুপ্রশস্ত হল এবং এত পরিমাণ পর্দা উন্মুক্ত হল যে, ইতপূর্বে আমরা জানতাম না, যে তাতে এত পর্দা রয়েছে। আজ হাজারো পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়েছে, হাজারো বিষয় ছাপানো হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে কানুনের সমগ্র প্রান্ত ও পার্শ্ব উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। পূর্বে জানা ছিল না, এই পার্সোনাল ল'র মধ্যে এত পরিমাণ ইলম ভরপুর রয়েছে। প্রত্যেক লেখক ও রচয়িতা আপন রুচি ও যোগ্যতা মোতাবেক ইলম তুলে ধরেছেন। এত পরিমাণ দুর্লভ বস্তু বের হয়েছে যে, যদি বিরোধীতা ও প্রশ্ন উত্থাপন না হতো, তাহলে কখনো এত পরিমাণ আমাদের সামনে প্রকাশ পেত না। শুধু এতটুকু জানতাম যে, কানুন আল্লাহর। ভাই, আমল করে নাও, মেনে নাও। কিন্তু টক্কর দেয়ার কারণে পরস্পর উন্নতি হয়েছে। আশ্চর্যজনক সূক্ষ্মতা ও সূক্ষ্ম বিষয় উলামারা সৃষ্টি করেছেন। যদি টক্কর না হতো, তাহলে পার্সোনাল ল'র মাসয়ালা সুস্পষ্ট হতো না। আল্লাহ তায়ালা যখন চান ইসলামের কোন মাসয়ালাকে সুস্পষ্ট করতে, তখন জাহেল ও মূর্খদের দ্বারা টক্কর দেন যে, তোমরা বিরোধিতা কর, প্রশ্ন তোল। যত বেশি বিরোধিতা হতে তত বেশি আলেম জবাব দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে। এতে যে কিনারা গোপন ছিল, তা প্রকাশ হয়ে সামনে চলে আসবে, সবাই জানতে পারবে।

এ কারণে কুফফারদের টক্কর দেয়া মুসলিমদের সাথে, ফাসিকদের সংঘর্ষ বাঁধানো হয় মুত্তাকীনদের সঙ্গে, মুনাফিকদের টক্কর দেয়া হয় মুখলিসদের সাথে, যাতে মুখলিসদের ইখলাস প্রকাশ পায়; মুনাফিকদের নিফাক উন্মোচিত হয় এবং যে জিনিস ক্ল্যাসিক ও আসল তা প্রকাশ পেয়ে জনসম্মুখে জাহির হয়। সুতরাং বাস্তবতা হলো এই যে, পার্সোনাল ল'র বিরোধিতা আমাদের জন্য বিশাল নেয়ামত হিসেবে প্রকাশ পেল। যদি তা না হতো, তাহলে এত বড় মহা ঐক্য,

যা আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন তা হতো না। এই ঐক্যের কারণে যে হেফাজত হয়েছে, পার্সোনাল ল'র তা অন্য কোন উপায়ে হবে না।

আর এই হেফাজতের কারণে বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে যে ধরনের ভীতির সঞ্চার হয়েছে, তা হতো না। হাজারো মুসলমান যারা পার্সোনাল ল'কে বুঝেশুনে মানতো না, তারা মানতে লাগল।

অতএব এক নেয়ামত আমলে নেয়ার কারণে হাজারো নেয়ামত আপসে মিলে গেল। এই হিসেবে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিরোধিতাকারীদের প্রতি। তারা যদি এহেন কাজ না করত, তাহলে আমরা এই নেয়ামতসমূহ পেতাম না। আর তারা বেশি বিরোধিতা করে দেখতে পেয়েছে মাসয়ালা আরো সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, আগামী দিন এই সুস্পষ্ট মাসয়ালার পরিধির ভিতর তারাও এসে যাবে এবং তারাও বলবে, ভাই! যা দেখার ইচ্ছা ছিল তা তো দেখা হলো। যখন তারা দেখবে তখন গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। অতএব তাদের বিরোধিতাই তাদের শরয়ী কানুন গ্রহণ করার কারণ হলো। বিরুদ্ধবাদীদের জন্যও রাস্তা সুগম হলো।

কানুনের ভিত্তি হাকিকতের উপর

আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য ইলমি ও চিন্তাধারার রাস্তা খুলে দিয়েছেন, অনেক জনসাধারণের মধ্যে এখন যোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। চিন্তা-ফিকিরের যোগ্যতা অর্জনের পর যখন চিন্তা-গবেষণা করবে, তখন সবাই স্বভাবজাত কানুন গ্রহণ করবে। ফলে মানবরচিত কানুনের কবর রচিত হবে, ভূপৃষ্ঠ থেকে হারিয়ে যাবে।

পিতার সন্তান হওয়া এটি কোন কাল্পনিক বা ধারণামূলক কথা হতে পারে না যে যাকে মনে চায় পিতা বলে দিবেন তো সে পিতা হয়ে যাবে, আবার যাকে মনে চায় ছেলে বলে দিবেন তো সে ছেলে বনে যাবে। বরং বাপ-বেটা হয় জুযইয়াত (অংশীদার) এর সম্পর্কের দ্বারা। বেটা পিতার অংশ, তার বীর্য থেকে জন্মেছে সেজন্য সে তার বেটা। স্রেফ মৌখিক দাবি দ্বারা অংশ প্রমাণিত হবে না। এই অংশ জন্মগত।

যে বেটা সে বেটাই আর যে বাপ সে বাপই। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, যখন কেউ এই বাস্তবতার উপর চিন্তা-গবেষণা করবে, তখন আকল থাকলে নিজে নিজে লজ্জিত হবে। আর বলবে, ভাই! শুধু যবানে বলে দিলেই সন্তান কিভাবে হবে। সন্তান হওয়াও হাকিকী যে, সে উত্তরাধিকার সম্পদে অংশীদার এবং এককসমূহেও অংশীদার। এগুলো কি ধারণামূলক কারখানা যে, আমি বসে বসে

বলে দিব আর তা বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। অতএব বাপবেটা হওয়া ধারণামূলক বিষয় নয়। বরং তা জন্মগত বিষয় এবং আল্লাহর সৃষ্টি। কানুন বা আইনী প্রক্রিয়ায় যত জিনিস বানানো হয়, সেগুলো আবিষ্কৃত হয়, হাতে গড়া হয়। কিন্তু আল্লাহর কানুনের ভিত্তি হাকিকতের উপর। আর মানবরচিত কানুন তৈরি করা হয় নিজেদের নেতৃত্বের কারণে, নিজেদের হেফাজতের কারণে, যাতে নিজেরা হেফাজত হতে পারে। অন্যরা চাই নিষ্পেষিত হোক। কিন্তু আল্লাহর নিকট সবাই সমান। সবাই তার বান্দা তিনি সবার হিতাকাঙ্ক্ষী। সেজন্য তিনি কানুন প্রেরণ করেন সমগ্র মানুষের হেদায়েতের জন্য। তাই সকল বনি আদমের কর্তব্য হলো সেগুলোর অনুসরণ করা।

পার্সোনাল ল'র সেবা

এখন আমি বলব, বাঙ্গালোরবাসী অতিথিদের যে ধরনের আতিথেয়তা দেখিয়েছেন এবং মেহমানদারি করেছেন আর উন্নত চরিত্রের যে প্রমাণ তারা রেখেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা আমাদের আপাদমস্তকের সেবা নয়; বরং তারা পার্সোনাল ল'র খেদমত করেছেন, তারা ঐক্যবদ্ধ গ্রুপের খেদমত করেছেন, তারা খেদমত করেছেন সকল ফেরকা একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য। অতএব এটি এত বিশাল বড় নেয়ামত যে, আমি শব্দাবলির দ্বারা তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে পারবো না। কিন্তু তারপরও মানুষের ওপর অবশ্য কর্তব্য হলো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা– আল্লাহ তায়ালার ও মানুষের।

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ

যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।

কারণ, মানুষ যা করে তা আল্লাহতায়ালার তাওফীকেই করে। তাই প্রথমে আল্লাহর শুকর তারপর মাধ্যমের (মানুষের) শোকর। আমাদের কৃতজ্ঞতার স্থলে আপনারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন এটি আপনাদের উন্নত চরিত্রের আলামত ও পরিচয়।

কবি বলেন–

তিনি দানও করছেন আবার লজ্জাও পাচ্ছেন।

বাস্তবে এই শুকরিয়া আপনাদের জন্য সেই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে আপনার নাম-নিশানা অবশিষ্ট থাকবে। অতএব আল্লাহ তায়ালা আপনাদের দায়েমী করুন এবং আমাদের শুকরিয়াকেও দায়েমী করুন।

চিরস্থায়ী কৃতজ্ঞতা

মানুষ চিরস্থায়ী প্রাণী, মানুষ। অনাদি (যার সূচনা নেই) নয়; বরং চিরস্থায়ী (যার সূচনা আছে)। আযালি এজন্য নয় যেহেতু আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন; তার পূর্বে তাদের নাম-গন্ধও ছিল না। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا•

মানুষের উপর এমন বিশাল সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না, মুখে মুখে তাদের চর্চাও ছিল না।

কেউ জানতো না জায়েদ কে, বকর কে।

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে এভাবে যে তাকে পরীক্ষা করব। *[সূরা দাহর : ১-২]*

আমরা জন্মের পর জানতে পেরেছি, আমরা অস্তিত্বহীন ছিলাম। জন্মের পূর্বে আমারা অস্তিত্বহীন ছিলাম। জন্মের পূর্বে অস্তিত্বহীনতার ইলমও আমাদের ছিল না। জগতের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে তখন মানুষ ছিল না। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যখন সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন আর ধ্বংস হবে না, এখন মানুষ অনন্তকাল থাকবে আর কোন দিন সমূলে মিটে যাবে না।

মৃত্যু মানে ধ্বংস নয় যে মানুষ মউত আসার ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে, নিঃশেষ হয়ে যাবে। বরং মৃত্যু অর্থ ইন্তিকাল তথা স্থানান্তরিত হওয়া। এই বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি, ইহজগত থেকে পর জগতে স্থানান্তরিত হওয়া। সুতরাং এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি এক জগত থেকে অপর জগতে স্থানান্তরিত হতে থাকবে; কিন্তু মানুষ মিটে যাবে এমনটি হবে না।

নয় মাস মায়ের উদরে ছিলেন; এক জগতে ছিলেন। এই জগতের সময়সীমা নয় মাস। ওখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। এখন পৃথিবীতে আপনার বয়স ৬০/৭০/৮০ বা একশত বছর এখানে থাকবেন। এখান থেকে

স্থানান্তরিত হয়ে আলমে বরযখে পৌঁছবেন, যাকে আপনারা কবর নামে চিনেন। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন সেখানে আপনি কতকাল থাকবেন। কেয়ামত পর্যন্ত তো থাকতে হবেই। কেয়ামত সংঘটিত হলে আপনি হাশর জগতে স্থানান্তরিত হবেন। সেখানে একদিন থাকতে হবে। তবে হাশরের একদিন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য। হাশর জগতের বয়স হলো পঞ্চাশ হাজার বছর। এই জগতে পঞ্চাশ হাজার বছর অতিবাহিত করে স্থানান্তরিত হবেন জান্নাতপানে।

সুতরাং মানুষ সমূলে ধ্বংস হবে না। পিতার পিঠ থেকে, মায়ের পেট থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। সে চলতে থাকবে অনন্তকাল পর্যন্ত। সেজন্য আপনারাও বাকি থাকবেন, আমরাও বাকি থাকবো, আপনাদের চরিত্রও বাকি থাকবে; আমাদের শোকর বাকি থাকবে। উভয় বস্তু দায়েমি। তা চলতে থাকবে এবং জান্নাত পর্যন্ত সাথে থাকবে।

এক ধ্যান ও এক অন্তর

আপনাদের এই খেদমত বাস্তবে মেহমানদের জন্য নয় বরং এক বিশাল মাসয়ালার খেদমত করেছেন। পার্সোনাল ল'-এর খেদমত করেছেন, তাকে ব্যাপক করেছেন, তাকে প্রসার করেছেন। আপনারা চাচ্ছেন, সমস্ত মানুষ এ সম্পর্কে অবগত হোক। সেজন্য এই আজিমুশ্বান জলসার আয়োজন করেছেন। এই জলসা মূলত ওয়াজ-নসিহতের জলসা নয়। ওয়াজ-নসিহত দ্বারা তরবিয়ত হয় এবং এই জলসা ঘোষণার যে আপনারা সতর্ক করতে চান ওই খতরা সম্পর্কে, যা কানুনের উপর আগত। তা থেকে উত্তরণের পথ ও পদ্ধতি আপনাদের সামনে রাখা হবে। সেই পদ্ধতিগুলোর উপর আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলবেন।

এই জলসা এসব ঘোষণা করার জন্য, ওয়াজ ও নসিহতের জন্য নয়। ওয়াজের জন্য হাজার হাজার মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে ইবাদত, মুয়ামালাত ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এই জলসা শুধু ওয়াজ-নসিহতের নয়, এই জলসা আম ঘোষণার, যাতে আগত খতরা সম্পর্কে সতর্ক করা যায়। অতএব এখানে অনেক খতরা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে যে, অমুক মাসয়ালাকে পরিবর্তন করলে অমুক আশঙ্কা রয়েছে। পার্সোনাল ল'র মাসয়ালার মধ্যে অনুপ্রবেশ করলে এই এই খতরা দেখা দিবে। এই খতরাসমূহের উপর প্রস্তাবনা আসছে যেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

সুতরাং এই জলসা আম ঘোষণা এবং আম অনুমোদনের জন্য, যাতে আপনাদের ইত্তেহাদ বাকি থাকে, অটুট থাকে। আর এ কথা পরিষ্কার যে, মৌখিক কোন ইত্তেহাদ হয় না। আপনি যবানে বলে দিলেন আমি আপনার বন্ধু, সেও বলে দিলো আমিও আপনার বন্ধু; এমন বন্ধুত্ব স্থায়ী হবে না। কেননা, তা শাব্দিক ও মৌখিক বন্ধুত্ব। হাকিকতে বন্ধুত্ব হলো আন্তরিক বন্ধুত্ব। যে বন্ধুত্ব কলিজায় মিশে যায়, সেই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়। আর এমন দোস্তি কখন হবে? যখন উভয়ের ধ্যান-খেয়াল চিন্তা-চেতনা এক হবে। যদি খেয়াল ভিন্ন হয় আপনার রুখ একদিকে আমার অন্যদিকে, তাহলে কখনো একতা সৃষ্টি হবে না। আর যখন খেয়ালসমূহে একতা চলে আসবে, তখন আপনা আপনি ইত্তেহাদ সৃষ্টি হবে। অতএব পার্সোনাল ল' এবং কানুনে ইলাহী ও কুরআনুল কারীদের প্রত্যেকটি অংশের হেফাজত এমন বস্তু যে, এ কথার উপর সবাই একমত ও ঐক্যবদ্ধ। তার অর্থের মধ্যে মতানৈক্য করলে অভিমত ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু মৌলিক কুরআন ও হাদিসের কানুনের ব্যাপারে সবাই ঐক্যবদ্ধ।

এই মুহূর্তে আঘাত আসছে আমাদের খেয়াল ও চিন্তা-চেতনার উপর নয় বরং আঘাত আসছে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাতের উপর। তাই এহেন মুহূর্তে কোন ফেরকা ও দল এ কথা মেনে নিবে যে, কোন ব্যক্তি কুরআন ও হাদিসের মাসয়ালা পরিবর্তন করে ফেলুক। এ ব্যাপারে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে। অতএব আমাদের মাঝে ধ্যানের একতাও আছে, অন্তরের একতাও আছে।

সম্মিলিত মাকসাদ ও পরস্পর একনিষ্ঠতা

পরস্পর ইখলাসও রয়েছে। ইখলাস ও নিষ্ঠা ব্যতীত পরস্পর এভাবে একত্রিত হতে পারে না। আর ইখলাস এজন্য রয়েছে যে, মাকসাদ তো অভিন্ন। পৃথক পৃথক নয় বরং একই মাকসাদ। আর তাহলো কুরআন ও সুন্নাহ। এ দুয়ের মধ্যে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে পারে না। আপনি কী পরিবর্তন করবেন? পরিবর্তনের অধিকার তো স্বয়ং সাহেবে শরীয়ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও দেওয়া হয়নি। স্বয়ং নবী করীমকে হুকুম করে ইরশাদ করেছেন, হে নবী! আপনি এ কথা ঘোষণা দিন যে–

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ

আমার জন্যও বৈধ নয় যে, কোন ক্ষুদ্র অংশকে নিজ থেকে পরিবির্তন করব।

আমি স্রেফ বর্ণনাকারী, আমানতদার ও আহ্বানকারী। আল্লাহ তায়ালা যা কিছু হুকুম করবেন, তা হুবহু কোন প্রকার কম ও বেশি ব্যতীত তোমাদের সামনে রেখে দিব। এর মধ্যে আমার পক্ষ থেকে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব নয়। সুতরাং স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অনুমোদিত নন, তাহলে আপনারা তার অনুমোদন কিভাবে পাবেন। আর যখন আমরা এহেন কাজ করতে পারব না, তখন অন্য জাতিরা কিভাবে অনুমোদন পাবে, কিভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করবে? যদি তারা এহেন কাজের দুঃসাহস দেখায়, তাহলে মোকাবেলা হবে, প্রতিরোধ হবে। আর মোকাবেলা হলে সাহায্যও আসবে।

বান্দার যিম্মাদারী ও আল্লাহর নুসরাত

সাহায্য অর্জন এবং যুদ্ধ করার একটি বিশেষ মূলনীতি হলো এই, যদি আপনি দুর্বল ও কমজোর হন আর বিরোধী পার্টি অনেক শক্তিশালী হয়; আপনি তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে সক্ষম নন। তখন উসূল হল, কোন শক্তিশালীকে তাদের মোকাবেলায় দাঁড় করানো। সে যুদ্ধ করতে থাকবে আর আপনি বসে যুদ্ধের তামাশা দেখতে থাকবেন।

আজ কানুনের উপর আঘাত আসছে আর আপনাদের লড়াই করার শক্তি নেই। তাহলে সমগ্র মুসলিম জাতিকে আল্লাহর নামে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেন এবং তাদের বলে দিন এরা কুরআন ও হাদিসকে পরিবর্তন করতে চায়। সমস্ত কুরআনওয়ালা তা বুঝবে এবং লড়াই শুরু করবে আর আমরা আরামে বসে দেখব যে আল্লাহকে কারা পরাস্ত করতে পারে? তার কানুনকে কারা পরাজিত করতে পারে? এই আন্দোলনের পদ্ধতি এমন হতে পারে যে, আমরা কুরআন ও হাদিসকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করব। নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কথা বলব না, আমাদের বুদ্ধিও কিছু বলবে না, আমাদের চিন্তা-চেতনাও বলবে না। আমরা শুধু কানুনের আমানতদার, আমাদের দায়িত্ব হল পৌঁছানো। কানুন তো কানুনের মালিকের। আল্লাহর যদি কেউ লড়তে চায় তাহলে সে লড়বে কানুনের সঙ্গে, কানুনের আবিষ্কারকের সঙ্গে। আমরা তো আবিষ্কারক নই, আমরা বসে বসে তামাশা দেখব। যেমনটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছিল। মোকাবেলা হয়েছিল মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে। এ কথা জানা যে, মুসলমান সংখ্যায় অল্প ছিল এবং রসদ-হাতিয়ারও অল্প ছিল। আর মোকাবেলা

হয়েছিল এমন কওমের সঙ্গে যাদের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ রসদ ও যুদ্ধসামগ্রী ছিল। হেজাযের নেতৃত্ব তাদের হাতে ছিল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করলেন–

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ

হে নবী! আমাকে ছেড়ে দিন, আমার মোকাবেলার সামনে ওদের ছেড়ে দিন। আমি প্রতিশোধ নেব, শামাল দেব। আর আপনি বসে বসে দেখবেন।

সুতরাং আমাদের কাজও একই হবে। হে ভাই! তোমরা আমাদের সম্পদের উপর অথবা জাতের উপর হামলা করছ না। তোমরা সরাসরি আল্লাহর কানুনের উপর হামলা করছ। আর আল্লাহর কানুন আমাদের হাতে গড়া নয়। স্বয়ং আল্লাহর হাতে গড়া। অতএব তোমরা মোকাবেলা কর যদি তোমাদের সামর্থ থাকে, শক্তি তাকে। আমাদের দায়িত্ব তো আমরা পেশ করেছি যে, এটি আল্লাহর কানুন এতে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না। তারপরও করলে তোমরা তোমরা অপরাধী হবে আমাদের কোন অপবাদ নেই যে, আমরা অহেতুক তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তোমরা নিজেদের শামাল দাও।

অতএব মূলনীতি হলো যখন আপনাদের শক্তি না থাকবে, তাহলে কমপক্ষে এতটুকু শক্তি রয়েছে যে, নিজেদের দীনকে মজবুতভাবে ধারণ করবেন। আর অন্যদের বলে দিবেন এতে পরিবর্তন সম্ভব নয়। এতটুকু আপনি করবেন। জানেন। এখন লড়াই করার পর কে বিজয় হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

শাহে হাবশার পরাজয়

মক্কা মুকাররামার উপর আবরাহা বাদশার আক্রমণের কথা সবাই জানে। সে এই নিয়তে এসেছিল যে, বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করে ফেলবে (নাঊযুবিল্লাহ), যাতে মানুষের মন বাইতুল্লাহ থেকে ফিরে ওই ঘরের দিকে যায়, যা সে ইয়ামানে নির্মাণ করেছিল। এই নিয়তে সে বিশাল দেহ বিশিষ্ট হস্তিবাহিনী নিয়ে বায়তুল্লাহর পানে রওয়ানা হল এবং মক্কাকে ঘিরে ফেলল। তার ইচ্ছা ছিল বাইতুল্লাহকে চুরমার করে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলবে (নাউযুবিল্লাহ)।

আবরাহা খাজা আবদুল মুত্তালিবকে অবগত করাল, যদি তোমাদের কিছু বলার থাকে তাহলে এখানে এসে বল। তুমি হলে মক্কাবাসীদের সর্দার। খাজা আবদুল মুত্তালিব বলেন, সে তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাল এবং বলল, তোমার কোন কথা বা আবেদন থাকলে পেশ কর। তিনি বললেন, আমার কিছুসংখ্যক

উট আছে, কিছু গোলাম, বান্দী ও সম্পদ রয়েছে, যেগুলোকে আপনি হেফাজত করবেন এবং সেগুলোর উপর আপনি হাত বাড়াবেন না। এছাড়া আর কিছু বলতে চাই না।

আবদুল মুত্তালিবের কথা শুনে যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল এই ভেবে যে, মক্কার সর্দার কয়েকটি উট নিয়ে বসে আছে। আর বাইতুল্লাহর এত বস্তু সম্পর্কে কিছুই বলল না যে, জনাব তাকে চুরমার করবেন না, তার উপর হামলা করবেন না। তখন বাদশাহ তাকে বলল, আপনি নিজের উটগুলো সম্পর্কে কথা বলতে এসেছেন। আপনি একটি ব্যক্তিগত সম্পদকে অগ্রাধিকার দিলেন। অথচ আমার আগমনের উদ্দেশ্য হলো এই মার্কাযকে ধ্বংস করে ফেলব, যার উপর আপনাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। তা সম্পর্কে আপনি কিছুই বললেন না।

খাজা আবদুল মুত্তালিব বললেন, বাইতুল্লাহর মালিক আমি নই। এটি আল্লাহর ঘর, তিনি নিজেই আপনার থেকে প্রতিশোধ নিবেন, আপন ঘর হেফাজত করবেন। আমি তো আপন মালিকানা ও সম্পদ সম্পর্কে বলতে এসেছি। আল্লাহর মালিকানা সম্পর্কে বলতে আসিনি। সে ব্যাপারে তিনি জানেন আর আপনি জানেন। তার পরিণতি এমন হয়েছিল যে, আল্লাহ তায়ালা তার হস্তি বাহিনীকে কিছুসংখ্যক ছোট্ট পাখির মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন। বাইতুল্লাহ সঅবস্থায় বহাল ছিল। তার বাহিনীসহ সে উড়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্য হতে একজনও বাঁচতে পারেনি।

পার্সোনাল ল'-এ হস্তক্ষেপের কারণ

আমাদের ও আপনদের দায়িত্ব হল, প্রথমে আমরা সবাই এই কানুনের উপর আমল করব এবং নিজেদের ভিতর তাকে প্রবেশ করব। তারপর ঘোষণা করব, ইহা আল্লাহ প্রদত্ত কানুন, এতে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে পারে না। তারপরও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তাকে আল্লাহর মোকাবেলায় ছেড়ে দিব যে, আমরা তো তার উপর আমল করবই এবং ঘোষণাও করব তোমাদের মনে যা চায় তাই কর।

বাস্তব কথা হলো, কমতি আর অসতর্কতা আমাদের, আমরা নিজেরাই আমল করি না। পার্সোনাল ল' সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই। আমরা ওয়াকিফহাল নই যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ও বংশীয় আইন কী? সেগুলোর উপর আমলও করি না। যদি আমল করতাম, তাহলে অন্যরা নিজে নিজেই পরাস্ত হতো। কিন্তু আমাদের আমল না করার কারণে অন্যরা দুঃসাহস দেখায়, হস্তক্ষেপ করে।

কারণ, তারা জানে, মুসলমানদের খবর নেই যে, পার্সোনাল ল' কী। অতএব যে কোন উপায়ে তার রূপরেখা ও ধরন পাল্টে ফেল।

আমাদের বদ আমল ওদেরকে এই পথ দেখিয়েছে। আজ আমরা যদি সবাই মিলে এ কথার উপর একতা হয়ে যাই যে, জন্ম থেকে নিয়ে মরণ পর্যন্ত ইসলামি যত মুআশারাহ রয়েছে আমরা সেইগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করব। অতঃপর কোটি কোটি মানুষ যাদের সংখ্যা সাত কোটি বলা হয়। কিন্তু আনুমানিক দশ/বার কোটির কম হবে না, তারা সবাই মিলে যদি আমল করা আরম্ভ করে, তাহলে আমলের মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যে, অন্যদের চাক্কা ছুটে যাবে, সেই চাক্কা আর চলবে না। তখন মুখে বলার প্রয়োজন থাকবে না। আমাদের সকলের কাজ হলো আমল করা। তার উপর আরেকটি দায়িত্ব হলো ঘোষণা করা এবং পরিপূর্ণরূপে এ কথা অবগত করানো যে, এই কানুনের মধ্যে পরিবর্তন ও পরবর্ধন হতে পারে না। আর আমরা এহেন হঠকারিতাকে এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নেব না। আমাদের জীবন চলে যেতে পারে; কিন্তু কানুনের উপর আঘাত আসতে দেব না।

মুসলিমদের কর্তব্য ও শুকরিয়া জ্ঞাপন

এই ঘোষণা দেয়া আপনাদের উপর ফরজ, এগুলোর আমল করা ফরজ। এজন্য এই মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে, যাতে মুসলিম পার্সোনাল ল' সম্পর্কে কোন বিশ্লেষণ পেশ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের শুকরিয়া আদায় করা। আরেকটি হলো, পার্সোনাল ল'-এর উপর আপনারা একত্রিত হবেন। (আমল করবেন) ইল্‌মগত, আমলগত ও ঘোষণাগত। আর প্রচারও আপনারা করবেন। আর এই কথা সবাইকে অবগত করাবেন যে, এই কানুন আল্লাহর তায়ালার, আমরা তার আমানতদার। আমরা সামান্য সময়ের জন্যও তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা বরদাশত করব না। এই কটি কথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল। কোন ওয়াজ বা বয়ান করার ইচ্ছা ছিল না।

বোর্ডের একজন খাদেম ও সদস্য হিসেবে আমার এও ফরয ছিল যে, আপনাদের আতিথেয়তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। নিজের পক্ষ থেকে এবং এই সমস্ত বুযুর্গদের পক্ষ থেকে। আসলে তারা সবাই সম্মানিত ও বুযুর্গ। তারা আমাদের চেয়ারে এনে বসিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি এই কাজ কর। কোন কর্মের প্রধান তো মূলত ঐ ব্যক্তি হন, যিনি প্রধান বানান, নির্বাচন করেন। কারণ, তিনি

যাকে ইচ্ছা চেয়ারে বসাতে পারেন। আমি একজন নিশানমাত্র। কাজ তো এই সমস্ত বুযুর্গরা করেন।

প্রকৃতপক্ষে কাজ তারাই করেছেন। শুকরিয়া আদায়ে আমি তাদের প্রতিনিধিত্ব করছিমাত্র। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের উত্তম বদলা দান করেন। আপনাদের হালতসমূহে বরকত দান করুন। আমীন।

বয়ান : ৬

ইসলাম ও স্বাধীনতা

কোন জাতি যদি স্বাধীন হতে চায়, তাহলে প্রথমে তাদের মানসিকভাবে স্বাধীন হতে হবে। মনকে স্বাধীন বানাতে হবে। তারপর যে ধরনের আযাদী অন্তরে জাগ্রত হবে সেই আযাদী বাস্তবে প্রকাশ পাবে। এ কারণে ইসলাম বাহ্যিক আযাদীর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রথমে মানুষের ভিতরে আযাদী ও সাহসিকতার অবস্থা ও মর্যাদা সৃষ্টি করেন যাতে সেই নির্ভীকতা ও সাহসিকতার দ্বারা তার বাহ্যিক আযাদীও চলে আসে। তেমনিভাবে ইসলাম শুধু প্রথাগত স্বাধীনতার দাবিদার এবং পতাকাবাহী নয়, বরং বাতেনী (ভিতরগত) এবং বুনিয়াদী (স্থায়ী) আযাদী ও স্বাধীনতার আহ্বানকারী ও ঘোষণাকারী। ইসলাম মানুষকে রসমি ও সত্তাগত, বাহ্যিক ও বাস্তব উভয় প্রকার আযাদীর শিক্ষা দেয়।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ○ وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ○ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ○

আযাদীর মর্ম

বুযুর্গানে মুহতারাম!

ইসলাম আযাদীর সবচেয়ে বড় বাহক এবং পতাকাধারীই নয় বরং ইসলামই শুধু ইসলামই পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে। পৃথিবী যদি ইসলাম দ্বারা আলোকিত না হত, তাহলে কোন ব্রেইন আযাদীর মর্মার্থ এবং তার কোন কার্যকরী নকশা কোন চক্ষু ধারণ করতে পারত না। কেননা, বুদ্ধির দৌড়ের পরিধি হলো আযাদীর অর্থ কুঠীর, বাংলো, কেক-মিষ্টি, টোস্ট-মাখন,

খেলাধুলা, তামাশা, গান-বাজনা, খেলনা, মানবিক আরাম-আয়েশ, দেশে আমদানি ও রফতানি, আকাশ, ভূমি, জল ও স্থল পথে ভ্রমণ ও ঘোরাঘুরি। পার্টি ফিলিংস এবং তা দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্তকরণ, নব আবাদ এবং ভূমিদখলের লিপ্সার বিশেষ সুবিধাকে সামনে রেখে আইন প্রণয়ন এবং আইনী কৌশলের আড়ালে জাতি-গোষ্ঠীকে আশ্রয়হীন এবং অধিকারবঞ্চিত করা ছাড়া অন্যকিছু নয়। অন্যথায় গোলামি ও গোলাম বানানোর শব্দের জন্য কোন অর্থ বাকি থাকবে না। অপরদিকে আযাদীর হাকিকী ও প্রকৃত অর্থ হলো হক ও সততা, ন্যায় ও ইনসাফ, প্রাধান্য ও সংযমতার সত্যিকারের জযবা অনুকূলে আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দান করা, দুর্বল ও দরিদ্রদের উন্নত করা, বেকারত্ব সমস্যা দূর করা, তাদের কাজের ব্যবস্থা করা, অত্যাচারে নিষ্পেষিত ব্যক্তিদের সাহায্য করা, সীমালঙ্ঘনকারীদের থামানো। অন্য ভাষায় উঁচু-নিচুর পার্থক্য দূরীভত করে সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করা, যাতে দুর্বল শ্রেণী মাজলুম না হয় আর শক্তিশালী ও সামর্থ্যবানরা জালেম না হয়। বাড়াবাড়ির সুযোগ না পায়। অতএব স্বাধীনতার সারনির্যাস হলো স্বাধীনভাবে কোন প্রকার বাধা ব্যতীত পরিপূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যের সঙ্গে অধিকার আদায় করা, যার দ্বারা জালেমের জুলুম বন্ধ হবে আর মজলুমের অসহায়ত্ব চিরতরে নিঃশেষ হবে।

স্বাধীনতার ইসলামি চিন্তাধারা বা মূলনীতি

আযাদীর উক্ত মর্ম ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামের মূলনীতি ও চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যাক :

আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ○ وَ نُرِيْدُ أَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ○ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ○

ফেরাউন তার রাষ্ট্রে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করত আর

নারীদের জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল অনর্থ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী। দেশে যাদের দুর্বল করা হয়েছিল। আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদের নেতা বানানোর, তাদের দেশের উত্তরাধিকারী দান করার এবং তাদের দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে (ক্ষমতা হারানো) আশঙ্কা করত, যা থেকে তারা বাঁচতে চেয়েছিল। *[সূরা কাসাস : ৪, ৫, ৬]*

উক্ত আয়াতের সার সংক্ষেপ এই হয় যে, দুর্বলদের উন্নত করা, সহযোগিতা করা আর জুলুমবাজ শক্তি প্রয়োগকারীদের পদদলিত করা থামিয়ে দেওয়া। দুর্বলদের যে অধিকারগুলো শক্তিশালীরা নিজেদের ক্ষমতার জোরে জবরদখল করে রেখেছিল, সেইগুলো তাদের দাঁতের নিচ থেকে বের করে অর্থাৎ তাদের দখলদারি থেকে বের করে দুর্বলদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া, যাতে দুর্বলরা স্বাধীনভাবে শ্বাস নিতে পারে। আর যুগের ফেরাউন ও হামান চরিত্রের মানবরূপী পশুগুলো তাদের প্রকৃত চরিত্রে ফিরে আসতে পারে অন্যথায় খতম ও হারিয়ে যায়।

যদি আযাদীর অর্থ এই হয় এবং শক্তি ও সামর্থ্যের মাকসাদ এই হয়, নিঃসন্দেহে তাই হবে। যুগের ফেরাউনের জৈবিক মাকসাদ নয়, যার শিরোনামের ফিরিস্তি উপরের লাইনগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে ইসলাম ব্যতীত আর কে বা কোন্ ধর্ম রয়েছে যে, উক্ত মাকসাদকে আমানতদারী, দীনদারী ও চরিত্রের সাথে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে?

একথা অস্বীকার করি না, পৃথিবীর কোন জাতিই দাসত্বের প্রোগ্রাম নিজ জনগণকে দেয়নি। কিন্তু এ কথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, আযাদীর জয়ধ্বনি ও স্লোগান ওঠার পর সত্যিকারের স্বাধীনতার পরিপূর্ণ প্রোগ্রাম পেশ করার জন্য কোন জাতিই কষ্ট সহ্য করেনি। সুতরাং বিভিন্ন জাতির দাবি যা কিছু হয় কিন্তু তাদের নিকট আযাদীর ওই পরিপূরক প্রোগ্রাম নেই, যার দ্বারা বর্ণিত আযাদীর মাকসাদ অর্জন হতে পারে।

ইসলাম যেমনভাবে এমন আযাদীর দাবি করেছে, তেমনিভাবে তার আইন মোতাবেক কার্যকরী ও চারিত্রিক প্রোগ্রামও পেশ করেছে। সেজন্য স্বাধীনতার দাবির ব্যাপারে ইসলামকে সত্যিকারের দাবিদার বলা হবে। যেহেতু ইসলাম দাবির পাশাপাশি কার্যকরী প্রমাণও পেশ করেছে।

বিবেক ও মনের স্বাধীনতা

চিন্তা-গবেষণা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়, যাতে সত্যিকারের স্বাধীনতা এমন হয়, যাতে অহেতুক চাপ ও ভয়-ভীতি থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা যায়। আর তা এ ছাড়া সম্ভব নয় যে, প্রথমে মানুষের অন্তর ও দেমাগ এবং বিবেক স্বাধীন হবে। বিবেক, মন ও রায় স্বাধীন হলে আকল ও বুদ্ধি এবং অনুভূতি ও অনুভব স্বাধীন হয়, যাতে যা কিছু সে বোঝে তা নিজের জ্ঞান ও অভিমত দ্বারা বুঝতে পারে। অন্যদের চাপ ও বলপ্রয়োগ দ্বারা বুঝানো লাগে। অতঃপর তার বুঝ মোতাবেক আমল করতে পারে এবং তকেই কর্মসম্পাদন মনে করে। মানুষের সব রকমের আযাদীর সেলসেলা মন ও বিবেক থেকে। মন স্বাধীন হলে তার সারা পৃথিবী স্বাধীন, অন্যথায় সে স্বাধীন হয়েও গোলাম থাকে। আর সে গোলাম হলে তার পুরো পৃথিবী গোলাম।

ইসলাম সবচেয়ে বেশি চেষ্টা ও মেহনত ব্যয় করেছে মানুষের বাতেন তথা ভিতরকে স্বাধীন করার জন্য এবং তার আকল ও বোধশক্তিকে এত পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়েছে যে, স্বয়ং ইসলাম মানার ব্যাপারেও তার বাতেনে কোন প্রভাব মেনে নেয়নি, পছন্দ করেনি। মাদ্দি শক্তি প্রয়োগ তো দূরের কথা। মোজেযা, যা আল্লাহর কাজ তা নবীদের মাধ্যমে প্রকাশ হয়। তাকে নবুওয়াতের দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু মাসায়েল সত্যায়নের দলিল বানাননি। কারণ, মাসায়েলের সত্যতা দলিল ও হুজ্জত দ্বারা সুস্পষ্ট হয়। অলৌকিকতা দ্বারা সুস্পষ্ট হয় না।

দলিল ও প্রমাণ ব্যতীত স্রেফ অলৌকিকতার জোরে কোন বস্তুকে মেনে নিতে বাধ্য করা মূলত বলপ্রয়োগে বাধ্য করার নামান্তর যাকে জবরদস্তি ও বাধ্যকরণ বলা হয়, যার দ্বারা মাসয়ালার হাকিকত সুস্পষ্ট হতে পারে না যে, তার প্রত্যাখ্যান ও গ্রহণের ফয়সালা দেয়া যাবে। কেউ যদি দাবি করে, নামাজ ও যাকাত সত্য, হজ্ব ও রোজা আবশ্যক, বিবাহ ও তালাকের অমুক পদ্ধতি সঠিক, ক্রয় ও বিক্রয়ের অমুক নিয়ম সহীহ এবং ওই নিয়মটি অবৈধ, শাস্তি ও যুদ্ধ এর জন্য এই সময়টি উপযোগী আর ওই সময় বা স্থান উপযুক্ত নয় আর লোকটি দলিল হিসেবে যদি এ কথা বলে, আমি চোখের ইশারায় বিল্ডিং ধ্বংস করতে পারি বা মৃত্যুকে জীবিত করতে পারি অথবা বলে, আমি পাখীদের কথা বুঝি, তাহলে এ কথা সুস্পষ্ট যে, ওই সমস্ত অলৌকিকতার দ্বারা তার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশ পাবে। কিন্তু মাসায়েলের গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা তা দ্বারা

ফয়সালা করা যাবে না। দেওয়াল ভেঙে ফেলা, মৃতকে জীবিত করা এবং পাখিদের ভাষা বুঝার দ্বারা মাসায়েলের গ্রহণযোগ্যতাকে আবশ্যক করে না।

প্রকাশ থাকে যে, শুধু ওয়াল ভেঙে ফেলার দ্বারা কোন মাসয়ালাকে মানানো আকলের উপর চাপ প্রয়োগ করার নামান্তর যে, সে দলিল-প্রমাণ ছাড়া মাসয়ালাকে স্বীকৃতি দিবে। কেননা, মাসয়ালার গ্রহণযোগ্যতার সম্পর্ক দলিলের সাথে, অলৌকিকতা প্রকাশের সাথে নয়। অলৌকিকতার দ্বারা নবীগণ আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত পুরুষ তা অবশ্যই সুস্পষ্ট হবে। কিন্তু এমনটি জরুরি নয় যে, তা দ্বারা নবীদের আনীত মাসায়েলের গ্রহণযোগ্যতাও মস্তিষ্কে এসে যাবে। বরং তা গ্রহণযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত হওয়া দলিল দ্বারা সুস্পষ্ট হবে। মুজেযা সমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট হবে না।

বাকশক্তির স্বাধীনতা

সুতরাং যদি অলৌকিকতার দ্বারাই মাসায়েলের যথাযথতাকে জবরদস্তি মানানো হতো এবং অন্তর্দৃষ্টিকে প্রামাণিক পথ থেকে হটিয়ে মাসায়েলের যথার্থতা বা গ্রহণযোগ্যতা পর্যন্ত পৌঁছতে অনুমতি না দেওয়া হত, তাহলে অবশ্যই তা আকলের উপর এক ধরনের অহেতুক চাপ প্রয়োগ হত, যার দ্বারা আকলের স্বাধীনতার মাঝে বাধা সৃষ্টি হত। অথচ ইসলাম আকলকে স্বাধীনভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের সুযোগ দিয়েছে। এজন্যই অলৌকিকতাকে নবীদের নবুওয়াতের দলিল তো বলেছেন কিন্তু মাসায়েলকে যুক্তিসঙ্গত বুঝার জন্য তাকে দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। বরং তার জন্য কারো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দূর হয়ে আসার জন্য মুজেযা এবং অলৌকিকতাই উত্তম দলিল হতে পারে। আর ইজ্জত ও প্রমাণ এবং বিজ্ঞতা ও মেধার রাস্তা উন্মুক্ত করা হয়েছে মাসায়েলের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যে, এটি আসল মানদণ্ড ও প্রমাণপত্র। সুতরাং কুরআনুল কারীম একজন মাননেওয়ালার পবিত্র গুণাবলি এই বর্ণনা করেনি যে, সে শুধু কোন শক্তি বা মুজেযা এবং অলৌকিকতার চাপে মাসয়ালাকে মেনে নিবে। চাই সে তাকে অযৌক্তিক মনে করুক। বরং এমনটি বর্ণনা করেছে–

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ○

এবং (এই মুমিন বান্দা) এমন যে, যখন তাকে আল্লাহর আহকামের মাধ্যমে নসিহত করা হয়, তখন তার উপর বধির

ও অন্ধের ন্যায় লুটিয়ে পড়ে না বরং বুঝেসুঝে মনোনিবেশ করে, যাতে মানার সাথে বুঝও থাকে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্য ইরশাদ হলো–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

আপনি বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝেসুঝে দাওয়াত দেই– আমি ও আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই (যে পূর্ব পুরুষদের রীতিনীতিকে দলিল-প্রমাণ চাড়া মেনে নিব)। *[সূরা ইউসুফ : ১০৮]*

হযরত ইবরাহীম আ. যেখানে নিজের সত্যতা ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার দলিল আগুন শীতল ও আরামদায়ক হওয়ার মুজেযা দ্বারা পেশ করেছেন, সেখানে আল্লাহর তাওহীদ স্বীকার করানোর জন্য অলৌকিকতার স্থলে নমরুদের সাথে দালিলিক বিতর্ক করেছেন, যা হয়েছিল হুজ্জত ও প্রমাণভিত্তিক। তিনি কোন মুজেযা দ্বারা তাকে চুপ করানোর চেষ্টা করেননি। হযরত মুসা আ. যেখানে লাঠি ও ইয়াদে বায়জার মুজেযা পেশ করেছেন, যাতে নিজের পয়গম্বর হওয়া প্রমাণিত হয়, সেখানে মাসায়েল বুঝানোর জন্য কোন মুজেযা ব্যবহার করেননি। বরং ফেরাউনের সাথে কথোপকথন করেছেন হুজ্জত ও দলিল দ্বারা, যার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনুল কারীমে সংরক্ষিত রয়েছে। ঠিক একই শিরোনামের উপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে হাজারো মুজেযা দেখিয়েছেন, সেখানে মাসায়েলের অধ্যায়ে শুধু একটি মুজেযা পেশ করেছেন। আর তা ছিল কুরআনুল কারীম, যা হুজ্জাত ও বুরহান দলিল ও প্রমাণ এবং যুক্তিগত ও অনুভূতিগত ধরনের দলিলসমূহে ভরপুর। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নবী হওয়ার কারণে দলিল গ্রহণ পদ্ধতি তথা মুজেযাওয়ালা শরীয়ত দান করেছেন।

উপরের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, সুস্পষ্ট হয় যে, মাসায়েল বোধযোগ্য ও শ্রবণযোগ্য হওয়া, তা স্বভাবজাত এবং অত্যন্ত সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা সাবেত হয়। অলৌকিকতার মাধ্যমে নয়। অলৌকিকতা ও মুজেযার জোরে মাসায়েল মানাতে গেলে এমন একটি চাপ প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে আকল ও বুদ্ধির স্বাধীনতা রহিত হয়ে যায় এবং মানুষকে আকল ও চিন্তাশক্তি দেওয়া ও না দেওয়া সমান

প্রমাণিত হয়। সুতরাং ইসলাম আযাদীর সবক শিক্ষা শুধু বাহ্যিক ও উপর অংশকে দেয়নি বরং মানুষের বাতেন সর্বপ্রথম আযাদীর দৌলত প্রদান করেছেন। মানুষের বিবেক, বুদ্ধিকে স্বাধীন করেছেন। তার আকলকে আযাদ করেছে, তার বোধ ও চিন্তাশক্তি স্বাধীন করেছেন। সংক্ষিপ্ত শব্দে বলা যায়, মানুষের হাকিকতে সত্তাকে আযাদীর বীজ রোপন করেছেন এবং তাকে স্বাধীন দেহধারী বানিয়েছেন। সুতরাং বিবেক ও বুদ্ধির আযাদী ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ, যার উপর থেকে ইসলাম সকল বহিরাগত প্রভাব এমনকি খোদায়ী কর্ম (মুজেযাসমূহ) এর চাপকেও অবশিষ্ট রাখেননি।

মতের স্বাধীনতা

স্বাধীন মনের পর মা ফিয্ যমির অর্থাৎ স্বাধীন রায়-এর অবস্থান। দীনদারী হিসেবে অন্তর যদি কোন বিষয়কে হক জানে, তাহলে তাকে প্রকাশ্যে প্রকাশ করার অধিকার দেয়াও ইসলামের স্বভাবজাত উন্নত চরিত্রের কর্ম ছিল। বিবেকের আহ্বান, অন্তরের ইখলাসপূর্ণ একটি আপিল বন্ধ রাখার জন্য অন্তরে উত্থাপন করা হয়নি বরং প্রকাশ করার জন্য এবং প্রকাশ্যে প্রকাশ করার জন্য উদয় করা হয়েছিল। কোন বড় বস্তুকে অধিকার দেয়া হয়নি যে, সে বিবেকের আহ্বান এবং সত্য অন্তর হতে উদয় হওয়া অভিমত পেশ করার জন্য শর্তারোপ করবে। একে সত্যায়ন করা ও মিথ্যা আখ্যা দেয়া অথবা হৃদয়গ্রাহী করা ও প্রত্যাখ্যান করা সবার ইখতিয়ার আছে, তবে হুজ্জত ও প্রমাণের ভিত্তিতে। কিন্তু তাকে প্রকাশ করতে না দেওয়া কারো অধিকার নেই।

যদি রায়কে স্বাধীনতা দেয়া না হয়, তাহলে বিবেকের স্বাধীনতার কোন মানে হতে পারে না। বর্ণিত আছে, সাধারণ একজন মানুষের রায়ের উপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রায়কে প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বারিরাহ রাযি.কে বললেন হযরত মুগীসের সাথে সম্পর্ক না ভাঙতে। হযরত বারিরাহ রাযি. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি কি হুকুম, না মশওয়ারা? তিনি বললেন, হুকুম নয় বরং মশওয়ারা ও অভিমত। বারিরাহ রাযি. বললেন, তাহলে রায় মানা ও না মানার ব্যাপারে আমি স্বাধীন। পরিশেষে তিনি মানেননি। একদিকে নবীর রায় যিনি খাতিমুল আম্বিয়া হওয়া ছাড়াও একজন সর্বজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ। আর অপর দিকে একজন মহিলার রায়, যার সত্তাকে নাকিসুল আকল মনে করা হয়। কিন্তু

ইসলামের দান করা স্বাধীন অভিমতের স্থান এত উঁচু যে, একজন নারীর রায়ের উপর নবীর রায়ের সামান্য চাপকেও বৈধতা দেয়নি।

সুতরাং ইসলামের জন্মগত স্বাধীনতা, মানুষের স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রথম তার বাতিনকে স্বাধীনতা দান করেছে। তার আকল, বিবেক ও রায়কে স্বাধীন রেখেছে এবং তার উপর এমন কোন চাপকে পছন্দ করেনি, যা তার জন্মগত প্রকাশিত বস্তু এবং চাহিদাকে পদদলিত করবে।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম মানুষের অভ্যন্তরে নবুওয়াত ও মুজেযাত তথা নবীর কর্ম এবং আল্লার কর্মের চাপ প্রয়োগকেও বরদাশত করে না, মেনে নেয় না, যতক্ষণ না মানুষের অন্তর স্বয়ং অন্তরের ঝোঁক ও নিজের অভ্যন্তরীণ চাপ তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। তাহলে ওই ইসলাম মানুষের অভ্যন্তরে ইট-পাথরের আঘাত, স্বর্ণ-রূপা ও হীরা-জাওহারের চাপ, তীর-বল্লম, গ্যাস, বোমার আঘাত, কারো প্রথাগত কুরবানী বা হাঙ্গামাপূর্ণ নেতৃত্বের চাপ প্রয়োগ কিভাবে পছন্দ ও সহ্য করবে? ইসলাম স্বয়ং নিজেকে তলোয়ারের জোরে কারো মধ্যে প্রবেশ করাতে চায় না এবং কোন প্রকার প্রথাগত চাপ দ্বারা নিজের গায়ে ঘুণ পোকা এবং রংচটা ও মরীচিকা ধরুক তার অনুমতি দেয় না।

ইসলাম পরিষ্কার ঘোষণা করেছে–

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে।
[সূরা বাকরা : ২৫৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেদায়েত দিয়ে বলা হয়েছে–

اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

আপনি জোর করে তাদের মুমিন বানাতে পারবেন চান নাকি?

সুতরাং যে ইসলাম দীন গ্রহণে মানুষের দিল ও বিবেককে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে, সেই ইসলাম অভিমত এবং তবিয়তের মৌলিক তাকাজাকে শর্তযুক্ত ও বাধ্য করা এবং পরাধীন বানানো কিভাবে পছন্দ করবে? অতএব ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেছে এবং মানবাত্মা, মানব মতামত, মানব অন্তরের আহ্বানকে নিজ ইচ্ছামাফিক বের হওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছে।

বাহ্যিক স্বাধীনতা অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার অনুগামী

প্রকাশ থাকে যে, বাহ্যিক আযাদী, অভ্যন্তরীণ আযাদীর অনুগামী হয়। যদি মন স্বাধীন হয়, তাহলে তার বাহ্যিক অবস্থাও স্বাধীন থাকে। তবে শর্ত হলো, অভ্যন্তরে সত্যিকারের স্বাধীনতা এবং গোলামিমুক্ত হতে হবে এবং তা অভ্যন্তরের সত্যিকারে ভাষ্যকার হবে, শাব্দিক ভাষ্যকার নয়, যাতে কোন হাকিকত নেই। সুতরাং আযাদী হোক বা গোলামি হোক প্রথমে তা অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়, তারপর তার বহিরাংশ আযাদ বা গোলাম হয়।

কুরআনুল কারীম সায়েন্টিফিক হাকিকত ও মূল তথ্য বলে দিয়েছে–

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

নিঃসন্দেহের আল্লাহ তায়ালা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের (অভ্যন্তরীণ) অবস্থা পরিবর্তন করে। *[সূরা রাদ : ১১]*

সুতরাং বাহ্যিক আযাদী তখনই প্রকাশ পায়, যখন অভ্যন্তরীণ আযাদী থাকে, বাহ্যিক ইনকিলাব তখনই প্রকাশ পায়, যখন ভিতরে থাকে। বাহ্যিক গোলামি তখনই আসে, যখন অন্তরে গোলামি প্রবেশ করে।

যদি কোন জাতি স্বাধীন হতে চায়, তাহলে প্রথমে তাদের মনের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। অতঃপর যে ধরনের আযাদী অভ্যন্তরে সৃষ্টি হবে, তা বাইরে প্রকাশ পাবে। সেজন্য ইসলাম বাহ্যিক বা বহিরাংশে আযাদীর পরিবেশ (ময়দান) সৃষ্টি করার জন্য প্রথমে মানুষের অভ্যন্তরে আযাদী ও নির্ভীকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, যাতে ওই নির্ভীকতা ও সাহসিকতার কারণে তার বাহ্যিক আযাদী ও উক্ত পরিবেশে পরিবেষ্টিত হয়ে যায়। তেমনিভাবে ইসলাম শুধু বাহ্যিক আযাদীর দাবিদার এবং পতাকাধারী নয়, বরং অভ্যন্তরীণ ও স্থায়ী আযাদী ও স্বাধীনতার আহ্বায়ক। ইসলাম মানবজাতিকে প্রথাগত ও অর্থগত, আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত উভয় প্রকার আযাদীর শিক্ষা দেয়।

অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা

অভ্যন্তরে ইসলামি স্বাধীনতার মর্ম হলো মানুষের অন্তর প্রত্যেক বস্তুর চাপ থেকে মুক্ত হয়ে হকের পাবন্দ (অধীন) হওয়া। সমগ্র গাইরুল্লাহর শাসন ও বাদশাহী থেকে স্বাধীন হয়ে আল্লাহর শাসনের ছায়াতলে চলে আসা। যদি এই হক গ্রহণ এবং বাতেল পরিত্যাগ বিবেকের জাওহার (মূল ধাতু) হতে পারে, যা

সত্যিকারের স্বাধীনতার নির্যাস সারসংক্ষেপ, তাহলে এমন অন্তর হতে আসল আযাদী বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে, প্রকাশ পাবে। হকপন্থীরা বিজয়ী হবে আর বাতেলপন্থীরা পরাজিত হবে। সিদ্দিকীন (চির সত্যবাদী) ও সালেহীনদের আলো ছড়িয়ে পড়বে এবং ফেরাউন ও হামানদের নিয়ম-নীতি বন্ধ হয়ে যাবে।

লাঞ্ছনাপূর্ণ গোলামি

কিন্তু যদি হক থেকে আযাদ হয়, নফসের অনুসরণ করে এবং গাইরুল্লাহর চাপের প্রভাবে ছিল এবং বিবেক পরাজয় বরণ করে অর্থাৎ স্বয়ং নিজের উপর সন্তুষ্ট নয় এবং বহিরাগত প্রভাবে প্রভাবিত এবং নিজের মৃত্যুতে তথা পরাজয় নিজেই লজ্জিত। কেমন যেন সে হক থেকে মুক্ত এবং বাতিলের গোলাম (যা ইসলামি স্বাধীনতার বিপরীত) তাহলে সেই প্রকারের আযাদী বাইরে প্রকাশ পাবে। ফলে ফেরাউন ও হামানরা ক্ষমতার চেয়ারে সমাসীন থাকবে। আর সালেহ ও সিদ্দিকীনরা নিঃসঙ্গ বনে যাবে। আর এমন আযাদী দ্বারা নিঃসন্দেহে পৃথিবী আবাদ হবে না বরং বরবাদ ও ধ্বংস হবে, যাকে সহীহ হাদিস শরীফে কেয়ামতের আলামত (যার দ্বিতীয় নাম ফেতনা যা সমগ্র জাতি এবং বিশেষ করে আলেমদের জন্য ধ্বংসাত্মক বিষ) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিবরাইল আ. কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন–

أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ

(কেয়ামত এবং বিশ্বধ্বংসের নিকটবর্তী সময়ে) বান্দি আপন মালিকা জন্ম দিবে অর্থাৎ মেয়েরা পর্যন্ত তাদের মায়ের উপর হুকুমত চালাবে, যে মেয়ে ছেলেদের তুলনায় অধিক মায়ের অনুগামী হয় (এটি হলো ঘরোয়া জীবনযাত্রার ধ্বংস)। আর শাসন ও নগর অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মুআমালা ধ্বংসের দৃশ্য হলো এই যে তোমরা দেখবে পায়ে জুতা নেই, শরীরে কাপড় নেই (একেবারে নিম্ন শ্রেণীর লোক) ছাগলের রাখাল অর্থাৎ অসভ্য প্রকৃতির মানুষ সুউচ্চ বিল্ডিংয়ে অহংকার করবে।

অর্থাৎ অভদ্র ও অসভ্য প্রকৃতির মানুষের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাবে। আর বিজ্ঞরা উদ্দেশ্যহীন বেকার ঘুরাফেরা করবে। এমন কর্তৃত্ব প্রকাশ্যে তো আযাদী হবে; কিন্তু বাস্তবে তা লাঞ্ছনাকর গোলামি হবে, যা হকের গোলামির পরিবর্তে নফসের গোলামির প্রেমে জড়িয়ে পরিশেষে জাতিকে ব্যাপক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।

অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে অভ্যন্তরীণ আযাদীর অর্থ হলো বিবেকের স্বাধীনতা, জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং চিন্তা ও ফিকিরের স্বাধীনতা, যা দ্বারা মানুষ নিজে নিজেই নিজের মনের ভাব প্রকাশে সাহসী এবং নির্ভীক হবে। আর বাহ্যিক আযাদীর অর্থ হলো অন্তরের আহ্বান মোতাবেক কার্যকরী পদক্ষেপসমূহে এমন নির্ভীকতা ও শক্তি সৃষ্টি হওয়া যাতে হকের কার্যাবলি প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন করতে কারো ইতস্ততার শিকার না হতে হয় এবং মানুষদের ভর্ৎসনাকারীদের পরওয়ানা করতে হয় এবং উপদেশ দাতার উপদেশের অপেক্ষা না করতে হয়।

একমাত্র ইসলামই আযাদীর পতাকাধারী

উক্ত হাকিকত সামনে আমরা বলতে পারি যে, ইসলাম শুধু আযাদী নিয়ে আসেনি বরং আযাদীর মর্ম, অর্থ বুঝানোর জন্যও এসেছে। ইসলাম বাহ্যিক আযাদীর জন্য আসেনি বরং বাতেন ও অভ্যন্তরীণ আযাদী দান করার জন্য এসেছে। ইসলাম আযাদীর অর্থ ও মর্ম বুঝানোর জন্য প্রথমে গোলামির অর্থ বুঝিয়েছে যে, গোলামির সংক্ষিপ্ত শিরোনাম হলো নফস ও শয়তানের অনুসরণ করা। চাই কোন ব্যক্তি বা জামাত তার আনুগত্যের শিকার হোক না কেন। অতঃপর এই নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ দ্বারা আযাদীর অর্থ বুঝিয়েছে যে স্বাধীনতা হলো হকের গোলামির অপর নাম। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গেতে যারা হকের গোলাম হবে, তারাই আযাদ হবে আর যারা হক থেকে মুক্ত হবে, তারাই গোলাম বা পরাধীন। এতে প্রতীয়মান হলো, ইসলামে আযাদীর অর্থ লাগামহীন উট হওয়া নয় বরং মহব্বত ও দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে হকের অনুসারী বনে যাওয়া।

আযাদীর মাপকাঠি

বর্তমানকালে কোন জাতি বা দেশ যদি আযাদ হয়, তাহলে তাদের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার ফয়সালা বা যাচাই করা হবে এই মূলনীতির ভিত্তিতে যে, যদি তারা স্বাধীনের পর নিজেদের মনের সহজ সত্য আহ্বানে আল্লাহর সৃষ্টজীব

থেকে উঁচুতা-নীচুতা দূরীকরণে নির্ভীক হয়, দুর্বলদের শক্তিশালীকরণে এবং তাদের হারানো অধিকার ফিরিয়ে দিতে এবং জোর ও জালেমের জুলুমের পাঞ্জাকে ভেঙে ছিন্ন করে তাদের থেকে আত্মসাৎকৃত সম্পদ ছড়িয়ে নিতে কোন বাধা না হয়, তাহলে স্বাধীন; অন্যথায় পরাধীন। আর যদি ঘটনাক্রমে এমন হয় যে, অন্যের নয় বরং নিজের অপদস্থ নফস এবং তার লোভ লালসার গোলাম হয়, তাহলে এই অভ্যন্তরীণ ও ভিতরগত গোলামি কিছুদিন পর বাহ্যিক ও বহিরাগত গোলামিকে নিজের দিকে টেনে নিবে।

একথা স্পষ্ট যে, আযাদী দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তবে স্বাধীনকৃত দেশের ভিতর যদি স্বাধীন হয় এবং তার ইনসাফ ও সমতার সত্য জযবা এবং সেই পবিত্র জযবার স্বচ্ছ পদক্ষেপসমূহ কোন বহিরাগত চাপকে না মানে, পরোয়ানা না করে এবং কারো ভর্ৎসনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়, যাতে ওই সাম্য ও সমতার মাঝে জাতীয়তা, বর্ণ, বংশ, দেশ, সম্পদের লিপ্সা, ক্ষমতার লোভ ও ভ্রান্ত পরিবেশ ইত্যাদির কোনটাই তার জযবা ও কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে, তাহলে উক্ত দেশ স্বাধীন আর ওই জাতি আযাদী পেয়ে ভাগ্যবান। আর নিঃসন্দেহে ভিতরগত এই আযাদী বাহ্যিক আযাদীকে অনেক ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী করবে। সুতরাং সত্যিকারের স্বাধীনতা হলো যাতে ভিতর ও বাহির একইভাবে স্বাধীন হয়। তার বিপরীত না হওয়া যে, বাহ্যিকভাবে তো আযাদী আছে; কিন্তু অন্তরে বা অভ্যন্তরে গোলামির চোর সিঁদ খনন করছে। অথবা মৌখিক হাকীকী আযাদীর দাবিতে অতিশয় প্রশংসাকারী হয়; কিন্তু অন্তরে তার বিপরীত জযবার তুফান বয়ে চলে বা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ইসলামি স্বাধীনতার প্রভাব

ইসলাম পরিপূর্ণ আযাদী নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে। যেখানে সে আযাদীর সুখ্যাতি সমুন্নত করেছে আর তার আহ্বানে পবিত্র অন্তর মানুষ নিজেদের মনের আওয়াজ দ্বারা লাব্বাইক বলে গ্রহণ করেছে, সেখানেই উত্তরাধিকারী তৈরি হয়েছে। নিচু শ্রেণী উঁচু হয়েছে। উঁচু নিচু হয়েছে গোলাম এবং মনিবের মধ্যকার তফাৎ দূর হয়েছে। অসহায় ইয়াতীমরা ছেঁড়া জুব্বা ফেলে দিয়ে নাজ ও নেয়ামতের মর্যাদার পোশাক পড়েছে। মজলুমদের আরশ কাঁপানো ফরিয়াদ বন্ধ হয়েছে। দুর্বলবাদীদের গর্ভে আযাদ সন্তান জন্মেছে। আশ্রয়হীন, বেওয়ারিশ অন্যের উত্তরাধিকারী হয়েছে। যাদের শোয়ার জন্য সহজে মাটির বিছানা জুটতো

না, তারা কাতানের কাপড় দ্বারা নাক পরিষ্কার করছে। যারা একটু নড়েচড়ে নিজের সেবা করাকে লজ্জা মনে করত, তারা আজ মাখলুকের সেবক হয়েছে।

মোটকথা, ইসলাম আযাদীর যে বিপ্লব ঘটিয়েছে, তা উঁচু-নিচু এবং আমি-তুমির তমিয করার ইনকিলাব ছিল না। বরং উঁচু নিচু মিটানো এবং আমি-তুমির কিসসা নিঃশেষ করার ইনকিলাব ছিল। আইনি সাম্য, শিক্ষাগত সমতা, সম্পদের ভারসাম্য, সমমর্যাদা, ধনী ও গরিবের মিলন, উঁচু ও নিচুর সংমিশ্রণ, গোলাম ও মনিবের একতা, সাদা ও কাল একই নজরে দেখার ইনকিলাব ছিল, যা এ ছাড়া অসম্ভব ছিল না যে, এই আমীর ও গরিব, সাদা ও কালো, উঁচু-নিচু ইত্যাদি দেখা ব্যতীত সবাই মিলে এমন এক সত্তাকে দেখা, যিনি সবার থেকে উত্তম এবং তেমনিভাবে সকলের রোখ একে অপরের দিকে করা ব্যতীত সবার রোখ এক মার্কাযের দিকে হবে যিনি এক ও নিয়ন্ত্রক।

সুতরাং ইসলাম আযাদী ও আযাদী লাভের পদ্ধতির এই হাকিকত, যাতে সমতার সঙ্গে একে অপরের সেবা বরং ত্যাগের জযবামূলক কাজ শিক্ষা দেয়। স্বয়ং মানুষের আপন ব্যক্তিত্বের আযমত, পারিভাষিক আত্মসম্মানবোধ দ্বারা প্রকাশ পাবে না বরং প্রতিটি ব্যক্তির গোপন আযমতকে মিটিয়ে হকের আযমত অন্তরে মিলিয়ে সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য ইসলামি আযাদীর অর্থ নফসের গোলামি এবং গাইরুল্লার গোলামি নয় বরং হকের গোলামি। সুতরাং আযাদী শব্দটি ইসলাম এবং অইসলাম ও উভয়ের নিকট সমান। কিন্তু উভয়ের নিকট অর্থগত বিরাট পার্থক্য রয়েছে। 'ইসলাম ও আযাদী' এই শিরোনাম যখন সামনে ভেসে ওঠে, তখন উক্ত বিশদ ব্যাখ্যাকে সামনে রাখা উচিত, যাতে অন্যদের শাব্দিক আযাদী হতে ইসলামের হাকীকী আযাদী পৃথক হতে পারে।

বয়ান : ৭

উত্থান ও পতন

মুসলিম জাতি দুনিয়াকে কিছু দিতে এসেছে, গ্রহণ করা এবং ভিক্ষা-প্রার্থনা করার জন্য আসেনি। প্রকাশ থাকে যে, তারা এমন কিছু দিতে পারে, যা অন্যদের নিকট নেই। তাদের নিকট রয়েছে। সুস্পষ্ট কথা হলো, তা দুনিয়াবী দৌলত ও প্রাচুর্য বা ইজ্জত ও মালের স্তূপ নয়। তা তো সবার নিকট আছে। বরং এগুলো থেকে বেশি দামি বস্তু তাদের হাতে রয়েছে। তাদের প্রদানকৃত বস্তু পরিবর্তন হয় না; একই থাকে। আর তা হলো সনদযুক্ত মজবুত দীন। মুসলিমরা এই ফিতরাতে ইলাহীর উপর নিজে চলে, অন্যদের পরিচালনা করতে পারে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا۔

উত্থান ও পতনের মাপকাঠি

প্রত্যেক জাতির জীবনের একটি মানদণ্ড ও মূলনীতি থাকে, যা দ্বারা তাদের উন্নতি ও অবনতি এবং ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী বা ধ্বংস ও অবশিষ্ট থাকার পরিচয় মিলে। মুসলমানদের অবস্থা এবং ভবিষ্যতের উপর গবেষণা করার জন্য এই পথটি অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত যে, তাদের বুনিয়াদী মূলনীতিকে সামনে রাখবে। আশপাশের অবস্থা, হাঙ্গামাপূর্ণ ঘটনাসমূহ অথবা ব্যক্তিগত অভিমত মাপকাঠি হতে পারে না। এগুলো দ্বারা কোন জাতির উন্নতি ও অবনতির পরিচয় হবে না। মুসলিম জাতির মূলনীতি হিসেবে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং প্রথম শতাব্দির আমলসমূহই সামনে আসতে পারে, যা তাদের উন্নতির যুগ। উম্মত যে পরিমাণ তাদের মোতাবেক হবে সেই পরিমাণ তাদের স্থায়িত্ব ও উন্নতির আশা করা যাবে, বিশ্বাস করা যাবে এবং তাদের উন্নতি অন্তর্নিহিত হবে। আর যে পরিমাণ তাদের থেকে দূরে থাকবে, সেই পরিমাণ অবনতির কারণ হবে। তারা তাদের থেকে সরে যাওয়ার এবং রাস্তা পরিবর্তনের চেষ্টা করবে এবং তাতেই তাদের অবনতি নিহিত। জনাবের এমন অনুভব একেবারেই যথাযথ যে, মুসলিম জাতি

দুনিয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে তাদের সামনে ভিক্ষুক ও প্রার্থনাকারী সেজে জীবিত থাকতে পারে না। কিন্তু অমুখাপেক্ষিতা ও স্বনির্ভরতার অর্থ একতা নষ্ট, ঘরের কোণে বসে থাকা এবং পৃথক থাকা পছন্দ করা নয়। বিশেষ করে বর্তমান আন্তর্জাতিক যুগে এভাবে থাকাও মৃত্যু সমতুল্য। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, মুসলমানরা অন্যান্য জাতি থেকে স্বনির্ভর থাকবে, ভিক্ষুক ও প্রার্থনাকারী হবে না আবার সকল জাতির জনতার ভিড়ে সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, তাদের মাঝে প্রবেশও করবে। একসাথে চলবে, তাহলে এই প্রবেশের কী অর্থ হতে পারে? তার জবাব হলো, তারা ভিক্ষুক বনে প্রবেশ করবে না বরং অনুগ্রহকারী এবং আত্মত্যাগী বনে প্রবেশ করবে। অন্য ভাষায় বলা যায়, মুসলমান দুনিয়াকে কিছু দেয়ার জন্য এসেছে, নেয়ার জন্য এবং পাওয়ার জন্য আসেনি।

প্রকাশ থাকে, তারা এমন কিছু দিতে পারে, যা অন্যদের নিকট নেই। আর তা দুনয়াবী দৌলত ও সম্পদ বা মর্যাদা ও মালের স্তূপ নয়। এগুলো তো অন্য জাতির নিকটও রয়েছে। বরং এগুলো থেকে দামি কিছু তাদের নিকট রয়েছে।

শিক্ষক ও জাতির নেতা

দুনিয়াকে দেয়ার জন্য একটি জিনিস অবশিষ্টে আছে। আর তাহলো সনদযুক্ত মজবুত দীন। এই ফিতরাতে ইলাহীর নিজে চলে অন্যদের চালাবে। তাদের শিক্ষক ও নেতা হবে। এতে উম্মতে মুসলিমার মূলনীতি এবং রূপরেখার সারনির্যাস। সংক্ষিপ্ত শব্দে একথা বলা যায় যে, আত্মশুদ্ধির সাথে জগত ইসলাহের আম দাওয়াত আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা এবং আম্বিয়াদের সুন্নতকে জিন্দা করা ব্যতীত অন্যকিছু নয়। উম্মত এই পদ্ধতিতে আগে বাড়বে, উন্নতি লাভ করবে এবং এ লাইনে দুনিয়ার সকল অঞ্চল মুসলমানদের অনুগামী হবে। এজন্যই তাদের উন্নতি ও অবনতি এবং উন্নয়ন ও অধঃপতন বুঝার, পরিচয়েরও এটিই সঠিক মানদণ্ড হতে পারে যে, প্রত্যেক শাখাগত জীবনে, চাই দিয়ানত হোক ও সিয়াসত হোক বা তামাদ্দুন ও সামাজিক হোক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হোক বা যুদ্ধ ও সন্ধি হোক নিরাপদ হোক বা নিরাপত্তাহীন হোক, সম্পদশালী হোক বা না হোক, সে এগুলোকে গ্রহণ করুক বা না করুক। যদি গ্রহণ না করে থাকে, তাহলে তার স্বনির্ভরতা বাকি থাকবে না। ইহসান ও আত্মত্যাগও না, যা তাদের অস্তিত্বের আসল বুনিয়াদ ছিল। তেমনিভাবে তাদের জাতীয়তাও বাকি থাকবে না।

মুসলিম জাতির চিন্তাধারা যদি এমন হয় যে, কোন অঞ্চলে আরাম আয়েশে বা বেশির চেয়ে বেশি কিছু পড়ালেখা শিখে জীবন যাপন করা, তাহলে সেই দেশের বিভিন্ন জাতির ভিড়ে তার পরিণাম এমন হবে যে হীনম্মন্যতা, ঘৃণা, লোভ-লালসা ও এগুলো থেকে সৃষ্টি হওয়া অন্তরের অশান্তি, অভ্যন্তরীণ দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা, অস্থিরতা ও ভয়ভীতি এবং বিক্ষিপ্ত অন্তরের আকৃতিতে প্রকাশ পাবে, যেমনটি বর্তমানে হচ্ছে। তারা কখনো প্রশান্তি এবং নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারবে না। সেজন্য ইসলামি জীবনে ওই জীবন যাপনের কল্পনার কোন বিশেষ মূল্যায়ন হবে না, যতক্ষণ না তার পাশাপাশি ওই জযবার মানদণ্ড থাকবে যার উপর মুসলিম জাতির বুনিয়াদ। আর যার জন্য তাদের দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল।

আন্তরিক প্রশান্তি

তবে যদি তাই হয়, তাহলে পুনরায় জাতির মাঝে উল্লিখিত খতরা ব্যতীত মনের প্রশান্তি, স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা, স্বনির্ভরতা ও শ্রেষ্ঠত্ব ফিরিয়ে আনা আবশ্যক। তাহলেই জাতির পৃথক মর্যাদা বা প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রচলিত শান-শওকত ও জাতির অন্তরে তার ভাবমূর্তি ঠিক থাকবে। যেমনটি ইতিহাস বারবার পুনরাবৃত্তি করছে। অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যদি দেশের মধ্যে ডান-বাম শক্তির সঙ্গে তৃতীয় শক্তি মুসলমান হয়, তাহলে তাদের ও তাদের সকল চিন্তা-চেতনা ও জীবনের চিন্তাধারা প্রথমে ওই মাপকাঠি দ্বারা যাচাই করতে হবে, যে মাপকাঠির নিরিখে তাদের মুসলমান বলা যায়। তাহলে এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে যে, হিন্দুস্তানের কোন প্রদেশে মুসলমানদের চারিত্রিক বা সামাজিক অবস্থা কেমন অথবা অন্যান্য জাতির সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন এবং তাদের রাজনৈতিক পলিসি কেমন? অথবা তারা কি কাঙাল, বেকার, অথবা তারা সম্পদশালী কিনা?

বরং এমন প্রশ্ন বাকি থাকতে পারে যে, তাদের অবস্থা যা হোক তারা কী তাদের বুনিয়াদী মাপকাঠি মোতাবেক আছে কি নেই? যদি তারা এমন না হয়, তাহলে তাদের অন্তরে বুনিয়াদী চিন্তাধারা কিভাবে জাগ্রত করা যায় এবং তাদেরকে বিভিন্ন বানানে মূলনীতি বা চিন্তাধারা থেকে সরিয়ে কিভাবে আসল ও হাকিকী চিন্তাধারার দিকে আনা যায়। মুসলিমদের দৃষ্টি আমাদের অবস্থার প্রতি নয় বরং কাজকর্ম, আখলাক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি। যেগুলো তারা ইতিহাস থেকে পেয়েছে।

বিশাল উন্নয়নমূলক খেদমত সেবা

আমি মনে করি, বর্তমান দুরবস্থা, চালচলন ও চরিত্রের অধঃপতনই অনেকাংশে দায়িত্ব থেকে বিচ্যুতিই অমুসলিমদের ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সন্দেহ ও আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যদি চালচলন ও চরিত্র মাপকাঠি মোতাবেক হতো এবং নিজেদের ফরজ দায়িত্ব হতে গাফেল না হতো, তাহলে সন্দেহের সুযোগ থাকত না। প্রতিটি সন্দেহের উত্তর মুসলমানদের চালচলনে পেয়ে যেত যেমনটি পূর্ব যুগে পেয়েছে। এ কথা সঠিক যে, মুসলমান ইত্তেহাদ ও তানযীম ব্যতীত তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও কুরআনি সাক্ষীর উৎস থেকে প্রমাণ মিলে, এই ইত্তেহাদ শুধু প্রথাগত তানযীমগুলো দ্বারা কখনো অর্জন হয়নি, হবেও না। তার সুরত ও প্রক্রিয়া ঈমান ও আমলে সালেহ এবং বিশেষ করে দাওয়াত ইলাল্লাহ। যে পরিমাণ ইখলাসপূর্ণ মনোনিবেশ অন্যদের প্রতি হবে এবং আমরা ইসলামি হালকাসমূহের সুপ্রশস্ততার প্রতি নজর দেব, সেই পরিমাণ তবিয়তগতভাবে আমরা মন্দ উত্তাধিকার থেকে বেঁচে থাকতে পারব। আর যদি উক্ত প্রশ্নাবলির উপর নিজেরা চিন্তা-গবেষণা করে অথবা দেশের আহলে ইলম ও সম্মানিতদের হতে এগুলোর উপর প্রার্থনা করে সেগুলোর সমাধানে মনোনিবেশ করি, তাহলে অবশ্যই জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও পৃথক মর্যাদা এবং তাদের চালচলনের উন্নতির একটি বিশাল গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক এবং বুনিয়াদী খেদমত হবে।

উল্লিখিত মহান প্রশ্নাবলি দেখে যেখানে সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক হয়েছে, সেখানে এই কয়েকটি প্রশ্নও মনের ভিতর উদয় হয়েছে। প্রশ্নগুলো ছাত্রসুলভ। তারপরও পেশ করার দুঃসাহস দেখিয়েছি। মুসলিম জাতির প্রতিটি বিষয়ে উপকার হবে, চাই রাজনীতি হোক অর্থনীতি হোক অথবা ধর্মীয় হোক। যদি উক্ত মাপকাঠি সামনে রাখে, তাহলে আশাবাদী যে, তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। তাদের হিম্মত বুলন্দ হবে।

মাআসসালাম

মুহাম্মদ তৈয়ব গুফিরা লাহু
মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ
৩ যিলহজ্ব ১৩৮৯ হিজরী

বয়ান : ৮

তিউনিস ও মারাকেশের আযাদী সংগ্রাম

আযাদী বা স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। চাই সেই মানুষ শ্বেতাঙ্গ হোক বা রঙিন চামড়াধারী জাতির সদস্য হোক, চায় উজ্জ্বল সূর্যের সন্তান হোক বা অন্ধকার রাতের সন্তান হোক। যেমনভাবে একজন ইংরেজ, ফরাসি, আমেরিকান ও রাশিয়ান আযাদীর অধিকার রাখে তেমনিভাবে কেনিয়ার একজন হাবশী কৃষ্ণাঙ্গ এবং উত্তর আফ্রিকার একজন তিউনিসী এবং মারাকেশীও আযাদীর অধিকার রাখে। সেও নিজের স্বাধীনতার মালিক এবং নিজের ব্যাপারে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا• اَمَّا بَعْدُ

বাস্তব পরিস্থিতি

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আমরা এখানে মানবেতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মারহালার উপর একটি বড় উদ্দেশ্যের জন্য জমায়েত হয়েছি। প্রথমে আমি সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার, তারপর আপনাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, আপনারা আমাকে এই মুহূর্তে (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ ঈসায়ী) সভাপতির ইজ্জত প্রদান করেছেন এবং সুযোগ করে দিয়েছেন যে, আপনাদের সম্মুখে দুই জাতির আযাদীর বিষয়ে ওকালতির ফরিযা আঞ্জাম দেয়ার জন্য।

আপন ইচ্ছার অধিকার

কিছুকাল পূর্বে আমাদের মাঠঘাট, আমাদের উঠোন, আমাদের গ্রামের বৈঠকখানাগুলো এবং বড় বড় শহরের হলগুলো এই স্লোগানে প্রকম্পিত হচ্ছি

যে, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। আজ যেহেতু আমাদের দেশ স্বাধীন, স্বাধীনতা ছয় বছর পদার্পণ করেছে। তাই আমরা এক কদম আগে বেড়ে এই বিশ্বাসের ঘোষণা দিতে পারি যে, স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। চাই সে মানুষ শ্বেতাঙ্গ হোক বা রঙিন জাতির সদস্য হোক, চাই উজ্জ্বলময় সূর্যের সন্তান হোক, চাই অন্ধকার রাতের সন্তান হোক। যেমনভাবে একজন ইংরেজ একজন ফ্রান্সি, একজন আমেরিকান, একজন রাশিয়ান স্বাধীন হওয়ার অধিকার রাখে, তেমনিভাবে কেনিয়ার একজন শ্বেতাঙ্গ, উত্তর আফ্রিকার একজন তিউনিসিয়ান ও মারাকেশবাসীও সেই অধিকার রাখে। তারাও নিজেদের স্বাধীনতার মালিক ও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার।

স্বাধীনতায় সহযোগিতা

জনাব! দেশের প্রসিদ্ধ, অভিজাত ও মর্যাদাবান জামাত (দল) জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের আহ্বানে তিউনিস ও মারাকেশ স্বাধীনতায় সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য একত্রিত হয়েছি। এটি এমন একটি শহর, যার জাতীয় ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ভারত ছেড়ে দাও স্লোগান উঠেয়েছিল। পরিশেষে ইংরেজ বাহিনীর হিন্দুস্তান ছাড়তে হয়েছিল। ভারত থেকে ইংরেজদের বিছানা গোটাতে হয়েছিল। আজ আমরা এই শহর থেকে ফ্রান্সকে আহ্বান জানাচ্ছি, তোমরা তিউনিস এও আলজেরিয়া ছেড়ে দাও। আমরা আশাবাদী যে, আমাদের স্লোগানও তেমনিভাবে কামিয়াব হবে, যেমনভাবে হিন্দুস্তান ছেড়ে দাও। স্লোগান কামিয়াব হয়েছিল।

তিউনিসের পরিস্থিতি

মুহাতারাম হযরত!

আমাকে অনুমতি দিলে আমি তিউনিস ও মারাকেশ মরক্কো সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করব।

তিউনিস ৪৮ হাজার বর্গমাইলের একটি ইসলামি অঞ্চল, যা উত্তর আফ্রিকায়, রোম সাগরের তীরে, ইতালি ও ফ্রান্স উপকূলের সামনে উপস্থিত। সর্বশেষ আদমশুমারি মোতাবেক সেখানে ২৬ লাখ মানুষের বসবাস। এখন হয়ত ৩০ লাখে পৌঁছেছে। সেখানে এক লাখ আট হাজার ফ্রান্সি বিদ্যমান, যারা দেশের সম্পদ দখল করে রেখেছে। সেখানে নামেমাত্র একজন বাদশাহ থাকে। কিন্তু আসল রাজত্ব পরিচালনা করে ফ্রান্সের রাজা। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবত বহিরাগত

রাষ্ট্রীয় শক্তি তিউনিসের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে। তিউনিসের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'নয়া দস্তুর পার্টি' (নতুন সংবিধান প্রণয়ন পার্টি) নেতৃত্বে চলছে।

আজ থেকে এক বছর পূর্বে ওই আন্দোলনের একজন বন্দি নেতা জনাব হাবিব বোরকিবাহ'র সঙ্গে এই বোম্বে শহরে মুলাকাত হয়েছিল। যখন তিনি খেলাফত অফিসে একটি প্রতিনিধি সম্মেলনে নিজেদের স্বাধীনতার দাবিসমূহ ব্যাখ্যা করেছিলেন আর আমাকে দাবিসমূহের সমর্থনে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। উক্ত সংক্ষিপ্ত বয়ানে তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন, ভারতবর্ষের আযাদিপ্রিয় জনতা এবং বিশেষ করে ধর্মীয় গ্রুপগুলো আপনাদের দাবিসমূহ সমর্থন করে। আজ এক বছর পর এই অঙ্গীকার পুনরাবৃত্তির সুযোগ পেয়েছি। আপনাদের শহরে তিউনিস ইমদাদী কমিটি বিদ্যমান রয়েছে, যার ঘোষণা আপনারা চার দিন পূর্বে পত্রিকার খবরে দেখেছেন, যা এই স্লোগান ও অঙ্গীকারনামার কার্যকরী প্রমাণ।

মরক্কোর পরিস্থিতি

তিউনিস থেকে আরো বেশি মরক্কোর বিষয়টি আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা হাঙ্গামার রূপ ধারণ করেছে। মারাকেশ উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম সীমান্তের দেশ। দেশটির উত্তরের প্রশস্ততা ২৮ এবং ৩৬ ডিগ্রির মাঝামাঝি, আর পশ্চিমের দীর্ঘতা ৩ এবং ১৪ ডিগ্রির মাঝামাঝিতে অবস্থিত। তার উত্তরে রোমসাগর এবং আবনায়ে জাবাল আত্তারিক, পশ্চিমে আটলান্টিক সাগর, দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি এবং উত্তর পূর্বে কোহেস্থান অবস্থিত, তার দৈর্ঘ-প্রস্থ ৫ লাখ ৮১ হাজার বর্গকিলোমিটার।

ফিরিঙ্গি জাতি (ইউরোপিয়ান বা পশ্চিমা জাতি) যারা এই মুহূর্তে গণতন্ত্রের নামে পৃথিবীর ঠিকাদার বনে আছে, তারা মারাকেশকে তিন ভাগে ভাগ করে তার নিরাপত্তা, শক্তি, যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। একটি অংশ ফ্রান্সি মারাকেশ, যা ফ্রান্সের গোলাম। এই অংশের রাজধানী ফৈজে এবং তার জনসংখ্যা ৮৪ লাখ ৪৯ হাজার। দ্বিতীয় অংশ স্পেনি মারাকেশ, যা স্পেনের গোলাম। তার রাজধানী রাবাতে আর তার জনসংখ্যা ১১ লাখ। তৃতীয় অংশ আন্তর্জাতিক সাদা চেহারাওয়ালাদের গোলামির অধীনে। এই অংশে ফ্রান্সি ইংরেজ, স্পেনি, ইটালিয়ান, আমেরিকান, ডিস ও বেলজিয়াম ইত্যাদি রাষ্ট্রের পছন্দনীয় শক্তি হুকুমত পরিচালনা করছে। তার রাজধানী তনজাতে।

সেখানকার জনসংখ্যা দশ হাজার। একটি সাধারণ আন্দাজ মোতাবেক মারাকেশের স্বাধীনতার মাসয়ালা কম ও বেশি এক কোটি মানুষের স্বাধীনতার বিষয়।

দুটি নতুন রাষ্ট্র

সুতরাং আজ উত্তর আফ্রিকার মানচিত্রে ইসলামি জগতের সীমানার ভিতর নতুন দুটি সালতানাতের উত্থান হতে যাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস মোতাবেক এখন উভয় শক্তির স্বাধীনতা এশিয়া শক্তিকে বৃদ্ধি করবে। আর উভয় রাষ্ট্রের স্বাধীনতার কারণে পৃথিবীর নিরাপত্তায় একটি নতুন জামানত মিলবে। উক্ত নকশাকে সামনে রেখে আজ আমরা এখানে এ কথা প্রকাশ করার জন্য জমায়েত হয়েছি যে, স্বাধীনতার স্লোগান, যা আজ সারা পৃথিবীতে উচ্চারত হচ্ছে। অতএব তিউনিস ও মারাকেশকে উক্ত স্লোগান থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না।

আমরা পৃথিবীর আন্তর্জাতিক অভিমতের সঙ্গে মিলে এই দাবি উত্থাপন করব যে, ফ্রান্সি শাহেনশাহকে তিউনিস, আলজাযায়ের (আলজেরিয়া) এবং মারাকেশ হতে হাত গোটাতে হবে। একেবারে এইভাবে, যেভাবে বৃটিশরা হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান থেকে, আমেরিকা ফিলিপাইন থেকে, ইতালি ত্রিপোলী তথা লিবিয়া ও হাবশা থেকে এবং হল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া থেকে হাত গুটিয়েছে।

দাবিসমূহ ও সমর্থন

আমাদের এই দাবিসমূহ এজন্য যে-

১. তিউনিসের 'নয়া দস্তুর পার্টি' এবং মারাকেশের 'ইস্তিকলাল পার্টি' উভয় দল দেশের জনসাধারণের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার দাবি করছে। আর এই দাবি সত্যের পক্ষে।

২. আকওয়ামে জাতিসংঘো চার্টার ফরমানের অধীনে তিউনিস ও মারাকেশের স্বাধীনতা, পৃথিবীর স্বাধীন শক্তিসমূহকে বৃদ্ধি করার জন্য জরুরি। জাতিসংঘের এ্যাসেম্বলিতে দুটি নতুন দেশের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বয়ং জাতিসংঘের শাখা বৃদ্ধি পাবে এবং সন্দেহ ও আশঙ্কা হ্রাস পাবে, যা পৃথিবীর শান্তিতে খতরা হিসেবে দেখা দেয়।

৩. আরব-এশীয় গ্রুপের পনেরটি শক্তি তিউনিস ও মারাকেশের আযাদীর জন্য জাতিসংঘের রাজধানীতে সরগরম রয়েছে। তারা পহেলা সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে

নিরাপত্তা পরিষদে উভয় দেশের স্বাধীনতার মুকাদ্দামা পেশ করে রেখেছে। ওই দেশগুলোর সাথে ভারতবর্ষ একাত্মতা পোষণ করছে। শুধু তাই নয়, অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। অতএব আমাদের জাতীয় পলিসির দাবি একই যে, আমরা ওই দুই দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরোপুরি সাহায্য করব।

৪. ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩-র সম্মেলনে আরব লীগের রাজনৈতিক কমিটি প্রস্তাবনা মঞ্জুর করে যে, জাতিসংঘের আরব প্রতিনিধিদের এই নির্দেশনা দেয়া হবে যে, তারা জাতিসংঘের কোনাল এ্যাসেম্বিলিতে আয়োজিত সম্মেলনে তিউনিস ও মারাকেশ স্বাধীনতার বিষয়টি জোরদারভাবে পেশ করবে এবং নিজেদের বন্ধু দেশগুলোর পক্ষ থেকে উক্ত বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা অর্জন করবে।

ফ্রান্সের দেউলিয়াত্ব

রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের এই পরিষ্কার ও স্বচ্ছ নকশাকে সামনে রেখে একটি প্রস্তাবনার সুরতে আমাদের তিউনিস এবং মারাকেশ স্বাধীনতার দাবি করা উচিত। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার এই যুগে যখন কিছু দিন পূর্বে পঞ্চাশ কোটি মানুষ (যা পৃথিবীর আবাদীর পঞ্চমাংশ) নিজেদের স্বাধীনতা অধিকার হয়েছে। এই মুহূর্তে ফ্রান্সের এক কোটি মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখতে বাড়াবাড়ি করা তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বের পরিচয়, যাকে বর্তমান যুগের স্বাধীন জাতি গ্রহণ করবে না।

অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণ এবং তাদের হুকুমত যারা ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার জন্য এবং আজ মিসর এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার সাহায্যে বন্ধুত্বের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে তারা তিউনিস এবং মারাকেশের স্বাধীনতার সমর্থন ও সাহায্যেও চক্ষু বন্ধ এবং চুপ থাকবে না, সোচ্চার হবে।

বর্তমান পৃথিবীতে আমান ও ইনসাফ, আপন ইচ্ছার স্বাধীনতা, সাম্য ও মানবতা ইত্যাদি শব্দগুলো সবচেয়ে বেশি উচ্চারণ হচ্ছে ইউরোপিয়নদের যবানে। যদি এই শব্দগুলোর তাদের নিকট ভিন্ন অর্থ হয় আর বাস্তবে এই শব্দগুলো অর্থহীনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না, তাহলে ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, স্পেন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং সমগ্র ওই ইউরোপিয়ান শক্তিগুলো, যারা তিউনিস ও মারাকেশের উপর নিজেদের দখলদারিকে শক্তভাবে ধরে নিশ্চিন্তে বসে আছেন কেন। আমরা এ কথা বলার অধিকার রাখি যে, হে মানবতাপূজার দাবীদার! হে নিরাপত্তা ও ইনসাফের ঠিকাদারগণ! এবং হে গণতন্ত্রের পতাকাধারী ও মানবতার দাবিদার! তোমরা তিউনিস ও মারাকেশের বাসিন্দাদের গোলাম

বানিয়ে রাখতে বাড়াবাড়ি করছ কেন? যদি তোমাদের সত্যিকারের আমান ও ইনসাফ এবং মানবতার সম্মান না থাকে, তাহলে নিজেদের ওই শাব্দিক দাবির পক্ষপাতিত্ব কর। এক কোটি মানুষের এমন একটি ন্যায্য ও বৈধ দাবির পথে প্রতিবন্ধক হয়ো না, যার সাহায্যে সমগ্র গণতন্ত্রপ্রিয় পৃথিবী আজ ঐক্যবদ্ধ।

স্বাধীনতা দাবির ধর্মীয় অবস্থান

জনাব! আমার যেহেতু ভারতবর্ষে ও এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ও ইলমি মার্কায দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গে যিম্মাদারির সম্পর্ক রয়েছে এবং তার একজন যিম্মাদার এবং খাদেম হিসেবে আমি ইসলামি ভ্রাতৃত্বের হাওলা দিয়ে তিউনিসের ইসলামি নেতা জনাব হাব্বি বুরকি বাহকে আশ্বস্ত করেছি, আপনাদের স্বাধীনতার দাবিতে ভারতবর্ষের মুসলমানরা আপনাদের সঙ্গে থাকবে। সেজন্য যদি আমি এই গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা দাবির ধর্মীয় পজিশন সুস্পষ্ট করা ব্যতীত এই উদ্বোধনী ভাষণকে শেষ করা ঠিক হবে না। যখন এমন কোন ইজতেমায়ী বা রাজনৈতিক বিষয় যাতে পৃথকভাবে মুসলিম জাতি অথবা অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিশে দাঁড়ায়। এমন মুহূর্তে ইসলাম আমাদের তৃষ্ণার্ত ছেড়ে দেয়নি বরং পরিষ্কার সুস্পষ্ট এবং আলোকোজ্জ্বল হেদায়েত দিয়েছে। যেখানে জাতির স্বাধীনতা ও জালেমদের থেকে মুক্তি অর্জনের সম্পর্ক রয়েছে, সেখানে ইসলামই হলো সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ও তত্ত্বাবধায়ক। ফেরাউনের নিকট থেকে বনী ইসরাঈলের জন্য হযরত মুসা আ.-এর স্বাধীনতার দাবি এ ব্যাপারে হেদায়েতের উজ্জ্বল মিনার, জ্বলন্ত প্রমাণ। বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন গোলাম পরাধীন বানিয়ে রেখেছিল। তাদেরকে নাগরিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। সবচেয়ে নিম্নমানের কাজগুলো তাদের দ্বারা সম্পাদন করা হতো। তাদের অস্পৃশ্য বানিয়ে ফেলেছিল। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই দুর্বল ও খারাপ ছিল। এর পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছিল, যাতে তাদের নিরাপত্তা ও ঐক্যবদ্ধ যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের ছেলে-সন্তানদের কন্ট্রোল করা হতো, জন্মের সাথে সাথে মেরে ফেলা হতো, যাতে ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে কোন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোগ্য সন্তানের উত্থান না ঘটতে পারে যে, নিজের স্বজাতির দুরবস্থা দেখে প্রভাবিত হয়ে মাথা উঠিয়ে দাঁড়াবে এবং যাতে এই পরাধীন জাতির কোন সঠিক লিডারশীপ প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে যে, এই জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ ও স্লোগান উঠাবে। কিন্তু দখলদার জাতির নিজেদের নিষ্ঠুরতা ও চালাকীর অন্ধকারেও পরিশেষে বনি

ইসরাঈল জাতির মধ্যে হযরত মুসা আ.-এর পুতপবিত্র অস্তিত্বের জন্ম হয় এবং বেড়ে উঠেছেন ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে– তাকে বনী ইসরাঈলের হত্যাকারী ফেরাউনের রাজমহলে শাহেনশাহর পদ্ধতি ডেকে নেয়া হয়েছে। তার তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন। পরিশেষে তিনিই স্বজাতির আশ্রয়হীনতা এবং দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করে ফেরাউনের দরবারে ইসরাঈলদের স্বাধীনতার দাবি পেশ করেন। ফেরাউন তখন নিজের পুরাতন অনুগ্রহ লালন-পালনের নিয়ামতের আলোচনা উঠিয়ে স্বাধীনতার দাবিকে টালবাহানা ও তিক্ত করতে চাইল, তার উত্তরে মুসা আ. বললেন–

> হ্যাঁ, আমার সবচেয়ে বড় নেয়ামত, যা তুমি আমার উপর বলে বেড়াচ্ছে মনে হয় তা এই হবে যে, তার পরিবর্তে আমার জাতির লাখ লাখ মানুষকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে।

অতঃপর সে ধমক দিয়ে স্বাধীনতার দাবিকে দমাতে চাইল, যা জালিম জাতির চিরাচরিত নিয়ম। ফেরাউন বলল, "হে মুসা! আমি তোমাকে কারাগারে দেব।" তার উত্তরে মুসা আ. বললেন, "যদিও আমার দাবির স্বপক্ষে পরিষ্কার প্রমাণ পেশ করি অর্থাৎ বন্দি করার ধমকি থেকে একটি সুপ্রমাণিত দাবিও কি সামান্য হবে?"

উক্ত ভ্রান্ত টালবাহানার উপর কোন প্রকার প্রভাবিত না হয়ে হযরত মুসা আ. সুস্পষ্ট ভাষায় ফেরাউনের সামনে এমন স্বাধীনতার দাবি পেশ করলেন যে, আমি আল্লাহর নির্দেশে বলছি, বনী ইসরাঈলদের মুক্তি দিয়ে আমার সঙ্গে দিয়ে দাও এবং তাদেরকে শাস্তি দেয়া হতে হাত গুটিয়ে নাও। অন্যথায় তার যিম্মাদারী তোমাকে বহন করতে হবে আর হক ও সত্য দাবিগুলোর মিথ্যা আখ্যায়িত করার শাস্তি মিথ্যা আখ্যায়িতকারীকে পেতে হবে। তাকেই ভোগ করতে হবে।

এই ঘটনায় আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আ.কে স্বাধীনতার দাবি পেশ করার জন্য পাঠিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মজলুম জাতির স্বাধীনতার দাবি জানানো একটি ধর্মীয় অধিকার। যার স্বপক্ষে আল্লাহ তায়ালার শুধু সমর্থনই নয় বরং তার হুকুম এবং নির্দেশ রয়েছে, যা তা জরুরি এবং ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ। আর এমন দাবি নিয়ে যারা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেন, তারা অবশ্যই একটি ধর্মীয় তাকাজা পুরা করছেন। অতঃপর যতটুকু কোন নিমজ্জিত দেশ এবং ভূখণ্ডকে জালিমদের অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে বের করা এবং হকদারদের নিকট পৌঁছানো সম্পর্ক রয়েছে। উক্ত ঘটনার মধ্যে তারও একটি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

মাতৃভূমি স্বাধীনতার চেষ্টা-প্রচেষ্টা অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে আমালিকা জাতি অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছিল। বনী ইসরাঈলকে তাদের মাতৃভূমি থেকে বঞ্চিত করেছিল। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আ.-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিলেন, ফিলিস্তিন ভূখণ্ড তোমাদের হক; তাতে প্রবেশ তাকে হস্তগত কর এবং আমালিকা দখলদার এবং হঠকারী জাতির দখলকে সেখান থেকে উঠিয়ে দাও। বনী ইসরাঈল আমালিকাদের তাগড়া দেহ এবং বাহ্যিক শক্তি দেখে ভীত হয়ে হুকুম পালনে পিছুটান দিল এবং দখলদার জাতির মোকাবেলায় নিজেদের দুর্বল জ্ঞান করে নিজেকে মাতৃভূমিতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে বসল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই শক্তিশালী জাতি নিজে নিজে আমাদের মাতৃভূমির দখল না ছাড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাতে প্রবেশ করব না।

জাতিকে বুঝানো হলো, আল্লাহকে ভয় কর। তার উপর ভরসা কর, আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে, যখন তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে তখন বিজয় তোমাদের দান করা হবে। কিন্তু তারপরও বনী ইসরাঈল পিছপা হয়েছে এবং দেশ স্বাধীনতার আন্দোলনে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি নেমে এসেছে। একে তো তাদের জয় ও দখল দীর্ঘ চল্লিশ বছর পিঠিয়েছে দ্বিতীয়তো দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত বনী ইসরাঈলকে ময়দানে তিহে কাটাতে হয়েছে। শাস্তি হিসেবে ঘর থেকে বাইরে থাকতে হয়েছে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টিও পেয়েছে। এতে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, জালিম সম্প্রদায় থেকে আপন মাতৃভূমিকে মুক্ত করা এমন একটি ধর্মীয় দায়িত্ব যে, তা থেকে পিছপা হওয়া বা অস্বীকার করা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয় এবং তাদের আরো ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়, যা উক্ত উদ্দেশ্য জরুরি এবং ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

আযাদী, ধর্মীয় ও মানবিক অধিকার

সুতরাং আজ তিউনিস ও মারাকেশের বাসিন্দারা যদি ফ্রান্স থেকে নিজেদের স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে তাদের থেকে আপন মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে চায় এবং নিজেদের দেশের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব চায়, তাহলে তা তাদের দীনি ও ধর্মীয় অধিকার, যাকে তাদের সর্বাবস্থায় অর্জন করা উচিত। আর যদি আমরা

অথবা মুসলিম জাহানের সকল বাসিন্দা চাই আরব লীগের সদস্য হোক বা আরব মুলুকের সরকারি প্রতিনিধি হোক উক্ত স্বাধীনতা দাবির সাহায্যে ফ্রান্স সরকার এবং ইউরোপিয়ান জাতির জবরদখলের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তাহলে তা শুধু আন্তর্জাতিক আইন, স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ ও গণতন্ত্রপ্রিয় জাতির ঐক্যবদ্ধ খাহেশাতের মোতাবেকই হবে না বরং ধর্মীয় উসুল এবং ইসলামি আইনের মানশা মোতাবেক হবে। এমনকি তা একটি শরয়ী ও দীনি দায়িত্ব পালন হবে।

অতএব তিউনিস ও মারাকেশ স্বাধীনতা দাবির এই সাহায্য-সহযোগিতা স্বয়ং সেই দেশের দায়িত্বশীল সাধারণ পার্টি, জাতিসংঘের ঘোষণা, আরব এশিয়া গ্রুপের সম্মিলিত পনেরটি শক্তি, আরব লীগ কমিটির প্রস্তাবনা, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রপ্রিয় পলিসি এবং পরিশেষে ধর্মের সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ নির্দেশের অধীন উক্ত দাবি শুধু ওয়াজিব নয় বরং আবশ্যকীয় এবং মানবাধিকারের সঠিক সুরক্ষা।

বয়ান : ৯

খেদমতের আয়না জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ

বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে বিপরীত উপাদানের রাহনুমায়ী তো দূরের কথা, মুখ খোলাই সহজ নয়। অতএব এহেন বৈরি ও সংঘাতময় ময়দানে ওই জামাতই এগিয়ে আসতে পারে, যারা সাংঘর্ষিক চিন্তাধারার মধ্যেও নিজেদের চিন্তাধারা (মূলনীতি) ও চালচলন ব্যতীত অন্যদের চালচলন গ্রহণ করে না। তাদের সুপ্রশস্ত অন্তর ও চিন্তাধারা এবং প্রোগ্রামের প্রশস্ততায় সকল চিন্তাধারা হারিয়ে যাবে, বিলীন হয়ে যাবে এবং তা মর্যাদা হিসেবে এক-তৃতীয়াংশ এবং হাকেম, যা সকলের বিচারক হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এমন জামাত কুদরতিভাবে ধর্মীয় জামাত-ই হতে পারে, যে জামাত ধর্মীয় লাইনে স্বয়ং নিজেও তার যাত্রী হবে এবং অন্যদেরও নিজের সাথে নিয়ে যাবে। আর তারা আল্লাহর মাখলুককে এমন উঁচু মাকামে দেখতে চায় যে, নিচের সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ওই পথযাত্রীদের নজরে তুচ্ছ এবং অবজ্ঞার পাত্র বনে যাবে। মাযহাব এবং বিশেষ করে স্বভাবজাত দীন তথা ইসলামই এমন একটি শক্তি যে, অভিমত ও কিয়াসের সকল সীমাবদ্ধতা তাতে পৌঁছে বিলীন হয়ে যায়, হারিয়ে যায়।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



[১৯ মার্চ ১৯৫৩ সালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুরাদাবাদ শাখার সম্মেলন]



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ

আকাবিরদের শুকরিয়া

বুযুর্গানে মিল্লাত ও উম্মাতের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ!

এই মুকাদ্দাস জলসার সভাপতির উপযুক্ত অবশ্যই আমি ছিলাম না। তারপর বুযুর্গান এবং আকাবিরদের উপস্থিতি তো আমার সত্তাকেও শূন্যের কোঠায় পৌঁছে দিয়েছে। এমতাবস্থায় কারো নাম উচ্চারণ করার যোগ্যতার প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না। সেজন্য সাহস হচ্ছে না যে, সেই স্থানে দাঁড়াব কিছু বলা না বলা তো দূরের কথা। আবার সাথে সাথে এই মাকামের দায়িত্বশীলতা এবং তাও এমন অবস্থায় যে, প্রশস্ত ও গভীর জ্ঞান এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক ফিকির ও অভিজ্ঞতার দাবি রাখে তা নিজের মধ্যে নেই।

তারপরও হিম্মত করে তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছি। কিন্তু যখন এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করলাম যে, যারা সভাপতির ইজ্জত দিয়েছেন, তারাই তার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, তখন তাদের সামনে দাঁড়ানোর দুঃসাহস দেখালাম এবং আকাবির ও

সম্মানিত ব্যক্তিদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। তারপর নিম্নের কিছু আবেদন পেশ করার হিম্মত হলো।

চিন্তাধারাগত ফেতনার যুগ

হযরত মুহতারাম!

বর্তমানে যে সময়টি আমরা অতিক্রম করছি, তা অত্যন্ত সঙ্গীন ও নাজুক। উপরে উপরে তো প্রশান্ত; কিন্তু ভিতরে ভিতরে হিংসার আগুনে পোড়ে। উপরে তো সবুজ-শ্যামল স্থান; কিন্তু ভিতরে কাটা (হিংসা)। যদি কোন সুতি কাপড় পরিধানকারী (সুস্থ মানুষ) সবুজ স্থানে প্রবেশ করে, তাহলে নিচে বিঁধে থাকা কাটা তাকে আঘাত করা ব্যতীত ছাড়বে না। মুসলমানদের সামাজিক ব্যবস্থা আজ বিশেষ কিছু ফেতনায় বেষ্টিত। শরীয়ত দীন সম্পর্কে বলেছে যে, ফেতনার যুগে দীন ধরে রাখা হাতে জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ রাখার মত হবে। কিন্তু আজ দুনিয়াকে ধরে রাখা দীন ধরে রাখা হতে অধিক মুশকিল। এখন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংঘাতের যুগ। জাতির মধ্যে দলগত দ্বন্দ্ব তো ভিন্ন ব্যাপার, জাতিগত প্রবণতাও আছে। কিন্তু সরকারি এবং কিছু উভয় লাইন থেকে পৃথক হয়ে তারা উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিপক্ষ। শুধু ব্যক্তি ও দলের মধ্যেই দ্বন্দ্ব সীমাবদ্ধ নেই বরং চিন্তাধারাতেও পরস্পর ঝগড়া লড়াইয়ে লিপ্ত। উক্ত দ্বন্দ্বে মুসলমানরা 'মজনুর ডাবল দুঃখ-কষ্ট' এই পঙ্‌ক্তির সাক্ষী, সত্যয়নকারী। আর তার টার্গেট হওয়ার সুরত এমন যে– "প্রত্যেক মসিবত আকাশে এসে ভূমিতে না পৌঁছেই জিজ্ঞেস করে, আলোকিত ঘর কোথায়।"

অর্থাৎ মুসলিমদের দুঃখ-কষ্ট অন্যদের সঙ্গে বিশেষিত নয় বরং তাদের ফিরিস্তি তৈরি করলে দেখা যাবে অন্যদের সঙ্গে মুসলমানরাও রয়েছে।

ভিন্ন উপাদান ও মতাবলম্বীদের সার্বজনীন রাহনুমায়ী

এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিভ্রান্তিকর অবস্থায় বিপরীত উপাদান ভিন্ন চিন্তাধারা মানুষদের রাহনুমা তো ভিন্ন কথা, যবান খোলাই মুশকিল। সুতরাং এহেন বৈরি, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে ময়দানে এমন জামাতই এগিয়ে আসতে পারে, যে জামাত সাংঘর্ষিক চিন্তাধারাসমূহের মধ্যে নিজের চিন্তাধারা ও মূলনীতির চালচলন ধরে রাখতে পারে, অন্যদের জীবনধারা গ্রহণ করে না। তার সুপ্রশস্ত অন্তর, চিন্তাধারা এবং প্রোগ্রামের ব্যাপকতায় সমস্ত চিন্তাধারা ও মতবাদ বিলীন হয়ে যায়। আর

সে এক তৃতীয়াংশের স্থান গ্রহণ করে এবং বিচারক বনে যে সকলের ফয়সালাকারী হয়। প্রকাশ থাকে যে, এমন জামাত কুদরতিভাবে কোন ধর্মীয় জামাত হবে। যে জামাত ধর্মীয় লাইনে নিজেও চলবে, নিজেও সে পথের যাত্রী হবে এবং অন্যদেরও নিজের সাথে নিয়ে চলবে। আর আল্লাহর সৃষ্টজীবকে এমন এক উঁচু স্থানে দেখতে চায় যে, নিচে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ওই যাত্রীদের নিকট কিছুই মনে হবে না, তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হবে। ধর্ম এবং বিশেষ করে স্বভাবজাত দীন ইসলাম এমন একটি বিশ্বব্যাপী শক্তি যে, সকল অভিমত ও কিয়াসের সীমাবদ্ধতা তাতে পৌঁছে বিলীন হয়ে যায়।

এই ভারত ভূখণ্ডে হযরত সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমীরি, নূরে হিন্দ খাজা কলীরি, কুতুবে আলম শায়েখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী এবং প্রত্যেক যুগের উলামায়ে রাব্বানী ও মাশায়েখে হাক্কানী রহ.গণ প্রত্যেক পার্টি, প্রত্যেক ফেরকা এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীকে নিজেদের সুপ্রশস্ততায় হারিয়ে রেখেছিলেন, সবাইকে নিজের কাছে টেনে নিতেন। তাদের আমলে পার্টি সিস্টেমের বিরোধ ছিল না। আজও মুসলিম জাতির যদি সঠিক রাহনুমায়ি হত, তাহলে তারা যে কোন লাইনে থাকত, তাদের উম্মতের দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সর্বব্যাপী তরীকা এবং তাদের সত্যিকারের স্থলাভিষিক্তদের আদর্শ কাজে লাগাত এবং প্রভাবিত হতো।

জমিয়তের রাজনীতি থেকে পৃথক থাকা প্রয়োজন

জমিয়তে উলামা জন্মগতভাবে একটি খালেস দীনি জামাত দল। ১৯৪৭ সালের পূর্বে রাজনৈতিক খেদমতের একটি মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক রেকর্ড গড়েছে। ধারাবাহিক আত্মদানের ধারা ইতিহাসের পাতা সন্নিবেশিত করেছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে কারো পেছনে বা নেতৃত্বে নয় বরং সবার আগে থেকে আপন নেতৃত্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তারপরও তার মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম। আর ধর্মের মানদণ্ডেই সবকিছু করেছে। সময়ের প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর পরিশেষে পুনরায় মূলের দিকে ফিরে আসে, যা তার আসল ও প্রকৃত স্বভাব ছিল। অর্থাৎ ধর্ম এবং ধর্মীয় প্রবণতা।

জমিয়তে উলামা ১৯৪৭ সালের ইনকিলাবের পর রাজনীতি থেকে পৃথক হওয়ার যে দৃষ্টান্ত কায়েম করেছিল, তা অবশ্যই জাতির উন্নয়নের জন্য যথাযথই ছিল না বরং আবশ্যক ছিল। আর তা এজন্য নয় যে, রাজনীতি কোন নিষিদ্ধ বৃক্ষ অথবা তা তার জন্য অবৈধ হয়ে গিয়েছিল বরং সাধারণ রাজনৈতিক মুসলেহাত ব্যতীত সেজন্য রাজনীতি থেকে দূরে সরেছিল যে বিপ্লবের পর কোন জাতির নির্মাণকারী

দলের জন্য রাজনৈতিক জটিলতা থেকে দূরে থাকাই প্রয়োজন এবং তারা রাজনৈতিক উত্থান-পতনে জড়িত হয়ে উন্নয়ন কাজে সময় ব্যয় করতে পারে না তাই।

জাতীয় উন্নয়নের দাবিসমূহ

জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত নাতিদীর্ঘ প্রোগ্রামকে গুটিয়ে নিম্নের শিরোনামের মধ্যে নিয়ে আসা যেতে পারে।

১. নিযামে তালীম, ২. নিযামে তাবলীগ, ৩. সমাজ সংশোধন এবং ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক অধিকারগুলোর রাজনৈতিক সুরক্ষা।

জাতীয় উন্নয়নের এই দফাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম বস্তু হলো তালীম (শিক্ষা)। যার দ্বারা কোন জাতির মন-মস্তিষ্ক তৈরি হয়। সর্বপ্রকার সফলতা এবং সব ধরনের ইজ্জত ও উন্নতির প্রাথমিক সৌন্দর্য হলো ইলম। আল্লাহ তায়ালা নবী আগমনের ধারাবাহিকতা এই ইলমের জন্য কায়েম করেছিলেন। ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রথম আয়াত اقرأ নাযিল হয়েছিল, যার সারমর্ম হলো পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান। ইসলামের পূর্বে নিকটবর্তী যুগটি সবটুকুই মানবিক খারাবির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই যুগ জাহিলিয়াত বা মূর্খতার যুগ আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, সর্বপ্রকার খারাবি ও বিপদাপদের উৎসমূল হলো মূর্খতা এবং সর্বপ্রকার কামাল ও সৌন্দর্যের মূল হলো ইলম। এজন্যই দীনি তাকাজসমূহের অনুপাতে সর্বপ্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তালিমের বিষয়।

সেক্যুলার হুকুমাতের তত্ত্বাবধানে মুসলিম শিশুদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার সুরক্ষা

সময়ের চাহিদা অনুপাতে এই বিষয়টি মুসলমান ও প্রত্যেক ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য অতি মনোনিবেশযোগ্য যে, বাধ্যতামূলক শিক্ষার সংবিধানের অধীনে যে পাঠ্যসূচি হুকুমত তৈরি করেছে, তা দ্বারা সেক্যুলারিজম প্রমাণ হয় না। তার সাধারণ রোখ বরং অনেক অংশ ইসলামের আকিদা ও আমলের উপর সরাসরি একটি পৃথক আঘাত, যার ফলে একজন মুসলিম শিশু আকিদা ও আমল হিসেবে মুসলমান থাকা কঠিন হবে। সেজন্য সময়ের দাবি মোতাবেক অত্যন্ত প্রয়োজন যে মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা জাতীয়ভাবে করা উচিত।

১৮৫৭ সালের ইনকিলাবের পরও আকাবিরে উম্মত এবং জাতির নাড়ি ও শিরা অনুভবকারী ব্যক্তিদের সর্বোত্তম রাজনীতি ছিল স্থানে স্থানে মাদরাসা তৈরি করা এবং মুসলিম জাতি ধর্মীয় চালচলনে সাহায্য করা। সেই মাদরাসাগুলো আজও আলহামদুলিল্লাহ সফলতার সঙ্গে চালু আছে এবং আপন কর্মে লিপ্ত। তন্মধ্যে কিছু মাদরাসা মার্কাযের মর্যাদা রাখে। যেমন দারুল উলূম দেওবন্দ, মাজাহিরুল উলূম সাহরানপুর, মাদরাসায়ে শাহী মুরাদাবাদ ইত্যাদি। এই মাদরাসাগুলোর উদ্দেশ্য হলো পরিপূরক ও সর্বজ্ঞানের অধিকারী আলেম তৈরি করা, যারা জাতির হেদায়েত ও রাহনুমায়ির ফরিযা আঞ্জাম দিবে। কিন্তু বর্তমান যুগে পরিস্থিতির কারণে ওই মাদরাসাগুলো ছাড়াও এমন মাকাতিব অতি প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যা বিভিন্ন বিক্ষিপ্ততা এমনকি গান্দা লিটারেচার (আদব) এর বিষক্রিয়া থেকে মুসলিম শিশুদের বাঁচাতে পারবে। দীনি মাদরাসা যদি আলেম তৈরি করে, তাহলে এই মক্তবগুলো দীনদার তৈরি করবে, যারা আলেম না হলেও দীনি বুঝ রাখবে।

নিসাবে তালীম ও তালীমের মাধ্যম

উক্ত উদ্দেশ্যের আলোকে জমিয়তে উলামা যথেষ্ট ঘাম ঝরিয়ে চেষ্টা ও গবেষণা করে একটি পরিপূরক পাঠ্যসূচি তৈরি করেছে, যা আস্তে আস্তে সারা দেশে নিজের আসন তৈরি করে নিচ্ছে, সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। হিন্দুস্তানের প্রত্যেকটি প্রদেশ যদি জমিয়তের সাথে এ ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং তার প্রোগ্রাম মোতাবেক এই নিসাব চালু ও প্রসার করার জন্য অনুরূপ কাজ করে, তাহলে অনেকাংশে উক্ত বিষকে দূরীভত করা যাবে, যা ওই অসংযত নিসাবনামা বা সাধারণ প্রচলিত পাবলিক শিক্ষার মাধ্যমে অন্তরে ও মস্তিষ্কে সংযুক্ত হয়েছিল।

এই প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য শিক্ষার মাধ্যম উর্দু ব্যতীত অন্য কোন ভাষা হওয়া উচিত নয়। উর্দু একটি সহজ-সরল এবং সুশিষ্ট ভাষা হওয়া ছাড়াও সেটি এখানকার মাতৃভাষা। আর সাথে সাথে এই ভাষা অনেক ইলম ও ফুনুনের (বিষয়ে) ব্যাংক হিসেবে পরিণত হয়েছে। অতএব তার হেফাজত উলূম ও ফুনুনের হেফাজত এই কাজটি মুসলমানদের সর্বাবস্থায় আবশ্যক।

পূর্বের দীনি মাদরাসাগুলোও এই প্রয়োজনকে গুরুত্বসহ দেখেছে। তারা শিক্ষার মাধ্যম আরবী ভাষাকে রেখেছেন আর বুঝেছেন উর্দু ভাষায়। এতে উর্দু ভাষা শুধু হিন্দুস্তানেই উন্নতি লাভ করেনি বরং মুসলিম জাহানে হাজারো ব্যক্তি ওই

মাদরাসাগুলোর উসিলায় উর্দু ভাষা শিখতে পেরেছে। আজ আফগানিস্তান, ইরান, চীন, তুর্কিস্তান, রুশি তুর্কিস্তান, হিজায, আফ্রিকা, ইরাক, জাদা, সামারা ইত্যাদি দূরদূরান্তের দেশগুলোও উর্দু ভাষা হতে অপরিচিত এবং সম্পর্কহীন নয়। এজন্য আজ যতগুলো প্রতিষ্ঠান উর্দু ভাষাকে হেফাজতের জন্য জোর দিচ্ছে, আমাদের তাদের সবাইকে সাহায্য ও সহযেগিতা করা প্রয়োজন। সুতরাং ইতোপূর্বে আঞ্জুমানে তারাক্কীয়ে উর্দু সংস্থাটি উর্দু ভাষা সংরক্ষণে যে গুরুত্ব সফলতার কাজ শুরু করেছিলেন, জমিয়তে উলামা ও মাদারিসে দীনিয়ার পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানানো হয় এবং সাধ্য মোতাবেক সাহায্য করা হয়। ফলে ভাল প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে।

আরবী ভাষার গুরুত্ব

পাঠ্যসূচি নির্ধারণের ধারাবাহিকতায় ওইদিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, উর্দু যেমনভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও ইলমি ভাষা হওয়ার মর্যাদা কারণে এই দেশে গুরুত্ব রাখে, তেমনিভাবে এমনকি তার চেয়ে আরো বহুগুণ বেশি গুরুত্ব রয়েছে আরবী ভাষার। এটি কুরআন ও হাদিসের ভাষা, যা আমাদের দীন ও ধর্মের উৎসস্থল। হিন্দুস্তানি মুসলমানরা ধর্মের ব্যাপারে যে পরিমাণ ফানা ও বিলীন হয়ে যায়, সেই পরিমাণ ধর্মীয় ভাষা থেকে অজ্ঞ এবং বেপরোয়াও। যার ফলে তাদের কুরআন ও তার পরিভাষার সাথে সম্পর্ক হয় না, যা তাদের দীনি রুচিবোধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সম্পর্কহীনতার মাধ্যম হয়। যদি জাতি ও মিল্লাত দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কের জন্য ভাষা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তু না হয়, তাহলে কুরআন ও সুন্নাতের সঙ্গে সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব পয়দা করার মাধ্যম ও আরবী ভাষা ছাড়া দ্বিতীয়টি নয়।

প্রয়োজন হলে উর্দু নিসাব, এবং উর্দু সাহিত্যের সাথে সংক্ষিপ্ত আরবী নিসাবও মুসলিম শিশুদের মাঝে প্রচলন করা, যাতে তারা আরবী ভাষা থেকে অপরিচিত না থাকে। আমার যতটুকু ধারণা, এই প্রয়োজনকে হযরত মাওলানা মাহফুযুর রহমান সাহেব সাবেক পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি পুরো করেছেন। আরবী নিসাবে তার পাঁচটি কিতাবের একটি সেট রয়েছে, যা আরবী ভাষার গ্রহণযোগ্য পাঁচটি ভান্ডার, যার দ্বারা বাচ্চাদের অতি সহজে ও অল্প সময়ে কুরআনি পরিভাষা সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে আরবী ভাষার রুচিবোধ তৈরি হয়। যদি কিতাবগুলোকে এই উর্দু নিসাবের সঙ্গে যা জমিয়তে উলামা সংকলন করেছে, যুক্ত করা হয় এবং

চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে, যা কিতাব ও সুন্নতের জন্যই শুধু উপকারী প্রমাণিত হবে না বরং মুসলিম জাহানের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কের জন্যও ক্রিয়াশীল ও কার্যকর প্রমাণিত হবে।

জনসাধারণের তরবিয়ত

তালীম বিশেষ কিছু ব্যক্তিদের তরবিয়তের মাধ্যম। এর দ্বারা জনসাধারণদের নসিহত পূরণ হয় না। তার জন্য প্রয়োজন তাবলীগ। তবে শর্ত হলো কোন দলীয় বৈশিষ্ট্যে যেন না হয়। কারণ, তাতে দলাদলি ও গ্রুপিং সৃষ্টি হবে এবং বিষয়টি পিছিয়ে পড়বে। খালেস ইসলামি মাসায়েলের প্রচার ও প্রসার এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমে যে ধরনের প্রয়োজন দেখা দেয়, সেই অনুযায়ী শরীয়তের মাসায়েল দ্বারা জনসাধারণের মন-মস্তিষ্ককে আলোকিত করতে হবে। জমিয়তে উলামা এই ফরিজা আদায়েও গাফেল নয়, তার রিপোর্টগুলোতে তাবলীগি খেদমতের একটি মাকাম রয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতিতে এমন মুবাল্লিগ তৈরি করা প্রয়োজন, যারা ঝগড়াটে হবে না, জেদি হবে না, সহনশীলতা এবং প্রজ্ঞার সাথে মাসায়েলকে সহজ ও বোধগম্য করে দেমাগের ভিতর সহজতা সৃষ্টি করবে। আজ যখন তাবলীগের নামে অনেক নষ্ট চিন্তাধারা এবং অনৈসলামি বিষয় প্রচার হচ্ছে, তখন অতীব প্রয়োজন হলো সঠিক মাসায়েল ও চিন্তাধারা পেশ করে মানুষের অন্তরকে বিক্ষিপ্ততা ও ব্যাকুলতা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

ইসলাহে মুআশারাত বা সমাজ সংশোধন

বর্তমানকালে সবচেয়ে বড় ফেতনা এই যে আমভাবে মুসলমানদের মুআশারাত বা সামাজিক আদান-প্রদান অনৈসলামিক হয়ে যাচ্ছে তাদের বসবাস, চালচলন, চলনভঙ্গি ও কথাবার্তা ইত্যাদি অমুসলিমদের নমুনায় মডেলে হচ্ছে। রুহানি আদবের স্থলে জৈবিক চাহিদা জযবা দিল ও দেমাগের উপর প্রভাব ফেলছে।

বিবাহ শাদী ও শোক সমাবেশে এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অনৈসলামিক প্রথা এবং নিষিদ্ধ কর্মজীবন যাপনের অংশ হিসেবে প্রবেশ করেছে। এগুলোর সংশোধন ব্যতীত মুসলিম জাতির সঠিক চালচলন এবং ব্যক্তিগত মাকাম তৈরি হবে না। সেজন্য তার সংশোধন অতীব জরুরি।

আর এই সংশোধন স্রেফ ওয়াজ-নসিহত বা সাহিত্য দ্বারা হতে পারে না বরং এগুলোর পাশাপাশি প্রতিটি স্থানে মুসলিম ভাইদের থেকে প্রভাবশালীদের বাচাই করে তাদের দ্বারা কার্যকরি কমিটি বানাতে হবে। তাদের সংশোধনের জন্য মেহনত করতে হবে। তারপর তাদের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে হবে। এতে আমলি কার্যকরি কষ্ট পরিশ্রম এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যতীত কাজ হবে না। জমিয়তে উলামা মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং তাবলীগি নিযামের সিলসিলায় উক্ত খেদমত সহজ নিয়মে আঞ্জাম দিতে পারে। সুতরাং মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং সংস্থার কর্মকাণ্ডের সময় উক্ত ইসলাহী তানযীমকেও নজর রাখলে অতি সহজে সফলকাম হতে পারে। এই ইসলাহী কর্ম স্বয়ং এত সুপ্রশস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ যে, যে শ্রেণী বা জামাত এই কাজে সর্বদা সময় দিবে, তারা অন্য ময়দানে পদার্পণ করার সুযোগ পাবে না। এ কারণে উক্ত তাবলীগি কাজের জন্য কর্ম বণ্টন জরুরি। জাতীয় কাজের হাজার হাজার শাখা রয়েছে। যদি কর্মীদের একটি শ্রেণী সকল কাজ সমাধা দেয়ার ফিকিরে লেগে যায়, তাহলে কোন কাজই ভালরূপে সমাধা হবে না। সেজন্য কর্ম বণ্টনের পদ্ধতিতে কর্মীদলকে কাজ বণ্টন করে দেয়া জরুরি।

জমিয়তে উলামা উক্ত উন্নয়ন কাজে জড়িত হয়ে নিঃসন্দেহে পূর্বের ন্যায় রাজনৈতিক মাঠে শরিক হতে পারবে না। কিন্তু তার মানে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হওয়া নয়। যদি জমিয়তে উলামা মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাধারণ সম্মিলিত কাজের জন্য প্রস্তুত হয়, তাহলে অবশ্যই ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও সামনে রাখতে হবে এবং নজর করতে হবে যে, মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও তামাদ্দুনি অধিকারের উপর কোন্ পথে আঘাত আসে এবং তা বন্ধ করার সুরত ও পথ কী। যদি সংবিধান কোন আইন ওই অধিকারসমূহের উপর প্রভাব ফেলে, তাহলে তার বিরুদ্দে প্রতিবাদ করা এবং তাকে নিজেদের পরিপূর্ণ আইনী চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিবর্তনের চেষ্টাও জমিয়তকে করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, এই নেতিবাচক দিক প্রতিরোধ ও থামানোর জন্য জমিয়তকে রাজনীতি এবং রাজনৈতিক চালচলন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হওয়া ছাড়া তার উপর গভীর এবং যাচাইয়ের নজর রাখতে হবে এবং সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছাকাছি থাকতে হবে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। সেজন্য জমিয়তের রাজনীতি হতে সম্পূর্ণরূপে সরে আসার কোন অর্থ হতে পারে না। রাজনীতির মাঠে এতটুকু সম্পর্কের কারণে ১৯৪৭ সালের রাজনীতি থেকে পৃথক হওয়ার ঘোষণার মুখালেফ হবে না। কারণ, রাজনীতির সঙ্গে তার এতটুকু সম্পর্ক কোন সাধারণ কার্যকরী চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যতীত সম্ভব নয়। সংসদীয় রাজনীতির সম্পর্ক যতটুকু

রয়েছে যা থেকে দলগত পৃথকতার ঘোষণা ১৯৪৭ সালে দেয়া হয়েছিল, তা নিয়মমাফিক স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি এ সুপারিশ করা ব্যতীত থাকব না যে, বিশেষ সদস্যদের বাকি রেখে, কমপক্ষে জমিয়তের সাধারণ দায়িত্বশীল এবং উক্ত চিন্তাধারার মাঝে কার্যকরী একক দৃষ্টিভঙ্গি কায়েম থাকা জরুরি। অন্যথায় এই পরিস্থিতি ভ্রান্ত এবং সঠিক উভয় প্রকার অভিযোগের উৎস বনে থাকবে। যে জামাত বা দলগুলো খালেস রাজনৈতিক বা প্রতিরোধ/প্রতিরক্ষা লাইনে কাজ করতে চায়, আমাদের জন্য তাদের থেকে দূরে থাকার সুযোগ নেই। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড যতই আবশ্যক হোক না কেন তা প্রতিরক্ষা প্রয়োজন থেকে খালি থাকতে পারে না। বিশেষ করে যুগ যখন টানাটানি এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বের হয়। কর্ম বণ্টনের মূলনীতির উপর যদি কোন দল নিজের অভ্যন্তরীণ দাবিসমূহ এবং সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এমন কোন লাইন এক্তিয়ার করে, তাহলে ওই বিষয়কে আমরা যাচাই ও পর্যালোচনার অধিকার রাখতে পারি। কিন্তু স্বয়ং ওই কমিটি বা দলকে রহিত করার তো কোন সুযোগ নেই। আর যদি তারা আইনের সীমার মধ্যে নিজেদের কাজের জন্য কোন জায়েযের কারণ কায়েম করেন, তাহলে ভাল কথা ভাল পরামর্শ দিলে কোন অসুবিধা নেই।

জমিয়তের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য

জমিয়তে উলামা নিজের নাম ও রীতিনীতি হিসেবে এটি আহলে ইলমদের দল, যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো ধর্ম ও দীন। সেজন্য জমিয়ত শুধু আপন দলের জন্য নয় বরং মুসলমানদের সকল জামাতের সদস্যদের জন্য একজন মুফতির মর্যাদা রাখে। সে কারণে স্রেফ চারিত্রিক সম্পর্ক নয় বরং দেশের সকল বুদ্ধিজীবী এবং মুসলমানদের অন্যান্য ধর্মীয় ও রাজনীতি দলের সঙ্গে আইনী সম্পর্ক কায়েম রাখা উচিত, যাতে মুসলমানদের প্রতিটি দলের ধর্মীয় প্রয়োজনাদি এবং তাদের সুবিধা ও অসুবিধা সরাসরি ওই দলের যবান থেকে জমিয়তের নিকট আসতে থাকে। আর ওই দিকে দলীয় বিষয়ে জমিয়ত ও প্রতিটি স্তর থেকে সাহায্য পেতে থাকে। এ কাজের জন্য জমিয়তের সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি যথাসম্ভব রীতিনীতি পদ্ধতি থেকে মুক্ত হয়ে সাদাসিধে এবং স্বাভাবিক থাকলে তাদের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে এবং আম ও খাদসের চেষ্টাও বেড়ে যাবে। আর কোন দলই আত্মবিশ্বাসের সাথে জমিয়তে প্রতি মনোযোগী হওয়ার কোন প্রতিবন্ধক হবে না।

ভারত বিভক্তির পর জমিয়তের কর্মসূচি

১৯৪৭ সনের পরবর্তী সময়ে জমিয়তে উলামার দায়িত্বশীল সদস্যগণ মুসলমানদের পার্সোনাল ও ব্যক্তিগত মুআমালা আঞ্জাম দেয়ার জন্য যে শান্দার খেদমত করেছে, তা অস্বীকার করা যাবে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে বিলীন হবে না। আর কাজের এ ধারাবাহিকতা যতক্ষণ পর্যন্ত জারি থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে অনুকূলে না আসে। এই সিলসিলার একটি অপছন্দনীয় পদক্ষেপ ছিল হাজী এবং হেরেম যিয়ারতকারীদের পাসপোর্টের সাথে ইনকাম ট্যাক্সের ফরমের ছক পূরণ করার শর্তারোপ করা। উক্ত পদক্ষেপটি বিভিন্ন কারণে হাজীদের পেরেশানির কারণ হবে এবং তার প্রভাব যিয়ারতকারীদের সংখ্যা এবং হজের আগ্রহ-উদ্দীপনার উপর পড়বে। আশা করি, জমিয়তে উলামা এ সম্পর্কে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে হাজীদের পাসপোর্ট হতে উক্ত শর্ত উঠানোর ব্যাপারে পুরোপুরি চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাবে।

বেকার ও বেকারত্বের বিষয়

ওই সিলসিলার আরো একটি বিষয় হলো মুসলমানদের বেকারত্ব ও কর্মহীনতা, যা তাদের জন্য দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির কারণ। দরিদ্রতায় জর্জরিত হয়ে কখনও দেশ ত্যাগের কুমন্ত্রণা উথলে ওঠে, কখনও ভবিষ্যত প্রজন্মের ব্যাপারে পেরেশানি চিন্তা তাদের ভাবিয়ে তুলে। বেকার সমস্যা অনেক ফেতনা ও অপরাধ সৃষ্টির শিকড়। কর্ম ও উপার্জনক্ষম হওয়া দ্বারা অনেক ফেতনার পথ বন্ধ এমনিতেই বন্ধ হয়ে পড়ে। জমিয়তে উলামা এহেন সমস্যা সমাধানের জিম্মাদারী তো নিতে পারে না। কিন্তু যদি বিবেচনাধীন বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়টি সংযুক্ত করে নেয়, তাহলে জাতির সম্পদশালী ও হুকুমাতের মাধ্যমে দরিদ্রদের বেকারত্ব বিষয়টি সমাধানের জন্য কোন সুরত বের করা যেতে পারে এবং এ ব্যাপারে তাদের সান্ত্বনা দেয়া যাবে এবং মনো প্রশান্তির জন্য কমপক্ষে উপার্জনের রাস্তা বলে দেয়া যাবে।

মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাহে মুআশারাতের প্রচেষ্টা কর্মে যদি উক্ত বিষয়টি সামনে রাখা হয়, তাহলে প্রত্যেক স্থানে ধনী ও গরিবদের মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করে উক্ত সমস্যা সমাধান হওয়ার সুরত কিছু না কিছু বের হবে, সৃষ্টি হবে।

জমিয়তে উলামাকে সাহায্য করা প্রয়োজন

সুতরাং জমিয়তের সাবেক অনেক মূল্যবান খেদমতের সাথে আজও যদি তার উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম ও কর্মসূচিকে কার্যকর করা হয়, তাহলে তার প্রশস্ততা পূর্ব থেকে কম হবে না। অতএব এমন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না যে, যদি জমিয়তে উলামা রাজনীতি থেকে পৃথক হওয়ার ঘোষণা দিয়ে থাকে, তাহলে আজ তার পাত্রে কিছু অবশিষ্ট নেই এবং তার অবস্থান নিঃশেষ হয়ে গেছে? যদি তার রাজনীতি মূলত ধর্মের জন্য ছিল, অবশ্যই ধর্মের ছিল, তাহলে নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যেতে পারে যে, পূর্বেও জমিয়ত ধর্মের কাজ করতো, আজও ধর্মই তার সামনে থাকবে, ধর্মই তার প্রথম কাজ। প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর বা পরিবর্তনের পর কাজের ধরন কিছু পরিবর্তন হয়। আসল উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয়ে কোন পরিবর্তন হয় না। সেজন্যই আজও মূলনীতির আঁচল পূর্বের ন্যায় ভরপুর। এজন্য যেভাবে ৪৭ সালের পূর্বে তার নিয়মে শরিক হওয়া জরুরি ছিল, তেমনিভাবে আজও শরিক হওয়া জরুরি। বিশেষ করে তার তালিমী প্রোগ্রামকে কার্যকরীরূপে চালু করা এবং বিস্তার করা প্রয়োজন। তাই সকল মুসলমান জমিয়তে উলামার সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করবে এবং পূর্ণ আনন্দ ও উল্লাসের সঙ্গে তার সঙ্গ দিবে।

১৯৪৭ সালের পর জমিয়ত উলামা এমন একটি দল, যার প্লাটফর্মের উপর থেকে মুসলিম জাতি নিজেদের সকল দীনি, সামাজিক, তামাদ্দুনিক এবং অন্যান্য সকল দলীয় উদ্দেশ্য পুরা করতে পারে। কারণ, তার পিছনে সোনালী ইতিহাস রয়েছে, যা সকলের জানা। অতএব অতীতের ন্যায় আজও তার উপর ভরসা রাখতে হবে। তাই নতুন নতুন দল গঠন করার স্থলে এমনটিই উত্তম হবে যে, পুরাতন গঠনকৃত দলকে নিয়ে আগে বাড়া। তার গঠনতন্ত্রকে মজবুত করা এবং বেশি বেশি সময় ব্যয় করে তাকে কামিয়াব করা, মতের ভিন্নতা এবং মতবিরোধ থেকে কোন প্রতিষ্ঠান এবং কোন দল খালি নেই। কিন্তু এহেন মতপার্থক্য কোন জামাতের সঙ্গে মিলে কাজ করতে বাধা সৃষ্টি হতে পারে না। তবে শর্ত হলো, কাজে দৃঢ়তা থাকতে হবে এবং সাচ্চা নিয়ত থাকতে হবে। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে যখন জমিয়তের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের বিশেষ কোন জামাত বা নির্দিষ্ট কোন পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। এজন্যই সমস্ত মুসলমান এই প্রতিষ্ঠান, চিন্তাধারা ও রীতিনীতি পরিবর্তন করা ব্যতীত আপন করে নিতে পারে।

জমিয়তের মূলধন

জমিয়তে উলামার প্রাচীন ইতিহাস একটি আজিমুশ্বান ইতিহাস। তার চিন্তাধারা বা মূলনীতি হিন্দুস্তানের ওই নির্বাচিত উলামাদের মেধা ও দেমাগের মূলধন, যারা সর্বদা মুসলমানদের সফলতার খেদমত এবং তরবিয়ত করেছেন। এজন্য জমিয়তের চিন্তাধারা ও মূলনীতি সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, তার যে কোন একটি মূলনীতি গ্রহণ করলেও মুসলমানদের পস্তাতে হবে না। কোন কারণ থাকতে পারে না যে, জমিয়তের মূল নীতি এবং আমাদের সাহায্য-সহযোগিতার মধ্যে কোন সমুদ্র প্রতিবন্ধক হবে। অথবা আমরা তার তানযীমে শরিক হতে কোন প্রকার সংকোচবোধ করব। যদি প্রতিবন্ধকতার কোন কারণ সামনে আসে, তাহলে তা দূর করার পদ্ধতি ও পথ, অভিযোগ বা দূরে বসে বসে কিছু বলা ও শোনার স্থলে, বেশি উপকার হবে ঐক্যবদ্ধভাবে নিকটে গিয়ে তার সংশোধন করা। এখন যা পেশ করছি, তা নতুন কোন বিষয় নয়। এর পূর্বেও অনেকবার বলা হয়েছে এবং এগুলোর অনেক অংশ স্বয়ং জমিয়তে উলামার প্রোগ্রামে পূর্ব হতেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন উদ্দেশ্য শুধু স্মরণ করানো ও সংস্কার করা এবং আপনাদের থেকে কাজ প্রার্থনা করা। কারণ, কোন আইন ও মূলনীতির সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়ার রাস্তা হলো স্রেফ আমল করা। যদি আমল না হয়, তাহলে কুরআনি এবং অকাট্য উসূল ও নিজ স্থানে যতই উঁচু মাপের হোক তা উপকারী হিসেবে প্রমাণিত হবে না।

অথচ তাকাজা হলো, আংশিক মতামত ও কিয়াসের ইখতিলাফ ছুড়ে দূরে ফেলে আমলের পথে পা বাড়ানো। বরং এখন তারও প্রয়োজন হওয়া উচিত যে, জমিয়তে উলামা মানুষদের ডাকবে এবং কাজে জড়িত হওয়ার জন্য বারবার আবেদন করবে। বরং লোকেরা নিজে নিজে আপনি খেদমত পেশ করে জমিয়তের হাতকে শক্তিশালী করবে। মেনে নিলাম, যদিও জমিয়তের কাজে অসম্পূর্ণতা এবং ভুলত্রুটি বা কর্তব্যে অবহেলা রয়েছে, যা থেকে কোন ব্যক্তি এবং দল মুক্ত নেই, তাহলে তাও আপনারা যদি তৈরি হয়ে যান এবং আমলের দাবি করেন, তাহলে দূর হয়ে যাবে। ফলে অভিযোগের প্রয়োজন হবে না। জমিয়ত উলামার বুযুর্গদের এই সভাপতিত্ব দান নিজেদের একজন খাদেমের উৎসাহ প্রদানমাত্র। অন্যথায় আকাবির ও সম্মানিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আমার মত একজন অযোগ্য, বেকারকে সভাপতির আসনই নয় বরং তাদের সারির কোন আসনে বসা দুঃসাহস এবং বেয়াদবীমূলক কাজ। এই বেয়াদবীর ক্ষমা চেয়ে ইতি টানলাম এবং জমিয়তকে জিন্দাবাদ জানালাম।

বয়ান : ১০

সিলেবাস প্রণয়ন

কুরআনুল কারীম সর্বযুগে অপরিবর্তনীয়। কিন্তু তার বোঝানোর ধরন-নমুনা ভিন্ন হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ যে যুগে ফালসাফার জোর ছিল, ফিলোসফীদের দৌড়ঝাঁপ ছিল, সে যুগে কুরআনকে ফিলোসফি ঢঙ্গে বুঝানো হয়েছে। যে যুগে তাসাউফের দৌড়ঝাঁপ ছিল, সে যুগে কুরআনকে সুফীবাদের রঙে বুঝানো হয়েছে। আজ বিজ্ঞানের যুগ, তাই কুরআনকে সাইন্সি রঙে সুপ্রকাশ করব। এ সকল হাকিকতকে আমি সারনির্যাস হিসেবে শব্দাবলিতে প্রকাশ করতে পারি যে, 'মাসায়েল পুরাতন ও দালায়েল নতুন'। আমরা ওই আসল ফিতরি মাসায়েলকে নতুন অস্ত্রে সজ্জিত করে সবার সামনে প্রকাশ করব।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



আরবী ও ফার্সি তালিমী নিসাব সম্পর্কে লক্ষ্ণৌর এসেম্বলি হলে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর ঐতিহাসিক তেজোদীপ্ত বক্তৃতা

পূর্বকথা

ভারত সরকার আরবী মাদারিস নিয়ন্ত্রণ এবং সংস্কারকরণ ও প্রাচ্য উলুমের শিক্ষা পাঠ্যসূচি সংশোধন সংক্রান্ত যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা অবশ্যই সুন্দর এবং প্রশংসাযোগ্য ও অনুগ্রহ। এরই প্রেক্ষিতে হযরত মুহতামিম সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দ ৭ রবিউল আউয়াল ১৩৬৬ হিজরি সনে একটি বিস্তারিত দীর্ঘ পত্র ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জনাব হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সাহেবের দপ্তরে প্রেরণ করলেন। তাতে দারুল উলূম দেওবন্দের সমাপণি সনদ এবং তাকমীল শ্রেণীর সনদকে গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকর ও ক্রিয়াশীল স্বীকৃতি দেয়ার জন্য জনাবের বিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আজ যদি দারুল উলুমের ফুযালারা নিজেদের জীবন যাপনের তাগিদে হুকুমাতের কোন বিভাগের চাকরি করতে চায়, তাহলে সে যতই যোগ্যতাসম্পন্ন হোক না কেন তাদেরকে মৌলভী ফাযিল বা সমপর্যায়ের কোন সরকারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত তাদের সরকারি চাকরির সুযোগ দেয়া হয় না। অথচ দারুল উলুমের ফুযালারা ইলমি যোগ্যতার দিক থেকে সর্বাবস্থায় ইউনিভার্সিটির প্রথাগত ডক্টর ডিগ্রিপ্রাপ্তদের থেকে উন্নত ও উপযুক্ত। যদিও দেওবন্দের তালীমের উদ্দেশ্য সরকারি চাকরি অর্জন করা নয়। কিন্তু যারা প্রয়োজনের তাগিদে অপারগ হয়ে সরকারি চাকরি করতে চায়, তাদেরকে ফাযিল সমমানকে বিএ এমএ এবং তাকমীলের সনদকে এমএ ও পিএইচডি সম্মান স্বীকৃতি দিতে সরকারের সংশয় ও বিলম্ব করা উচিত নয়। এখানে এই বিষয়টি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট করে দেয়া আবশ্যক যে, দারুল উলূম সর্বাবস্থায় নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা, শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনাবিষয়ক এবং সরকারি সাহায্য গ্রহণ থেকে যেমনভাবে এখন পর্যন্ত সম্পর্কহীন এবং স্বাধীন রয়েছে, তেমনিভাবে একই পলিসি ও নিয়ম ভবিষ্যতেও যথারীতি বহাল থাকবে।

হাকীমুল ইসলামের সুস্পষ্ট ও বিশদ পত্রের উত্তর প্রদান করে জনাব মাওলানা আযাদ সাহেব লিখলেন, এই ব্যাপারে আমি নিজে হযরতের সাথে মুলাকাত এবং বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। যেহেতু ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ ঈসায়ী লক্ষ্ণৌ এসেম্বলি হলে আরবী ও ফার্সি তালিমি নিসাব সম্পর্কে সরকারি শিক্ষা

কমিটির নেতৃত্বে একটি তালিমী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে, যাতে দারুল উলুমের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করবেন, সেই অনুষ্ঠানে জনাবের সঙ্গে আমার মতবিনিময় হবে। দয়া করে উক্ত স্থানে উপস্থিত হওয়ার কষ্ট সহ্য করবেন। সুতরাং ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ ঈসায়ীর ওই শিক্ষা কনফারেন্সে দারুল উলূমের পক্ষ থেকে দারুল উলুমের মোহতামিম হযরত হাকীমুল ইসলাম, দেওবন্দের শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী এবং দারুল উলুমের মুফতি হযরত মাওলানা ইযায আলী সাহেব কনফারেন্সে শরিক হয়েছিলেন এবং তাদের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব, মাওলানা মিরাজুল হক সাহেব। তারা দেওবন্দের উস্তাদ আর মাওলানা আযিয আহমাদ সাহেব মুবাল্লিগে দেওবন্দ এবং আমি খালিক আহমাদ সিদ্দিকী, সম্পাদক মাসিক দারুল উলূম। আর দেওবন্দের কারিগরি শাখার তত্ত্বাবধায়ক ও মুবাল্লিগও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইউপির বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের দ্বারা এসেম্বলি হল ভরপুর ছিল। ইউপি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য বেশ ক'জন মন্ত্রী এবং পার্লামেন্টারি সদস্যগণও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ঠিক বিকাল তিনটার সময় কনফারেন্সের প্রধান বা সভাপতি মাওলানা আযাদ সাহেব আনুমানিক দীর্ঘ দু'ঘণ্টা পর্যন্ত একটি মজবুত উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। তাতে তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের ইলমি শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার অবনতির অবস্থার হালত বর্ণনা করে বর্তমান আরবী মাদরাসাসমূহের তালিমী নিসাব (পাঠ্যসূচি) এবং শিক্ষাপদ্ধতির উপর কঠোর সমালোচনা করলেন এবং বললেন, এই শিক্ষা-পঠন পদ্ধতি এবং পাঠ্যসূচির অনেক সাইড সময়ের চাহিদাসমূহ এবং প্রয়োজন পূরণে প্রতিবন্ধক এবং পুরোপুরি অনুপস্থিত। এগুলোকে অতি দ্রুত পূরণ করা আবশ্যক। শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক হওয়া উচিত। তার সঙ্গে আরো যুক্ত করা উচিত স্রেফ কিতাবের পাবন্দী নিয়মানুবর্তিতা একটি অহেতুক এবং ক্ষতিকর বস্তু, যা দ্বারা ইলম কয়েকটি লাইনে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে চিন্তা, ফিকির এবং ইজতিহাদ ও গবেষণার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। আযাদ সাহেবের এই সমালোচনার পর কিছু আলেমদের মধ্যে অসন্তুষ্টির (প্রভাব) আলামত দেখা দেয়, যা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা যে, বক্তৃতা শেষ করার পূর্বেই মাওলানা আযাদ সাহেব অনুভব করতে পেরেছেন, তিনি উক্ত সমালোচনায় সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমার আরো কিছু বলার ছিল, আপনাদের স্ব-স্ব অভিমত দ্বারাও উপকৃত হওয়ার ছিল। কিন্তু সময় যেহেতু পুরা হয়ে গেছে, তাই উচিত হবে, কনফারেন্সকে দ্বিতীয় বৈঠকের জন্য আগামীকাল ২৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর দেড়টা পর্যন্ত মুলতবী করা।

দ্বিতীয় দিন ঠিক দুপুর দেড়টায় হযরত হাকীমুল ইসলাম সাহেব এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরামগণ এসেম্বলি হলে সঠিক সময়ে তাশরিক নিলেন। আনুমানিক পৌনে দুটার সময় মাওলানা আযাদ সাহেব সভাপতির ভাষণ শুরু করেন। তিনি তার বক্তৃতায় নিসাবে তালীমের বিষয়টি পুনরায় উত্তাপন করে বললেন, আজ এতটুকু অবশ্যই বলব যে, যারা ইলমকে শুধু ইলমের জন্য পড়ে, যাদের উদ্দেশ্য ইলম দ্বারা জীবনোপায় অর্জন নয়; বরং স্রেফ ইলম এবং ইলমি যোগ্যতা সৃষ্টি করা, সেগুলো কওমি ও ধর্মীয় স্বাধীন মাদরাসাসমূহ, যাতে দীনিয়তের তালিম (ধর্মীয় শিক্ষা) অত্যন্ত স্বনির্ভরতা এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে দিয়ে থাকে। সেগুলোর মধ্যে বিশেষ করে দারুল উলূম দেওবন্দ একটি সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রাখে, যে প্রতিষ্ঠান সুদীর্ঘ আশি বছর যাবত অত্যন্ত শান শওকতের সাথে সর্বোচ্চ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এই মার্কাযী ইলমি প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব ও পশ্চিমে নিজের ইলমি প্রভাব ছড়িয়েছেন এবং আফগানিস্তান, বুখারা, বলখ, সামারা, আরব, তুর্কিস্তান ইত্যাদি দেশে দেওবন্দের ফুযালারা ছড়িয়ে পড়েছেন, যারা ইসলামের সঠিক ও মৌলিক খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। দারুল উলূম দেওবন্দ অত্যন্ত নাযুক এবং দুর্যোগপূর্ণ যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার প্রতিষ্ঠাতাদের হাতে স্বর্ণ-রূপা ছিল না। কিন্তু ইখলাস, সততা ও মুসলিম উম্মাহর খেদমতের সাচ্চা জযবা ছিল। সেই ইখলাসপূর্ণ বুনিয়াদের কারণে উত্তম ফুযালা-ফারেগীন তৈরি হচ্ছে। যারা দেশ ও বিদেশে ইসলামের প্রতিটি শাখায় শান্দার খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। পরিশেষে আফসোস ও অনুতাপের সাথে এ কথা অবশ্যই বলব যে, সেই যোগ্যতাসম্পন্ন ফুযালাদের যে অবস্থান ও পদমর্যাদা দেশে হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। এজন্য আমার অন্তর ব্যথিত। আমার গভীর অন্তরের আরজু হলো, এই ফুয়ালারা কেন ওই মাকাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, যার তারা যোগ্য হকদার।

এ ব্যাপারে আমার নিকট অভিজ্ঞতার আলোকে মাপা একটি পত্র এসেছে, যাতে ওই কষ্ট-দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই ফুযালায়ে দেওবন্দকে তাদের সর্বোচ্চ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পরিশেষে তাদের কেন ওই পদমর্যাদা দেয়া হয় না, যার তারা উপযুক্ত এবং অধিকারী (চিঠি বলতে হাকীমুল ইসলামের চিঠি বুঝানো হয়েছে, যার আলোচনা উপরে করা হয়েছে)। এটি স্বয়ং আমার অন্তরের আহ্বান। কিন্তু প্রয়োজন হল, তারা সামান্য একটু আগে বাড়বে এবং তাদের তালিমী জীবনে কিছুটা পরিবর্তন হবে। তাদের নিসাবে তালীমে পাঠ্যসূচিতে যুগের চাহিদা অনুপাতে কিছুটা পরিবর্তন করবে। আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন

নেই সামান্য পরিবর্তনই যথেষ্ট। নিসাবে সংশোধন, শিক্ষা পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন এবং শিক্ষার রঙে সামান্য পরিবর্তন।

মোটকথা আযাদ সাহেব দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় দরদমাখা আন্দাযে উলামাদের নিকট আবেদন করেছেন যে, তারা যেন নিসাবে তালিম সংশোধনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেন। আর প্রথম দিনের বক্তৃতায় যে কঠোরতা এসেছিল, তার ক্ষতিপূরণ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। মাওলানা আযাদ সাহেবের বয়ানের পর সাথে সাথে খান বাহাদুর মৌলভী মাহদী হাসান সাহেব যিনি লক্ষ্ণৌর শিয়া মাদরাসার প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি সভাপতির অনুমতি নিয়ে দাঁড়ালেন এবং লিখিত স্মরণিকা সামনে রেখে, মাওলানা আযাদ সাহেবের বক্তৃতাকে অক্ষরে অক্ষরে সমর্থন করলেন। শুধু ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে আরবী মাদরাসার দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষার নিসাবে শামিল করার বিরোধিতা করলেন। তারপর হযরত মুহতামিম সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দ (যাকে উলামায়ে দেওবন্দ এবং উলামায়ে মাজাহিরুল উলূম সাহরানপুর ও মুরাদাবাদের পক্ষ থেকে ওই সম্পর্কে খেয়াল পেশ করার জন্য প্রতিনিধি বানানো হয়েছিল)। তিনি নিজ স্থানে দাঁড়ালেন এবং জনাব সভাপতি মাওলানা আযাদ সাহেব থেকে বক্তৃতা দেয়ার অনুমতি চাইলেন। হযরত সভাপতি সাহেব অত্যন্ত আনন্দচিত্তে এবং অনুরোধের সুরে হযরত মুহতামিম সাহেবকে বক্তৃতার অনুমতি দিলেন। প্রথমে যেহেতু আওয়াজ কিছুটা নিম্নস্বরে ছিল তাই সভাপতি সাহেব শুনতে পারেননি। তাই তিনি বললেন, হযরত আমার পাশে স্টেজে চলে আসুন এবং এখান থেকে বক্তৃতা পেশ করুন। সুতরাং হযরত মুহতামিম সাহেব স্টেজে আরোহণ করে মাওলানা আযাদ সাহেবের আসনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিজের আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ মনোমুদ্ধকর ঢংয়ে অত্যন্ত সাহিত্যপূর্ণ এবং পরিপূরক ভাষণ পেশ করলেন যার সারসংক্ষেপ নিম্নে পেশ করা হলো।



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا• اَمَّا بَعْدُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰه عليه وَسَلَّم: إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

মুহতারাম সভাপতি ও সম্মানিত উপস্থিতি!

তালিমী কমিটির এই কার্যকরী পদক্ষেপ যা আযিমুশ্বান কনফারেন্সের অবয়বে আপনাদের সামনে আর কনফারেন্স সভাপতির মূল্যবান নসিহতাবলি যা গতকাল থেকে এখন পর্যন্ত আপনারা শুনে আসছেন এটি অত্যন্ত মোবারক তালিমী বিষয়ে প্রশংসিত পদক্ষেপ।

সহীহ তালীমের আসবাব ও আমলকারী

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন জাতির উন্নত ও বিখ্যাত হওয়া, এমনকি টিকে থাকা নয় বরং তাদের অস্তিত্ব যে ভিত্তির উপর মজবুত ও দৃঢ় থাকে, তাহলো তাদের সহীহ তালিম। আর সহীহ তালিম বলতে আমার উদ্দেশ্য হলো উপযুক্ত তালিমী নিসাব, ক্রিয়াশীল তালিমি পদ্ধতি, সঠিক উস্তাদ নির্বাচন, তালিমের নিযাম দূরস্ত থাকবে। যদি কোন জাতির মাঝে তালিমই না থাকে, তাহলে তা একটি বুনিয়াদী রোগ, যার কারণে কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে

পারে না। তালিমের নিসাব যদি ভুল ও অশুদ্ধ হয়, তাহলে যেহনের ডাইশ দুরস্ত হয় না। আর তালিমের পদ্ধতি যদি গলদ, হয় তাহলে তালিমের পুরোপুরি প্রভাব প্রকাশ হতে পারে না। আর উস্তাদ যোগ্য না হলে যোগ্যতার দ্বার উন্মুক্ত হয় না। আর সবকিছু থাকল কিন্তু তালিমের নিযাম সঠিক নেই, তাহলে প্রত্যাশিত ফলাফল মিলবে না।

মোটকথা, সঠিক ও শুদ্ধ তালিমের জন্য ওই সকল অংশগুলো থাকা আবশ্যক এবং এই কর্মগুলো তালিমের জন্য বুনিয়াদী বস্তু। কিন্তু আপনারা যদি গভীর চিন্তা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, ওই সকল বুনিয়াদী বস্তুর জন্য আরো একটি গভীর বুনিয়াদ রয়েছে যে তার সুস্থতা ও অসুস্থতার উপর ওই সকল বস্তুর সুস্থতা ও অসুস্থতা নির্ভর করে। আর তাহলো তালিমের মূলনীতি (চিন্তাধারা) এবং উদ্দেশ্য। এই মূলনীতির ভাল-মন্দ দ্বারা ওই বুনিয়াদসমূহে ভাল-মন্দ সৃষ্টি হবে। এমনকি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর এবং প্রতিষ্ঠান থেকে ফয়েযপ্রাপ্তদের কামিয়াবী এবং নাকামিয়াবীর কষ্টিপাথর। এর ভিত্তিতে ওই ইদারার (পূর্ণতা) কামাল ও অপূর্ণতা ফয়সালা করা হয়।

চিন্তাধারা বা মূল উদ্দেশ্যের গুরুত্ব

মূল চিন্তাধারার বিষয়টি মাথায় রেখে চিন্তা করা হলে যে উদাহরণস্বরূপ বৃটিশ সরকার সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল উদ্দেশ্য স্থির করেছেন চাকরি, যাতে এই শিক্ষার মাধ্যমে কেরানি বা দফতরি ইত্যাদি কর্মী তৈরি হয়। নিঃসন্দেহে বৃটিশ সরকারের চিন্তাধারা মানবতার সেবা দীনদারী এবং হক ও সততার সেবা ছিল না। এজন্য আমরা সরকারি ইদারা ও প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের চিন্তাধারার অধীনে যাচাই করতে পারি।

সরকারি ইদারা থেকে ফারেগ হওয়া ব্যক্তিদের আমরা উক্ত মাপকাঠিতে পরখ করতে চাই না যে, তারা কতটুকু সত্য এবং কতটুকু মূল্য, চাই দেশ ও জাতি হোক। সুতরাং নিজেদের নির্ধারণ করা মাপকাঠি দ্বারা গভর্নমেন্ট ও তার প্রতিষ্ঠান সফলকাম হয়েছে। আমাদের মাপকাঠি দ্বারা মাপা আমাদের অধিকার নেই। তবে আমাদের অভিযোগ করার অধিকার রয়েছে সরকারি চিন্তাধারার উপর। কিন্তু সরকারের পালিত ব্যক্তিদের উপর অভিযোগের অধিকার নেই। কারণ তারা তো নিজেদের মানদণ্ডে সফলকাম হয়েছেন।

আর এর সম্পূর্ণ বিপরীতে কওমী প্রতিষ্ঠান এবং দীনি মাদরাসাগুলোর তালিম দ্বারা উপার্জন, পদমর্যাদা কোনটাই উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো তাহযীবে

নফস আত্মাকে সংশোধন করা যে, এই শিক্ষার মাধ্যমে এমন লোক তৈরি করা হবে, যারা মানবতার সঠিক সেবক হবে এবং জগদ্বাসীর কল্যাণ কামনায় নিজের জান ও মাল এবং ইজ্জত-আবরুর কোন তোয়াক্কা করবে না। প্রকাশ থাকে যে, আমাদেরকে এই ব্যক্তিদের সফলতা ও অসফলতা এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পূর্ণতা ও অপূর্ণতা ওই মাপকাঠি এবং চিন্তাধারার মাধ্যমে যাচাই করতে হবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই ইদারাগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই ইদারাগুলো নিজেদের মাককসাদে সফলকাম হয়েছে। আমাদের কোন অধিকার নেই, তাদেরকে সরকারি মানদণ্ডে যাচাই করব। তারপর তাদের মূল্যহীন করব।

কওমী ও সরকারি ইদারার সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি

কওমী মাদরাসাসমূহের ফারেগীন ও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বা সাধারণ সরকারি বিভিাগসমূহের সঙ্গে ভবিষ্যতে কেমন সম্পর্ক থাকবে? এ সম্পর্কে আমাকে এ কথা বলার অনুমতি দেয়া হোক যে, আজ বিপ্লবের এক প্রকার প্রবল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এবং নেতৃত্ব পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমান হুকুমত জাতীয় হুকুমত থেকে রূপরেখা পেতে পারেন। এই হুকুমাতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল উদ্দেশ্য যদি তাই থাকে যা বিদেশী হুকুমাতের ছিল যে কিছু ক্লার্ক, কিছু সরকারি মেশিনের ম্যাকার, কিছু অফিস পিয়ন তৈরি করা। তাহলে মাদরাসাপড়ুয়াদের যে রীতিনীতি পূর্বেকার হুকুমাতের সঙ্গে ছিল, বর্তমান হুকুমাতের সঙ্গে তাই থাকবে। কিন্তু বর্তমান গভর্নমেন্টের চিন্তাধারা যদি অফিসিয়াল কর্মী তৈরি করা না হয় বরং এমন মন ও তবিয়তওয়ালা ব্যক্তি সৃষ্টি করতে চায়, যারা সত্যিকার মনুষ্যত্বে সজ্জিত হয়ে মানবতার সাচ্চা সেবক হবে, পরস্পর মেলামেশা ও সালাম বিনিময়, বন্ধুত্ব ও ঐক্যের গুণে অভ্যস্ত হয়ে দেশ ও জাতিকে সর্বোচ্চ উন্নতিতে পৌছানোর জযবা আগ্রহ রাখবে। তখন আমরা মনে করব, এই চিন্তাধারা ওই কওমী মাদরাসার কাছাকাছি এসে যাবে এবং মিলনের একটি দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হবে। সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য বন্ধুত্ব হওয়া জরুরি আর তা হতে পারে সম্মিলিত চিন্তাধারার মাধ্যমে। এজন্য আমার মতামত হলো, দীনি আরবী মাদারিসের রীতিনীতিতে পরিবর্তন সৃষ্টি করা থেকে অধিক জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারি ইদারাগুলোর মূল উদ্দেশ্য পরিবর্তন করা। এটি একটি সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধার, যা সরকারি ও কওমী প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পর নিকটবর্তী করতে পারে। এমতাবস্তায় কওমী মাদরাসাগুলোর এই কাজটি প্রয়োজন হবে না যে, তারা সরকারি ডিগ্রি বা সাহায্যের প্রতি ঝুঁকবে।

বরং আশা করি, গভর্নমেন্টের প্রয়োজন হবে যে, তারা মাদরাসার ছাত্রদের মূল্যায়ন করবে, তাদের খুঁজে বেড়াবে। আর এই সুরতে দীনি মাদরাসাগুলো প্রতিটি চারিত্রিক সাহায্যের হক পুরা করতে পারবে। কিন্তু নিজেদের স্বাধীনতা ঠিক রেখে। তারা যেভাবে সর্বদা আযাদ থেকেছে, তেমনিভাবে আজও তাদের তালিম ও নিযামে তালিম উভয়টি আযাদ থাকবে। এটি তাদের আযাদীরও কারিশমা যে, যখন মাওলানা আযাদ সাহেব আযাদীর কারণে তাদের এবং তাদের খেদমতকে সমর্থন করেছেন। তারা যদি আযাদ না হতেন, তাহলে প্রশংসাযোগ্য হতো না। আর যারা আযাদ নয়, তাদের এমন অবস্থানও নেই।

নিসাবে তালিম পরিবর্তনের বিতণ্ডা

এখন বাকি থাকল আরবী মাদরাসার নিসাবে তালীম পরিবর্তনের বিতণ্ডা। আমি এই মূলনীতি অস্বীকার করি না আর কেউ করবেও না যে, তালিমাতের সম্পর্ক আল্লাহর ওহীর সাথে। তা পরিবর্তন করতে আমরা সক্ষম নই এবং অধিকারও নেই। তবে যে বিষয়াবলি বা কিতাবসমূহ কুরআনুল কারীমের খাদেম হিসেবে তালীমের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলো যুগ ও পরিস্থিতি অনুপাতে পরিবর্তন হতে পারে।

কুরআনুল কারীম সর্বযুগে অপরিবর্তনযোগ্য কিতাব। কিন্তু তার বুঝানোর ধরন যুগে যুগে পরিবর্তন হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ফালসাকার জোরের যুগে ফারসাফার রঙে বুঝানো হয়েছে। যে যুগে তাসাউফের জোর ছিল, সে যুগে কুরআনকে সুফিয়ানা স্টাইলে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে সাইন্সের জোর; তাই কুরআনকে সাইন্সি আলোয় আলোকিত করব। এই সকল হাকিকতকে আমি সারসংক্ষেপ হিসেবে এই শব্দাবলিতে প্রকাশ করতে পারি যে–

"সমস্যা পুরাতন এবং দলিল-প্রমাণ নতুন।

আমরা সেই প্রাচীন স্বভাবজাত মাসায়েলগুলো আধুনিক অলংকারে সজ্জিত করে ময়দানে পেশ করব। সুতরাং নিসাব পরিবর্তন করার নির্যাস এছাড়া অন্যকিছু নয় যে, আমরা আপন শ্রোতাদের যবানে, নিজের ঘরের বস্তু তাদের সম্মুখে পেশ করব। ওহীর কিতাব এবং মাসায়েল পরিবর্তন করা যায় না, আর বদল করার আমাদের অধিকারও নেই। এজন্য সময়ের চাহিদানুপাতে এই ব্যাখ্যাগত বিষয় এবং কিতাব পরিবর্তন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। স্বয়ং দরসে নিযামির আবিষ্কার নিসাব পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় দলিল। কেননা, এই নিসাব প্রথম শতাব্দির নয়, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। অতএব, যখন প্রথম

অবস্থায় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব ছিল, তখন আজও তা সম্ভব হবে। কিন্তু ওই সীমারেখার ভিতরে যা পূর্বে পেশ করেছি।

নিসাবের বিষয়টি সর্বাবস্থায় উলামাদের মধ্যে গবেষণার বিষয় এবং সময় সময় তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হচ্ছে এবং হবে। আমি নিজে ১৩৫৮ হিজরি সনে আফগান সফর থেকে ফিরে এসে দারুল উলুমের মজলিসে শূরার মিটিংয়ে এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেছিলাম, যাতে নিসাব পরিবর্তন সংক্রান্ত নিজের চিন্তাধারা বিষদভাবে প্রকাশ করেছিলাম। অতএব নিসাবে তালীমের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে আসছে এবং হতে থাকবে। কিন্তু জরুরি হলো দায়িত্বশীল উলামায়ে কেরামগণ এই কাজটি নিজ হাতে করবেন। যেমনটি আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তবে যা কিছুই হয় তা নিজেদের দক্ষতার আলোকে পরিবর্তন করবে। আমি মনে করি, পরিবর্তনের সকল কাজ সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুসরণযোগ্য, যাতে সেগুলোকে কওমী মাদরাসার কাছাকাছি নিয়ে আসা যায়। নিসাবনামার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সব যুগেই হয়ে আসছে, যা এই বিষয়টির পৃথক দলিল যে, চিন্তাশীল ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন আলেমদের গুরুত্ব সর্বযুগেই রয়েছে। আর সব যুগে চিন্তাবিধ ও অসচেতন বুদ্ধিমান আলেম পয়দা হতে থাকবেন। যারা যুগের চাহিদা পুরা করবেন। প্রথম যুগ, মধ্য যুগ এবং শেষ যুগ কোন যুগেই চিন্তাশীল ও সচেতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন আলেম উম্মতের মধ্যে কম থাকবে না এবং কম হবে না। কারণ, স্বয়ং সাহেবে শরীয়ত ইরশাদ করেছেন–

مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ

আমার উম্মতের উদাহরণ বৃষ্টির ন্যায়। জানা নেই তার শুরুটা ভালো না, শেষটা ভাল।

এই হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, চিন্তাশীলতা কোন যুগের সঙ্গে রিশেষিত নয় বরং উত্তরসূরিদের মধ্যে পূর্বসূরীদের এত চিন্তাশীল ও দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি হতে পারে। এমনিভাবে সাহেবে শরীয়ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين ،

وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين

উত্তরসূরীদের মধ্যে প্রত্যেক ন্যায়পরায়নগণ এই ইলমকে বহন করবে। তারা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতিকে রদ

করবে, পথভ্রষ্টদের অবৈধ দাবিকে খণ্ডন করবে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যাকে দূর করবে।

তেমনিভাবে তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দিতে এমন একজন মুজাদ্দিদ পাঠান, যে উম্মতের দীনকে সংস্কার করে।

আর দীনের সারকথা যখন ঈমান ও আকাঈদ, ইসলাম ও আহকাম, তাযকিয়ায়ে আখলাক ও ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ, তখন অসম্ভব যে, মুজাদ্দিদ সেগুলো থেকে অপরিচিত থাকবেন অথবা তাঁর সংস্কারের অধীনে তরবিয়তপ্রাপ্ত চিন্তাবিদ তৈরি হবে না। এজন্যই সর্বাবস্থায় চিন্তা ও ফিকিরের দরজা খোলা থাকবে। কিন্তু আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা মোতাবেক সীমা অতিক্রম করে ফিকিরকে ফিকির বলব না এবং চিন্তাকে চিন্তা বলব না।

সর্ব প্রকার বুনিয়াদী বস্তু হলো মূল উদ্দেশ্য। তার দ্বারা প্রতিষ্ঠান গড়ে তা বিকৃতি হলে প্রতিষ্ঠান বিকৃত হয়ে যায়। আর এই লক্ষ্যের অধীনে আরো দুটি বুনিয়াদী বস্তু রয়েছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে পেশ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমার মস্তিষ্কে বিস্তারিত ও বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু সেগুলো উল্লেখ করার স্থান এটা নয়। কারণ, জনাব সভাপতি সাহেব উক্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য তিনি নিজেই একটি কমিটি করেছেন আর আলোচনা উক্ত কমিটিতে আসবে। সেজন্য এই সংক্ষিপ্ততার উপর তুষ্ট হওয়া যথেষ্ট মনে করছি।

বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর বক্তৃতাটি তালীম বিষয়ের প্রতিটি সাইড মূলনীতি হিসেবে এমন পর্যায়ের পরিপূরক ছিল যে, পরবর্তী সকল বক্তাদের জন্য তাছাড়া কোন উপায় থাকেনি যে, তারা তালীমের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরতের বক্তৃতার রেফারেন্স দিয়ে পূর্ণ সমর্থন করেছেন। হযরতের পর মাওলানা মুহাম্মদ রেজা সাহেব ফিরিঙ্গি মহল আলেমদের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তৃতা করলেন। তার বক্তৃতার সারসংক্ষেপ ছিল এমন, তিনি মুনাযারা স্টাইলে মাওলানা আযাদ সাহেবের বক্তৃতার উপর রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যখন তালিমের উদ্দেশ্যের কথা এসেছে তখন তিনি হযরতের বক্তৃতাকে পুরোপুরি

সমর্থন করেছেন। তারপর লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির আরবী প্রভাষক জনাব ড. আবদুল হালিম সাহেবও মুনাযারা স্টাইলে বক্তৃতা করলেন, তিনি মাওলানা আযাদ সাহেবের বক্তৃতার মধ্যে দোষ বের করলেন। পরিশেষে মুহতামিম সাহেবের বক্তৃতার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য উল্লেখ করে তার সমর্থন ও হৃদয়গ্রাহী করলেন অত্যন্ত জোরালো শব্দাবলি দ্বারা। শেষ পর্যায়ে প্রধান কাজী ও ডাইরেক্টর উলুমে মাশরেকিয়্যাা রিয়াসত ভূপাল জনাব আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান সাহেব বক্তৃতার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি অত্যন্ত বিশদ ও দালিলিক একটি বক্তৃতা দিয়ে হযরত মুহতামিম সাহেবের বক্তৃতার এই বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করলেন যে, মাসায়েল পুরাতন এবং দলিল নতুন। বললেন এর চেয়ে পরিপূরক কোন বাক্য নেই, যা নিসাব পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করতে পারে।

তারপর জনাব মাওলানা আবদুল মজীদ সাহেব বেনারশী অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে বক্তৃতা করে অত্যন্ত শান শওকতপূর্ণ শব্দাবলি দ্বারা হযরত মুহতামিম সাহেবের বক্তৃতার সমর্থন প্রকাশ করলেন।

সর্বশেষে মাওলানা আযাদ সাহেব সমাপণী বক্তৃতা দিলেন। তিনি হযরত মুহতামিম সাহেবের বক্তৃতার উপর নিজের প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি এমনভাবে প্রকাশ করলেন যে, কেমন যেন নিজের সমাপণি বক্তৃতার মতন মূল অংশ বানালেন হযরত মুহতামিম সাহেবের বক্তৃতাকে। তিনি হযরতের বক্তৃতার বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য বারবার উল্লেখ করতে লাগলেন। যেমন তিনি বলতে লাগলেন এভাবে যে, একটু আগে মাওলানা তৈয়্যব সাহেব বলেছেন, মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব সম্পূর্ণ সঠিক ও যথাযথ বলেছেন ইত্যাদি। আযাদ সাহেব বললেন, মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেবের উক্ত বাক্যটি মাসায়েল পুরাতন ও দালায়েল নতুন আমাদের ওই সমস্ত তালিমী মাকসাদের প্রতিবিম্ব এবং মাখনের মাখন, যা আমাদের সম্মুখে উদ্দেশ্য। এই বাক্যটি এত পরিপূরক ও সম্পূরক ব্যাখ্যা যে, এখন আপনি যতই ব্যাখ্যা করেন এবং ব্যাখ্যার দপ্তর তৈরি করেন; কিন্তু উদ্দেশ্যই এই বাক্যের বাইরে যাবে না।

মাওলানা আযাদ বললেন, হ্যাঁ মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব পুরোপুরি সঠিক এবং অত্যন্ত উপযোগী কথা বলেছেন যে, আরবী মাদরাসার নিজস্ব নিসাবে তালিম এবং মূল উদ্দেশ্যকে সংশোধন করা এত জরুরি নয়, যত প্রয়োজন সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য।

সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি নিজেদের মূল উদ্দেশ্য, চিন্তাধারা এবং তালিম ও তরবিয়ত পদ্ধতি ঠিক করে নেয়, তাহলে সেগুলো কওমী মাদরাসার কাছাকাছি চলে আসবে। তারপর আযাদ সাহেব বললেন, মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব

সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন যে, কওমী ও দীনি মাদরাসাগুলোর এই উন্নতি তাদের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন চলনের উপর সীমাবদ্ধ। একেবারেই সঠিক যে, তাদের স্বাধীন থাকাই তাদের উন্নত ও বুলন্দ মর্যাদা আর তাদের সেই স্থানেই থাকা উচিত।

তারপর মাওলানা আযাদ বললেন, মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব যথাযথই বলেছেন যে, তালিমের মূল উদ্দেশ্য যদি শুধু কর্মচারী, কেরানি ও দপ্তরি সৃষ্টি করা হয়, তাহলে এর চেয়ে নিম্নমানের কোন উদ্দেশ্য হতে পারে না এবং তা দেশের কোন সঠিক খেদমত হবে না। এভাবে হযরত মাওলানা আযাদ সাহেব হযরত মুহতামিম সাহেবের বক্তৃতার বাক্য বাক্য নিয়ে তার ব্যাখ্যা অত্যন্ত মর্যাদা ও শানদার স্টাইলে নিজ ভাষায় ব্যক্ত করলেন, যার দ্বারা মাওলানা অন্তরে প্রভাবিত হওয়া প্রকাশ করছিলেন। আর এর ফলে উপস্থিত সবাই খুব প্রভাবিত হচ্ছিলেন।

দেওবন্দের চিন্তাধারার সাথে জড়িতদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও খুশির মাকাম ছিল যে, পুরো তালিমী কনফারেরেন্সের হিরো বনে গেলেন দারুল উলূম দেওবন্দ আর দারুল উলুমের হালকার মধ্যে পুরো কনফারেন্সের হিরো হলেন মুহতামিম সাহেব, যার বক্তৃতার প্রতটি বাক্য এমনকি প্রতিটি শব্দকে চিন্তাশীল এবং সচেতন আলেমগণ পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন এবং আপন বক্তৃতায় সেগুলোর ব্যাখ্যা ও তাফসীর করতে থাকেন। ফলে একটি মার্কাযী তালিমী ইদারার, তালিমী লাইনে যে মাকাম ও অবস্থান হওয়ার প্রয়োজন, তা যথাযথভাবেই অর্জন হলো। আলহামদুলিল্লাহ।

বক্তৃতার শেষ প্রান্তে মাওলানা আযাদ সাহেব বললেন, আমি একটি কার্যকরী প্রস্তাব আপনাদের সামনে পেশ করছি আর তাহলো ১৫/২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি তালিমী কমিটি তৈয়ার করে অতিদ্রুত নিসাবে তালীমের সংশোধন ও পরিবর্ধনের কাজ শুরু করা হোক।

উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর করা হলো এবং অত্যন্ত খায়ের ও সুষ্ঠতার সঙ্গে তালিমী কনফারেন্সের সমাপ্তি হলো।

আহকার

খালিক আহমদ সিদ্দিকী

সম্পাদক, মাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ।

বয়ান : ১১

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে মূর্তিনির্মাণ

ভারতবর্ষের মূর্তিপূজকরা আল্লাহ তায়ালার কাল্পনিক প্রকাশস্থলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়নেওয়ালা ৩৩ কোটি দেবতার রঙিন মূর্তির গোলামি করে। পশ্চিমা বিশ্বের তিন খোদার পূজারীরা কুমারী মরিয়মের মূর্তি এবং আল্লাহর পুত্রের মূর্তির সামনে মাথা ঠোকে। ইরানী অগ্নিপূজারীরা ইরাজদান ও আহরমান মূর্তির সামনে বৈরাগ্য ও মনের বাসনা জাহির করে। অগ্নিপূজকরা অগ্নিশিখার সামনে মাথা নত করে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا• اَمَّا بَعْدُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ

ধ্বংসাত্মক হস্তশিল্প

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আজ মূর্তি ও ছবিনির্মাণকর্ম তার অসাধারণ প্রচার ও প্রসারের বদৌলতে বর্তমান সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। তার কোন শাখা আপন সৌন্দর্যকে ছবি ও মূর্তি ব্যতীত কায়েম রাখতে পারেনি। ঘর ও দোকান, হস্ত লিপি, বই-পুস্তক, চিঠি, মুদ্রা ও টাকা, সীলমোহর, দাওয়াতনামা, সনদপত্র, তলোয়ার-হাতিয়ার, ছুরি-চাকু, চামচ, ফ্লোর, প্রতীক ইত্যাদি কোন বস্তু ছবি থেকে খালি নেই এবং মূর্তি বা ছবি ব্যতীত এগুলোর অন্যকিছুর কল্পনাও করা হয় না। ফলে আকর্ষণ ও জযবার সকল শক্তি আজ ছবি ও মূর্তি তৈরিতে জড়িত হয়ে পড়েছে। আনুমানিক সমগ্র পৃথিবীর সকল জাতি নিজেদের পূর্ণ আকর্ষণ ও ভালবাসার সাথে ছবি ও মূর্তি দিকে নির্দেশপ্রাপ্তদের মত দৌড়াচ্ছে।

জাতিসংঘের এক বৈঠকে, যা মূর্তি ও ছবির সাথে আত্মোৎসর্গ সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আমরা ছবিকে কোন দৃষ্টিতে দেখি। অবশ্যই আমরা উক্ত সম্মেলনের বিপরীত এমন চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে ছবিকে দেখি যে, ছবি শুধু নিষিদ্ধ বস্ত নয় বরং এমন ধ্বংসাত্মক ও খারাপ হস্তশিল্প হিসেবে দেখি, যা একজন মুসলিমের মুসলমানসুলভ মনে যথেষ্ট রেখাপাত করে।

প্রতিকৃতি শুধু পরিচয়ের মাধ্যম

এটি একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, প্রত্যেক সুরত নিজেদের হাকিকত প্রকাশ এবং তার পরিচয়ের একটি মাধ্যম মাত্র। সুরত ও আকৃতির জগতের কোন হাকিকত সুরত ছাড়া পরিচিত হয় না। অতএব সুরত একটি মধ্যস্থতাকারী খাদেম, যার দায়িত্ব হলো স্রেফ বস্তুর হাকিকত পর্যন্ত পৌছানো।

যায়েদ ও উমরের অবয়ব আকৃতি, প্রাণীজগত ও উদ্ভিদজগতের আকৃতি, শুধু এতটুকু গুরুত্ব বহন করে যে, জগৎকে তাদের অদৃশ্য হাকিকতের পরিচয়কারী বানিয়ে দেয়। তার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, হাকিকত বা হাকিকতের ভাষ্যকার ব্যতীত কোন সুরত ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয় যে, শুধু সুরত স্বয়ং মাকসুদ (উদ্দেশ্য) নয় এবং মাকসুদ হওয়ার শানও রাখে না।

উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে এ বিষয়টি পরিমাপ করা কষ্টসাধ্য নয় যে, প্রকৃত মাকসুদ হলো হাকিকত। আসল বস্তু সুরত বা আকৃতি নয়। সুরত পরিচয়ের মাধ্যসমূহ থেকে একটি মাধ্যম। ধরে নেয়া যাক, যদি আমরা সুরত ব্যতীত কোন বস্তু চিনতে সক্ষম হই, তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তখন সুরতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা আমাদের নিকট বিরক্তিকর অনুভব হবে। আর আমরা উক্ত কাজকে সময় নষ্ট করা মনে করব। এজন্য একথা বলা অহেতুক হবে না যে, সুরত ও আকৃতির প্রতি মনোনিবেশ করা মূলত সরসারি হাকীকতের উপর সক্ষম না হওয়ার এবং আমাদের অনুভূতিশক্তি অসম্পূর্ণ হওয়ার ফলাফল।

উদাহরণস্বরূপ আমরা আগ্রার তাজমহলের আসল নকশাকে দৃষ্টিতে রাখার জন্য, তার ছবিকে সামনে রাখি। কিন্তু যদি কোন উপায়ে আমরা স্বয়ং তাজমহল এখানে তুলে নিয়ে আসতে পারি অথবা সর্বদা সব স্থান থেকে তাকে দেখতে সক্ষম হই, তাহলে সম্ভবত আমাদের ধ্যান ওই কাগজের তাজমহলের প্রতি কখনো মনোনিবেশ করবে না। এ কারণে এই ফলাফল পরিষ্কার যে, সুরত ও আকৃতির সামনে রাখা আসল ও মূলকে স্মরণ করার একটি মাধ্যমমাত্র এবং

সাথে সাথে সুরত দেখা অনুভূতিশক্তি অসম্পূর্ণ হওয়ার ফল যে, সে আসলকে সরাসরি দেখতে পারে না।

সুতরাং যখন এমন কোন সুরত, যা কোন প্রকৃত হাকিকতের শিরোনাম বা ভাষ্যকারও, তাও শুধু মাধ্যম হওয়া ছাড়া বেশি কিছু হতে পারে না, তাহলে ওই মূর্তি বা ছবি যা সুরত হয়ে শুধু সুরতের ভাষ্যকারী করছে, হাকিকতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অথবা কাল্পনিক মূর্তি, যার নিচে বাস্তব কোন সুরতই নেই, তাহলে অবশ্যই তা ভিত্তিহীন, ওজনহীন ও ভ্রূক্ষেপহীন। সে হাকিকতের স্থলে বাতিল এবং ভিত্তিহীন বা অস্তিত্বহীন বস্তুর ভাষ্যকারী করছে। তারপরও যদি এমন ভিত্তিহীন ও বাতিল সুরত মূর্তিগুলোকে মনোনিবেশের কেন্দ্র বানিয়ে নেয়া হয়, তাহলে তাকে মূল মাকসুদ থেকে অপ্রাকৃত এবং মাধ্যমের প্রতি আকর্ষণ ব্যতীত কোন শব্দে এমন কর্মকে ব্যাখ্যা করা হবে। আর এ কথা কে না জানে যে, মাকসুদ (মূল) থাকাবস্থায় শুধু ওসায়েলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকা ও মহব্বত রাখা অথবা অন্য শব্দে বলা যায় যে, নিজের অনুভূতির অসম্পূর্ণতা বা দুর্বলতা এবং কল্পনার অক্ষমতাকে দূরীভত করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও সেগুলো জিইয়ে রাখা, পালতে থাকা, বুদ্ধিমত্তার স্থলে নির্বুদ্ধিতা ও নাদানের কর্ম বরং তার চেয়ে আরো নিচের স্তরের কর্ম পাগলের কর্ম।

শিরক ফিল মাকসুদ

সুতরাং আলোচ্যবিষয়ের এহেন পরিবর্তনের ফলে মাধ্যম মাকসুদের মর্যাদা অর্জন করবে এবং স্বয়ং মূল মাকসুদ গুরুত্বহীন হয়ে যাবে। এর দ্বারা শিরক ফিল মাকসুদের (মাকসুদের সাথে শরিক করা) বুনিয়াদ শক্ত হয়, যার দায় একক ছবি বা আকৃতির উপর আরোপিত হয়। প্রকাশ থাকে যে, যখন অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে নিমগ্ন করে পরিদর্শন আস্বাদনের আগ্রহী বানানো হয় এবং মূর্তিসজ্জার মাধ্যমে সুরতের আসক্ত বানানো হয়, তখন তার ফলাফল এ ছাড়া আর কে কি বের হতে পারে যে, সে নিজের মনোশান্তিকে নষ্ট করে? কিছু অদৃশ্যের হয়েছে, কিছু জাহেরের হয়েছে, কিছুটা হাকিকতের প্রতি আকৃষ্ট আর কিছু সুরতের প্রতি।

কেমন যেন সে নিজের আসল স্বভাব থেকে অদৃশ্যের দিকে এবং অন্য কোন হাকিকতের দিকে ঝুঁকেছে। আর ওই অপ্রাকৃত শক্তি থেকে দৃশ্যমান এবং সুরত ও আকৃতির দিকে ধাবিত হয়েছে। আর এমনভাবে একত্ববাদ উদ্দেশ্যের স্থলে একাধিক উদ্দেশ্যের অপরাধী হয়ে যাবে, যা শিরকের হাকিকত। আর একথা

সবাই অবগত যে, মাকসুদের মাকসুদ বাকি না থাকা মানে শিরক ফিল মাকসুদ হতে বিরত না থাকা, আকলের ভ্রষ্টতা এবং সুস্থ বুদ্ধির হত্যাকে নিজের কাঁধে তুলে নেয়া ছাড়া কিছুই নয়। হ্যাঁ যে পর্যায়ের মাকসুদ হবে সেই পর্যায়ের গায়রে মাকসুদের অংশীদারি কায়েম করা ফিতরতের বিপরীত এবং অপরাধ হবে।

মূর্তিপূজা

এখানে পৌঁছে পৃথিবীর জাতি-গোষ্ঠী দুটা পথ ধরেছে। একদল যারা মাবুদ তালাশে অস্থির ও পেরেশান ছিল এবং গায়েব পরিচয়ের প্রেমিক ছিল। তারা নিজেদের অনুভূতিশক্তির চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মূর্তিকে আল্লাহর বড়ত্ব ও শক্তি জানার মাধ্যম স্থির করেছে এবং রবের পরিচয়ের জন্য প্রথমেই মূর্তিকে কল্পনার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছে। কিন্তু চলমান অভ্যাস মোতাবেক মানুষের অনুভূতি শক্তি এবং আকল ও মারেফতের প্রভাব প্রথমে মূর্তিকে আল্লাহর অংশীদার বানিয়েছে। অতঃপর আস্তে আস্তে মূর্তির মধ্যে মাকসুদিয়্যাত ও মাবুদিয়্যাতের যোগ্য হওয়ার শান সৃষ্টি করেছে। ফলে সকল ইবাদতকর্ম রুকু, সিজদা, নজর, মান্নত, ভেট, ভোগ ও কুরবানী ইত্যাদি যা ওই অতুলনীয় ও বেমিছাল সত্তার জন্য হতো, এখন তা তার নামের মূর্তি এবং কাল্পনিক অবয়বের জন্য হচ্ছে। গতকাল পর্যন্ত যে চিহ্ন ও অবস্থা তার নামে এবং তার সূক্ষ্ম ধ্যানে আত্মায় সৃষ্টি করা হতো, আজ তা তার কাল্পনিক সুরত ও মূর্তিসমূহ দ্বারা অর্জন করতে চাচ্ছে।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মূর্তিপূজক জাতি উম্মতে নূহ আ.। তারা পাঁচজন নেককার ব্যক্তির (ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নাসর) মূর্তিকে আল্লাহ পরিচয়ের মাধ্যম বানিয়ে নিজেদের মাবুদ হিসেবে সাব্যস্ত করে। পরিশেষে ওই মূর্তিগুলো তাদের চিন্তা-চেতনার উপর বিজয় অর্জন করে এবং এক সূক্ষ্ম ও সর্বজ্ঞাত আল্লাহর স্থলে পাঁচটি দেহধারী মূর্তি হয়ে দৃঢ় ও মজবুত মাবুদ হয়। এমন দৃঢ় হয় যে, তারপর তাদের নিকট পৃথকভাবে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে, সেগুলো সন্তানদাতা গণ্য হয়। ওরাই ইজ্জত বৃদ্ধির মালিক হয়। আর তাদের শক্ত মূর্তি থেকে সবাই আপন উদ্দেশ্য প্রার্থনা করতে থাকে। পরিণামে জাতি প্রকৃত হাকিকতসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে স্রেফ মূর্তিপূজার জালে ফেঁসে গেছে এবং তাদের চিন্তা-চেতনা মন-মানসিকতা গভীর ও প্রশস্ত হওয়ার স্থলে এমন হাল্কা হয়ে রয়েছে যে, হযরত নূহ আ.-এর সাড়ে নয়শত বছরের ওয়াজ ও নসিহত শুধু কয়েক দিনের মুনাফিকী ব্যতীত অন্য কোন নসিহত এবং কোন একটি

পরিণতিও তাদের দিল ও দেমাগ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। অতঃপর শুধু শুধু নূহ জাতিই নয় বরং প্রত্যেক মূর্তিপূজারী জাতি, যারা কওমে নূহের নকশে কদমের সহযাত্রী হয়েছে, তারাও ওই একই হালকাপূজারীর শিকার হয়েছে।

হিন্দুস্তানের মূর্তিপূজক এবং আল্লাহ তায়ালার কাল্পনিক দৃশ্যের সঙ্গে সম্পর্ককারীরা শত কোটি দেবতার রঙিন মূর্তিসমূহের গোলামে পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্যের তিন খোদার পূজারী, কুমারীর মূর্তি এবং আল্লাহর কথিত বেটার দেহের সামনে মাথানত করে থাকে। ইরানী অগ্নিপূজকরা ইয়াজদান ও আহরমান মূর্তির সামনে বৈরাগ্য ও মনোবাসনা প্রকাশ করছে। অগ্নিপূজকরা অগ্নিশিখার সামনে মাথানত করছে। মোটকথা ওই অনুভূতিপ্রিয়তাকে আকৃতি দান করে মানুষকে হাকিকত থেকে দূরে রেখেছে এবং তাদেরকে নিরেট শিরকের পথে ঠেলে দিয়েছে। ফলে এই আশরাফুল মাখলুকাত নিজের তাওহীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে, আর নিজেদের মনের বিক্ষিপ্ততা ও মতপার্থক্যের ধ্বংসাত্মক ফাঁদে ফেঁসে নিজেদের প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে।

মূর্তিচর্চা

অন্যান্য জাতির নিজেদের মূর্তিবাদী এবং ছবিপ্রিয়তা আল্লাহ তালাশের মাধ্যম ছিল না এবং তারা মূর্তি ও ছবি দ্বারা গায়েবী দৃশ্য অন্বেষণ শুরু করেনি। তথাপি তামাদ্দুন ও সামাজিকতা সংক্রান্ত সকল সৃষ্টিকে এই মূর্তির মাধ্যমে পরিচয়ের জযবা তাদেরও আসল ও মূল থেকে হটিয়ে নকলপছন্দী এবং ফের খালেস মূর্তিপূজা বা হাকিকত হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এই জাতি প্রথম জাতি হতে অনেক নিম্নে এবং যলিল ও তুচ্ছ স্থানে পৌঁছে থেমেছে। প্রথম জাতিরা যদিও সুরত ও মূর্তিগুলো ভবিষ্যৎ কিবলা বানিয়েছে, কিন্তু আল্লাহকে চিনার জন্য হাকিকতের বাহক ছিল। কমপক্ষে তাদের অন্তরে খোদা পাওয়ার জযবা তো ছিল। কেমন যেন হাকিকত তালাশ করতে গিয়ে সুরতের সঙ্গে মহব্বত সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। কিন্তু অন্য জাতির মূর্তিবাজির মধ্যে প্রথমেই হাকিকত দর্শনের কোন প্রকার জযবা তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল না। তাদের মূর্তিপ্রিয়তার জযবা স্রেফ সৌন্দর্য, সাজসজ্জা বা বাহ্যাড়ম্বর ও প্রদর্শনী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল, যার সম্পূরক শুধু সুরত আর সুরত, মূর্তি আর মূর্তি। অর্থাৎ এই জাতির নিকট মূর্তি ও ছবি দ্বারা কোন গোপন এবং অদৃশ্য হাকিকত জাতির করা তো উদ্দেশ্য হতো

না। তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য শুধু প্রকাশ্যমান জগতকে সুরত ও ছবি দ্বারা পরিচয় লাভ করা।

প্রকাশ থাকে যে, কায়েনাতের হাকিকত ও সুরত উভয়ের মধ্যে সুরতের স্থান হলো ফানি (নিজেই ধ্বংস) ও আনুষাঙ্গিক বস্তু। আর যখন ফানির ফানি পর্যায়ের অর্থাৎ মূর্তি ও ছবিকে সর্বশেষ মাকসুদ বানানো হয়, তখন এহেন জাতি শুধু বাস্তবতা হতেই দূরে থাকবে না বরং বাতিল থেকে বাতিল এবং হাকিকতহীন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের ওজন, শক্তি ও শিকড়কে আপন হাতে দুর্বল করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। ইউরোপের সংস্কৃতিপূজারী জাতি-গোষ্ঠী এই বাতিলপ্রিয়তা ও মূর্তিবাজির অভিশাপে সবচেয়ে বেশি জড়িত। ওই জাতিকে এই বুনিয়াদ ও সুরত দৃশ্যপূজারি এবং প্রদর্শনীপ্রিয়তা এমন পর্যায়ের হাল্কা, গাম্ভীর্যহীন এবং ভিত্তিহীন জাতিতে পরিণত করেছে যে, আজ তারা কোন হাকিকত পর্যন্ত তো পৌঁছতে পারবে না; এমনকি তাদের আবিষ্কৃত সুরতের সামনে কুদরতি প্রাকৃতিক সুরতের সাথে পুরোপুরি হৃদ্যতা কায়েম রাখতে পারে না। কারণ, এগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু বাস্তবতা তো অবশ্যই ছিল। তাদের চিন্তা-চেতনা ও জযবাসমূহের বড় একটি অংশ, নিজেদের হাতে তৈরি মূর্তিদের সাথে জড়িত হয়ে গেছে, গোলাম বনে গেছে। মূর্তি ও ছবি প্রকৃতি নির্মাণ ও সাজানো এবং ক্রয় করার কাজে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা, মূর্তির সামনে কল্পনার জগতে ওদের সঙ্গে কথা বলা, ইশ্‌ক ও মহব্বতের জযবাকে কাগজের রঙিন প্রতিচ্ছবির উপর উৎসর্গ করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

মূর্তিপূজার পরিণাম

আজ উলঙ্গ মূর্তিগুলোকে সামনে রেখে জৈবিক জযবা বা প্রবৃত্তির জযবা এমনভাবে প্রজ্বলিত করা হয়, যেমনভাবে কোন প্রকৃত সুরতের সামনে হতে পারে। বড় বড় ব্যক্তিত্বের মূর্তি শুধু বাজারের চত্বরেই স্থাপন করা হয়নি বরং অন্তরের গভীরে এমনভাবে গ্রথিত হয়েছে যে, তার সামান্য বদনাম ও অপমান করার দ্বারা এমনভাবে ইজ্জত নষ্টের বা মানহানির মামলা চালানো হয়, যেমনভাবে আসল ব্যক্তিত্ব বা জীবিত মানুষের ব্যাপারে চালানো হয়। পরিশেষে লানেসের মূর্তির মোকাদ্দমা দুনিয়ার দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়নি, সে কাঠুরিয়ার মূর্তির মানহানির কারণে, তার অনুসন্ধানে পুলিশ নির্ধারণ করা, তখনকার মূর্তিপূজক ইতিহাসে সংরক্ষিত। অথচ বর্তমান সময়ে সেই ঘটনা কোন ভিত্তি পাওয়া যায়নি। এই সমস্ত মুআমালা শুধু আবিষ্কৃত চিত্রের সাথে এমনভাবে শান

শওকতের সঙ্গে করা হচ্ছে যা সাধারণত কুদরতি চিত্রের সাথে করা হয়। কিছু দুর্লভ ও প্রাচীন বাদশাহী মূর্তির মূল্য এত পরিমাণ ওঠে যে, যদি সেগুলোকে নিলামে উঠানো হতো, তাহলে তার মূল্য দশ ভাগের এক ভাগও উঠতো না। অথচ এই মূর্তির জযবা ফিল্ম তৈরির ভিন্ন একটি বিষয় সৃষ্টি করে ফেলেছে, যার জন্য সরকারি বাজেটের পৃথক একটি অংশ নির্দিষ্ট।

প্রতিটি ফিল্মে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়। ছবি তৈরির কর্ম অনেক মূল্যবান কর্ম এবং সিনেমার দামি ইমারতগুলোকে সাংস্কৃতির অত্যন্ত শানদার ও প্রিয় দর্শনীয় উন্নতি মনে করা হয়। জীবিত মানুষদের থেকে এমন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা হয়, যা সিনেমার ছবিগুলো থেকে নেয়া হয়। প্রদর্শনী ও প্রতিকৃতিপূজার সর্বশেষ সীমা হলো হলো, বর্তমান সময়ে মানুষ নিজেই নিজের নিকট মূল্যহীন হয়ে গেছে যে, তার কর্মের জন্য স্বয়ং তার কুদরতি শরীর যথেষ্ট থাকেনি, যতক্ষণ না তার সুরতের বানানো সুরত অর্থাৎ ছবি সামনে বিদ্যমান থাকবে।

মোটকথা, মহব্বত ও শত্রুতা, পছন্দ ও অপছন্দ, ইশক ও ভালবাসা এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের ওই সকল মুআমালা যা একজন ভাস্কর্যপ্রিয় মানুষ মানুষের আসল ও প্রকৃত আকৃতি দ্বারা করে থাকে, আজ সেই ছবিরও নকল ছবি এবং কাল্পনিক সুরতের সঙ্গে সম্পর্ক করছে। সুতরাং এটি কি সুরতপছন্দীর শেষ সীমা নয়? আর যখন অবস্থা এমন হবে, তাহলে এটি হাকিকত থেকে বেখবর এবং অবজ্ঞার শেষ পর্যায় হবে না। অতঃপর এই জাতির ব্যাপারে যারা হাকিকত থেকে অজ্ঞ সেজে শুধু ছবির পিছনে লিপ্ত রয়েছে, তাদের ব্যাপারে আকল ও বুদ্ধি কেমন ফয়সালা করবে?

সুরতপছন্দীর সর্বশেষ পর্যায়

সুতরাং মানবজাতির উভয় দলের মধ্যে মূর্তি তার স্বভাবজাত চালচলনের মাধ্যমে আসল অজানা পর্দায় লুকিয়ে জোরপূর্বক তার স্থান দখল করে নিয়েছে। তেমনিভাবে উভয় স্থানে সে তাওহীদের মূল উদ্দেশ্যের শিকড় উপড়িয়ে শিরকের ভিত্তিকে মজবুত করে নিয়েছে। জাতির মধ্যে শিরকে ইবাদত সৃষ্টি করে ফেলেছে এবং সংস্কৃতিমনা জাতির মধ্যে শিরকে আদত সৃষ্টি করে ফেলেছে। এই শিরক ও মূর্তি ছবিপ্রিয়তার প্রথম স্তর। সুরতপছন্দীর সর্বশেষ মঞ্জিল হলো এই যে, অন্যের সঙ্গে শরিক হওয়া ব্যতীত শুধু সুরতই-হাকিকতের স্থান দখল করে পৃথকভাবে নিজেই মাকসুদিয়্যাতের (মূল উদ্দেশ্য) শান গ্রহণ করেছে। সুতরাং

ধর্মপ্রিয় জাতিদের সামনে মূর্তিই পৃথক প্রয়োজন পুরাকারী বনে অন্তরের কিবলা হয়ে গেছে। আর তামাদ্দুনিক জাতির সামনে ফটো ও দৃশ্য পৃথক প্রেমিক ও মূল উদ্দেশ্যস্থল বনে গেছে।

বর্তমানে কোন ডিজাইন ও নমুনা গ্রহণযোগ্য হয় না যাতে ফটো-ছবির দখল নেই। কোন পাণ্ডুলিপি আকর্ষণীয় হয় না যতক্ষণ না ফটো এবং বিশেষ উলঙ্গ ছবি দ্বারা সাজানো হয়। কেমন যেন সাহিত্য বইয়ের প্রাণ হলো রঙিন ফটো, উন্নত বিষয়ের স্থান।

ইল্‌ম ও জ্ঞানের মাঝে কোন শক্তি নেই যে, মানুষের পকেট থেকে টাকা বের করবে। কিন্তু ছবি আপন নিরেট ভালবাসার ভিত্তিতে এই আকর্ষণ ও টান অবশ্যই রাখে, যে ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারে, দোকানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারে এবং মানুষের মূল্যবান সময়কে নিজ পাতার জন্য কিনে নিতে পারে।

অদৃশ্য খাজানা হতে বঞ্চিত হওয়া

সারকথা এই বের হলো যে, বিশেষ করে মূর্তি মানুষকে হকপছন্দী থেকে অতি সহজে বাতেলপছন্দী চিন্তা-চেতনার দিকে নিয়ে যায়। বাস্তব জযবাকে বেকার ও নিষ্ফল বানিয়ে শেষ পরিণামের সৌভাগ্যকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। সুতরাং মানুষ যেখানে অদৃশ্য থেকে বের হয়ে দৃশ্যমান পৃথিবীতে এজন্যই এসেছিল যে, প্রত্যেক জীবন্ত দৃশ্য হতে দূরে থেকে গায়েবের অদৃশ্যের কালবী মুশাহাদায় নিমগ্ন হবে, প্রত্যেক সুরতগত বস্তুকে ডিনাই করে হাকিকতের দিকে যাবে এবং প্রতিটি বাতিল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে হকের দিকে ধাবিত হবে, যাতে তার সম্পর্ক ফানি বস্তুর স্থলে বাকি বস্তুর সঙ্গে হবে। এভাবে সে নিজেও স্থায়ী বনে যাবে এবং তার আমলের সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে। আর এখন ওই মূর্তি ও ছবির বদৌলতে এমন বক্র পথ অবলম্বন করেছে যে গায়েবের প্রতিটি রাস্তা হতে দূরে সরে সে অনুভবযোগ্য বস্তুকে নিজের চিন্তা-চেতনার কিবলা বানিয়ে নিয়েছে। গোপন ও অদৃশ্যের প্রতিটি খাজানা থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবন্ত প্রকাশ্য বস্তুকেই নিজের গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয় বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর রূহানিয়াতের সকল মজাদার পেশা থেকে বেপরোয়া হয়ে বস্তুবাদ বা বস্তুর অপবিত্রতায়, অপরিচ্ছন্নতায় পেষণ হওয়া নিজের জন্য সবচেয়ে বেশি মজাদার পেশা জ্ঞান করে। এমনকি যখন সে বাকিয়াতে সালেহাত তথা নেক কর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে ফানি (ধ্বংসশীল) বস্তুর মাঝে মগ্ন হয়, তখন নিজের আসল অস্তিত্ব হতে দূরে সরে নিজেও অস্তিত্বহীন বনে যায়।

মূর্তি বা ছবির সাথে হাকিকত জ্ঞাতদের আচরণ

উক্ত বাস্তবতাকে সামনে রেখে যদি আল্লাহর বিচারে যারা হাকিকতজ্ঞানী, তাদের হাকিকতপ্রেমিক অন্তরসমূহ সুরতের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে এবং মূর্তি ও ছবিকে ঘৃণা করে, তাহলে তা কি অবাস্তব আশ্চর্য হবে? হাকিকতজ্ঞানী ফেরেশতাগণ মূর্তি ও ছবির সঙ্গে কেমন আচরণ করেন?

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

যে গৃহে কুকুর ও ছবি-মূর্তি থাকে, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। *[বুখারী ও মুসলিম]*

হযরত খাতিমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ন্যায় হাকিকতজ্ঞাত ব্যক্তিত্ব ওই রীতিনীতি ও নকশার চিত্রের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন?

لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন গৃহে এমন কোন বস্তু যাতে ছবি মূর্তি রয়েছে, তা ভাঙা ছাড়া রাখতেন না। *[বুখারী শরীফ]*

মূর্তি বা ছবি নির্মাণকারীর পরকালীন পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা ছবি নির্মাণকারীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ

কেয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন আযাবে লিপ্ত হবে এমন মানুষ, যারা আল্লাহ তায়ালার শানে তাখলীকে (সৃষ্টি করা) নিজেকে তার মত বানাতে চায় অর্থাৎ ছবি নির্মাণকারীগণ। *[বুখারী, মুসলিম শরীফ]*

এ তো বাহ্য আকৃতির ছবি নির্মাণকারীদের সম্পর্কে শরীয়তের বিধানাবলি। কিন্তু হাকীকতের মূর্তি বাস্তব মূর্তি স্বয়ং আমাদের সুরত। এ ব্যাপারেও আল্লাহর মানশা হলো, আমি তাকে পৃথকভাবে দৃষ্টিপাতের মার্কায বানাব না।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক সুরত দেখেন না; তিনি তোমাদের অন্তর এবং নিয়ত দেখেন। (যা তোমার মাঝে অদৃশ্য রয়েছে)। *[বুখারী শরীফ]*

আর এ সবকিছু এজন্য যে, মানুষের অন্যের সাথে শিরক না করে আসল ওজুদ এবং নিজের অনুভব জগতের আসল মূলনীতির ধ্যান-খেয়ালে লিপ্ত থাকা তখনই সম্ভব ছিল, যখন সকল সুরত হতে নিজের ইন্দ্রিয় চোখ বন্ধ করে তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিত, যাতে গায়েবী ওজুদ এবং গোপন রহস্য তার দৃষ্টিতে চলে আসত।

হাকিকাতুল হাকায়েকের অনুসন্ধান

সুতরাং ইসলামি শিক্ষার সারনির্যাস এই বের হলো যে, সুরতের ছবি-মূর্তি পুরোপুরি ভ্রূক্ষেপ অনুপযুক্ত এবং পেরেশানি ও বিক্ষিপ্ততার শিকড়। তবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি, এগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু আনুষাঙ্গিক বাস্তবতা রয়েছে। কিন্তু তারপরও তোমরা জগতের এই অনুভবযোগ্য এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য থেকে আলাদা হয়ে পৃথক হয়ে তার হাকিকী সৌন্দর্যকে আপন মার্কায বানাও। এমনকি তারপর ওই হাকিকত থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে ওই হাকিকাতুল হাকায়েক পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা কর, যিনি সমস্ত কামালাত ও জামালাতের (সৌন্দর্য) মূল উৎপত্তিস্থল এবং হাকিকী (সত্যিকার) সৌন্দর্যের মূল উৎসস্থল।

সারকথা হল, শরীয়ত মানুষকে বাহ্য থেকে অদৃশ্যের দিকে নিয়ে যেতে চায়। আজসাম (দেহ) থেকে হাকায়েকের দিকে এবং পরিশেষে সৃষ্টিগত হাকায়েক হতেও সরিয়ে হাকায়েকে ইলাহিয়্যার দিকে নিয়ে যেতে চায়। যার মুশাহাদা (দেখা) সুরতসমূহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত কঠিন ও অসম্ভব ছিল। সুতরাং কোথায় ইসলামের এই হাকিকত পরিচিতি এবং সত্য প্রদর্শনী যে, গোপন থেকে গোপন এবং গায়েব থেকে গায়েবের দিকে উন্নতি করে মানুষকে হাকিকতের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ ও মিলিয়ে দিয়েছে? আর কোথায় মানুষের চিন্তাধারার এই বক্রতা, যে প্রদর্শনী ও সাজসজ্জা এবং সুন্দর থেকে সুন্দরে প্রবেশ করিয়ে মানুষকে হক এবং হাকিকত থেকে দূরে এবং অপরিচিত করে দিয়েছে? তাদেরকে হাকিকাতুল হাকায়েক আল্লাহ থেকে পৃথক করে আংশিক হাকায়েকের দিকে এবং তা থেকেও বঞ্চিত করে সুরত ও আকৃতির দিকে, ফের তা থেকেও সরিয়ে মূর্তি ও ছবির চেহারার সামনে দাঁড় করিয়েছে? অতএব ওখানে যদি আসলুল উসুল পর্যন্ত পৌঁছে যাবার কারণে তাওহীদ হতে তাওহীদ অর্জন হতো,

তাহলে এখানে গাইরে হকের দিকে ধাবিত হওয়ার কারণে শিরক থেকে শিরক সৃষ্টি হয়ে যাবে। এ কারণে যদি এ কথা বলা হয় যে, মূর্তি-ছবি শিরকের শিকড় এবং সুরতপছন্দী মানুষের তাওহীদকে আপন স্থানে রাখেনি, তাহলে তা একটি যথাযথ ও বাস্তবসম্মত দাবি হবে।

তাওহীদপ্রেমিকদের ছবি ও মূর্তির প্রতি ঘৃণা

এজন্য তাওহীদ প্রেমিক জামাত যদি সাধারণ ছবির দুশমন হয় এবং ঘৃণাকারী হয়, তাহলে তা তাদের আল্লাহপ্রদত্ত জযবা ও জন্মগত স্বভাবজাত অধিকার। এ কারণে নবীগণের (আ.) মত কামেল তাওহীদপন্থীরা মানুষদের মূর্তি ও আকৃতিপূজায় লিপ্ত হতে দূরে সরিয়ে রাখা-ই তাদের মাসলাকের নীতির একটি উজ্জ্বল ও আলোকিত পন্থা স্থির করতেন। তারা–

১. প্রাণীর ছবি/মূর্তিকে হারাম করেছেন।

২. ফেরেশতাদের ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

৩. নিজেদের দুশমনির কথা প্রকাশ করেছেন।

৪. মূর্তি-ছবি নির্মাণ ও নির্মাণকারীর উপর অভিশাপ করেছেন।

৫. ছবি ও মূর্তি তৈরি করার পর তা ধ্বংস করার তালিম দিয়েছেন।

হযরত উমর ফারুক রাযি. 'শাজারাতুর রিদওয়ান' এর মত বরকতপূর্ণ বৃক্ষটি কেটে ফেলেছিলেন, যাতে কখনো তাকে মূর্তিপূজা বা দৃশ্যপূজার ভিত্তি না বানাতে পারে। পবিত্র তাওয়াফভূমিতে হাজরে আসওয়াদকে একথা বলে চুমু খেলেন যে, "আমি জানি তুমি একটি পাথর যার হাতে কোন লাভ ও ক্ষতির ক্ষমতা নেই। যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চুমু দিতে না দেখতাম, তাহলে তোমাকে কখনই চুমু দিতাম না।"

যাতে পাথর পূজার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হয়। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীদের রওজা মোবারককে সিজদার স্থান বানানেওয়ালাদের প্রতি লানত করেছেন, যাতে এর দ্বারা পরিণামে ধ্বংসাত্মক সুরতপূজা বা মূর্তিপূজার বুনিয়াদ কায়েম না হয়। আর তেমনিভাবে একজন সত্য দীন গ্রহণকারী মুসলিম যাতে হাকিকত থেকে দূরে সরে না যায়।

হাকিকত পছন্দনীয় চিন্তা-চেতনা

অতএব এ কারণে হাকিকতের পরিচয় লাভকারী অন্তর ছবি ও দৃশ্য প্রেমিক বন্ধুদের এমন সন্দেহযুক্ত স্থান থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন, যেখানে তাদের সুরতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হাকিকত থেকে দূরে চলে যাওয়ার সামান্যতম খতরা রয়েছে।

একজন সালেক প্রাথমিক অবস্থায় আল্লাহর দিকে যাত্রাকালে যখন হাকায়েককে বিভিন্ন বাতেনি সুরত ও শিকলের আকৃতির পোশাকে মুশাহাদা করেন, যা স্বয়ং এক প্রকার গায়েবী অদৃশ্য বস্তু এবং তার মুশাহাদা ও গায়েবীভাবেই হয়। কিন্তু তারপরও তার মুরুব্বী ও পথপ্রদর্শক তাকে ওই আকৃতি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আল্লাহমুখী করার চেষ্টা করেন, যাতে ওই নকশাওয়ালা রঙিন সুরতে প্রবেশ করে আসল হাকিকত ভুলে না যায়। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে সে শিশু আর ঘর হলো রঙিন।

মোটকথা, সুরতপছন্দী, ছবিপ্রিয়তা, ছবিনির্মাণ, ছবিবাজি ইত্যাদি ইসলামি মাকসুদের বিপরীত এবং তার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য গায়েবের প্রতি ধাবিত হওয়া বা আল্লাহর দিকে যাত্রা করার পথে বিশাল বড় প্রতিবন্ধক। এজন্য কমপক্ষে কোন মুসলিম জাতির নিজেদের হাকিকতপ্রিয় চিন্তা-চেতনাকে পরিহার করে সুরতপূজার জযবা সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে মূল পদার্থ এবং আলোচ্য বিষয়ের উল্টো।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফীক দান করুন, যাতে আমরা সঠিক ইসলামি জযবার মূল্যায়ন করতে পারি এবং কমপক্ষে এমন রাস্তা পাশ কেটে চলার চেষ্টা করি, যা ইসলামি শাহী পথ থেকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং মঞ্জিলে মাকসুদকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়ার কাজে জাদুকরী প্রভাব রাখে।

বয়ান : ১২

একক ধর্ম

পরিস্থিতি এ কথা বলছে যে, যখন আমাদের তামাদ্দুনিক এবং সামাজিক যিন্দেগী একই ধরনের হয়ে যাবে, তখন কুদরতিভাবে এই উৎসাহ সৃষ্টি হবে যে, তাহলে আমাদের রূহানি (আধ্যাত্মিক) যিন্দেগীও এক হোক এবং ধর্মীয় জযবাসমূহও এক হোক।

এ কারণে বর্তমান সময়ে গ্রহণ করা ধর্মে এই বিষয়টি থাকা জরুরি যে, তাতে স্বজনপ্রীতি থাকবে না, অসমতা থাকবে না। যে ধর্ম ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্যওয়ালা হবে, সেই ধর্মই সফলকাম হবে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

একক চিন্তা-চেতনা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আপনারা অবগত আছেন যে, বর্তমান আধুনিক যুগে সাইন্স বিশাল বিস্তর পৃথিবীকে ভাঁজ করে অনেক ছোট বানিয়ে ফেলেছে। ফলে সারাটা পৃথিবী একটা ছোট্ট পরিবারের মত হয়ে গেছে। আবিষ্কৃত বস্তুযন্ত্র, দেখা-সাক্ষাৎ এবং চলাফেরা অতি সহজসাধ্য বানিয়ে ফেলেছে। পূর্বকালে ঘোড়াগাড়ি, বলদের গাড়ি ইত্যাদির সফরে ভ্রমণে অনেক কষ্ট হতো। স্থলপথে পায়ে হেঁটে হজে যেতে দু-তিন বছর লেগে যেত। অন্যান্য বাহনে ৯ মাস সময় ব্যয় হতো। কিন্তু আজ সাইন্স তথা বিজ্ঞানের উন্নতি ভ্রমণকে সহজ করে ফেলেছে। রথ ও গরুগাড়ির স্থলে রেলগাড়ি চলছে। আর এখন তো উড়োজাহাজ চলছে, যাতে চড়ে বোম্বে থেকে জিদ্দায় ৯ ঘণ্টায় পৌঁছা যায়। অথচ জলপথে এতটুকু রাস্তা অতিক্রম করতে ৯ দিন লাগে। বর্তমান আধুনিককালে রেডিওতরঙ্গে উড়োজাহাজ চালানোর

ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষ পাখির মত হয়ে যাবে এবং কয়েক ঘণ্টার রাস্তা মিনিটে চলে যাবে, অতিক্রম করবে। এখন কোন কথা বলার জন্য কোন শহরে বা স্থানে যেতে হয় না, স্বস্থানে দাঁড়িয়ে বলা যায়। কোন শহরে জলসা হলে বক্তার সেথায় যেতে হয় না। বরং রেডিও-টিভির মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে সম্বোধন করে বলা যায়। এই সমস্ত জিনিস সারা পৃথিবীকে একটি পরিবারের মত বানিয়ে ফেলেছে এবং সমগ্র রাষ্ট্র মহল্লার মত হয়ে গেছে।

উক্ত আবিষ্কারের প্রভাব এমন হয়েছে যে, রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যাবলি মিটে যাচ্ছে। এবং এক দেশের প্রভাব ও প্রবণতা অন্য দেশে প্রভাব ফেলছে। সবার ধ্যান-ধারণার মাঝে একতা সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ জযবা এক, চিন্তাধারা এক, ধ্যান-ধারণা এক। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী চাচ্ছে যে আমরা এক হয়ে যাই।

বার্মার স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের এখানে এসেছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি দিল্লী কেন আগমন করলেন। তিনি উত্তর দিলেন, হিন্দুস্তানের সরকারের সাথে কিছু পরামর্শ ছিল। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক দেশের ভিতরগত কর্মেও বহিঃরাষ্ট্রের পলিসির অধীনে কেমন যেন ভিতরগত রাজনীতি, বহিরাগত রাজনীতির দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত। এরই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা ঐক্যবদ্ধ চিন্তা-বোধের ফসল। ফলে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব আর স্বজনপ্রীতি দূর হচ্ছে, সীমাবদ্ধতা এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলি খতম হতে যাচ্ছে।

মূলনীতি পরিবর্তন

সুতরাং আজ সারাবিশ্বে স্লোগান উচ্চারণ হচ্ছে, যদি শান্তিময় পৃথিবী চাও, তাহলে ছুঁতছাঁত অস্পৃশ্য ভাব দূর কর এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য খতম কর, তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

গান্ধীজি যখন দিল্লী আসতেন তখন ভাঙ্গাচোরা বস্তিতে অবস্থান করতেন শুধু একথা প্রকাশ করার জন্য যে, আজ বিশেষত্ব খতম করার সময় এসেছে।

পণ্ডিত পন্ত সাহেব যখন রণখণ্ডি এলেন, তখন তিনি একজন হরিজনের বাড়িতে অবস্থান করেন এবং তার গ্লাসে দুধ পান করেন। এ সকল ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়, সকল জাতির মূলনীতি পরিবর্তন হচ্ছে। পূর্বে জনসাধারণ বিশেষদের অধীন ছিল, অনুগামী ছিল আর আজ বিশেষজ্ঞরা অনুগামী হচ্ছে সাধারণদের। আগে বাতির নিচে অন্ধকার ছিল আর আজ বাতির উপরে অন্ধকার। পূর্ব যুগে যে জিনিস লুক্কায়িত ছিল, আজ তা প্রকাশ্যে এসে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ সম্পদ ও নারী। আগেকার যুগে বিশেষ ব্যক্তির ভোট গুরুত্ব রাখত আর আজ সাধারণদের রায় গুরুত্ববহ। সুতরাং বিশেষদের নিচে নামতে হয়েছে আর সাধারণরা উপরে উঠেছে।

একক ধর্ম

পরিস্থিতি একথা বলছে যে, যখন আমাদের তামাদ্দুনিক ও সামাজিক জীবন এক হয়ে গেছে, তখন ফের কুদরতিভাবে এই জযবা সৃষ্টি হবে যে, আমাদের রূহানি যিন্দেগীও এক হোক এবং ধর্মীয় জযবাও এক হোক। এজন্য আজকের গ্রহণ করা ধর্মের মধ্যে এ কথা জরুরি যে, তাতে পক্ষপাতিত্ব নেই, উঁচুতা-নিচুতা নেই। আর যে ধর্মে ওই সমস্ত বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি পাওয়া যাবে, সেই ধর্ম সফলকাম। অতএব এক ধর্ম ঘোষণা করেছে যে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى

হে লোকসকল! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।

কেমন যেন সমগ্র জাতি মিলে একটি দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।"

বনী আদম একে অপরের অঙ্গ–

وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

আমি তোমাদের মধ্যে গোত্র-গোত্র বানিয়েছি শুধু পরিচয়ের জন্য, অহংকার সৃষ্টির জন্য নয়। তোমাদের মাঝে বংশের ভিন্নতা বড় ও ছোটর জন্য নয়। তবে আমলের ভিত্তিতে বড় ছোট হবে, জন্মগতভাবে কেউ বড়-ছোট নেই।

সূর্য উদিত হলে সে আলো বন্টনে উঁচু-নিচুর ব্যবধান করে না, বরং সবাই আপন আপন যোগ্যতা অনুপাতে আলো দ্বারা উপকৃত হয়। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিলেন, ইবাদাতের স্থান কারো জন্য নির্ধঅরিত নেই। যে বেশি একগ্রতার সাথে ইবাদত করবে, সে তত বেশি উন্নতি লাভ করবে। আর যে এমনটি করবে না, সে নিচে পরে যাবে, অবনতি ঘটবে।

সাধারণ সমতা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি রাসূলের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করে, তাহলে তারও হাত কেটে ফেলা হবে।

হযরত উমর ফারুক রাযি. মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, শোনো! ও আনুগত্য কর। একজন বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তা করবো না, তুমি খিয়ানতকারী, আত্মসাৎকারী। হযরত উমর রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, জনাব! আমি কী খেয়ানত করেছি? তখন লোকটি বললেন, বাইতুলমাল হতে সকলে একটি চাদর পেয়েছে, আপনার গায়ে দু'টি কেন? হযরত উমর রাযি. উত্তরে বলণেন, এর উত্তর আমার ছেলে আবদুল্লাহ দিবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমার ভাগের চাদরটি বাবাকে দিয়েছি। এতে জানা গেল, যদি ধনী ও নেতারা অভিযোগ করগে পারে, তাহলে গরিব ও প্রজারাও অভিযোগ করতে পারে। চিন্ত ার বিষয় হলো, আজ বর্তমান যুগে এ কথা ঘোষণা করা উচিৎ হবে যে, হে মানবকূল! তোমরা এমন কাজ কর, যাতে সবার উপকার রয়েছে, সবার ইজ্জত রয়েছে, সবার জন্য শান্তি রয়েছে। অথবা এই ঘোষণা উচিত হবে যে, হে হিন্দুস্ত ানবাসী! হে আরববাসী! তোমরা শুধু নিজেদের লাভ দেখ। তবে উঁচু ও নিচু যা হবে তা আমলের ভিত্তিতে হবে।

সুতরাং এমন ধর্ম এখন চলতে পারে, যাতে সাধারণ সমতা বিদ্যমান আছে। আমরা এ কথা বলব যে, বর্তমান জগদ্বাসী উক্ত সাম্যের মূলনীতি থেকে উপকৃত হয়েছে। অতএব যুগের চাহিদা হলো, উপার্জন এবং সামাজিক ও রূহানি সর্ব ব্যাপারে একতা ও ঐক্য প্রয়োজন। যে জাতি পূর্বে থেকে উক্ত চিন্তা-চেতনা নিয়ে চলে আসছে, তাদের কারো সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়নি। তারা সবাইকে নিজেদের মধ্যে সামলে নিতে পারবে।

সীমাবদ্ধতা দূর করার একটি উসুল

সবাইকে তাআস্‌সুব বা স্বজনপ্রীতি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তাআস্‌সুব বিভিন্ন কারণে জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। কখনো এ থেকেও তাআসসুব সৃষ্টি হতে পারে যে, অন্যদের পথ প্রদর্শককে মন্দ বলা। এজন্য সর্বপ্রথম কুরআনের আয়াতের মাঝে এ কথা বলা হয়েছে যে, আমরা মেনে নিলাম আল্লাহকে এবং তাঁর কিতাবকে, যা আমাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য এ নয় যে, যা কিছু পূর্ববর্তীদের উপর নাযিল হয়েছে তাদেরকে মন্দ বল। বরং এ কথা বলো যে, এই পর্যন্ত যা কিছু নবীদের উপর, দরবেশদের উপর এবং সন্নাসীদের নাযিল হয়েছে, আমরা এই সকলকে তাদের সময়ের জন্য সত্য মনে করি। অতএব, সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য একটি মূলনীতি হলো, দুনিয়ার সকল ধর্মের মধ্যে যা কিছু সত্য রয়েছে সেগুলোকে গ্রহণ করা এবং

কিতাবগুলোকে সত্য মনে করা আর যা কিছু পরবর্তী লোকেরা বৃদ্ধি করেছে বা সংযোগ করেছে, সেগুলোকে পরিহার করা।

কুরআনুল কারীম ঘোষণা করেছে যে, আমি সকল জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি। শাম, দামেশক, আরব ইত্যাদিতে পয়গম্বর এসেছেন। ভারতে কি নবী আসেনি? অবশ্যই এসেছেন। সর্বপ্রথম তো হযরত আদম আ. এসেছেন। তিনি শ্রীলংকায় নেমেছিলেন। ধর্মের শুরুটা হিন্দুস্তান থেকে হয়েছে। হযরত আদম আ.-এর উপনাম আবুল বাশার (অর্থাৎ মহাদেব)। তার ছেলে হযরত শিস আ.-এর কবর জোদ্দায় রয়েছে। তারপর এভাবে প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে নবীগণ আসতে থাকেন। সর্বশেষে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব দেশে আগমন করেন। এভাবে ভারত থেকে নবী আগমনের ধারা শুরু হয়েছে, আর শেষ হয়েছে আরবে।

মহাত্মা বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী

হাদিস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার নিকট দু'টি স্থান অনেক প্রিয়। একটি ওই স্থান, যেখানে হযরত আদম আ. অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর অপরটি ওই স্থান, যেখানে কাবাতুল্লাহ রয়েছে। হযরত মাওলানা মানাযির আহসান সাহেব একটি কিতাব রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন 'আন্নাবিইউল খাতিম'। সেই কিতাবে তিনি লিখেছেন, 'মহাত্মা বুদ্ধ' হিন্দুস্তানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সংবাদ দিয়েছিলেন। যেমনভাবে হযরত ঈসা আ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

বুদ্ধের মরণকালে তার একজন বুদ্ধিমান শাগরেদ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পর আমাদের কে কে পথ প্রদর্শন করবেন? তখন তিনি বলেছিলেন, আমার পূর্বে অনেক বুদ্ধ এসেছিলেন। এখন একজন সর্বশেষ বুদ্ধ আসবেন, যার উপাধি হবে 'মাত্তারিয়া'। তোমাদের তার দেখানো পথে চলা উচিত। 'মাত্তারিয়া' শব্দের অর্থ হলো রহমত। আর কুরআনুল কারীমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বলা হয়েছে। এজন্য বৌদ্ধ ধর্মের অনেকেই ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করে।

সম্মিলিত ঈমান

কুরআনুল কারীমের একস্থানে একজন নবীর নাম 'যুলকিফ্‌ল' আ. বলা হয়েছে। মাওলানা মানাযির আহসান সাহেব তার সম্পর্কে নিজের খেয়াল প্রকাশ করেছেন

যে, এ ললাটের স্থান আর কপাল থেকে কুফল হয়েছে। এর চেয়ে বেশি পার্থক্য করা সম্ভব নয়, এভাবেই হয়েছে।

প্রাচ্যীয় দেশগুলো উক্ত সুসংবাদকে গ্রহণ করে ধন্য হয় আর পশ্চিমা দেশগুলো মাদ্দিয়াতে ফেঁসে ধ্বংস হয়। হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী রহ. সারহিন্দ সম্পর্কে বলেছেন, এখানে দু'জন নবী এসেছিলেন। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব রহ. বলেছেন, গঙ্গার পানিতে বিশেষ কাইফিয়ত (অবস্থা) অনুভব হয়। অতঃপর তিনি গঙ্গা নিয়ে গবেষণা করেন, গঙ্গা কোথা থেকে শুরু হয়েছে। তার অন্বেষণে বের হলেন এবং গাংগুতরী পৌঁছেন। সেখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। ওখান থেকে ফিরে এসে বললেন, যেখানে গঙ্গার মুখ রয়েছে, সেখানে কোন নবীর আনওয়ার (নূর) দেখা যায়। অনেক সম্ভাবনা রয়েছে যে, গঙ্গা কোন নবীর দুআর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন যমযম কূপ হযরত ইসমাঈল আ.-এর বরকতে জারি হয়েছে। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব রহ. লিখেছেন, রামচন্দ্রজি ও কৃষ্ণজিকে খারাপ বলবেন না। কারণ, সম্ভাবনা রয়েছে যে, তারা তাদের সময়ে পয়গম্বর ছিলেন। সেজন্য তাদের নাম নিয়ে কখনো মন্দ বলবেন না। কারণ, তাদের পয়গামসমূহে অনেক কথা সত্য। সম্ভাবনা রয়েছে, পরবর্তী লোকেরা তাদের বাণীগুলো ওলট-পালট করেছে। যেমনভাবে ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা তাদের তালীমাতের মধ্যে সংমিশ্রণ করেছে। এ কারণে হুকুম হলো, যে সকল নবীর নাম কুরআন ও হাদিসে প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান রয়েছে, তাদের নাম ধরে ধরে আনুগত্য কর। আর যাদের নাম আসেনি, তাদের উপর ইজমালিভাবে ঈমান আনয়ন কর।

ধর্মের বুনিয়াদ

ইসলামের বুনিয়াদ (ভিত্তি) হলো মানার উপর, আনুগত্যের উপর। অর্থাৎ তাসদীকের (মানা) উপর, তাকযীবের (অমান্য) উপর নয়। অপরদিকে ইহুদী ধর্মের ভিত্তি হলো হযরত ঈসা আ.কে অস্বীকার করার উপর। আর খ্রিস্ট ধর্মের ভিত্তি হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার উপর। কিন্তু ইসলাম নিজের বুনিয়াদ রেখেছে মানার উপর, আনুগত্যের উপর। বাস্তবতা হলো, ধর্মের বুনিয়াদ মানার উপরই হতে পারে, না মানার উপর নয়। অর্থাৎ ধর্মের বুনিয়াদ ইতিবাচক দিকের উপর হওয়া উচিত, নেতিবাচক নয়।

অতএব যেহেতু সমগ্র পৃথিবী একটি গোত্রের ন্যায় হয়ে গেছে, সেজন্য এখন আর সীমাবদ্ধতা কায়েম থাকতে পারবে না। তেমনিভাবে রূহানি ধ্যান-ধারণা

এবং আকাঈদও একই অবস্থা। সুতরাং সর্বপ্রথম তাআসসুবকে মিটাতে হবে এবং শ্রেণী ও মতভেদ নিঃশেষ করতে হবে এবং দেশের সীমাবদ্ধতা খতম করতে হবে। দেশের ভিত্তি কুল্লি (পরিপূরক) বিষয়ের উপর হয়, জুযয়ি (আংশিক) বিষয়ের উপর নয়। আর কুল্লি বিষয় আন্তর্জাতিক বিষয়। তারই উপর দেশ নির্ভর করে। এজন্য কুরআনুল কারীম চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এই ঘোষণা দিয়েছিল যে, কোন রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের ফযিলত নেই অন্য রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের উপর। তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে ফযিলত রয়েছে।

মানবতার সম্মান

মানুষ ও মানবতার ইহতেরাম এমনভাবে জরুরি যেমনভাবে ধর্মের ইহতেরাম প্রয়োজন। এজন্য পরস্পর ছুত-অছ্যাত-অস্পৃশ্যতা, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি দূর করতে হবে। হযরত উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে জাবালা ইবনে আয়হাম গাসসানের বাদশাহ মুসলমান হয়ে মক্কায় তাওয়াফ করছিল। তখন কোন গ্রাম্য ব্যক্তির পা তার চাদরে লেগে যায়। এতে জাবালা ক্ষিপ্ত হয়ে লোকটিকে থাপ্পর মারে। লোকটি হযরত উমর রাযি.-এর নিকট অভিযোগ করে। তিনি আদেশ দিলেন, লোকটি নিজের বদলা এভাবে নিতে পারে যে, সে জাবালাকে একটি থাপ্পর মারবে।

এটিই হলো সাম্য। জাবালা আদেশ শ্রবণে বলল, আমাকে সুযোগ দেয়া হোক। যখন তাকে সুযোগ দেয়া হলো, তখন রেগে গেল এবং পুনরায় কুফরী গ্রহণ করে নিল। কিন্তু ইসলাম বড়-ছোট, উঁচু-নিচুর মধ্যে পার্থক্য দূর করার জন্য কারো কথার পরোয়া করেনি।

একক ধর্ম

বনী ইসরাঈলকে সর্বপ্রথম দৌলত ও হুকুমত দেয়া হয়েছিল। তারা বিলাসিতার সঙ্গে জীবন যাপন করতে থাকে। নবীগণ তাদের অনেক বোঝালেন। কিন্তু তারা শোনেনি, মানেনি। পরিশেষে ইরাকের বাদশা বখতেনাসর তাদের উপর চড়াও হয় এবং তাদের ব্যাপকহারে হত্যা করে এবং কয়েক লাখ বনী ইসরাঈলকে গ্রেফতার করে। আল্লাহর নবী হযরত দানিয়াল (আ.)ও বন্দিদের মধ্যে ছিলেন। তার দীনদারী, আমানতদারী, সততা, সত্যবাদিতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং ইবাদত ও যুহুদ দেখে জেলার তাঁর আসক্ত এবং বিশ্বস্ত হয়ে পড়েন, তাকে অত্যন্ত সম্মান করতে থাকেন। এ অবস্থায় দীর্ঘ সময় অতবিাহিত হওয়ার পর

বখতেনাসর একটি স্বপ্ন দেখল, যার ফলে তার অন্তরে ভয়, অশান্তি ও পেরেশানি সৃষ্টি হল। সে দরবারের গনক ও জাদুকরদের ডাকল। তাদের নিকট নিজের মনের অশান্তি উল্লেখ করে যা ওই অসাধারণ স্বপ্ন থেকে সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের থেকে ওই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করল। তারা বলল, স্বপ্ন বর্ণনা করুন। বাদশাহ বলল, স্বপ্ন তো আমার স্মরণ নেই। তারা বলল, তাহলে আমরা তাবীর কী করে বলব? সে রাগান্বিত হয়ে বলল, "আমি তো তোমাদেরকে এমন প্রকার কথা ও বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য আমার রাজদরবারে এই সম্মানের আসনে আসীন করেছি (যখন তোমরা এমন বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নও, তাহলে তোমরা কোন্ রোগের ঔষধ হবে?)। যাও তোমাদেরকে তিন দিনের সুযোগ দিলাম। যদি তোমরা এর ভিতরে স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা বলে দিতে পার, তাহলে তো ভাল কথা, অন্যথায় তোমাদের হত্যা করা হবে।"

উক্ত ঘটনার চর্চা হতে থাকে। ধীরে ধীরে তা জেলখানায় পৌঁছে যায় এবং হযরত দানিয়াল আ.-এর নিকট পৌঁছে। তিনি তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট বললেন, এমনটি সম্ভব যে আপনি বাদশার নিকট আমার কথা আলোচনা করবেন। কারণ, আমার নিকট তার স্বপ্নের জ্ঞান রয়েছে। আমার আশা যে, এ কারণে বাদশার দরবারে আপনার সম্মান ও পদমর্যাদা বেড়ে যাবে। আর আমার মুক্তির পথ সুগম হবে (যার ফলে আমার স্বজাতি এই বন্দিত্বের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে)। জেলার বলল, আমি আপনার ব্যাপারে বাদশার সীমাহীন গোস্বার ভয় করছি যে, বাদশাহ মনে করবেন, আপনি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এ কথা বলছেন। বাস্তবে আপনার নিকট সেই স্বপ্নের ইলম রয়েছে। আমি তাও জানি যে, দুনিয়ার কোন মানুষের মধ্যে যদি বাদশার ভুলে যাওয়া স্বপ্নের ইলম থাকে, তাহলে তা আপনার মাঝেই রয়েছে।

নবী বললেন, তুমি ভয় কর না। তুমি চিন্তা-ভাবনাহীনভাবে বাদশার সামনে আমার কথা বলে দাও (আমি নিশ্চিত ওই স্বপ্নের ইলম রাখি এবং স্বপ্নের তাবীর জানি)। কারণ, আমার একজন রব আছেন, যিনি আমাকে এমন কথার সংবাদ জানিয়েছেন, যা আমি জানতে চাই। জেলার বাদশার নিকট গিয়ে নবীর কথা আলোচনা করল। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ হযরত দানিয়াল আ.কে ডাকলেন। জেলার তাঁকে রাজদরবার পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। রাজদরবারের নিয়ম ছিল, ভিতরে প্রবেশকারী বাদশাহকে সিজদা করবে কিন্তু দানিয়াল আ. দরবারে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি সিজদা করলেন না। অনেক্ষণ পর বাদশাহ দরবার মুলতবী ঘোষণা করলেন এবং নির্জন কক্ষে দানিয়াল আ.-এর সাথে আলোচনা করতে লাগলেন।

সর্বপ্রথম বললেন, দরবারের আদব মোতাবেক আপনি আমাকে সিজদা করলেন না কেন? তিনি বললেন, কারণ, আমার একজন রব আছেন। আমি তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করি না। আমি ওই জিনিসের ভয় করছিলাম যে, আমি আপনাকে সিজদা করব আর তিনি ওই সময় আমার থেকে ওই ইলম কেড়ে নিবেন। তাহলে আমি আপনার স্বপ্ন না বলতে পারার কারণে আমাকে আপনার হাতে আজীবন বন্দি থাকতে হবে। আর আপনিও আমার থেকে ওই ইলমের ফায়দা উঠাতে পারবেন না আর আমাকে হত্যা করে ফেলবেন। এজন্য সিজদা ছেড়ে দেওয়াকে হত্যা থেকে সহজ মনে করেছি এবং সিজদা পরিহার করার ভয়কে ওই ভয় থেকে হালকা মনে করেছি যে, আপনি সারাজীবন ওই অশান্তির মাঝে জীবন যাপন করবেন, যে অশান্তি ভুলে যাওয়া স্বপ্নের কারণে এসেছে। অতএব সিজদা না করাকে আমি আপনার ও আমার জন্য উপকারী জ্ঞান করেছি।

বখতেনাসর বলল, আমার নিকট আপনার চেয়ে বেশি নিজ ইলাহ ও মাবুদের আনুগত্যকারী নেই। আর নিঃসন্দেহে এমন লোকই আমার পছন্দনীয়, যে তার রবের অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূরণ করে এবং আনুগত্য করে। হ্যাঁ, আপনার নিকট কি আমার স্বপ্নের ইলম এবং এর তাবীরের ইলম রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। "আপনি স্বপ্নে দেখেছেন আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে একটি বিশাল মূর্তি ঝুলে আছে, যার পাদুটি জমিনে লেগে আছে আর মাথা আসমানে। সেই মূর্তির উপরের অংশ স্বর্ণের, মধ্যাংশ রুপার এবং নিচের অংশ তামার। তার পা লোহার তৈরি আর পায়ের গোড়ালি মাটির তৈরি। আপনি তার সৌন্দর্য ও অপরুপ দৃশ্য এবং অতুলনীয় গঠন ও আকৃতিকে হতভম্ব হয়ে দেখছিলেন। তখন হঠাৎ আকাশ থেকে একটি বিশাল পাথর পড়ল এবং তা ওই মূর্তির দেহ কাঠামোর উপর এসে এত জোরে আঘাত করল যে, ওই মূর্তি ভেঙে চুরমার হয়ে সুরমার ন্যায় পিষে গেল। আর তার স্বর্ণ, রুপা, তামা ও লোহা এবং মাটি সবকিছু এক প্রকার মিশ্রণ হয়ে এমনভাবে জগাখিচুড়ি এবং স্তূপ হলো যে, ওই সকল ধাতু মিশ্রণ হয়ে এক ধরনের ধাতু হয়ে গেল, একাকার হয়ে গেল। কোন ধাতু পরস্পর পৃথক রইল না। তখন আপনার এ কথা মনের ভিতর বদ্ধমূল হল যে, এখন যদি পৃথিবীর সকল মানব ও দানব একত্রিত হয়ে ওই সকল ধাতুকে পৃথক করতে চায়, তাহলে তা পারবে না। আর যদি এমতাবস্থায় বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহলে (ওই ধাতু এমনভাবে পিষণ হয়ে সুরমা হয়েছে যে) বাতাসও ওই অণুগুলোকে উড়াতে পারবে। এমতাবস্থায় আপনি দেখেছেন, আসমান থেকে পতিত ওই পাথর হঠাৎ আকাশের বিশাল ময়দানে প্রসারিত হচ্ছে এবং প্রসারিত

হতে হতে এত বড় হচ্ছে যে, সমগ্র জমিনকে ঢেকে ফেলেছে। আর জমিন তার কারণে গোপন হয়ে পড়েছে। তখন আসমান এবং ওই পাথর ব্যতীত আপনি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

বখতেনাসর বলল, একেবারেই হুবহু বলেছেন। আমি যে স্বপ্ন দেখেছি তা এমনই ছিল। আচ্ছা, এখন ব্যাখ্যা বলে দিন। হযরত দানিয়াল আ. বললেন, শোনেন, ওই মূর্তি হলো পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, যারা দুনিয়ার প্রথমে, শেষে এবং মধ্যখানে (বিভিন্ন স্তর ও মর্তবার সঙ্গে আসবে) আসবে এবং এখন বিদ্যমান আছে। সুতরাং ওই মূর্তির স্বর্ণের অংশ বর্তমান যুগ এবং আপনার জাতি যাদের উপর আপনি কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন। আর রুপার অংশ হলো আপনার পরবর্তী আগত জাতি যাদের উপর আপনার ছেলে কর্তৃত্ব চালাবে। আর তামার অংশ হলো রোমীরা এবং লোহার অংশ হলো পারস্যরা। আর মাটির অংশ অন্য দুই জাতি যাদের উপর দুই মহিলা রাজত্ব করবে। একজন হবে পূর্ব ইয়ামানে আর অপরজন হবে পশ্চিম শামে। আর ওই পাথর, যাকে ওই আকর্ষণীয় মূর্তির উপর নিক্ষেপ করা হয়েছে তা ওই দীন, যাকে শেষ যামানার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে আসবেন এবং তিনি ও তার উম্মত উক্ত দীনকে ওই জাতীয়তার উপর নিক্ষেপ করে মরবেন যে, ওই দীনকে সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী করবেন। জাতিসত্তার এই উঁচু-নিচু ও অসমতাকে চিরদিনের জন্য ধ্বংস করে দিবেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা একজন উম্মি নবীকে আরব ভূমিতে পাঠাবেন। যিনি তামাম উম্মত, জাতিগুলোকে এবং বিভিন্ন ধর্মকে ভেঙে এক ধর্ম বানিয়ে ফেলবেন যেমনভাবে ওই পাথর মূর্তির সকল উঁচু নিচু ধাতুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এক করে দিয়েছে (এবং তারপর ওই সর্বশেষ দীন) তেমনিভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, যেমনভাবে ওই পাথর মূর্তিকে ভেঙে নিজেই সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তায়ালা আপন দীনকে খালিস করে দিবেন, বাতিলের মাথা নত হয়ে যাবে। হিদায়েতের রাস্তা প্রকাশ পাবে, গোমরাহি অদৃশ্য হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা উম্মিদেরও দীনের তালিম দিবেন আর দীনের মাধ্যমে দুর্বলদের (যাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হতো) শক্তি দান করবেন। বেইজ্জত তা দ্বারা ইজ্জত পাবে, কমজোর ও দুর্বলদের তা থেকে সাহায্য-সহযোগিতা মিলবে।

বাদশার অন্তরে কথাগুলো বসে গেল এবং সে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বলল, আমি যতদিন যাবত রাজত্ব চালিয়ে আসছি এ যাবত আপনার এত মানুষ আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। যে আমার অন্তরে অতি প্রিয় হবে। কেমন কাইফিয়্যাত

(অবস্থা) (চিন্তা ও পেরেশানি)কে এমনভাবে ছেটে দিল দূর করে দিল। এখন আমার দরবারে আপনার থেকে বেশি মর্যাদাবান আর কেউ হবে না। আমি আপনার এই বিশাল অনুগ্রহের সম্মানে প্রতিদান দিব।

খাতিমূলে আম্বিয়ার দীন

উক্ত হাদিস দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, খাতিমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন, যা সর্বশেষ যামানায় প্রকাশ পাবে; যেমনটি হচ্ছে ওই সমস্ত জাতিগত বংশ এবং দেশীয় স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে এবং এমনিভাবে পৃথিবীর তারতম্যপূর্ণ জাতীয়তা এবং উঁচু-নিচু জাতিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে এক জাতিতে পরিণত হবে। ছুঁত-ছাতের (তুচ্ছতার) শিকড় উৎস থেকে উপড়ে ফেলা হবে। ওই জাতিসমূহ যাদের ধর্মে উঁচু-নিচু অসাম্য এবং ছুত-ছাত ছিল, তারা নিজেরাই তাদের পূর্ব ধর্মের প্রতি অভিশাপ করতে থাকবে। এমনকি সকল প্রত্যাবর্তনশীল লিডারগণ মিলেও যদি ওই পূর্বের তারতম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায়, তাহলে তা পারবে না। তেমনিভাবে সারা জগতের মানুষ এক জাতিতে পরিণত হবে। সবার ইজম এক হবে। এক জাতির মধ্যে বিশ্বব্যাপী শাসনব্যবস্থা কায়েম হবে। অতঃপর যখন এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অন্তরে বদ্ধমূল হলো যে, দুনিয়ার সকল বুদ্ধিজীবী ও পরামর্শদাতাগণ সমতার উসুলকে তামাদ্দুনিক, জীবিকা উপকরণ এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে, কথায়, কাজে ও অন্তরে গ্রহণ করছে এবং তার ফায়দাসমূহ থেকে উপকৃত হচ্ছে। তখন যে ইসলামের মধ্যে সাম্যের পরিপূর্ণ তালিম সুদীর্ঘ চৌদ্দশত বছর যাবত বিদ্যমান। সেই ধর্মের অন্যান্য উসুলও গ্রহণযোগ্য হয়। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে এ কথা পেশ করছি যে, অবশ্যই ইসলামের সকল মূলনীতি একই রকম পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম। তারপর যেমনভাবে জাগতিক প্রয়োজন ইসলামের মূলনীতিগুলোকে গ্রহণ করছে, তাহলে রূহানি কর্মকাণ্ডে কেন ইসলামের উসূলকে মেনে নিবে না। পক্ষপাতিত্ব হতে হবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে। গভীরভাবে গবেষণা করলে ইনশাআল্লাহ ইসলামই এমন ধর্ম হিসেবে প্রকাশ পাবে, যা শুধু ব্যক্তিগত জযবা কে তো নয়, কিন্তু সুস্থ মনের সকল বুদ্ধিজীবী ও সহনশীল মানুষের অন্তর ও দেমাগকে প্রশান্ত করতে পারবে।

বয়ান : ১৩

দুনিয়া ও আখেরাত

ইসলাম এই শিক্ষা দিয়েছে যে, দুনিয়াও একটি জগৎ, আখেরাতও একটি জগৎ। শুধু রাস্তা অতিক্রম করা নয় যে, দুনিয়া একটি রাস্তা, এখান থেকে চলে আখেরাতে পৌঁছে যাও। বরং বলা হয়েছে– الدنيا مزرعة الاخرة 'দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।' এখানে যেমন বীজ বপণ করা হবে, পরকালে তেমন ফল পাওয়া যাবে। অতএব দুনিয়াটা হলো চাষাবাদের স্থান। মানুষের কাজ হলো বীজ বপণ করা। ভাল বীজ বপন করলে ভাল ফল-ফসল উৎপন্ন হবে। খারাপ ও নষ্ট বীজ হলে খারাপ ফল হবে। কবি বলেন, গম থেকে গম, যব থেকে যব উৎপন্ন হবে। আমলের প্রতিদান থেকে গাফেল হয়ো না।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ○ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ○

এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ কিছুই নয়। পরকালের বাড়িই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত। তারা যখন জলযানে আহরণ করে, তখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদের উদ্ধার করেন, তখনই তারা আল্লাহর সাথে শরিক করতে থাকে, যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে। অচিরেই তারা জানতে পারবে। *[আনকাবুত ২৯:৬৪-৬৬]*

বাস্তব অবস্থা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আমি এখন (দক্ষিণ আফ্রিকা) এখানে কোন দীর্ঘ তাকবীর করব না। সময়ও কম, আমিও এই মুহূর্তে ক্লান্ত। বয়স হিসেবে দুর্বল, আনুষাঙ্গিক কারণেও দুর্বল।

এ কারণে বেশি নাতিদীর্ঘ কথা বরার হিম্মত নেই। উক্ত আয়াতের আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা পেশ করব আপনাদের সামনে।

দুনিয়ার আলোচনার উদ্দেশ্য

উল্লিখিত আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তায়ালা শানুহু দু'টি জগতের আলোচনা করেছেন। একটি ইহজগৎ অপরটি পরজগৎ। দুনিয়া জগতের আলোচনা এজন্য করেছেন যে, আমরা দুনিয়াতে বসবাস করছি, আমাদের ফরজ দায়িত্বসমূহ বাতলে দেয়ার জন্য দুনিয়ার আলোচনা করা হযেছে। দুনিয়ার আনুগত্য বা দুনিয়ার প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, ঈমান আনা হয় গায়েবী বস্তুর উপর। ঈমান বলা হয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খবরসমূহকে বিশ্বাস করে কোন জিনিস মানা। চোখে দেখে মানার নাম ঈমান নয়। অথবা আকল দ্বারা বুঝে মানার নাম ঈমান নয়। কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, আমি ঈমান আনয়ন করলাম যে ২*২=৪ হয়। কারণ, তা একটি আকলগত বস্তু। এটি ঈমান আনার বস্তু নয়, এটি অনুভবযোগ্য বস্তু। অথবা যখন সকালবেলা সূর্য উদিত হয়, তখন এ কথা বলতে পারবে না, আমি ঈমান আনয়ন করলাম যে সূর্য উদিত হয়েছে। এটি ঈমান আনয়নের বস্তু নয়। এগুলো চোঁখে দেখার বস্তু।

মোটকথা, ঈমান আনা হয় অদৃশ্য বস্তুর উপর। আবার তাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর উপর ভরসা করে এবং মনের প্রশান্তির সাথে। তিনি যেভাবে বলবেন হুবহু সেভাবে মেনে নেয়ার নাম ঈমান। অতএব উক্ত আয়াতে কারীমার মধ্যে দুনিয়ার আলোচনা ঈমান আনয়নের জন্য নয় বরং দায়িত্ব বাতলে দেয়ার জন্য।

আখেরাতের আলোচনার উদ্দেশ্য

আর আখেরাতের আলোচনা করেছেন ঈমান আনয়নের জন্য। কেননা, তা চোখের সামনে বিদ্যমান নেই। আখেরাতের প্রথম ঘাঁটি আলমে বরযখ, যাকে কবর বলে। তার অবস্থা না কোন আকল অনুভব করতে পারে, না কোন চক্ষু দেখতে পারে। শুধু সত্যবাদী খবরদাতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খবরের উপর ভরসা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

আলমে আখেরাত প্রতিষ্ঠিত হওয়া, হাশরের ময়দানের অবস্থা, জান্নাত ও জাহান্নামের ওজুদ, পোলসেরাত ও মিযানের অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত কোন চক্ষু

দেখেনি এবং কোন আকল থেকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কোন আকল অনুভব করছে। এমন বিষয়কে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়ার নাম ঈমান। মোটকথা, দুনিয়ার আলোচনা করা হয়েছে বিধানাবলি বাতলে দেয়ার জন্য আর আখেরাতের আলোচনা করা হয়েছে ঈমান আনয়নের জন্য।

আকল দ্বারা আখেরাত বোঝার ক্ষতি

যে জাতিগুলো আকল দ্বারা আখেরাত বুঝতে চেয়েছে, তারা অনেক হোঁচট খেয়েছে আর আকল প্রকৃত অবস্থা বুঝতে সক্ষম নয়। কারণ, আকল অদৃশ্য বিষয়াবলি অনুভব করতে পারে না। আকল শুধু অনুভবযোগ্য বস্তু, চোখ দ্বারা দেখা বস্তু, কর্ণ শোনা বস্তু বা নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নেয়া বস্তু থেকে কিছুটা ফলাফল বের করতে পারে। কিন্তু গায়েবী বিষয়সমূহ আয়ত্ত করা বা যাচাই করা ইত্যাদি আকলের কাজ নয়। এগুলো ওহীর কাজ। একমাত্র ওহীই এই সংবাদ দিতে পারে যে, গায়েব কী বস্তু। অদৃশ্য জগতে কি কি কাণ্ড ঘটবে। এতে আকলের প্রয়োজন নেই, আকল কাজেও আসবে না, এতে আকল চলবেও না।

সারকথা, যে জাতিরা আকেরাতকে স্রেফ আকল দ্বারা নিশানা বানিয়েছে, তারা হোঁচট খেয়েছে।

আখেরাত অস্বীকারকারীদের মতবাদ

কিছু জাতি মনে করে, আখেরাতের কোন অস্তিত্ব নেই, আখেরাত বলতে কোন কিছু নেই। শুধু দুনিয়াই জগত, পরবর্তীতে কিছু নেই। তারা বলে থাকে, যখন মানুষ মারা যায়, তখন ধ্বংস হয়ে যায়। এখন তারা পুনরায় আসবে না, প্রথমে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। অতএব কিসসা খতম। তারা আখেরাতকে মানেই না যে জাযা ও সাজা হবে, হিসাব-নিকাশ হবে, আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে ইত্যাদি তারা মানে না– বিশ্বাস করে না। তারা নবীদের সংবাদগুলোর উপর বিশ্বাস রাখে না। বরং তারা আকল দ্বারা যাচাই বাছাই করে থাকে।

একথা সুস্পষ্ট যে আকল মরার পরের কোন বস্তুর খবর দিতে পাবে না– এজন্য তারা বিশ্বাস করে না। আর তারা মৃত্যু মানে শুধু ধ্বংস মনে করে, মনে করে কবরে গেল আর শুয়ে গেল। যেমনভাবে প্রথমে ছিল না, তেমনভাবে ভবিষ্যতেও থাকবে না। মোটকথা কতক জাতি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেছে যে, যা কিছু আছে তা দুনিয়াই, আখেরাত বলতে কোন জিনিস নেই।

দুনিয়াকে শুধু চলার পথ মনে করার মতবাদ

কতক জাতি এমন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে যে, আখেরাত হলো আসল। দুনিয়া হলো আখেরাতের পথ। তা থেকে অতিক্রম করে আখেরাত জগত আসবে। যে দুনিয়াতে আসেনি, সৃষ্টি হয়নি, তার জন্য আখেরাত নেই। যে দুনিয়াতে এসেছে, সৃষ্টি হয়েছে, অতঃপর ইন্তেকাল করেছে, তার জন্য আখেরাত জগৎ। সারকথা, দুনিয়া একটি রাস্তা এবং অতিক্রমস্থল। ভবিষ্যতে আসবে আখেরাত, আখেরাতই আসল গন্তব্যস্থল ও উদ্দেশ্য, ওখানেই যেতে হবে। অতএব একটি মতবাদ বের হল যে, তারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তার পাশাপাশি দুনিয়াকে শুধু একটি রাস্তা মনে করে।

প্রথম মতবাদের জাগতিক প্রভাব

উক্ত দুটি মতবাদধারী জাতির উপর দুটি প্রভাব পড়েছে। যারা মনে করে দুনিয়াই জগৎ; আখেরাত আসবে না, ওখান থেকে তামাদ্দুনের (সামাজিক জীবনে) সীমালঙ্ঘন স্থায়ী হয়েছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারা বলছে, যখন দুনিয়াই জীবন, তাহলে আরাম-আয়েশে কোন প্রকার কমতি করা যাবে না। "যতটুকু আরাম আয়েশ দরকার করে নাও জগত স্থায়ী নয়।"

আহার, পান, পরিধান বস্ত্র ও বাসস্থান, বাড়ি-বাংলো ইত্যাদি এগুলোই তাদের দুনিয়া, এগুলোই তাদের আখেরাত। সামনে কোন বস্তু নেই। তাদের হালাল ও হারামের পার্থক্যের কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু দুনিয়াই সবকিছু; আগে যেতে হবে না, কোন হিসাব দিতে হবে না, সেজন্য বৈধ ও অবৈধের কোন প্রশ্ন নেই। সুতরাং যেভাবে পার আয়েশ কর।

এমনিভাবে তামাদ্দুনের সীমালঙ্ঘন এবং তাতে অতিরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, শুধু তাই নয় যে, মানুষ ভাল আহার করবে, পান করবে, ভাল পরিধান করবে, বরং খাওয়া এবং পান করায় এত পরিমাণ বাড়াবাড়ি এবং বাহ্যিকতা হয়েছে যে, সেখানে আকলও পৌঁছতে পারে না। এহেন বাহ্যিকতা বেড়েই চলছে।

মোটকথা, পৃথিবী সজ্জিত করার যিন্দেগী। পৃথিবীর না সাজালে মানুষের জীবন কোন জীবন নয়। সুতরাং তামাদ্দুনের সীমালঙ্ঘন, আরাম ও আয়েশের বস্তু, খানাপিনার সামগ্রী এবং বসবাসের সামানের মধ্যে এত পরিমাণ সীমালঙ্ঘন হয়েছে যে, পূর্বেকার আকলের মধ্যে একথা কখনো অনুভব হয়নি যে, দুনিয়া উন্নতি করে এতটুকু উপরে পৌঁছে যাবে। আরাম ও আয়েশ এবং সাজসজ্জার এত পরিমাণ সামান তৈরি হবে।

সারকথা, উক্ত চিন্তাধারার অধীনে তামাদ্দুনে সীমালঙ্ঘন সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, এখন দীনদারী ও দীন বলতে কোন কিছু নেই। আল্লাহর সামনে হিসাব এবং উপস্থিতি দেয়ার কোন প্রশ্ন নেই। শুধু দুনিয়াই দুনিয়া। তাকে প্রতিষ্ঠা করে নাও, মনে চায় যতটুকু, ততটুকু স্থায়ী করে নাও। যতটুকু মনে চায় দুনিয়াতে আরাম আয়েশ করে নাও। কবি বলেন- "যতটুকু আরাম করার প্রয়োজন করে নাও, ভবিষ্যতে কিছু নেই।" ফলে তামাদ্দুনে সমাজ ব্যবস্থার, শহুরে জীবনে এবং তামাদ্দুনিক সামগ্রীতে অতিরঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে।

এজন্য মনে হয়, যারা এহেন তামাদ্দুনের আবিষ্কারক তারা ভুলেও কখনো মৃত্যুর চিন্তা করেনি। তারা মনের অজান্তেও কবর বা আখেরাতের কল্পনা করেনি। তাদের একটিই কল্পনা যে, দুনিয়া দৃশ্যমান, অতএব যেভাবে পার চালিয়ে দাও। সারকথা, একদলের মতবাদ আর চিন্তাধারা তো এমন ছিল। তার প্রভাব এই হলো যে, দীন খতম হয়ে গেছে শুধু দুনিয়া রয়ে গেছে। আখেরাত দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু জাগতিক সামগ্রী দৃশ্যমান আছে।

দ্বিতীয় মতবাদের জাগতিক প্রভাব

দ্বিতীয় চিন্তাধারা ছিল আখেরাত। আখেরাতই মূল উদ্দেশ্য। দুনিয়াটা মাত্র একটি রাস্তা, যাকে অতিক্রম করতে হবে। এই মতবাদ দ্বারা এমন প্রভাব পড়ল যে, শুধু তাই নয় যে, তামাদ্দুন গ্রহণ করবে না; বরং তাদের চিন্তাধারা যতটুকু দেহকে শাস্তি দেবে, যতটুকু আরাম-সামগ্রী পরিহার করবে, যতটুকু বৈরাগ্য গ্রহণ করবে, ততটুকু আখেরাতওয়ালা বলবে। অতএব কিছু জাতির চিন্তা ধারা এমন। আমি বার্মা অঞ্চলে দেখেছি, তাদের ধর্মীয় নেতা যাদেরকে ভাখসু বলে তারা বাড়ি তৈরি করে না, বিবাহ করে না। এমনকি খানাপিনাও তারা রান্না করে না। ভিক্ষাও করে না। তাদের কাজ হলো সকালবেলা বের হওয়া আর তাদের কওমের লোকেরা জানে, যে তারা আসবে। তাই প্রত্যেক ঘরে আহারের পূর্বে তাদের জন্য একটা বা অর্ধেক রুটি তাদের নামে রেখে দেয়। সাথে কিছু তরকারীও রাখে। যখন তারা আসে তখন দিয়ে দেয়। এগুলো তাদের খাবার। পাহাড়ের গর্তে থাকে, একটি ধুতির এক পার্শ্ব কোমরে বাঁধে, অপর পার্শ্ব গায়ে জড়ায় আর বলে বেড়ায়, দুনিয়া অতিক্রম করার রাস্তা, যতটুকু তাতে বাহ্যিক আড়ম্বরতা করা হবে, ততটুকু আখেরাত ভুলে যাবে। আর আখেরাতই আসল।

সুতরাং এই মতবাদে তামাদ্দুন একেবারেই খতম হয়ে গেছে। প্রথম মতবাদে শুধু তামাদ্দুন আর তামাদ্দুনই ছিল। আর দ্বিতীয় মতবাদে একেবারেই তামাদ্দুন

খতম হয়ে শুধু পৃথিবীটা 'কোন কিছু নয়' হিসেবে রয়ে গেছে। ধ্বংস বনে রয়ে গেছে যে, দুনিয়াতে সামান্য আরাম করা কেমন যেন আখেরাতকে নষ্ট ও বরবাদ করে ফেলা।

খ্রিস্টবাদ ও দুনিয়া

খ্রিস্টবাদের ভিতর দেখা যায়, তাদের ইতিহাস সাক্ষী যে, যতই শরীরকে কষ্ট দেয়া যাবে, ততই আখেরাত বনবে। এ কারণে তাদের কিছু পাদ্রীদের দেখা যায়, তারা একটি গর্তে যাতে কাদা রয়েছে, শুয়ে-বসে বছর পার করে দেয়। মশামাছি তাদের কামড়াতে থাকে, দেহে ফোসকা পড়ে যায়; তবুও ওই গর্তে পড়ে থাকে। আর মনে করতে থাকে, আমরা আখেরাতে যাচ্ছি। দুনিয়ার সাথে আমরা আখেরাতে যাচ্ছি। দুনিয়ার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। বিবাহ-শাদীর প্রয়োজন নেই, ঘরবাড়ির দরকার নেই। যদি গীর্জার মধ্যে কোন মহিলা নান বা রাহেবা হয়ে আসে, তাহলে সে এমন অঙ্গীকার করে যে, বিবাহ করব না। দুনিয়ার লজ্জতের (স্বাদ) সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। কোন পুরুষ গেলে এই ওয়াদা করে যে, বিবাহ করবে না, কোন মহিলা তার ঘরে আসবে না। না কোন ঘর-বাড়ি নির্মাণ করবে।

মোটকথা, এক মতবাদের ভিতরে তামাদ্দুন এত পরিমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আখেরাত একেবারেই ভুলে গেছে। অপর মতবাদে তামাদ্দুন এত বিলীন হয়েছে যে, দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেছে। শুধু আখেরাতই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

উভয় মতবাদ ও চিন্তাধারা বিপরীতমুখী। এক দলের নিকট দুনিয়া কোন বস্তু নয়, আখেরাতই আসল বস্তু। আকেদল বলে, যা কিছু আছে দুনিয়ায় আছে; আখেরাত কোন বস্তু নয়।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, দুনিয়াও যথারীতি একটা জগত, আখেরাতও একটা জগত। শুধু অতিক্রমের রাস্তা নয় যে, এখান থেকে চলে আখেরাতে পৌঁছে যাও। বরং ইসলাম বলেছে–

الدنيا مزرعة الاخرة

দুনিয়া আখেরাতের ফসল উৎপন্নের স্থান।

যেমন বীজ এখানে বপণ করবে, তেমন ফসল আখেরাতে পাওয়া যাবে। অতএব দুনিয়া চাষাবাদের স্থান। মানুষের কাজ হলো বীজ বপণ করা। ভাল বীজ ফেললে ভাল ফসল মিলবে, মন্দ বীজ হলে মন্দ ফল মিলবে। কবি বলেন–

'গমের বীজ দিলে গম উৎপন্ন হবে, কিকরের বীজ বপণ করলে কাটাওয়ালা বৃক্ষ উঠবে। সীনডের বীজ বপণ করলে দুর্গন্ধময় বৃক্ষ গজাবে।'

মোটকথা, যেমন বীজ পুঁতবে তেমনি ফল ভবিষ্যতে পাবে। অতএব আখেরাত দুনিয়ার দ্বারা অর্জন হবে। এমনটি নয় যে, দুনিয়ার সম্পর্ক আখেরাতের সাথে নেই আর আখেরাতের সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে নেই।

দুনিয়াতে বসবাসের পদ্ধতি

এখন কথা হলো দুনিয়ায় কিভাবে বসবাস করবেন? ইসলাম এ কথা বলে না যে, আপনি ছিন্নমূল হয়ে বসবাস করুন, ভিক্ষা প্রার্থনা করে খান, ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে পেট পালুন। বরং এ কথা বলেছে–

اليد العليا خير من اليد السفلى

উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম।

ভিক্ষুকের হাতের মর্যাদা কম আর দাতার হাতের মর্যাদা বেশি। ইসলাম আরো ঘোষণা করেছে–

كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

হালাল উপার্জন এমন ফরজ, যেমন নামাজ ও রোজা ফরজ।

মানুষের উপর ফরজ দায়িত্ব হলো যে সে উপার্জন করবে, সে ভিক্ষা করে খাবে না, বরং এমন যোগ্যতা লাভ করবে যে, সে আরো দশজনকে আহার করিয়ে নিজে আহার করবে। মোটকথা, মুসলমানকে ভিক্ষা চাওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তাকে ভিক্ষুক বানিয়ে পাঠানো হয়নি যে, সে ভিখারী হয়ে থাকবে। বরং তাকে দাতা বানিয়ে পাঠানো হয়েছে যে, সে জাতিকে কিছু দিবে। তাদের নিকট প্রার্থনার উপযুক্ত হবে না বরং তাদের দাতা হবে। সে এমন জিনিস দান করবে, দুনিয়া যার মুহতাজ। দুনিয়াবাসীকে দীনের প্রতি দাওয়াত দিবে। এমন দীনের দিকে দাওয়াত দিবে, যার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি বরাবর।

হাদিস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

আল্লাহ তায়ালা তার যে বান্দাকে নেয়ামত প্রদান করেন, তার থেকে এটি পছন্দ করেন যে, সেই নেয়ামতের প্রভাব ও চিহ্ন তার উপর কিছুটা প্রকাশ পাক।

সুন্দর পোশাক পরিধান করবে, ভাল খাবার খাবে, ভালভাবে চলাফেরা করবে, ভাল বাড়িতে বসবাস করবে। চালচলন সুন্দর হবে। কিন্তু সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে, আরাম আয়েশ করতে গিয়ে যেন সীমা অতিক্রম না করে। যেমন দীন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

لاتغلو فى دينكم

দীনের মাঝে সীমালঙ্ঘন করো না, যেন বহনক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এতটুকু কাজ অবলম্বন কর, যা দ্বারা জীবন চলে যায় ও অবিচল থাকে।

তেমনিভাবে দুনিয়া সম্পর্কে বলেছেন, এমন সীমালঙ্ঘন কর না যে, আখেরাত ভুলে যাওয়ার মাধ্যম হয়। এত পরিমাণ দুনিয়া গ্রহণ কর যে, আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করতে পার, অন্যকে আহার করিয়ে নিজে আহার করতে পারে, এতটুকু জরুরি। কিন্তু কখনো নিজের আখেরাতকে ভুলিয়ে দিবে না যে, দুনিয়ার মধ্যে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে যাবে যে, অন্তর থেকে মৃত্যুর কল্পনা বের হয়ে যাবে। এমন দুনিয়াদারীকে নিষেধ করা হয়েছে। এমনটিই সীমালঙ্ঘন ও অতিরঞ্জিত।

সম্পদ ও ইবাদতে পরস্পর সম্পর্ক

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে (যার মর্মার্থ মোটামুটি এমন) তোমরা এমনভাবে জীবন যাপন কর আর যুহদ ও কানাআত (অল্পেতুষ্টি) এর অর্থ এমন ভাববে না যে, যখন তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় হবে, তখন কিছু রেখে যাবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এমনটি করা উত্তম নয়। উত্তম হলো, আপন জীবনে উপার্জন করে সন্তানদের কিছু রেখে যাও।

আর তা তখন সম্ভব হবে যখন মানুষ উপার্জন করবে। কিছু সম্পদ পুঞ্জিভূত করবে, কিছু সন্তানদের জন্য জমা করবে। কিছু তাদের সেবা করবে, কিছু আত্মীয়-স্বজনের সেবা করবে। হাজার হাজার ইবাদত রয়েছে, যেগুলো সম্পদের উপর নির্ভর করে। আপনার হাতে যদি দৌলত না থাকে, তাহলে যাকাত দিবেন কিভাবে? তাহলে আপনি একটি ফরজ আদায় থেকে বঞ্চিত হলেন। আপনার হাতে সম্পদ না থাকলে হজ্জ কিভাবে করবেন? তাহলে হজ্বের

দৌলত থেকে মাহরুম হলেন। আপনার মাল না থাকলে গরিব-মিসকীনদের সেবা করবেন কী করে? তখন আপনি দান করা হতে মাহরুম হবেন। মোটকথা, এমন হাজারো ইবাদত রয়েছে, যা সম্পদের উপর নির্ভর।

আমি বলি, এই মসজিদ যেখানে আপনারা নামাজ আদায় করছেন, তাও সম্পদের উপর নির্ভরশীল, সম্পদ হাতে না থাকলে এমন নয়নাভিরাম মসজিদ নির্মাণ হতো? আল্লাহর ঘর এমন সুসজ্জিত কিভাবে হতো? আর এই উত্তম কাপড়ের জায়নামাজ যা দেখে অন্তর খুশি হয় যে, আল্লাহর ঘরকে সাজিয়ে রেখেছে। এগুলো তো সম্পদেরই কারিশমা। অতএব সম্পদের উপর নামাজ, হজ্ব, যাকাত, সদকা ইত্যাদি নির্ভরশীল। এমন হাজারো ইবাদত রয়েছে, যেগুলো সম্পদের উপর নির্ভরশীল। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। তাই সে দৌলতকে কিভাবে হারাম স্বীকৃতি দিবে? যদি হারাম করত, তাহলে মানুষকে হাজারো ইবাদত থেকে বঞ্চিত করত। এ কারণে ইসলাম নির্দেশ দিল–

كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

হালাল উপার্জন মানুষের উপর এমন ফরজ যেমন তাদের উপর নামাজ রোজা ফরজ।

উদ্দেশ্য হলো, আমি যাতে কারো মুহতাজ আর মুখাপেক্ষী না থাকি, এত পরিমাণ উপার্জন করা। কিন্তু তাতে যদি আল্লাহ তায়ালা বরকত দেন, লাখপতি বানিয়ে ফেলেন, তাহলে এই কাজের অনুমতি নেই যে, সম্পদকে নষ্ট করে ফেলবেন, সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবেন। বরং সম্পদ ব্যয়ের খাতসমূহে জায়েয এবং হালাল পন্থায় ব্যয় করতে হবে।

মোটকথা, উপার্জন কর হালাল পন্থায় এবং ব্যয় কর হালাল উপায়ে। তাহলে এমন উপার্জন এবং ব্যয় উভয়টিই ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, এটি ইবাদতের মাধ্যম।

ইবাদতের উসিলার হুকুম

উসিলার হুকুম তা-ই হয় মাকসুদের যা হয়। যখন মাকসুদ ইবাদত হয়, তখন মাধ্যমও ইবাদত হবে।

আপনি যে নামাজ পড়ছেন, তারও উসিলা হলো অযু। সেজন্য অযু ইবাদতের মধ্যে গণ্য। এমন নয় যে, ওযুতে কোন সাওয়াব নেই। তার নিয়ত করা শর্ত। নিয়ত ব্যতীত অযু করলে, পবিত্রতা তো অর্জন হবে, নামাজ হয়ে যাবে; কিন্তু সাওয়াব মিলবে না। যতক্ষণ না আপনি এই নিয়ত করবেন যে, আমি এজন্য

অযু করছি যে, তা দ্বারা নামাজ পড়ব, এটি নামাজের উসিলা। অতএব অযুও ইবাদত, যেহেতু তা নামাজের উসিলা। মসজিদ নির্মাণ ইবাদত। কেননা, এটি নামাজ ও যিকরুল্লার মাধ্যম। মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করাও ইবাদত। কেননা, তা ইবাদত ও নামাজের উসিলা। মোটকথা, উসিলা যতো হবে তার হুকুম তাই হবে, যা আসল মাকসুদের হুকুম হয়।

দুনিয়া আখেরাতের উসিলা

এ কারণে গোটা দুনিয়াকে মুসলমানদের জন্য দীনের উসিলা মাধ্যম বানানো হয়েছে।

ان الدنيا خلقت لكم وانتم خلقتم للاخرة .

দুনিয়া তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর তোমাদেরকে আখেরাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব দুনিয়া আখেরাতের জন্য উপার্জন কর, সেবা ও আনুগত্যের উপার্জন কর। এই সকল জিনিস ইবাদতের মধ্যে গণ্য। মোটকথা, উপার্জন এবং ব্যয় সব আনুগত্যের মধ্যে শামিল। তবে শর্ত হলো নিয়তকে সহীহ করা এবং উদ্দেশ্য হওয়া আল্লাহর রেযামন্দি। এ কারণে কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াতে নিন্দা করা হয়েছে আর কিছু আয়াতে প্রশংসা করা হয়েছে।

এক স্থানে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

এই তোমাদের সন্তানাদি এবং এই তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য ফেতনা ও পরীক্ষার বস্তু।

এই আয়াতে এক ধরনের নিন্দা করা হয়েছে।

অন্যত্র হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

ভালো মানুষের ভাল সম্পদ, তা উত্তম সামগ্রী এবং উত্তম পুঁজি।

এখানে সম্পদের প্রশংসা করা হয়েছে।

মোটকথা, এক স্থানে প্রশংসা এবং এক স্থানে নিন্দা করা হয়েছে। নিন্দা এজন্য যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জায়েয পদ্ধতি উদ্দেশ্য না হওয়া। আর প্রশংসা এজন্য যে, আল্লাহর রেযামন্দি উদ্দেশ্য থাকে, তার জন্য মানুষ সম্পদ বৃদ্ধি করে, তার

বেষ্টনীর ভিতর থেকে মানুষ উপার্জন করে, অতএব সম্পদ ও মোবারক এবং উপার্জনকারীও মোবারক। যদি সম্পদ সাধারণভাবে নিন্দার বস্তু হতো, তাহলে সাহাবাদের মধ্যে কেউ সম্পদশালী হতেন না। অথচ তাদের মধ্যে লাখপতি, কোটিপতি এবং হাজারপতিও রয়েছে। তেমনিভাবে হেদায়েতের রাহবার ইমামগণও কেউ লাখপতি ও কোটিপতি রয়েছেন।

কোটিপতি ইমাম

আপনাদের ইমাম আবু হানিফা রহ. যাঁর ফিকাহের উপর আপনারা পরিচালিত হচ্ছেন। তাঁর রেশমি কাপড়ের ব্যবসা ছিল। আর ব্যবসা এমন ছিল না যে, একটি/দুটি কাপড়ের দোকান দিয়েছেন আর কাপড় বিক্রি হয়ে গেছে। ফলে ব্যবসা শেষ হয়ে গেছে। বরং তাঁর কাপড় বুননের কারখানা ছিল। তাঁর কারখানা থেকে কাপড় বিভিন্ন দেশে রফতানি হতো। সে কারণে তিনি কোটিপতি ছিলেন। এমনকি ইমামের ওফাতের পর তার খাজানায় কয়েক কোটি দিনার জমা ছিল। তার মধ্যে কিছু অছিয়ত ছিল আর অবশিষ্ট সম্পদ সন্তানদের মাঝে বণ্টন করা হয়েছিল।

ব্যবসায় ইমাম আবু হানিফার রহ.-এর সতর্কতা

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সম্পদ উপার্জন সর্বোচ্চ হালাল পন্থায় হতো। তার জীবনীতে রয়েছে, তিনি এক ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠালেন এবং বললেন, মিসর গিয়ে এই মাল বিক্রি করে এসো।

প্রথমে লোকটি এই কাজ করল যে, মাল বিক্রি করতে কিছুটা দেরি করল, যাতে কিছু মূল্য বৃদ্ধি হয়। আর মূল্য বৃদ্ধি হলে পরে বিক্রি করবো। অতএব সে এই নিয়তে মাল স্টক করে রাখল। এক মাস পর মূল্য বৃদ্ধি হলো। ফলে এক লাখের পরিবর্তে দুই লাখ উপার্জন করল, যথেষ্ট লাভ হলো। দ্বিতীয়ত লোকটি এই কাজ করল যে, যখন দাম বেড়ে গেল, তখন প্রতি রুপির বিপরীত এক রুপি করে দাম বাড়িয়ে দিল। আর গ্রাহক বেশি থাকায় দু'লাখের স্থলে আড়াই লাখ বিক্রি করল।

উক্ত রুপি এনে ইমাম সাহেবের খেদমতে পেশ করল। ইমাম রহ.-এর অনুমান ছিল হয়তো সত্তর বা আশি হাজার রুপি লাভ হতে পারে। সেখানে আড়াই লাখ রুপি হাতে এলো। তিনি বললেন, এত লাভ কিভাবে হলো? লোকটি বলল,

প্রথমে আমি মাল বিক্রিতে এক মাস দেরি করেছি, যাতে কিছুটা মূল্য বৃদ্ধি হয়। কিছু মূল্য বৃদ্ধির পর আমি প্রত্যেক রুপির সাথে এক রুপি ফি বাড়িয়ে দিয়েছি।

ইমাম আবু হানিফা বললেন, নাউযুবিল্লাহ! প্রথম সুরত হলো স্টক, যার অর্থ হলো এই যে, আরো দেরি কর, যাতে গ্রাহক ও ক্রেতারা অপারগ হয়ে ক্রয় করে। অতএব গ্রাহককে অপারগ করে লাভবান হওয়া হারাম কর্ম। সুতরাং তুমি গুদামজাত করেছ, যা শরীয়তে নিষেধ। যে মাল বিক্রি করতে এজন্য দেরি করা যাতে মূল্য বৃদ্ধি পায়, শরীয়তের নিয়ম হলো প্রত্যেক মালের সিজনে বিক্রি করে ফেল, সাধারণভাবে সর্বত্র যে মূল্য রয়েছে তাই বিক্রি কর। মাল এজন্য আটকে রেখে যে ডবল দাম বৃদ্ধি পাবে শরীয়ত এহেন কাজকে হারাম সাব্যস্ত করেছে।

তারপর বললেন, "প্রতি রুপির বিনিময়ে এক রুপি করে বৃদ্ধি করে তুমি ধোঁকাবাজি করেছ, ন্যায্য মূল্য থেকে অত্যধিক বেশি নিয়েছ। শরীয়ত এহেন কর্মকেও অনুমতি দেয় না। তিনি বললেন, এখন তো এই কাজটি কঠিন ও দুরূহ যে, তোমাকে আড়াই লাখ রুপি দিয়ে আবার পাঠাবো যে, তা নিয়ে গ্রাহকদের ফিরিয়ে দাও। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন কে কোথাকার, কার বাড়ি কোথায়? অতএব আমার খাজানায় এক পাইও জমা করা যাবে না। এখনই এই সম্পদ গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হোক।"

তখন আড়াই লাখ দিনার সেই সময় গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হলো। এমনই ছিল ইমামে আযম রহ.-এর সম্পদ উপার্জনের অবস্থা। তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে বিক্রি করতেন এবং মাল উপার্জন করতেন।

ব্যয়ের খাত দ্বারা আয়ের খাতের পরিচয় লাভ

যখন বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন হয়, তখন সেই সম্পদ বৈধ পন্থায় ব্যয় হয়। যেমন আমাদের সর্দার শায়েখ আবদুল কাদির জিলানী রহ. বলতেন, আমি সম্পদে ব্যয়ের খাত দেখে আয়ের খাত বুঝতে পারি। যে স্থানে বা খাতে ব্যয় হয়, আমি বুঝতে পারি, ভাল খাতে ব্যয় হচ্ছে, তাহলে ভাল উৎস হতে উপার্জন বা আয় হয়েছে। আর যদি হারাম স্থানে বা খাতে ব্যয় হতে দেখি, তাহলে বুঝতে পারি, তা হারাম পন্থায় আয় হয়েছে।

মোটকথা, ব্যয়ের খাত দেখে আয়ের খাত বুঝে নিতে পারি যে, এই সম্পদ কিভাবে এসেছে?

অতএব ইমাম সাহেবের সম্পদ পবিত্র এবং সর্বোচ্চ পবিত্র পদ্ধতিতে উপার্জন হত, তাই ব্যয়ও পবিত্র পন্থায় হত, বৈধ পথে হত।

ইমাম আযমের পক্ষ থেকে আলেমদের বেতন প্রদান

ইমাম আবু হানিফা রহ. একটি ইলমের মজলিস তৈরি করেছিলেন, তাতে প্রায় চার-পাঁচশ' উলামায়ে কেরাম সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁরা শুধু সাধারণ আলেমই ছিলেন না। বরং তারা নিজ নিজ বিষয়ের ইমাম ছিলেন। কেউ তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম, কেউ হাদিসের ইমাম, কেউ ভাষার ইমাম, কেউ ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। এমন সকল আলেমদের সমন্বয়ে ইলমি মজলিস কায়েম করেছিলেন এবং ফিকহের মাসায়েল সংকলন করছিলেন। ইজতিহাদ ও ইস্তেমাতের মাধ্যমে মাসায়েল উদ্ভাবন করা হতো। একেকটি মাসয়ালা উক্ত মজলিসে উত্থাপন করা হত আর সেই বিষয়ে কয়েক সপ্তাহব্যাপী আলোচনা-পর্যালোচনা হতো, অতঃপর পরিষ্কার করতে করতে সর্বশেষে যে পরিচ্ছন্ন কথা বের হতো সেটি সংকলন করে লেখা হতো যে এটিই কুরআন ও হাদিসের অধিকতর নিকটবর্তী কথা। এমনটিই ছিল আপনাদের ফিকহে হানাফীর মজবুত অবস্থা। অতএব উক্ত মজলিসের চার-পাঁচশ' আলেমের বেতন ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ধনভান্ডার থেকে দেয়া হতো। কারো এক হাজার, কারো দুই হাজার, কারো তিন হাজার, এভাবে লাখ লাখ রুপি মাসিক বেতন দেয়া হতো, এ কাজে ব্যয় হতো।

গরিবদের উপর ইমাম সাহেবের ব্যয়

আলেমদের মাসিক বেতন ছিল সদকা ও খয়রাতের বাইরে। এছাড়া কুফা অঞ্চলে যতগুলো পরিবার ছিল সকলের পরিসংখ্যান ইমাম সাহেবের নিকট ছিল, কোন বাড়িতে কতজন বালেগ কতজন শিশু, কতজন মহিলা, কতজন পুরুষ, কতজন গরিব এবং কতজন ধনী তার লিস্ট ছিল। সবাই প্রতিদিন আহার করত, তিনি খেয়াল রাখতেন কেউ যাতে কষ্ট না করে।

প্রতিটি ঘরে যতজন সদস্য থাকত এবং কুফার মধ্যে যতগুলো দরিদ্র ঘর রয়েছে, সবার জন্য সবার দেহ অনুযায়ী রমাযান মাসে পোশাক তৈরি হতো, ঈদের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর ফজরের পূর্বেই প্রত্যেকের ঘরে, সদস্য সংখ্যানুযায়ী পোশাক পৌঁছে যেত। পোশাক পেয়ে গরিবরা বলতো আমার গরিব নই, আমরা ধনীদের ন্যায় ঈদ করি। আল্লাহ আবু হানিফাকে শান্তিতে রাখুন।

মোটকথা, এ-খরচ ভিন্ন ছিল যে কোন দরিদ্রের ঘর এমন থাকতো না, তাদের ঈদ উদযাপন হতো না। তাদের অবস্থা অনুযায়ী উত্তম পোশাক পাঠাতেন। এভাবে তিনি আলেম ও গরিবদের উপর লাখ লাখ টাকা ব্যয় করতেন।

একজন ঋণগ্রহিতার সঙ্গে ইমাম সাহেবের আচরণ

তাছাড়া করজ দেওয়ার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত থাকত। হাজার হাজার মানুষ করজ নিত। কারো পঞ্চাশ হাজার প্রয়োজন হলে ইমাম সাহেব রহ. দিয়ে দিতেন। ত্রিশ হাজার দরকার হলে তাও দিয়ে দিতেন। সবাই তাদের প্রয়োজন মত করজ পেয়ে যেত। ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকত যে, করজ নেয়ার পর নিয়ত পাল্টে ফেলত, ফেরত দিতে মন চাইত না। এক লোক পঞ্চাশ হাজার রুপিয়া করজ নিল। তারপর ভাবতে লাগল, এত টাকা দেয়ার সামর্থ্য নেই, এত টাকা কিভাবে ফেরত দিব। অতএব এড়িয়ে যেতে শুরু করল। লোকটি ইমাম সাহেবকে এক রাস্তা দিয়ে আসতে দেখলে সে অন্য রাস্তা গ্রহণ করত। তারপর একদিক থেকে আসতে দেখলে সে অন্যদিকে ফিরে যেত। সে কখনো সামনে পড়ত না, লজ্জা পেত। পরিস্থিতি দেখে ইমাম সাহেব বুঝে নিলেন, হয়তো লোকটি তার নিয়ত পাল্টে ফেলেছে।

একদিন ইমাম সাহেব এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন লোকটি তাকে দেখে অন্য গলিতে প্রবেশ করল। তখন ইমাম সাহেব রহ. হঠাৎ উক্ত গলিতে প্রবেশ করে লোকটির কাঁধে হাত রাখলেন এবং বললেন, হে ভাই! আমি তোমার সঙ্গে কি অন্যায় করেছি যে, তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ? আমি কি অস্পৃশ্য জাতির লোক যে আমার থেকে দূরে দূরে পাশ কেটে চলছ? তুমি এমনটি কী কারণে করছ? লোকটি তখন নিশ্চুপ, তার অন্তরে অন্য চিন্তা। তিনি বললেন, মনে হচ্ছে পয়সা ফেরত দিতে মনে চাচ্ছে না।

সে এ কথা বলেনি যে, আমার নিকট পয়সা নেই। কারণ, সে ধনী মানুষ ছিল। সে বলল, আমার এড়িয়ে চলার কারণ হলো পয়সা ফেরত দিতে মনে চাচ্ছে না। ইমাম সাহেব বললেন, ভাই! মাল কি এমন জিনিস যে, তার কারণে সম্পর্ক খারাপ করবেন? পঞ্চাশ হাজার রুপিয়া সম্পূর্ণ মাফ। কিন্তু সম্পর্কের মাঝে পানি যেন ঢালা না হয়। আসা-যাওয়া আগের মত জারি রাখবেন। একেবারেই ক্ষমা, আপনাকে এক পাইও দিতে হবে না।

হাজারো ঘটনা রয়েছে যে, হাজার হাজার, লাখ লাখ পরিমাণ করজ মাফ করে দিয়েছেন। এমন দানশীলতার সমুদ্র ঈমানের মধ্যে প্রবহমান ছিল। তার উপার্জনেও সর্বোচ্চ সতর্কতা ছিল এবং ব্যয়ের মধ্যেও সর্বোচ্চ সতর্কতা ছিল।

আর্থিক ইবাদাতের তাওফিকের মানদণ্ড

শায়েখ আবদুল কাদির জিলানী রহ. বলেছেন, আমি সম্পদ ব্যয়ের খাতসমূহ দেখে তার আয়ের রাস্তা বলে দিতে পারি, বুঝে নিতে পারি। যদি ব্যয়ের খাত সহীহ হয়, তাহলে উপার্জন হয়েছে সহীহ পথে। আর যদি ব্যয় গলত পথে হয়, তাহলে উপার্জন হয়েছে গলত পথে। কবি বলেন– "হারাম মাল হারাম পথে ব্যয় হয়।"

যে সম্পদ অবৈধ বা অসতর্কতাবশত উপাজন হয়েছে, তা ব্যয়ও হয় তেমন খাতের উপর। ওই মালকে সহীহ খাতে ব্যয় করার তাওফীক হয় না, যা অবৈধ পথে অর্জন হয়েছে।

নেয়ামত প্রকাশ করার স্থান

সুতরাং আমার উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বুঝানো যে, ইসলাম দুনিয়াকে তুচ্ছ ও অস্তিত্বহীন স্বীকৃতি দেয়নি যে, আখেরাতকে মূল উদ্দেশ্য বানাও আর দুনিয়াতে ভিক্ষা করে খাও। দুনিয়াতে দুরবস্থার পড়ে থাক এবং ধিক্কার পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়ে তাক। তা ইসলাম বলেনি। বরং ইসলাম ঘোষণা করেছে–

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

আল্লাহ যাকে নেয়ামত দান করেছেন, আল্লাহর তা পছন্দ যে সে তার নিয়ামতের চিহ্ন প্রকাশ করুক।

পোশাক ভাল পরিধান করুক, ভাল খাবার আহার করুক, ভাল স্থানে বসবাস করুক, ভাল সামাজিকতা প্রদর্শন করুক। একথা বলেনি যে, তুচ্ছ ও ধিক্কার পাওয়ার যোগ্য হয়ে বসবাস করুক।

ব্যক্তিগত হালত অনুসরণযোগ্য নয়

এখন কতকের এই সন্দেহ হতে পারে যে, কিছু হাদিসও বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কিছু আল্লাহওয়ালার। ছালার চট পর্যন্ত পরিধান করেছেন। তারা সুন্দর ও ভাল কাপড় পরিহার করেছেন।

এমনটি তাদের হাল (বিশেষ অবস্থা) ছিল আর কারো হাল কানুন হয় না। উপরে যা বলা হয়েছে, তা হলো শরীয়তের বিধান। তবে কারো উপর যদি যুহদ ও কানাআতের হাল প্রবল হয়ে যায় এবং সে সমস্ত মাল বিক্রি করে কবর স্থানে গিয়ে বসে যায়, তাহলে তা তার হাল। তাকে মন্দ বলা যাবে না। সে তার

বিশেষ হালে নিমজ্জিত। কিন্তু একে কানুন বানানো যাবে না যে, দুনিয়াবাসীকে তার দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াত ওই জিনিসের দিতে হবে, ইসলাম যার ব্যাপারে হুকুম করেছে।

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যে গায়েবী কানুন পেশ করেছেন, তাই কানুন থাকবে। মানুষের হালত কানুন হতে পারে না। হালতওয়ালা ব্যক্তিদের সম্মান করতে হবে। তাদের আযমাত করতে হবে। তাদের এই কর্মকে বড় মনে করতে হবে। কিন্তু বিধান বানান যাবে না যে, এই কর্মের তাবলীগ করবেন যে, অমুক বাড়িঘর সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে, অতএব তোমরাও ছেড়ে দাও। মোটকথা তা কানুন হতে পারে না। তা ব্যক্তিগত হাল। আপনাদের ভিতর এমন হাল আসলে আপনিও তার উপর আমল করবেন, কেউ বাধা দেবে না।

নবীজির ব্যক্তিগত জীবনের অনুসরণ

কতক সাহাব (রাযি.) এমন রয়েছেন, যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত জিন্দেগীকে নিজের মাযহাব স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু নবীদের শান এমন যে, কারা তাঁদের পদাঙ্ক পুরোপুরি অনুসরণ করে চলতে পারবে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সাইয়েদুল আম্বিয়া, তাই তাঁর জিন্দেগী আরো উঁচু মানের আরো উন্নত। এজন্য সবাই তার উপর চলতে পারবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ শানের উপর যারা চলেছেন, তাঁরা সাহাবাদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন। এজন্য তারা শহরে থাকতে পারেনি।

হযরত আবুযার গিফারী রাযি. সাহাবাদের মাঝে তাঁর যুহদ ও কানাআত প্রসিদ্ধ রয়েছে। হযরত উসমান গনী রাযি.-এর খেলাফতকালে তিনি শামে গেলেন আর শাম দেশে তামাদ্দুন ও বাহ্যিকতা এবং খানাপিনা খুব বেশি ছিল। আরবদের মত তারা গরিব ছিল না। তাদের বিশাল বিশাল বাড়ি ও বিল্ডিং ছিল। আহারের জন্য বিভিন্ন প্রকার খাবার সামগ্রী ছিল। পোশাক ছিল দামি দামি।

তিনি যে দস্তখানে ডবল খাবার দেখতেন, সেখানে লাঠি নিয়ে পৌঁছে যেতেন এবং বলতেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্তখানের উপর কখন ডবল খাবার থাকত? এখনই সদকা করে দাও। সাহাবা রাযি. ও তাবেঈগণ ভয়ে সদকা করে দিতেন। কারো ঘরে এক জোড়া পোশাক অতিরিক্ত আরেক জোড়া থাকলে সেখানে ডান্ডা নিয়ে চলে যেতেন এবং বলতেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে দ্বিতীয় জোড়া কাপড় কখন ছিল? তাই তোমাদের

জন্য ডবল কাপড় রাখা কখন জায়েয হল? অথবা কারো নিকট কিছু পয়সা জমা হলে, তিনি তার বাড়িতে ডান্ডা নিয়ে উপস্থিত হতেন আর বলতেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে কখন সম্পদ জমা ছিল যে, তোমরাও জমা করছ। এই মুহূর্তে সদকা করে দাও।

হযরত আবু যর রাযি.-এর কাছে লোকেরা অপারগ হয়ে গেল এবং হযরত উসমান গনী রাযি.-এর নিকট পত্র লিখল, তিনি আমাদের জীবন সংকীর্ণ করে ফেলেছেন। আমরা শরীয়তের কানুনের উপর চলি আর কানুনের মধ্যে তো সুযোগ ও সুপ্রশস্ততা রয়েছে।

নবী কারীম সা.-এর ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঝলক

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিগত যিন্দেগী অনেক উঁচু মানের আযীমাতওয়ালা (সংকল্পমূলক) জীবন ছিল। কারো কি শক্তি আছে যে, তার হুবহু অনুসরণ করতে পারবে! পারবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান তো এমন ছিল যে, হাদিস শরীফে এসেছে– মাগরিব নামাজের ইকামাত হচ্ছে। তিনি নামাজের স্থানে। তাকবীর বলা শেষ; নামাজ শুরু করবেন। এমন মুহূর্তে তিনি ঘাবড়ে গেলেন এবং ঘরে চলে গেলেন, অল্পক্ষণ পরে ফিরে এলেন এবং মাগরিবের নামাজ পড়ালেন। সাহাবাগণ. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ অভ্যাসের বিপরীত তাকবীরের পরে কিছুক্ষণ বিরতি দিলেন, ঘরে তাশরীফ নিলেন, অতঃপর ফিরে এলেন, এমনটি কেন করলেন? ইতিপূর্বে তো তা দেখিনি?

নবীজি বললেন, আমার মনে পড়ে গেল, আমার ঘরের তাকে একটি দিনার পড়ে আছে আর নবীর জন্য জায়েয নেই, তিনি ঘরে রাত্রি যাপন করবেন আর তার ঘরে স্বর্ণ, রুপা থাকবে। তাঁর ঘরে একটি দিনার ছিল, যা সাত দিরহাম সমতুল্য। তার মানে আমাদের বিবেচনায় দুই রুপিয়া ছিল।

তিনি বললেন, ঘরে গিয়ে তা সদকা করেছি, ঘরকে তা থেকে পবিত্র করেছি, তারপর এসে নামাজ পড়িয়েছি। নবীর জন্য উচিৎ নয়, তিনি ঘরে রাত্রি যাপন করবেন আর তার ঘরে সোনা বা রুপা মজুদ থাকবে।

অতএব আজ এমন কে আছে যে, তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর আমল করবে যে, স্ত্রীর সকল জেওর-অলংকার এখনই নিয়ে বিক্রি করে ফেলবে? যা কিছু লোহার সিন্দুকে রাখা আছে, তা বের করে গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দিবে? এ কাজের কারো সামর্থ্য নেই, নেই কারো হিম্মত সাহস।

শরীয়তের উদারতা

শরীয়ত যখন এজাযত দিয়ে দিল, যাকাত দাও, সদকা দাও। অবশিষ্ট সম্পদ তোমাদের জন্য হালাল। সাধারণ মানুষ এই কানুনের উপর চলবে। এখন এমন অবস্থা যে এক পাইও যাতে ঘরে না থাকে তা যখন এমন হাল ও কৈফিয়ত হবে, তখন করবে। আর এ কথা মনে রাখতে হবে যে, হাল কোন কিছুর হুজ্জত ও দলিল হতে হতে পারে না। হাল কানুন হতে পারে না। হুজ্জত হলো একমাত্র শরীয়তের কানুন। তবে হ্যাঁ আল্লাহ্ যদি আপনাকে ওই হাল প্রদান করেন আর আপনি তা করেন, তাহলে আপনাকে তাযীম করা হবে। কিন্তু হালকে কানুন বানিয়ে স্টেজে পেশ করবেন যে ঘরের সমস্ত আসবাব এখনই সদকা করে দাও। এমনটি করা জায়েয হবে না। বরং তা কানুনের বিরোধিতা করা হবে। সুতরাং শরীয়তের উদারতা ভিন্ন বস্তু এবং মানুষের ব্যক্তিগত হালত ভিন্ন জিনিস। প্রত্যেক অভিজাত ও সাধারণের জন্য পয়গাম হবে, তা শরীয়তের কানুন হবে। আর হাল তার জন্য হুজ্জত হবে, যার হাল রয়েছে। যে আমল করবে, তার ইজ্জত করা হবে।

হাল-এর অনুসরণ নয়

অন্যথায় এমন হয়ে যাবে যে, একজন তরিকতের শায়েখের অনেক মুরীদ রয়েছে। ঘটনাক্রমে শায়েখ অসুস্থ হলেন। ডাক্তার বলে দিলেন, এই মুহূর্তে ওযু করলে রোগ বেড়ে যাবে। অথবা দাঁড়ানোর শক্তি ছিল না, তাই শরীয়ত অনুমতি দিবে দিল– বসে নামাজ পড়তে, তিনি বসে নামাজ পড়লেন। পরদিন মুরীদগণ ঘোষণা দিল, পীর সাহেব বসে নামাজ পড়েছেন। তাই আমরাও সবাই বসে নামাজ পড়ব। তারা ফরজ কিয়াম ছেড়ে দিল। তারা এমন কাজ করল, যা একেবারেই নাজায়েয ছিল।

কারণ তারা পীর সাহেবের কাজের অনুসরণ করেছে। কর্মের অনুসরণ করা যায় নবীদের– অন্য কারো নয়। তারপরও যদি অনুসরণ করতেই হতো, তাহলে শায়েখের ন্যায় নিজেদের উপরও অসুস্থতা সৃষ্টি করে নিত। এত পরিমাণ অসুস্থতা আসতো, যতটুকু শায়েখের উপর এসেছিল। তাহলে তাদেরও বসে বসে নামাজ পড়ার ইজাযত মিলতো। আর অসুস্থতা তার কমবেশি অনুভব করা যায় না। আর কর্মে শায়েখের নকল হলে তা হবে এমন নকল, যা শুধু রূপ দেখানো হবে। হাকিকতে তাতে কিছুই নেই। এজন্য একমাত্র শরয়ী কানুন সকলের দলিল। তার উপর আমল করতে হবে। তার উপর চলতে হবে।

তবে হালওয়ালাকে সম্মান করতে হবে। তার ভর্ৎসনা করা যাবে না। আল্লাহ্ যদি এমন হাল সকলকে নাসীব করেন তাহলে তা সৌভাগ্যের বিষয় হবে।

শরয়ী উদারতার সীমারেখা

ইসলামি শরীয়ত সুযোগ দিয়েছে এক তো শুধু এতটুকু বলেছে যে, হারামের সীমান্তে যেয়ো না, হালালের সীমানায় থেকো। দ্বিতীয়ত এই যে, জাগতিক আসবাবে সীমালঙ্ঘন করো না, এতটুকু গ্রহণ কর, যাতে জীবন সুন্দর ও সাজানো যায় আর অন্তর তাতে আটকে না থাকে। অন্যথায় মানুষ জাগতিক সামগ্রীর গোলামে পরিণত হবে। আর এমন ব্যক্তির উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদদুআ করেছেন। তিনি বলেছেন–

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ

ধ্বংস হবে টাকা-পয়সার গোলাম, ধ্বংস হবে স্বর্ণমুদ্রার গোলাম, আর শাল চাদরের গোলামও ধ্বংস হবে।

অর্থাৎ তার অন্তর ওই বস্তুগুলো আটকে আছে যে, যেগুলোর মধ্যে লিপ্ত হয়ে না মৃত্যুর স্মরণ আছে, না আছে আখেরাতের স্মরণ, না আছে ফারায়েয ও দায়িত্বের স্মরণ। এমন সম্পদ তো জানের জন্য মসিবত। আর এমন মানুষকেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ দুআ দিয়েছেন। কিন্তু জায়েযের সীমারেখায় থেকে মানুষ তুচ্ছ ও ধিক্কারযোগ্য অবস্থায় থাকতে পছন্দ করে না। বরং সৌন্দর্যের সাথে থাকতে পছন্দ করে। এমন নয় যে, খাবার জমিনে ঢেলে, মুখ লাগিয়ে আহার করে নাও, বরং ডিশ প্লেট থাকবে। আবার তা কিছুটা দামি ও শানদার হবে, যাতে মানুষের নজরে অপ্রিয় না হয়। এভাবে কিছুটা বাহ্যিকতা করলেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যাতে সীমালঙ্ঘন না করে যে সকালে এক প্লেট বিকালে অন্য প্লেট এবং দুপুরে আরেক প্লেট। তেমনি রাতে শয়নের একটি পোশাক, দিনে আরেক পোশাক এবং পরিধানের জন্য ভিন্ন পোশাক। তাহলে তা হবে পোশাক ও পাত্রের গোলামি। অথচ বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে।

দৌলতে দুনিয়ার প্রশংসা ও নিন্দার মাপকাঠি

দুনিয়ার সম্পদের প্রশংসাও এসেছে এবং নিন্দাও এসেছে। ওই দুনিয়ার নিন্দা করা হয়েছে যে, দুনিয়া আখেরাত থেকে গাফেল বানিয়ে দেয়। আর এমন দুনিয়ার প্রশংসা করা হয়েছে যে দুনিয়া আখেরাত পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম হয়।

এজন্য আরেফে রুমি রহ. উদাহরণ দেন যে, যেমন সমুদ্র তাতে যখন নৌকা চলে, তখন পানি যদি নৌকার বাইরে থাকে, তাহলে নৌকার জন্য তা সাহায্যকারী হবে; কিনারায় ভিড়বে এবং নির্ধারিত স্থানে পৌছবে। কিন্তু পানি যদি নৌকার ভিতরে চলে আসে, তাহলে নৌকা ডুবে যাবে, নৌকার মাঝি বা আরোহী ডুবে যাবে, উভয়ে ধ্বংস হবে। তেমনিভাবে মানুষের অন্তর নৌকার মত, আর দুনিয়ার সম্পদ ও সামগ্রী সমুদ্র ও নদীর মত। অতএব দৌলত যতক্ষণ অন্তর থেকে বাইরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অন্তরকে তীর পর্যন্ত পৌছানোর মাধ্যম হবে। আর যদি ভিতরে এসে যায়, তাহলে অন্তর ও অন্ত রওয়ালা উভয়ে ডুবে যাবে, ধ্বংস হবে।

একে তো দুনিয়াকে ব্যবহার করা, শরীয়ত তা নিষেধ করেনি। দ্বিতীয়ত, দুনিয়াকে মহব্বত করা, দুনিয়ার মহব্বতের মোহে পড়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের মুহব্বতকে ভুলে যাওয়া তারই নিন্দা করা হয়েছে।

জন্মগত মহব্বত

কুরআনুল কারীম উদারতা প্রদান করেছে; এ কথা তো বলেনি যে, মালের মহব্বত সম্পূর্ণরূপে বের করে দাও। এটি তো জন্মগত বিষয় যে, যখন মানুষ উপার্জন করে, তখন কিছু না কিছু নিজ মালের প্রতি মহব্বত হয়। নিজের ঘরের সাথে হয়, নিজ সামান, বিবি বাচ্চাদের প্রতি মহব্বত হয়। সম্পূর্ণরূপে মহব্বত বের করে দেয়া মানুষের আয়ত্তে নেই।

এমনটি তো তবিয়তের তাকাজা যে, যে জিনিস মানুষের নিকট থাকে, তার সঙ্গে কমবেশি মহব্বত গড়ে ওঠে। একজন অপরিচিত লোক যদি প্রতিবেশী বনে এবং কিছুদিন বসবাস করে, তাহলে পরস্পর মহব্বত হয়ে যায়। অতএব নিজ ঘর ও বাড়ির সাথে স্বভাবজাত মুহব্বত হবে। কুরআনুল কারীম এমন মহব্বতের অনুমতি দিয়েছে। কারণ, মুতলাক ও সাধারণ মুহব্বত হওয়া তা নিষেধ নেই। কিন্তু এমন মহব্বত যা ফারায়েয এবং ওয়াজিবাতে প্রতিবন্ধক হয়, তা থেকে বেঁচে তাক তা নিষেধ। এজন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআনের একস্থানে বলেছেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ
اَمْوَالُ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ
اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ

> হে নবী! আপনি মানুষদের বলে দিন, তোমাদের পিতা ও পিতামহ, তোমাদের বংশ ও সন্তানাদি, তোমাদের প্রিয় পাত্র ও আত্মীয়-স্বজন এবং তোমাদের বিবি এবং বাচ্চা, তোমাদের সম্পদ এবং ব্যবসার মাল যার দরপতনের তোমরা ভয় কর যে, বাজার মন্দা হয়ে যাবে। আর লাভবান হওয়ার জন্য রাত-দিন তোড়জোড় মেহনত কর। আর তোমাদের এই দালান এবং বাসস্থান যার ভিতর তোমরা আরাম কর, এই সমস্ত জিনিস যদি তোমাদের নিকট বেশি প্রিয় বনে যায় এবং এত প্রিয় বনে যায় যে, আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভুলে যায়, তাহলে আল্লাহর আযাবের অপেক্ষা কর যে, এই দৌলত ছিনিয়ে নেয়া হবে। *[সূরা তাওবা : ২৪]*

কিন্তু যদি এমন হয় যে, সবচেয়ে প্রিয় নয় বরং মুতলাক মহব্বত হয়, তাহলে তা স্বভাবজাত ও জন্মগত। এমন মহব্বতকে শরীয়ত নিষেধ করেনি। কারণ, জন্মগতভাবে নিজের সম্পদ ও ঘরবাড়ির প্রতি মানুষের কমবেশি ভালবাসা থাকবেই। অতএব এই সাধারণ মহব্বত নিষেধ করা হয়নি, অধিক মহব্বতকে নিষেধ করা হয়েছে। অধিক মহব্বত হওয়ার অর্থ হলো, আমার শুধু এগুলোই প্রিয়পাত্র, আল্লাহ নয়, রাসূল নয়, নয় ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ। এহেন মহব্বতকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি এতটুকু মহব্বত হয়, যা স্বাভাবিক এবং সাথে সাথে অন্তরে দীনের মহব্বত হয়েছে সম্পদও আছে আবার নামাজও পড়ে। রোজাও রাখে, হজ্বও করে, যিকিরে মগ্ন থাকে, তাহলে এমন সম্পদ নিষেধ নয় এবং এমন মহব্বতও নিষেধ নয়।

দীন ও দুনিয়ার সম্পদ

আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, আমি আফ্রিকায় দেখে এসেছি, আল্লাহ তাদের দীনি সম্পদ দিয়েছেন, সাথে সাথে জাগতিক সম্পদও দিয়েছেন। তাদের ব্যবসাও রয়েছে এবং লাভও হয়। তাদের ঘড়-বাড়ি, পরিধানের বস্ত্র, বসবাসের ঘর ও চালচলন সবই ভাল ও উন্নত। এগুলোর পাশাপাশি মসজিদও আছে, আছে নামাযিও। তারা মসজিদগুলো এমনভাবে সজ্জিত করেছে যে, মনে হয় মানুষ তাদের প্রাসাদ-বাংলোকেও এত সজ্জিত করে না। মসজিদগুলোতে দামি কার্পেটের জায়নামাজ বিছানো হয়েছে। আরামের সকল প্রকার সামান রয়েছে। তারা নিজেদের ঘড়বাড়ি নিয়ে যতটুকু ফিকির করে, তার চেয়ে বেশি ফিকির করে আল্লাহর ঘরের, যাতে সেগুলোও সজ্জিত হয়, সুন্দরভাবে।

আল্লাহর বাংলো

আমি এখানে এসে বলেছি, মসজিদসমূহকে তো আল্লাহর ঘর বলা হয়। আর এখন বলি এগুলো আল্লাহর ঘর নয় বরং আল্লাহর বাংলো। এগুলো সজ্জিত ও নকশাকৃত কার্পেট দ্বারা সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন রকমের ঝাড়বাতি রয়েছে। ছাদকেও বিভিন্ন নকশা ও চিত্র দ্বারা সাজানো হয়েছে। তো এগুলোকে ঘর বলা চলে না। ঘর তো আমাদের এলাকায় যা তৈরি করা হয়, এগুলো তো আল্লাহর বাংলো। আমাদের ঘরে যে মসজিদ রয়েছে, সেগুলো আল্লাহর ঘর। আর আফ্রিকায় যে মসজিদ রয়েছে, সেগুলো আল্লাহর বাংলো।

সুতরাং যারা আল্লাহর জন্য বাংলো বানায়, তারা নিজেদের জন্য বাংলো নির্মাণ করবে তা তাদের জন্য নিষেধ নয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। যারা আল্লাহর ঘরকে সাজাবে, তারা নিজেদের ঘর কমবেশি সাজিয়ে নিবে তাতে অসুবিধা নেই। তেমনিভাবে পোশাককে সজ্জিত করবে, তারা আল্লাহর ঘরে কার্পেট বিছিয়েছে যদি নিজেদের ঘরে কার্পেট বিছায় এতে কোন অসুবিধা নেই।

তবে কথা হলো, যাতে সীমালঙ্ঘন না হয় এবং এমন সম্পর্ক গড়ে না ওঠে, যার ফলে দীনি কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অন্যথায় এতটুকু যদি নিষেধ হতো, তাহলে সাহাবাদের মধ্যে একজনও সম্পদশালী হতেন না। অথচ হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা. সম্পদশালীদের একজন ছিলেন। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. বড় সম্পদশালী সাহাবী ছিলেন।

হযরত জাবের রা.-এর সম্পদ এবং অন্তরের কাইফিয়্যাত

কিন্তু কালবের অবস্থা কেমন ছিল? একদিন হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ রা. বাড়ি এলেন কিছুটা হতাশ ও চিন্তিত মনে এবং চেহারার রং পাল্টানো। তাঁর বিবি তাকে বললেন, আজ আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে? তিনি বললেন, ভান্ডারে এত পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে যে, আমার অন্তরে বোঝা সৃষ্টি হয়েছে আর আমার মন পেরেশান হচ্ছে। স্ত্রীও সাহাবী ছিলেন। তিনি বললেন, তারপর আপনি কি করলেন? সাহাবী বললেন, কিছু বুঝে আসছে না। স্ত্রী বললেন, ঘাড়বে যাওয়ার কী প্রয়োজন। সদকা করা শুরু করুন, গরিবদের দিতে থাকুন। তিনি বললেন, তদবির তুমি ভালই বলেছ। অতঃপর তিনি খাযাঞ্চিকে আদেশ দিলেন, তুমি বণ্টন করা আরম্ভ কর।

সকালে যা হিসাব করেছিলেন, তা থেকে সারা রাত দুই লাখ রুপিয়া গরিবদের মাঝে বণ্টন করলেন। সকালে বাড়ি এসে বিবির হাতে চুমু খেলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দান করুক। তুমি কেমন সুন্দর তদবির বলে দিয়েছ। এখন আমার মন হালকা হয়েছে।

তো তিনি এত সম্পদশালী ছিলেন; কিন্তু অন্তর আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ থাকত। সম্পদ বেশি বৃদ্ধি পেলে অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে যেত। আর আমাদের অন্তর সম্পদ কমে গেলে ভারাক্রান্ত হয়। বৃদ্ধি পেলে মন খুশি হয়। তাদের নিকট কিসসা সম্পূর্ণ উল্টো হতো।

সম্পদ নিয়ে দুই সাহাবীর দুর্লভ ঝগড়া

হাদিস শরীফে এসেছে, এক সাহাবী অন্য সাহাবী থেকে জমি ক্রয় করলেন। মূল্য পরিশোধ করেন, জমি হস্তগত করেন। ইমারত নির্মাণের জ্য যখন ভিত্তি খনন করতে লাগলেন, তখন বড় একটি ডেকচি পেলেন, যাতে সোনা-রুপা ভরা ছিল। প্রায় লক্ষ টাকার সম্পদ হবে। তা নিয়ে জমি বিক্রেতার বাড়িতে হাজির হলেন এবং বললেন এটি আপনার ডেকচি। বিক্রেতা বললেন, এই ডেকচি কিভাবে আমার? ক্রেতা বললেন, জমি আপনার নিকট থেকে ক্রয় করেছি, তা থেকে বের হয়েছে। আর আমি তো জমি ক্রয় করেছি। ডেকচি তো ক্রয় করেনি। অতএব তা আপনার হক। বিক্রেতা বললেন, যখন আমি জমি বিক্রি করেছি তখন জমির নিচ পর্যন্ত তার মালিক আপনি হয়ে গেছেন। অতএব এ সম্পদ আপনার হক– আমার নয়। এখন তাদের মাঝে ঝগড়া এই বিষয় নিয়ে যে ক্রেতা বলেন, এটি আপনার হক, আমার নয় আর বিক্রেতা বলেন, তা আমার হক নয়, আপনার হক। পরিশেষে উক্ত মুকাদ্দামা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার পর্যন্ত গড়াল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দু'জনকে বললেন, তোমাদের কোন সন্তান আছে কি? তাদের একজনের ছেলে আর অপরজনের মেয়ে ছিল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা উভয়কে বিবাহ দাও এবং বিবাহে উক্ত সম্পদ ব্যয় কর। অতঃপর উভয়ে শান্ত হলেন।

আমাদের সমাজে তো এমন ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হয় যে, এটি আমার হক, তোমার নয়। অন্যজন বলে, ইহা আমার হক, তোমার নয়। তাদের ঝগড়া ছিল এই নিয়ে যে, ইহা আপনার হক, আমার নয়। দ্বিতীয় জন বলতেন, না তা আমার নয়, আপনার হক। সাহাবা ও আমাদের মাঝে এতটুকু পার্থক্য। তাঁরাও সম্পদশালী ছিলেন। আর আমরাও সম্পদশালী। পার্থক্য এতটুকু যে, তাদের

অন্তরে সমপাত্রের সাথে আল্লাহ তায়ালা এবং দীনের মহব্বতে কুরবান ছিল। আর আমাদের অন্তর তেমন নয়। কিন্তু এতটুকু যে, কমবেশি মহব্বত থাকবে এবং দীনের মহব্বত নষ্ট হবে না। এমন মহব্বতকে শরীয়ত নিষেধ করে না। অনুমতি প্রদান করে, সম্পদ জমা কর, ব্যয় কর, ভাল খাও ও পান কর, ভাল কাপড় পরিধান কর কোন অসুবিধা নেই।

দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেত

আমি প্রথমে যে আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেছিলাম, তার অন্তর্ভুক্তিতে এ কথা বলেছিলাম যে, এক প্রকার মতবাদ বা চিন্তাধারা তো এমন যে, দুনিয়া হলো রাস্তা মাত্র এবং তা খতম হয়ে যাবে। আর আমাদের কাজ হলো শুধু অতিক্রম করা। চাই চৌরাস্তা দিয়ে হোক, চাই ময়লাযুক্ত রাস্তা দিয়ে হোক, চাই ভিক্ষা করে অতিক্রম হোক– একভাবে আখেরাতে পৌঁছলেই হলো। এহেন কর্মের নাম বৈরাগ্য এবং দুনিয়ার কোন মূল্যই নেই। যদি এমন ধর্মের ভিত্তিতে পৃথিবী চলত তাহলে দুনিয়া বিরান হতে যেত এবং স্থানে স্থানে বিলীন হওয়ার আলামত দেখা যেত। পৃথিবী আবাদ হতো না।

তেমনিভাবে এমন মতবাদও সঠিক নয় যে, আখেরাত বলতে কিছু নেই। যা কিছু হয় শুধু দুনিয়াতেই হয়। অতএব হালাল ও হারামের তোয়াক্কা করো না। শুধু খাও আর উড়াও, আয়েশ কর এবং মজা উপভোগ কর। এমন চিন্তাধারাকে শরীয়ত নিষেধ করে। শরীয়ত ঘোষণা করে–

الدنيا مزرعة الاخرة

এই পৃথিবী আখেরাতের ক্ষেত।

যেমন বীজ বপণ করবেন, পরকালে তেমন ফসল উপার্জন করবেন। যদি সম্পদের বীজ পবিত্র ও বৈধ খাতে ব্যয় করেন, তাহলে পরকালে পবিত্র ফল এবং পবিত্র ফুল-ফল প্রকাশ হবে উৎপন্ন হবে। আর নাপাক ও হারাম স্থানে রোপন করলে, তাহলে বীজ নাপাক হলে পরকালে কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ মিলবে এবং যাক্কুম ইত্যাদি কপালে জুটবে, যা সহ্য করা কঠিন হবে। কারণ, যেগুলো আযাবের রূপ ধারণ করবে। মোটকথা, দুনিয়াকে শুধু রাস্তা বলেনি যে, ভাই! মুসাফিরদের মত জীবন যাপন কর। উপার্জন করার প্রয়োজন নেই, বিবাহ-শাদীর প্রয়োজন নেই। আবার আসল মাকসাদও বলা হয়নি। বরং চাষাবাদের ক্ষেত বলা হয়েছে, যাতে বীজ বপণ করা জরুরি।

কৃষকের দায়িত্ব

এ কথা সুস্পষ্ট যে, যখন কৃষক বীজ বপণ করবে, তখন কিছু না কিছু মেহনত অবশ্যই করতে হবে। রক্ত ও ঘাম একাকার করতে হবে। বীজও বপণ করতে হবে, পানির সেচও দিতে হবে। মোটামুটি মেহনতও করতে হবে। তাহলে সে ছয় মাসের খোরাকী উপার্জন করতে পারবে। তা থেকে পয়সাও অর্জন হবে।

সারকথা, দুনিয়াকে বলা হয়েছে ক্ষেত আর দুনিয়াবাসীকে বলা হয়েছে, তোমরা হলে কৃষক আর কৃষকের কাজ বসে থাকা নয়। অন্যথায় যখন অন্য কৃষকরা ফসল ঘরে তুলবে সে ঘরে বসে কাঁদবে এবং বলবে, হায়! যদি আমিও বীজ বপণ করতাম, তাহলে আমিও আজ ফসল উপার্জন করতাম। তখন শুধু আফসোস করতে থাকবে। সেজন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে, দুনিয়াতে থাক এবং কিছু কাজ করতে থাক।

আখেরাতের অবস্থান

এই দুনিয়া থেকে নিজের আখেরাত সৃষ্টি করুন। এজন্য এ কথা কল্পনা করা যাবে না যে, দুনিয়া এই পৃথিবী আর আখেরাত সপ্তম আকাশের উপরে রাখা রয়েছে। বরং আপনার আখেরাত দুনিয়া হতে বের হবে। তা বের করতে থাকেন। যে কর্ম করে যাচ্ছেন তা থেকেই আখেরাত বের হবে। অতএব প্রতি কাজে নিয়ত সহীহ হওয়া উচিত, ইত্তেবায়ে সুন্নাত হওয়া উচিত। এই দুনিয়া থেকে আখেরাত সৃষ্টি হবে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, মানুষ দস্তরখানে বসবে এবং বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করবে আর আলহামদুলিল্লাহ কাছিরান বলে শেষ করবে, তাহলে তার পিছনের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে। সুতরাং আহার করলেন আপনি, সাথে সাথে মাফ করে দেয়া হলো। তাহলে আহার থেকে আখেরাত বের হয়ে এল। যদি রুটি-আহার না করা হতো এবং সুন্নাত তরীকায় হামদ ও সানা দ্বারা শুরু ও শেষ করা না হতো, তাহলে এই গুনাহের ক্ষমার অঙ্গীকার কোথা থেকে হতো? অতএব রুটি ও আহার থেকে আপনার আখেরাত বের হলো। তেমনিভাবে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, সে যদি কোন ব্যক্তি আদর ও মহব্বত এবং স্নেহ করে কোন এতিমের মাথায় হাত রাখে, তাহলে যত সংখ্যক চুল তার হাতের নিচে পড়বে, তত নেকী তার আমালনামায় লিখে দেয়া হবে। বাহ্যত দেখা যায়, এতিমের মাথায় হাত রাখা একটি জাগতিক কর্ম। কিন্তু নিয়তের কারণে নেকী বৃদ্ধির মাধ্যম হয়ে গেল। যদি এতিমের মাথায় হাত রাখা না হতো অথবা এ কর্মকে দীন মনে করা না হতো, তাহলে

চুলপরিমাণ নেকী কোথা হতে আসত? সুতরাং এতিমের মাথা হতে আপনার আখেরাত বের হলো এবং আপনার হাত থেকে আখেরাত বের হলো। অন্য এক হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, যদি কোন সদকা করে এবং জোড়া বানিয়ে সদকা করে অর্থাৎ যদি পয়সা দেন, তাহলে একটা নয় বরং দুটি দেন। টাকা দিলেও একটি নয় দুটি দেন। কাপড় দিলেও একটা নয় বরং জোড়া দেন।

> যে ব্যক্তি প্রতিটি জিনিসে জোড়া জোড়া সদকা দিল তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা হতে সবগুলো তার জন্য উন্মুক্ত, তা মন যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চায় প্রবেশ করুক।

অতএব দুনিয়াতে জোড়া বস্তু সদকা করার দ্বারাই আখেরাত পেল। তাহলে আখেরাত আপনার কর্ম থেকে বের হলো। আখেরাত তো কোথায়ও পৃথক করে রাখা হয়নি। মোটকথা, দুনিয়া হলো আখেরাতে উপার্জন মাধ্যম। আর দুনিয়া থেকেই আপনার আখেরাত বের হবে।

ব্যবসার মাঝে আখেরাত লুকায়িত

যদি ব্যবসা করেন, নিয়ত পরিষ্কার রাখবেন, এই ব্যবসা আপনার আখেরাতের মাধ্যম হবে। হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

التاجر الصدوق الامين مع السفرة الكرام البررة

> একজন সত্যবাদী ব্যবসায়ী যিনি আমানতদার হলো তার হাশর নবীদের সঙ্গে হবে, জান্নাতেও তাদের সঙ্গে যাবে।

কতই বড় ফযিলতপূর্ণ কাজ! যদি দিয়ানতের সাথে ব্যবসা না করত, তাহলে এমন ফযিলত সে কিভাবে পেত?

তেমনিভাবে হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

غَفَرَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا

> আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে ক্ষমা এবং অনুগ্রহ করেন, যে দয়া ও সহানুভূতির সাথে ক্রয় করে এবং একইভাবে বিক্রি করে।

বিক্রি করার সময় তার জযবা এমন যে, আমার গ্রাহকের যাতে ক্ষতি না হয়। গ্রাহক ক্রয় করার সময় এমন জযবা নিয়ে ক্রয় করছে যে, আমার ব্যবসায়ীর যাতে লোকসান না হয়। উভয়ের অন্তরে নেক জযবা। তাই উভয়ের জন্য নেক দুআ যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন যে, রহম দিলে বিক্রয় করছেন এবং তাকেও ক্ষমা করেন, যে রহম দিলে ক্রয় করছেন।

অতএব যদি এই ব্যবসা না হতো, তাহলে আখেরাতের ওয়াদা আপনার জন্য কোথা থেকে পূরণ হতো? ব্যবসা থেকে আখেরাত বের হলো। এমনটি ভাবা উচিত নয় যে, আখেরাত হয়তো আরশের নিচে লুকানো রয়েছে আর দুনিয়া এখানে উপস্থিত। বরং এই দুনিয়াতেই আখেরাত লুকিয়ে আছে। বের করা আপনার দায়িত্ব। যেমনভাবে জমিনের ভিতর ফল-ফুল লুকিয়ে আছে, বের করা কৃষকের কাজ, সে বীজ বপণ করতে থাকতে, পানির সেচ দিতে থাকবে, আর ফল ফসল উৎপন্ন করতে থাকবে। আর যদি কৃষক মনে করে যে, এইতো জমিন। আর ফলের জগৎ তো আকাশে রয়েছে, ওখান থেকে ফল বর্ষণ হবে, তাহলে কখনও তার ফল মিলবে না। ফল পেতে হলে এই জমিনে মেহনত করতে হবে। সুতরাং মানুষকে দুনিয়াতে এজন্য পাঠানো হয়নি যে, সে দুনিয়াকে পরিহার করে চলবে, পিঠ দিয়ে চলবে বরং দুনিয়া দ্বারা আখেরাতের কাজ করবে। প্রতিটি জিনিস কাজে লাগাবে, হায়াতকে কাজে লাগাবে, মৃত্যুকে কাজে লাগাবে।

মৃত্যুর মাঝে আখেরাত লুকায়িত

যখন মানুষের কোন প্রিয়ভাজন দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যায়, তখন তবিয়তগতভাবে মানুষের কষ্ট ও ব্যথা অনুভব হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান সে, যে ওই কষ্টে থেকে নিজের জন্য কোন প্রতিদান বের করে নেয়। আর তা এভাবে যে, না কোন হাহুতাশ করবে, না বর্ণনা করে করে কাঁদবে। আবার একেবারে পাথরও বনে যাবে না যে, চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হবে না। মন ঠিক রেখে যতটুকু স্বভাবগত চিন্তিত-দুঃখিত হওয়া প্রয়োজন এতটুকু হবে। আর উপদেশ গ্রহণ করবে, আজ সে চলে যাচ্ছে, আগামীতে আমারও যাওয়া লাগবে। তার মৃত্যুকে নিজের মৃত্যু স্মরণিকা বানাবে। তাহলে তার মৃত্যু দীনের উন্নতির মাধ্যম হবে, যদি সে না মরত তাহলে তার ওই প্রতিদান কিভাবে অর্জন হতো?

হাদিস শরীফে এসেছে, একজন বৃদ্ধার জোয়ান ছেলে মারা গেল। মহিলা মাতম করছিল। সে হায় হায় বলে বলে মাথার চুল টানছিল। তার পাশ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, "হে বৃদ্ধ মহিলা! সবুর কর।" মহিলার জানা ছিল না, তিনি আল্লাহর রাসূল। মহিলা বলল, হ্যাঁ, তুমি তো এ কথা বলে দিলে যে সবুর কর। যদি তোমার ঘরে এমন মসিবত বিপদ আসত, তাহলে বুঝতে পারতে সবর কাকে বলে। তুমি আমাকে সবর করতে এসেছে? আমি সবর করতে পারব না।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে তুমি বুঝ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট থেকে চলে এলেন। পরদিন সে জানতে পারল, তিনি তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। তখন তার দরবারে উপস্থিত হলো এবং আবেদন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার খবর ছিল না যে, আপনি আমার নিকট গিয়েছিলেন এবং সবর করার উপদেশ দিচ্ছিলেন। আমি একন সবর করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন– "যখন দুঃখ এসেছিল, তখন সবর করলে প্রতিদান মিলত।"

চার বছর পর এমনিতেই সবর এসে যায়। কোন মানুষ তো আর সারা জীবন কাঁদে না। অতএব এটি অপারগতার সবর। আর দুঃখ ও ব্যথার সময় সবুর করলে তা হতো ইচ্ছাকৃত। আর সবর নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই প্রতিদান পাওয়ার কারণ হয়। অপারগতা ও অনিচ্ছাকৃত বস্তুর উপর কোন প্রকার প্রতিদান জুটে না। যে জিনিসে ইচ্ছা ও ইখতিয়ার ব্যয় করা হয় এবং তবিয়তের বিপরীত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয়, তাতেই প্রতিদান সংযুক্ত হয়।

সারকথা, মউতকেও আখেরাত স্মরণের মাধ্যম বানান হয়েছে। যেমনভাবে জীবনকে আখেরাত স্মরণের মাধ্যম বানানো হয়েছে।

অন্যের নেক কর্ম উন্নতির মাধ্যম

উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, কারো ভাল কর্ম দেখলে লোভ কর আর মন্দ কর্ম দেখলে লোভ কর না। উদাহরণস্বরূপ আপনি কাউকে দেখলেন, অনেক নফল নামাজ পড়ছে, তখন আপনার অন্তরে নামাজের লোভ জাগল। আপনি দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আমাকেও এত নফল পড়ার তাওফীক দাও আর আপনার তাওফীক হয়ে গেল; তাহলে ওই ব্যক্তির নফল আপনার নফলের মাধ্যম ও উসিলা হলো। অতএব মানুষের নেক কর্মও আমাদের উন্নতির কারণ এবং মানুষের মৃত্যুও উন্নতির মাধ্যম হয়।

অন্যের মন্দ কর্ম উপদেশ গ্রহণের মাধ্যম

আর যদি অপরের মন্দ কর্ম দেখে আপনি তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তা থেকে বেঁচে থাকেন, তাহলে তো মানুষের পাপ কর্মও আমাদের উন্নতির মাধ্যম হলো। এক কথায় দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুতে উপদেশ, নসিহত, ওয়াজ ও ইবরত রয়েছে। মানুষকে এজন্য পাঠানো হয়নি যে, তারা দুনিয়াকে ধ্বংস করে নিঃশেষ করে দেবে। বরং পাঠানো হয়েছে, যাতে তারা জগতের প্রতটি বস্তু হতে ইবরাত

অর্জন করে। প্রতিটি বস্তু থেকে যেন নাসিহত হাসিল করে। প্রত্যেক বস্তু হতে নিজের আখেরাত বানাবে এবং নিজের আখেরাতকে স্মরণ করবে। আর তা তখনই সম্ভব, যখন দুনিয়া সজ্জিত থাকে। দুনিয়াকে দেখে দেখে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব।

আলেমদের সম্মান

হযরতদের সম্মানে এই কয়েকটি বাক্য আরজ করলাম। সময় স্বল্প ছিল, হিম্মতও কম ছিল, যথেষ্ট দুর্বলতাও ছিল। ব্যস্ততাও ছিল। আবার আজ সফরের শেষ রাতও। সেজন্য ইচ্ছা করেছি, যেহেতু ঘোষণা হয়েছে; তাই কিছু না কিছু বলতেই হবে। ঘোষণার সম্মান করতে হয়। আবার উলামা হযরত একত্র হয়েছেন, তাঁদের সম্মানে এই কয়েকটি বাক্য পেশ করলাম। আল্লাহ তায়ালা এতে বরকত দিন। আমাদেরকে ইলম ও আমলের তাওফীক দিন। আমাদের দুনিয়া দুরস্ত করেছেন এবং আখেরাতও দুরস্ত করে দিন। আমাদেরকে ইনসাফের উপর কায়েম রাখুন। বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন হতে হেফাজত করুন।

বয়ান : ১৪

ক্ষুদ্র জগৎ

ইনসান এমন একটি সম্পূরক হাকিকত যে, সকল হাকিকত ও সুরত তাতে জমা রয়েছে। ইলাহিয়্যাত ও মাখলুকিয়্যাত (সৃষ্টি) একীভূত হয়েছে। এর সকল নমুনা তাতে বিদ্যমান। প্রত্যেক মানুষ একেকটি জগত, যাতে যুলমত (তমসাচ্ছন্নতা), নূরানি (উজ্জ্বলতা), শয়তানি ও রাহমানি (মন্দ ও ভাল), মাদ্দি (বাহ্যিক) ও রূহানি সকল নমুনা বিদ্যমান আছে।

সকল আসমান প্রাণের তত্ত্বাবধানে চলে। দুনিয়ার আসমানকে হুকুম করে, রূহের দেখানো পথে উন্নতি ও অবনতি আছে, তার পাহাড়ে উচ্চতা ও খোলা প্রান্তর রয়েছে। কেমন যেন মানুষ তার সত্যায়নকারী।

'আমি হলাম ওই ক্ষুদ্র জগত আমিই তার তত্ত্বাবধায়ক।'

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ•

জগতের প্রকার ও তার অংশসমূহ

বুযুর্গানে মুহতারাম!

মানুষ ক্ষুদ্র জগৎ। বৃহৎ জগতের তামাম নমুনা এতে বিদ্যমান। সুতরাং চিন্তা-গবেষণা করলে দেখা যাবে বিশ্ব জগৎ দু'ভাগে বিভক্ত– ১. আলমে শাহেদ বা বাহ্যিক জগৎ, ২. আলমে গায়েব বা অদৃশ্য জগত। আলমে শাহেদ বলতে বুঝায় দেহের সমষ্টি, যা চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় এবং অনুভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, সাগর, পাহাড়, জমিন, আসমান ইত্যাদি। ইনসানের মধ্যে আমলে শাহেদ হলো তার দেহ, যাতে গোস্ত, চর্বি, হাড়, চামড়া ইত্যাদি এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অতঃপর পৃথিবীর আলমে শাহেদের যেমনভাবে দুটি অংশ রয়েছে– একটি ভূমণ্ডল যেমন জমিন ও তার শ্যামলতা, সাগর ও পাহাড় ইত্যাদি। অপরটি নভোমণ্ডল যেমন আকাশ, চাঁদ, সুরুজ ইত্যাদি। তেমনিভাবে মানুষের মধ্যে তার উপর অংশ যাতে কালব অন্তর ও দেমাগ রয়েছে

আর নিম্নাংশ যাতে বিভিন্ন অনুভবযোগ্য কর্ম ও নড়াচড়া করার শক্তি গোপন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ হাত-পা পেট ইত্যাদি।

ধাতুচতুষ্টয়ের কার্যকারিতায় পরিপূর্ণ সাদৃশ্য

যেমনভাবে পৃথিবীর ভিত্তি চারটি ধাতুর উপর যথা আগুন, বাতাস, পনি ও মাটি, তেমনিভাবে হুবহু মানুষের মধ্যে ওই চারটি ধাতু ও মাদ্দার নিদর্শন রয়েছে। তাদের মধ্যে হারারাত (উষ্ণতা), বারূদত (শীতলতা), পোস্ত (চামড়া) এবং রাতুবাত তথা তরলতার কার্যকারিতা রয়েছে। অতঃপর নিম্নাংশের মধ্যে চার ধাতুর কার্যকারিতার যে রং ও ঢং রয়েছে, তা হুবহু মানবজগতের নিম্নাংশে রয়েছে।

মাটির সর্বপ্রকার সিফাত মানুষের মাঝে বিদ্যমান

উদাহরণস্বরূপ, জমিন একটি মাটির স্তূপ। তেমনি মানুষের সম্পূর্ণ দেহ একটি মাটির সৃষ্টি। তারপর জমিন যেমন সমতল নয় বরং তাতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এবং গভীরতা সর্বকিছু রয়েছে, তেমনি মানুষের দেহেও সেগুলো রয়েছে। তেমনি জমিন খনন করলে যেমনভাবে অনবরত পানি প্রবাহিত হতে থাকে, তেমনি মানুষের দেহ ফেটে গেলে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। অতঃপর জমিন যেমন বিভিন্ন রঙের হয় সাদা কালো লাল হলুদ ইত্যাদি, তেমনি মানবদেহে মাটির বিভিন্ন রং বিদ্যমান। বাহ্যিক বা উপরের অংশ সাদা, ভিতরের অংশ যেমন বগলের নিচ ও রানের ফাঁকা অংশ কাল। চেহারায় লালচে ভাব থাকে। হাড়ের জোড়ার চামড়ায় সাধারণত হলুদভাব প্রকাশ পায়, তেমনি সর্বপ্রকার মানুষের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সব রঙের মানুষ রয়েছে। পশ্চিমারা সাধারণত সাদা, প্রাচ্যদেশী এবং আফ্রিকানরা কাল, ভারতবাসীরা সাধারণত শ্যামলা, চায়নারা হলুদ, আর আরবগণ লাল রঙের হয়। অতঃপর জমিনের কিছু কিছু অংশ যেমন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয় যেমন ব্যায়ামের স্থান, খেলার মাঠ এবং কিছু অংশ থাকে পচা, যার মধ্যে ময়লা পড়ে, তেমনিভাবে মানুষের লাবণ্যময় ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অংশ হলো মুখ ও এবং হাত যাকে ইজ্জতের সাথে চুমু দেয়া হয়। আর পচা-গান্ধা অংশ হলো বগলের নিচের অংশ বা নাপাক অংশ।

মোটকথা, মাটি ও তার বিশেষ গুণাগুণ ও অবস্থা সবই মানুষের মাঝে বিদ্যমান।

আগুনের সর্বপ্রকার গুণ

যেমনভাবে সারা পৃথিবীতে আগুন ও বিদ্যুতের স্রোত দৌড়াচ্ছে, তেমনিভাবে মানবদেহে হারারাত এবং আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আর এই মজ্জাগত ও স্বভাবজাত উষ্ণতার উপর মানুষের জীবন দাঁড়িয়ে আছে। মাটি এবং পাথর ও লোহাকে পরস্পর ঘর্ষণ করা দ্বারা আগুন সৃষ্টি হয়। তেমনি মানবদেহের রান বা হাত পরস্পর ঘর্ষণ করলে হারারাত সৃষ্টি হয়। অতঃপর আগুন যেমন উপকার গ্রহণ করে থাকে পৃথিবীর উপরাংশ অর্থাৎ সূর্য থেকে অর্থাৎ সূর্য না হলে পাথর ধুলো হয়ে উড়ে যেত, তেমনিভাবে মানবদেহ হারারাত ফয়েযপ্রাপ্ত হয় তার উপরাংশ কাল্‌ব ও দেমাগ থেকে। কালবই মজ্জাগত হারারাত তৈয়ার করে থাকে। যদি কালব এই হারারাত না পাঠায়, তাহলে দেহ ঝরে পড়বে আর কাল্‌ব না থাকলে সারাদেহ মুর্দা হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে।

পানির সর্বপ্রকার গুণ

পানি যেমনভাবে জমিনের কোণে কোণে বসে আছে। তেমনি মানবদেহে রাতুবাত বা পানির আদ্রতা রক্তের অবয়বে মিশে আছে। অতঃপর পৃথিবীর বুকে যেমনভাবে ঝরনা প্রবহমান রয়েছে, কোথাও বড় নদী, কোথাও ছোট নদী আছে, তেমনি মানবদেহের ছোট ও বড় রগ বা শিরা নদীর মত। অতঃপর যেমনভাবে জমিনে নদীনালা ও পানির টিলা তথা পুকুর রয়েছে, তেমনি মানবদেহে রাতুবাতের পানি থাকে। অতঃপর যেমনভাবে জমিনে মিষ্ট, লবণাক্ত ও খনিজ বনের বিভিন্ন প্রকার ঝরনা রয়েছে, তেমনি মানবশরীরের মুখ থেকে মিষ্টি পানি এবং চক্ষু থেকে লবণাক্ত ঝরনা প্রবাহিত। পিত্ত থেকে তিক্ত এবং পাকস্থলী থেকে টক পানি প্রবাহিত হয়। অতঃপর যেমনভাবে পৃথিবীতে উষ্ণতা ও আদ্রতার প্রভাবে বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে কোথাও প্রবহমান সাগর রয়েছে, কোথাও বরফওয়ালা পানি রয়েছে, যেমন উত্তর বরফ সাগর, তেমনি মানবদেহের কফ ইত্যাদি জমাট পানির ঝরনা, তেমনি কোথাও পচা-গান্ধা পানি থাকে, তেমনি মানুষের মধ্যে পেশাব ও শ্লেষ্মা হলো গান্ধা পানি, যা পচা-গান্ধা নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়। তেমনি পৃথিবীর কোথাও ঠাণ্ডা পানির ঝরনা এবং কোথাও গরমের জোর রয়েছে। তদ্রূপ মানবদেহে ঠাণ্ডা পানির ঝরনা জারি আছে। জিহ্বা হলো ঠাণ্ডা পানির ঝরনা এবং পেশাব হলো গরম পানির ঝরনা। অতঃপর পৃথিবীতে মাজমাউল বাহরাইন বা দুই সাগরের সঙ্গমস্থল নামক একটি স্থান রয়েছে, যার একাংশে মিষ্টি পানি আর অপরাংশে লবণাক্ত পানি। তেমনি

মানব দেমাগ বা মস্তিষ্কের সম্মিলিত অনুভূতির মধ্যে আস্বাদন শক্তির মিষ্ট ঝরনা রয়েছে এবং দৃষ্টিশক্তির লবণাক্ত ঝরনা রয়েছে। তেমনি যেমনভাবে দুনিয়াতে বর্ষাকাল হয়, বৃষ্টি ও পানি প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ মানবদেহ থেকে ঘাম প্রবাহিত হয় অতঃপর যেমনভাবে ভূমি থেকে সানমুন (যে বাতাস দ্বারা আকাশে পানি ওঠে মেঘ হয়)। হয় ভূমির উপর পানি বর্ষণ করে, ঠিক তেমনি মানবদেহ হতে ঘাম তৈরি হয়ে দেহে বর্ষিত হয়। মোটকথা, পানির সকল প্রকার ভেদ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান।

বাতাসের সকল প্রকার ভেদ

পৃথিবীর সকল খোলা ও খালি স্থান যেমনভাবে বাতাসে ভরপুর, তেমনিভাবে মানবদেহের প্রতিটি খালি স্থান বাতাসে পরিপূর্ণ। অতঃপর জমিনে যেভাবে বাতাস চলে, তেমনি মানবদেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে তা ঠাণ্ডা হয় আর যে বাতাস ভিতর হে বের হয় তা গরম হয়। আর বাতাস যেমনভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তেমনিভাবে মানুষের ভিতর হতে ঢেকুর আসে, যা সুগন্ধময় ও পরিষ্কার হয় এবং পায়ুপথে বাতাস বের হয়, যা দুর্গন্ধযুক্ত হয়। তেমনি জমিনে বাতাস বন্ধ ও কমে যাওয়ার কারণে যেমনভাবে মানুষ পেরেশান ও ঘাবড়ে যায়, তেমনি মানুষের দেহের বাতাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে তাদের অবস্থাও তাই হয়। জমিনের খোলা স্থান থেকে বাতাস উঠিয়ে নিলে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, তেমনি মানবদেহ থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস উঠিয়ে নিলে দেহাঞ্চলও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

সারকথা, বাতাসের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য মানুষের মাঝে রয়েছে।

সকল প্রকার জড় পদার্থ

পাহাড়কে জামাদাত তথা জড় পদার্থের হাড্ডি মনে করা হয়। মানুষের মধ্যে পাহাড়ের ন্যায় কেউ বড় কেউ ছোট। পাহাড়গুলোতে যেভাবে মাটি জমে তেমনিভাবে মানবদেহাঞ্চলে গোস্ত জমে। তারপর পাহাড়ের কিছু কিছু স্থান উষ্ণ থাকে, কিছু স্থান শীতল থাকে। তেমনি দেহের আবৃত বা ভিতরাংশ গরম থাকে এবং উপরের বা বহিরাংশ যা দেখা যায় তা ঠাণ্ডা থাকে। অতঃপর কয়েকটি সম্মানিত পাহাড় যিয়ারত করতে হয়। আর কয়েকটি অপছন্দ করা হয়। তেমনি মানবদেহের চেহারাকে আদবের সাথে চুমু দেয়া হয়, দেখা হয় আর কিছু অংশকে দেখা শরয়ী ও আকলীভাবে লজ্জা ও উলঙ্গ মনে করা হয়। তেমনি

জমিনের কিছু দেখার শক্তি আছে কিন্তু দেখা দোষ জ্ঞান করা হয়। তেমনি মানবদেহের কিছু অংশ যেমন পেট ইত্যাদি দেখা বোকামির কাজ। অতঃপর পাহাড়ে যেমনভাবে তৃণলতা উৎপন্ন হয়, তেমনি মানবদেহে চুল-পশম গজায়। যেমনভাবে জমিনের কোথাও ঘন জঙ্গল ও ঝোপঝাড় থাকে, তেমনি মানবদেহের চেহারা ও মাথায় ঘন চুল হয় এবং অন্যান্য স্থানে ছিদ্র রয়েছে, যেমনভাবে জমিনে কিছু তৃণলতা সমান থাকে, এক সাথে বাড়ে, একসঙ্গে বৃদ্ধি পায়। কতক এক অবস্থায় থাকে। তেমনি মানবদেহের কিছু অঙ্গ এক সাথে বড় হয়। আর দেহের চামড়া এক রকম থাকে। জমিনের কিছু স্থান ঝোপঝাড় পরিষ্কার না করলে তার সৌন্দর্য বাড়ে না। তেমনি মানবদেহের বগলের চুল এবং নারীর যৌনাঙ্গের লোম। অতঃপর জমিনের কিছু অংশ স্বঅবস্থায় বহাল থাকলে তার সৌন্দর্য ডাবল হয়। আর কিছু অংশ কাটছাটের দ্বারা ডাবল সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে মানবদেহে চেহারার দাড়ি রাখলে ডাবল সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আর দাড়ির সংশোধন ও পরিপাটি এবং গোঁফ কাটা ও ছাটার দ্বারা চেহারার সৌন্দর্য ঠিক থাকে।

সকল প্রকার প্রাণীজগত

যেমনভাবে জমিনে বিভিন্ন জাতের প্রাণীদের বসবাস রয়েছে, তেমনি মানবজগতে, মাথায় উকুন, পেটে কৃমি, পাকস্থলিতে লাল কৃমি রয়েছে। এগুলো দেহের রক্ত চুষে বড় হয়। আর যেমনভাবে জমিনের গভীরে ও ভিতরে বিভিন্ন রঙের পোকামাকড় ও সাপ-বিচ্ছু রয়েছে, তেমনি মানবদেহে বিভিন্ন রঙের জীবাণু রয়েছে, যা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়। অতঃপর যেভাবে পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের প্রাণী বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে, তেমনি মানবদেহের প্রতিটি অঞ্চলে নতুন নতুন আকৃতির ও অবয়বের জীবাণু রয়েছে। তারপর তেমনভাবে জমিনের প্রাণীজগত জমিন থেকে জন্ম নিয়ে তাতে দাফন হয়ে যায়, তেমনি জীবাণু দেহে জন্ম নেয় এবং দেহে, মনে এবং জমিনে দাফন হয়।

ভূমিকম্পের প্রভাব-আলামত

ভূমিকম্পের ফলে যেমনভাবে সমগ্র পৃথিবী কেঁপে উঠে, তেমনি দেহে ভয় আসার কারণে সারাদেহ হঠাৎ কেঁপে ওঠে, নড়ে ওঠে। অতঃপর যেমনভাবে আগ্নেয়গিরি ফেটে লাভা বের হওয়াকে ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে ধরা হয়, তেমনিভাবে

ভিতরগত উষ্ণতা, ক্রোধ বা পেরেশানি কারণে মানুষের সারাদেহ ভয় ছড়িয়ে পড়ে ও কেঁপে ওঠে।

অতঃপর যেমনভাবে ধাতুর প্রবলতার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অস্বাভাবিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; উদাহরণস্বরূপ দুর্ভিক্ষ, তমসাচ্ছন্নতা, অগ্নিবৃষ্টি বা অতিরিক্ত গরম ইত্যাদির রকমের জলবায়ুর প্রভাব পড়ে। তেমনিভাবে মানবদেহাঞ্চলে তবিয়ত বিপরীত প্রভাব পড়ে; যেমন জ্বর, কফ, সারসাম (যে কারণে মাথা ফুলে যায়) এবং চুলকানি ও খুঁজলি দেখা দেয়।

বুদ্ধি ও সূক্ষ্মতার প্রভাব

যেমনিভাবে আকল-বুদ্ধি ও হিকমতের স্বল্পতা এবং দৈহিক যৌনতা বৃদ্ধির কারণে মানুষ মানুষের শত্রু হয়, তেমনিভাবে কখনো বুহরানি রোগ তথা কঠিন পীড়া সৃষ্টি হয়, ফলে মানুষ নিজের দেহ নিজেই আঁচড়ায়, গোস্ত উপড়ে ফেলে। অতঃপর যেমনভাবে বাদশাহ রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং মন্ত্রী, সৈনিকরা তার সাহায্যকারী হয়, তেমনি দেহজগতের বাদশাহ হলো কাল্‌ব বা অন্তর। মস্তিষ্ক ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় তার মন্ত্রীপরিষদ ও পরামর্শদাতা। পাকস্থলী তার ধনভান্ডার, হাড় ও পা তার সৈনিক ও পাহারাদার। আর যেমনভাবে নভোমণ্ডলে চন্দ্র ও সূর্য আলোকিত ও আলো দেয়, তেমনি দেহরাজ্যের মাথায় (নভোমণ্ডলে) আলোকিত ও আলো প্রদানকারী দুটি চক্ষ রয়েছে। অতঃপর যেমনভাবে তারকারাজি রাস্তা প্রদর্শন করে, তেমনি দেহের দেমাগে চিন্তা-ফিকিরের ফলাফল এবং চিন্তাধারা রয়েছে, যা দ্বারা মানুষ কাজের পথ খুঁজে পায়।

তারকারাজির প্রভাব আলামত

তারকারাজি যেভাবে মাদ্দি (প্রাকৃতিক) প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তেমনিভাবে মানব-মস্তিস্ক চিন্তা, ফিকির ও আনন্দ-খুশি সৃষ্টি করে। আসমানের উপর অদৃশ্যভাবে জান্নাত রয়েছে, যাতে নিরানন্দ ও অস্থিরতার কোন চিহ্ন নেই। তেমনি হুবহু মানুষের মধ্যে আনন্দ ও খুশির চিহ্ন, প্রফুল্লতা ও প্রশান্তি জান্নাতের মত, যাতে নিমজ্জিত হয়ে মানবাত্মা দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তা থেকে বেখবর হয়ে পড়ে। তারপর অদৃশ্যে যেমনভাবে জাহান্নাম রয়েছে, যেখানে চিন্তা দুঃখ-কষ্ট ও উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ ব্যতীত আনন্দ ও খুশির কোন চিহ্ন নেই, তেমনি মানব অন্তরে, মসিবত ও দুশ্চিন্তা আলামত এবং সন্ত্রস্ততা ইত্যাদি জাহান্নামের মত। আর আসমানের সর্ব উপরে যেমনভাবে সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ আরশে

আযমি রয়েছে, যেখানে আল্লাহু সুবহানাহু তাজাল্লির কোন প্রকার পর্দা ব্যতীত একচ্ছত্র রাজত্ব, তেমনি দেহজগতের সর্বোচ্চ ও সর্বসেরা বস্তু হলো মানুষের সূক্ষ্ম কালব, যা আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লির স্থান, যার মধ্যে কোন মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর সূক্ষ্ম রহস্য সরাসরি উদ্ভাবিত ও প্রকাশিত হয়।

ফেরেশতা ও শয়তানি প্রভাব

আসমানে যেমনভাবে ফেরেশতাকুল অদৃশ্য খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন, যাদের অবাধ্যতার কোন নিদর্শন নেই, এমনই মস্তিষ্কে পঞ্চইন্দ্রিয় ফেরেশতাদের মত খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকে। আসমানের নিচে অদৃশ্য জগতে পথভ্রষ্ট শয়তানদল যেমনভাবে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে না, তেমনিভাবে মানব-মস্তিষ্কের নিচে জালেম আত্মা রয়েছে, যা কালবের ইঙ্গিতে চলে না, অবাধ্যতা করে এবং ধ্বংসাত্মক স্বাদ উপভোগে নিমজ্জিত হয়ে সমস্ত দেহ জগতকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

আলমে গায়েব তথা অদৃশ্য জগতের সঙ্গে সদৃশ্য

দ্বিতীয় জগত হলো, আলমে গায়েব তথা অদৃশ্য জগত, যা জড় পদার্থ হতে পবিত্র ও মুক্ত। শুধু অন্তরচক্ষু দ্বারা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ হক তায়ালার জাত ও সিফাত (গুণাবলি), ফেরেশতা এবং অদৃশ্য রহস্যের জগৎ ইত্যাদি। মানুষের আলমে গায়েব হলো তার রূহ বা আত্মা, যা ইলমের উৎসস্থল। আর লতিফায়ে রূহ (সূক্ষ্ম রূহ), মানুবীয়্যাত (অভ্যন্তরীণ) ও রূহানিয়াত এবং ইলাহিয়্যাতের কেন্দ্র। কেমন যেন এই রূহের ভিতর বাতেনী কামালাতের নমুনা বিদ্যমান, যা তাতে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। যেমনভাবে বরকতপূর্ণ ব্যবস্থাপক সত্তা ও হাকীম আপন হেকমত ও কুদরতের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব শামলে রেখেছেন। তিনি যদি সামান্য মুহূর্তের জন্য মনোযোগ সরিয়ে নেন, তাহলে সারাবিশ্ব চূর্ণবিচূর্ণ ও ধ্বংস হয়ে যাবে, তেমনিভাবে মানবাত্মা দেহজগতকে থামিয়ে রেখেছে। যদি সামান্য সময় নিজের রূহকে দেহ থেকে ফিরে নেয়, তাহলে সমগ্র দেহদেশ পচে গলে যাবে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যেমনভাবে বিভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন জগৎসমূহের একক ব্যবস্থাপক তাঁর কোন অংশীদার নেই, তেমনিভাবে রূহও মানবদেহের একক ব্যবস্থাপক, যার কোন শরিক নেই। অতঃপর যেমনভাবে আল্লাহ তায়ালা একক বিশ্বস্ত ও আবশ্যকীয় পরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতি থেকে অদৃশ্যে

থাকেন এবং তাদের অনুভূতির সক্ষমতার বাইরে থাকেন, মানুষের রূহও তেমন। অতঃপর যেমনভাবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ বিশাল জগতের প্রতিটি কণায় কণায় ছড়িয়ে আছেন এবং প্রত্যকটি বস্তুতে তার জ্যোতি থাকা সত্ত্বেও কেউ ইশারা করে বলতে পারে না, তিনি এখানে আছেন বা ওইখানে আছেন, তেমনি মানবরূহ, তাদের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও কেউ বলতে পারে না রূহ কোন্ কোণে রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক যেমন আরশের সঙ্গে রয়েছে, তেমন জমিনের সঙ্গে নেই এবং বাইতুল্লাহর সঙ্গে যেমন আছে তেমন অন্য জগতের সঙ্গে নেই। সুতরাং পবিত্র ভূমির উপর আঘাত হলে সারা পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাবে। তেমনিভাবে মানবরূহের সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক কালবের সঙ্গে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যেমনভাবে নিকটতম ফেরেশতাদের আদেশ করেন আর তারা নবীদের নিকট আল্লাহর ওহী নিয়ে আগমন করেন, তেমনিভাবে মানবাত্মার সিফাত, সততা ও হেদায়েত। অতঃপর যেমনভাবে প্রত্যেক বোধশক্তি এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তি হলো তার ফেরেশতাকূল, যাদের শক্তি দেমাগে গোপন রয়েছে। আর যে অঙ্গসমূহের মাধ্যমে শক্তিগুলো প্রকাশ্যমান হবে ওই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি স্থান আম্বিয়াদের স্থলে অতঃপর যেমনভাবে আল্লাহ তায়ালার গুণাগুণ সিফাত ও কামালাত কোন না কোন বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে প্রত্যেক নবীর আ.-এর উপর তাজাল্লি হয়, তেমনিভাবে রূহ কোন না কোন সিফাতের সঙ্গে তার সদস্যদের উপর প্রকাশ হয় এবং প্রতিটি অঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, নাক ইত্যাদি তার বোধশক্তি ও অনুভূতিশক্তির প্রকাশস্থল।

আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশি সম্পূরক তাজাল্লি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পড়েছে, তাঁর মধ্যে পূর্ববর্তী এবং পর্ববর্তী তামাম উলূম ও কামালাত পূর্ণতার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, তেমনিভাবে রূহের সবচেয়ে বেশি তাজাল্লি পড়েছে কালবের উপর। আর কাল্ব হলো উলূম জমা হওয়ার স্থান। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুভূতিশক্তি ফয়েয বা ফায়দা লাভ করে কাল্ব থেকে।

অতঃপর যেমনভাবে এটি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আকিদা যে, অন্যান্য আম্বিয়া আ.দের নবুওয়াত ও মারেফাত হযরত খাতিমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত ও মারেফাত থেকে ফায়দা লাভ করেছে এবং তার অধীন ও জড়িত ছিল, তেমনিভাবে এই অনুভূতিসম্পন্ন অঙ্গগুলোর ইলম কালবের ইলমি শক্তি থেকে ফায়দা লাভ করে এবং তার অধীনে থাকে। আর কাল্ব সত্তাগতভাবে বোধশক্তিসম্পন্ন। এজন্য চোখ-কান বন্ধ করে কাল্ব একাই চিন্তা-

গবেষণা করে এবং সমগ্র কায়েনাতের নকশাকে খেয়াল জগতে দেখতে পারে। সে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মুহতাজ নয়।

আর যেমনভাবে খাতিমুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবীদের হাকীম এবং সকল ধর্মের রহিতকারী, তেমনি কাল্‌ব ও সকল নেতৃত্বদানকারী অঙ্গগুলোর উপর হাকীম এবং সেগুলোর ইলমি পুঁজির উপর নিরীক্ষক এবং ব্যয় নির্বাহকারী যে, চোখ সঠিক দেখে না এবং কান সঠিক শ্রবণ করে না। আর সেগুলোর কালবের ইলমের উপর ইখতিয়ার নেই। অতঃপর কামালাতে খোদাওয়ান্দি যেমনভাবে সর্বপ্রথম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় সত্তায় নাযিল হয়েছে, তেমনিভাবে রূহের ফায়যান (বিশাল দান) ও সর্বপ্রথম কালবের উপর হয়েছে। এমনকি হায়াত ও জীবনও সর্বপ্রথম কালবের উপর নাযিল হয়েছে। অতঃপর যেমনভাবে হযরত আম্বিয়া আ.গণ মানুষকে হেদায়েতের পথ দেখিয়ে আমলের জন্য জোর ও অপারগ করেন না বরং আমলের যোগ্যতা সৃষ্টি করে, আমল করা মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিত, এমনিভাবে মানুষের রূহ বস্তুর সৌন্দর্য ও মন্দ প্রদর্শন করে, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমলের যোগ্যতার শক্তি সৃষ্টি করে, আমল করা নফসের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়। আমলের জন্য নফসের উপর জোর ও মাজবুর করে না। তারপর যেমনভাবে খাদ্যের প্রভাব প্রতিক্রিয়া দেহে প্রকাশ পায়, তেমনি রূহও আপন তরবিয়াত দ্বারা তার ভাল ও মন্দের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেহে প্রকাশ করে।

পরিশেষে বরকতস্বরূপ হযরত কারী তৈয়ব সাহেব রহ.-এর মুখনিঃসৃত শব্দ সরাসরি বর্ণনা করছি। মোটকথা, মাবদা (উৎস) হোক বা মাআদ (প্রত্যাবর্তন স্থল) হোক, নবুওয়াত হোক বা আহকাম হোক, তা সাজা ও প্রতিদান হোক, আল্লাহ তায়ালার কামালাত ও সিফাত হোক বা কর্ম হোক ইত্যাদি সবকিছুর নমুনা মানুষের আলমে গায়েবে তথা রূহের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হলো যে, ইনসান এমন একটি সমষ্টিগত হাকিকত যে, সমস্ত হাকিকত ও সুরত তাতে একীভূত। উলুহিয়্যাত এবং মাখলুকিয়্যাতের সকল নমুনা তাতে বিদ্যমান। আর প্রতিটি মানুষ একেকটি পৃথক জগত, যাতে জুলমানি, নূরানি, শয়তানি এবং রাহমানি, মাদ্দি ও রূহানি সকল বস্তুর নমুনা রয়েছে। কবি বলেন– 'সকল আসমান মনের অধীনে চলে। দুনিয়ার আসমানকে আদেশ করে রূহের পথে উন্নতি ও অবনতি, পাহাড়ে রয়েছে উচ্চতা ও খোলা প্রান্তর। কেমন যেন মানুষ এ কথার সত্যায়নকারী। আমি ইসলাম ওই ছোট্ট দুনিয়া যে, আমি নিজেই নিজের পৃষ্ঠপোষক।'

[মাসিক আল হক পত্রিকা হতে সংগৃহীত]

বয়ান : ১৫

ইল্‌ম ও হেকমতের উপকারিতা

এ কথা সুস্পষ্ট যে, যারা তাইয়্যিবীন, তারা দীন পছন্দকারী। তারা তাইয়্যিবাতকে পছন্দ করবে। কারণ, তারা দীনকে পছন্দ করে, তাদের ভিতর দীন আছে। কোন নেককার কখনো পছন্দ করবে না যে, তার স্ত্রী বদকার আসুক, যিনাকারিণী আসুক। কিন্তু খাবিসীন যারা খুবসে লিপ্ত, তারা এমন স্ত্রীদের পছন্দ করে, যারা খুবুসে লিপ্ত। পুত-পবিত্র ও সতী সাধ্বীর প্রতি তাদের মন কখনো ধাবিত হবে না। কারণ, তাদের অন্তর খুবুসে ভরপুর।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا• اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَ الطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ○

দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রতা নারীদের জন্য। সচ্চরিত্রা নারীগণ সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীগণের জন্য। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। *[সূরা আন নূর : ২৬]*

কুরআনুল হাকীম ও মানবিক উপলব্ধি

প্রকাশ থাকে যে, আয়াতে কারীমার মধ্যে জাহেরী পাক ও নাপাকের কথা বলা হয়নি যে, যার কাপড় পবিত্র সে তাইয়্যিবীনদের অন্তর্ভুক্ত। আর যার কাপড় নাপাক সে খাবিসীনদের অন্তর্ভুক্ত। বরং এখানে তাইয়্যিবীন (পবিত্র) ও খাবিসীন

(অপবিত্র) বলা হয়েছে আকাঈদ, আমল এবং চিন্তা-ফিকিরের ভিত্তিতে। অর্থাৎ তাইয়্যিবীন তারা যাদের আকাঈদ আমাল এবং চিন্তাধারা সবই দুরস্ত আছে। আর যাদের নেই তারা খাবিসীনদের অন্তর্ভুক্ত।

যদি নবীদের সন্তান হয় এবং কুফুরে লিপ্ত হয়, তাহলে সেও খাবিসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সে তাইয়্যিবীনদের মধ্যে শামিল হবে না। হযরত নূহ আ.-এর ছেলে সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ

সে আপনার আহল (বংশ) নয়।

আপনার আহল তারাই যারা আপনার আনুগত্য করে। যেমনটি হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَهُوَ اِلَىَّ

যে আমার আনুগত্য করবে, সে আমার সন্তানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যে করবে না সে সন্তান হবে না।

এখানে সন্তান বলতে বংশীয় বা ঔরশজাত সন্তান উদ্দেশ্য নয় এবং রূহানি সন্তান উদ্দেশ্য। যে আমার দীনের উপর থাকবে এবং দীনের উপর চলবে, সে আমার সন্তান।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ

আমি তোমাদের পিতার পর্যায়ে।

এখানে পিতা বলতে নসবী বা বংশীয় পিতা উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে ইঙ্গিত হলো সম্পর্কীয় ও রূহানি পিতার দিকে। যার নিকট আমার দীন পৌঁছে, আর সে দীন মোতাবেক চলে, তাহলে আমি তার অধিকারজাত পিতা। আর সে আমার ছেলে। যে দীনের অন্তর্ভুক্ত হয় না, আমি তার পিতা নই, সে আমার সন্তান নয়। সুতরাং তাইয়্যিব ও খাবিসের অর্থ হলো, যে উক্ত ফিকির ও আকিদা এবং আমাল থেকে বাইরে সে খাবিসিনদের অন্তর্ভুক্ত আর যে এগুলোতে দাখিল তারা তাইয়্যিবীনদের অন্তর্ভুক্ত।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, যারা তাইয়্যিবীন, তারা দীন পছন্দকারী। তারা তাইয়্যিবাতকে পছন্দ করবে। কারণ, তারা দীনকে পছন্দ করে, তাদের ভিতর

দীন আছে। কোন নেককার কখনো পছন্দ করবে না যে, তার স্ত্রী বদকার আসুক, যিনাকারিণী আসুক। কিন্তু খাবিসীন যারা খুবসে লিপ্ত, তারা এমন স্ত্রীদের পছন্দ করে, যারা খুবুসে লিপ্ত। পুত-পবিত্র ও সতী সাধ্বীর প্রতি তাদের মন কখনো ধাবিত হবে না। কারণ, তাদের অন্তর খুবুসে ভরপুর।

এটি একটি অনুভবগত মাসয়ালা, যাকে কুরআনুল কারীম সুস্পষ্ট করেছে যে, নেককার মানুষ নেক বস্তুর প্রতি ধাবিত হবে আর বদকার ব্যক্তি বদ মন্দ বস্তুর প্রতি ধাবিত হবে। চাই সেই বস্তু নারী হোক বা অন্যকিছু। যখন অন্তরে বদ থাকে, তখন মন্দই পছন্দ হবে আর নেকী বা ভাল থাকলে ভালই পছন্দ হবে।

আম্বিয়া আ.-এর শান ছিল, তাদের তবিয়তকে সৃষ্টি করা হয়েছে পবিত্র অবস্থায়। স্বভাবগতভাবে নবীদের আ. তবিয়ত খায়ের ও ভালোর প্রতি ধাবিত হবে, মন্দের দিকে যাবে না। কারণ, তাঁদের বুনিয়াদ ও ভিত্তি পবিত্র। এ কারণে তাঁদের উসিলায় যদি কারো বুনিয়াদ পবিত্র হয় অথবা রিযাযত ও মুজাহাদা দ্বারা নিজের তবিয়তকে পবিত্র করে নেয়, তাহলে সে পবিত্র জিনিসকে পছন্দ করবে। অপবিত্র ও মন্দ জিনিসকে কখনো পছন্দ করবে না। খাদ্য হলে পবিত্র ও হালাল খাদ্য পছন্দ করবে। হারাম ও নাপাক পছন্দ করবে না। পোশাক হলে জায়েয পোশাক পছন্দ করবে, নাজায়েযকে নয়। এভাবে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে উক্ত উসুল ও মূলনীতি গ্রহণ করবে। কারণ, এটি ইট তবিয়তগত উসুল।

ইউরোপিয়ান একজন সংস্কারবাদী লেখক লিখেছেন– কুরআনুল কারীম পৃথিবীর সর্বপ্রথম কিতাব, যাতে তবিয়তগত বস্তুর আলোচনা করা হয়েছে আর অন্যান্য কিতাবে শুধু বিধানাবলি দেয়া হয়েছে, এটি হারাম, এটি হালাল ইত্যাদি। আর কুরআন স্রেফ হারাম ও হালাল বর্ণনা করেনি বরং হালাল পর্যন্ত পৌঁছার জন্য যে তবিয়তগত পথ রয়েছে, সেদিকেও মনোনিবেশ করেছে। হারাম পর্যন্ত পৌঁছার জন্য যে সকল তবিয়তগত মূলনীতি রয়েছে, সেদিকেও মনোনিবেশ করেছে।

মানুষের মাঝে স্বভাবজাত খারাবির স্তর

হাদিস হলো কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা। এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের মজলিসে ইরশাদ করলেন–

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَقَ فِتْيَانُكُمْ وَطَغَى نِسَائُكُمْ

হে লোকসকল! ওই সময় তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন তোমদের নওজোয়ানরা খারাপ হয়ে যাবে? মহিলাগণ অবাধ্য হয়ে যাবে। তোমাদের কথা শুনবে না, মানবে না?

সাহাবায়ে কেরাম তো সর্বোত্তম যুগে ছিলেন। তাই তাঁদের অন্তরে এহেন পরিস্থিতির কল্পনাও ছিল না। তাঁরা হযরান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! এমন হয়ে যাবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ এমন হবে এবং তার চেয়ে আরো কঠিন হবে।

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন ভাল কথার নসিহত পরিত্যক্ত হবে এবং মন্দ কাজ হতে বাধা পরিত্যাগ করা হবে। অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থাকবে না।

তখন সাহাবাদের মাঝে আরো হয়রানি বেড়ে গেল। কারণ, তাঁরা তো পবিত্র যুগের মানুষ, তাঁরা রাত-দিন মারুফ তথা ভালো কর্মে লিপ্ত থাকতেন। তাঁরা খারাপও বন্ধ কাজের কল্পনাও করতেন না। তাই তাঁরা পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন হালত হয়ে যাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ এমন হবে এবং এর চেয়ে আরো কঠিন হবে।

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ

ওই সময় তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন তোমরা ভালো জিনিসকে মন্দ এবং মন্দ জিনিসকে ভালো জানতে থাকবে? অর্থাৎ তবিয়ত উল্টে যাবে যে, ভালো জিনিস খারাপ মনে হবে আর মন্দ বস্তু ভালো মনে হবে।

উক্ত হাদিসের মধ্যে স্তর বর্ণনা করা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম আমল থেকে শুরু হবে। মানুষ সর্বপ্রথম আমলিভাবে মন্দ কর্মে এবং অতিরঞ্জিত ও সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হবে। আকিদার মাঝে কোন খারাবি আসবে না বরং আমল খারাপ হয়ে যাবে। যুবকরা ফাসিক ও ফাজির হয়ে যাবে, মহিলারা অবাধ্য ও স্বাধীন হয়ে যাবে, না স্বামীকে মানবে, না পিতা ও সন্তানকে মানবে। তাদের মনে যা চাবে তাই করবে। এভাবে আমল খারাপ হয়ে যাবে। আমলের খারাবি যখন শিকড় মজবুত করে ফেলবে, তখন নসিহতের কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। নসিহতকারীর মনে এমন আশঙ্কা উদয় হবে যে, যদি উপদেশগ্রহীতা এ কথা বলে ফেলে যে,

তোমার আমল নেই, তুমি কোন মুখে নসিহত করছ, তখন নসিহতকারীর মুখ থাকবে না, সে লজ্জা পাবে। এভাবে নসিহত বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব এটি হলো দ্বিতীয় স্তর যে, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনীল মুনকার বন্ধ হয়ে যাবে।

আর তৃতীয় স্তর ভাল কাজে বাধা প্রদান করা আর মন্দ কর্মে উৎসাহিত এবং পথ প্রদর্শন করা হবে। আর চতুর্থ স্তর হলো বুঝশক্তি ওল্টে যাবে যে ভাল বস্তু মন্দ মনে হবে আর খারাপ বস্তু ভাল মনে হবে। মোটকথা, খারাবির সূচনা হবে আমলের মধ্যে। তারপর আকিদা ও বিশ্বাসে, তারপর নসিহতে তারপর আকল ও তবিয়তে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে। পরিণামে মানুষ ওল্টো পথে চলতে থাকবে। অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হবে।

মানসিক উসুল হলো, প্রথমে আমল বিগড়ায়, তারপর চিন্তা বিগড়ায়, তারপর আকিদা বিগড়ায় অতঃপর বুঝশক্তি ওল্টে যায়। অতএব এ কথা বলা হয়নি যে, মন্দ কর্ম থেকে বেঁচে থাক বরং মন্দ পর্যন্ত পৌঁছার মানসিকগত রাস্তা বলে দেয়া হয়েছে যে, আমলকে হেফাজত কর, যাতে ফিকির হেফাজত হয়। আর ফিকিরকে হেফাজত কর, যাতে আকিদা সংরক্ষিত থাকে। আকিদাকে হেফাজত কর, যাতে বোধশক্তিতে বক্রতা সৃষ্টি না হয়।

তাই তো ইউরোপের একজন সংস্কারক বললেন, জগতের সকল কিতাবে আহকাম বিদ্যমান রয়েছে, আর কুরআনুল কারীমে আহকামের পাশাপাশি তবিয়ত ও মানসিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা অন্য কোন আসমানি গ্রন্থে করা হয়নি। এখানে ফিতরাত তথা জন্মগত ও স্বভাবজাত পথ দেখানো হয়েছে। এখন কুরআনুল কারীমের শিক্ষা না থাকলে আহকাম কিভাবে জানবে আর আহকাম না জানলে আকিদা কিভাবে সঠিক হবে, আর আকিদা দুরস্ত না হলে ফিকির কিভাবে সহীহ থাকবে। আর ফিকির সহীহ না থাকলে উল্টে যাবে, অন্তর উল্টে যাবে। এমনটিকে বলা হয়েছে যে–

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ○

অনেক মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদের মুমিন বলে দাবি করে, কিন্তু তারা বাস্তবে মুশরিক। তারা শিকর কর্মে লিপ্ত। এটি হলো আরেক স্তর।

গাভী হায়াতের নিদর্শন

হযরত মুসা আ. আপন কওমকে বললেন, গাভী যবেহ করে তার গোস্ত মৃত ব্যক্তির সঙ্গে লাগাও; তাহলে সে জীবিত হয়ে যাবে। বনী ইসরাঈলরা বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করছেনঃ তিনি বললেন, আমি ঠাট্টা বিদ্রূপ করি না। আমি তো আল্লাহর ওহী থেকে বলছি। তারা বলল, গাভীটি কেমন হবে? তিনি বললেন, বৃদ্ধও হবে না, কুমারীও হবে না, বরং মধ্য বয়সের হবে। তারা বলল, রং কেমন হবে? তিনি বললেন, গাঢ় পীত বর্ণের হবে, যা দর্শকদের খুশি করবে এবং যার চাষাবাদ করা হয়নি ও অন্যান্য কাজে লাগানো হয়নি অর্থাৎ নিখুঁত ও নিষ্কলঙ্ক।

এমনসব গুণাবলির একটি গাভী পাওয়া গিয়েছিল, যার মালিক একজন নেককার মানুষ ছিলেন। তার ইন্তেকালের পর তার এতিম বাচ্চাদের জন্য শুধু একটি গাভীই ছিল, অন্য কোন সম্পদ ছিল না। সমস্ত বনী ইসরাঈল একত্র হয়ে তাদের নিকট গেল এবং জানতে চাইল, এই গাভীর মূল্য কত? এতিম ছেলেটি বলল, গাভী যবেহ করে তার চামড়া বিছিয়ে দেব, তোমরা তাতে স্বর্ণ ভরে দিবে। এভাবে ছেলেটি লক্ষ্য স্বর্ণমুদ্রা পেল। অতঃপর গাভী যবেহ করে মৃত ব্যক্তির লাগানো হলে সে জীবিত হয় এবং তার হত্যাকারীর নাম বলে দেয়।

মোটকথা, গাভীর মধ্যে হায়াতের নিদর্শন রয়েছে।

তেমনিভাবে সামেরি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল যে, প্রথমে হযরত মুসা আ. বনী ইসরাঈলসহ নদী অতিক্রম করলেন। তার জন্য পানি ওয়ালসদৃশ্যে দাঁড়িয়ে যায়, পানি থেকে চারটি রাস্তা তৈরি হয়। ফলে বারটি গোত্র একত্রে বার রাস্তা দিয়ে এভাবে অতিক্রম হয় যে, তারা পরস্পর একজন অপরজনকে দেখতে পাচ্ছিল।

ফেরাউন যখন নদীর কিনারে আসে, তখন হামান খুশিতে বলে ওঠে, আপনার আগমনে দরিয়ায় রাস্তা হয়েছে। ফেরাউন তাকে ধমক দিয়ে বলল, রাস্তা আমার আগমনে নয় বরং তা মুসার মুজেযা। ফেরাউন তখন ঘোড়ার উপর আরোহি ছিল আর অন্যান্য মন্ত্রীরা ঘুড়ির উপর ছিল। হযরত জিবরাঈল আ.-এর ঘোড়া দরিয়ার রাস্তায় নেমে পড়ল। সাথে সাথে ফেরাউনের ঘোড়াও এবং কিবতিদের সকল ঘোড়া নদীপথে নেমে পড়ে। এভাবে সকল কিবতির সলির সমাধি ঘটে। তখন সামেরী লক্ষ করল, হযরত জিবরাঈল আ. যে ঘোড়ায় আরোহি ছিলেন, সেই ঘোড়ার ক্ষুরের নিচে যদি মাটি পড়ত, তাহলে সাথে সাথে ঘাস উৎপন্ন হতো। এতে সে বুঝে ফেলল, তাতে হায়াতের মাদ্দা (ধাতু) রয়েছে।

সে কিছু মাটি উঠিয়ে সংরক্ষণ করে। তারপর নবী ইসরাঈলকে বলে, তোমাদের সকল জেওর-অলংকার একত্রিত কর। তারা কিবতীদের নিকট থেকে আনিত সমস্ত জেওর একত্র করে। সামেরী সোনা-রূপার জেওর একত্র করে বাছুর নির্মাণ করে এবং তার মুখে মাটি ভরে দেয়। ফলে বাছুরটি দৌড়াতে থাকে এবং আওয়াজ করতে থাকে। তখন সামেরী বলতে থাকে, হযরত মুসা (আ.) খোদাকে দেখার জন্য তুর পাহাড়ে গিয়েছিল, আর (নাউযুবিল্লাহ) খোদা নিজে এখানে এসে গেছেন। তখন থেকে গোপূজার সূচনা হয়।

ইতিহাসবিদরা লিখেছেন, হিন্দুস্তানে গোপূজা এসেছে বনী ইসরাঈল থেকে। তাদের কিছু সদস্য মুরতাদ হয়ে হিন্দুস্তানে এসেছিল। তারা এখানে বাছুরপূজার সূচনা করে। তারা হযরত মুসা আ.-এর নিকট থেকে সে সকল সত্য কথা শুনেছিল, সেগুলোর সঙ্গে নিজেদের বানানো কথাকে মিলিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে শুনিয়ে গো পূজায় উৎসাহিত করে। এভাবে গোবৎস পূজা শুরু হয়।

সারকথা, এতটুকু জানা গেল যে, গাভীর সঙ্গে হায়াতের সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে মায়ের দুধ না থাকলে বাচ্চাদের গভীর দুধপান করানো হয়। তার মধ্যে ওই মাদ্দা রয়েছে, যার দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পায়, যা মায়ের দুধে রয়েছে। আর এজন্যই স্বপ্নে গাভী জাতীয় প্রাণী দেখলে ইনশাআল্লাহ তাতে হায়াত রয়েছে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীর হাদিস জানা থাকা প্রয়োজন

স্বপ্নের তাবীরের সম্পর্ক কিছুটা মৌসুমের সঙ্গে কিছুটা স্বপ্নদ্রষ্টার গুণাবলির সঙ্গে এবং সংখ্যা ও শুমারির সাথে সম্পর্কিত। ব্যাখ্যাকারী যদি সহীহ হয়, তাহলে সে কানুনের ভিত্তিতে তাবীর করবে। এজন্য স্বপ্ন সম্পর্কে হুকুম হলো, সবার নিকট স্বপ্নের কথা বলা যাবে না। প্রথমে যে ব্যাখ্যা দিবে, তাই বাস্তবে ঘটে যাবে। এ কারণে বুঝমান-বুদ্ধিমান এবং হিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট স্বপ্ন বলো, তাহলো সে ভাল তাবীর করবে।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব নানুতুবী রহ. স্বপ্ন দেখলেন, তিনি ফজরের নামাজের জন্য ঘর হতে বের হচ্ছেন। তখন একটি অনেক বড় দুম্বা যা গাভী বরাবর তার প্রতিপক্ষ হিসেবে সামনে দাঁড়াল। তিনি তার শিং ধরে ফেললেন। তখন কখনো তিনি দুম্বাকে ধাক্কা দেন ফলে সে পিছনে সরে, আবার কখনো প্রাণীটি ধাক্কা দেয় আর তিনি পিছনে সরে আসেন। এক পর্যায়ে হযরতের বাম রানে শিং মারে। এতে এক ফোঁটা রক্ত বের হয়ে আসে।

হযরত নানুতুবী রহ. সকাল বেলায় স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন। ইয়াকুব সাহেব সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, ভাই সাহেব! আমি এই স্বপ্ন দেখেছি। তখন হযরত নিজের মূলনীতি মোতাবেক বললেন, কেয়ামত দিবসে মৃত্যুকে দুম্বার আকৃতি দেয়া হবে। অতএব মউতের সঙ্গে আপনার মোকাবেলা হয়েছে কখনো আপনি মউতকে হটিয়ে দিয়েছেন, কখনো মউত আপনাকে হটিয়ে দিচ্ছে। আর যে শিং বাম রানে লেগেছে এবং এক ফোটা রক্ত বের হয়েছে সে সম্পর্কে বলেছেন– আরব পরিভাষায় দাদার আত্মীয় সম্পর্কে বতুন বলে যে, ওরা পেট ও বুতুনের আত্মীয় আর চাচার সন্তানদের আফখায (রান) শব্দের ব্যাখ্যা করা হয় যে ওরা রানের সন্তান। এটি আরবের পরিভাষা।

অতঃপর তিনি বললেন, হে ভাই! রানের মধ্যে যে শিং আঘাত করেছে আমি 'রান' শব্দ থেকে এ কথা ব্যাখ্যা করতে পারি যে, আপনার চাচার সন্তানদের মাঝে কোন অঘটন ঘটতে পারে। আর যেহেতু এক ফোটা রক্ত বের হয়েছে, তাহলে চাচার সন্তানদের হতে একজন কম বয়সী বাচ্চা মারা যাবে। আর মহিলারা যেহেতু বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি হয় আর রক্ত বের হয়েছে বাম পার্শ্ব থেকে, তাই মহিলা মারা যাবে আর রক্ত যেহেতু এক ফোটা তাহলে কম বয়সী ছোট মেয়ে মারা যাবে।

যখন তিনি উক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করলেন, তখন অল্পক্ষণ পর একজন মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এলেন এবং বলতে লাগলেন, গত পরশু আপনার চাচাতো ভাইয়ের যে মেয়ে জন্ম নিয়েছিল সে এখন মৃত্যুবরণ করেছে। হযরত বললেন, তাবীর এসে পড়েছে। সুতরাং তাবীর দেয়ার ক্ষেত্রে হাদিসের দখল রয়েছে। যেমনটি তিনি হাদিস শরীফের শব্দ থেকে তাবীর করলেন। অতএব স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করা সবার কাজ নয়। তেমনিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যার মধ্যে মৌসুমের পরিবর্তনের দখল রয়েছে, যা ব্যাখ্যাকারীগণ বুঝতে পারেন এবং মৌসুম হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যার সংখ্যা ও গণনার প্রভাব

তেমনিভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যায় সংখ্যা ও গণনার প্রভাব রয়েছে। হযরত কাসেম নানুতুবী রহ. যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব রহ.সহ সমস্ত উলামায়ে কেরাম অনেক পেরেশান ছিলেন। কিন্তু ইয়াকুব সাহেব সকলকে সান্ত্বনা দিলেন যে, হযরত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করবেন না। এতে সবাই প্রশান্তি লাভ করলেন। কিন্তু উক্ত রোগে তিনি

দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। লোকেরা বলল, হযরত! আপনি তো বলেছিলেন, ইন্তিকাল করবেন না। এখন তো ইন্তিকাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, মিয়া, কাশ্‌ফ তো সঠিকই ছিল। ব্যাখ্যায় ভুল হয়েছে। তিনি বললেন, যখন আমি মুরাকাবা করি, তখন মাহদী শব্দ আমার সামনে ভেসে ওঠে। আর মাহদী শব্দে যে সংখ্যা ও গণনা রয়েছে, তা ষাট থেকে বেশি হয়। আর অসুস্থতার সময় হযরতের তার বয়স হলো পঞ্চাশ বছর। তাই আমি বললাম, এখনো বয়স বাকি রয়েছে। কিন্তু মাহদী শব্দ দ্বারা তার সংখ্যা ও গণনা উদ্দেশ্য ছিল না বরং উদ্দেশ্য ছিল স্বয়ং মাহদীর জাত বা সত্তা। আর ইমাম মাহদীর বয়সকাল হবে ঊনপঞ্চাশ বছর।

সারকথা, মাহদী শব্দ দ্বারা তার জাত উদ্দেশ্য ছিল, মাহদী নাম উদ্দেশ্য ছিল না। সেজন্য তাবীর করতে গিয়ে ভুল হয়েছে। কাশফের মধ্যে কোন ভুল ছিল না। এতে প্রমাণিত হলো, কাশফের তাবীরের মধ্যে সংখ্যা ও গণনার দখল রয়েছে। এজন্য একজন ব্যাখ্যাকার অনেক বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। আয়াতে কুরআনি ও হাদিসে নববীর দ্বারা দলিল গ্রহণ, মৌসুমি ভিন্নতাকে সামনে রাখতে হবে, সংখ্যা ও গণনার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি পৃথক ইলমি বিষয়, যা একজন তাবীরকারী জানেন। সেজন্য সর্বদা স্বপ্ন এমন ব্যক্তিদের সামনে বলা উচিৎ, যারা স্বপ্নের বাহ্য জগৎ ও কল্পনার জগতের সাথে সম্পর্ক রাখেন বা অবগত আছেন। তাহলে তারা উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য দিয়ে সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করতে পারবেন।

রূহানীভাবে রহমাতে নবীর বিশ্বব্যাপী প্রভাব

সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাহমাতে আম্মা হওয়ার সবচেয়ে বড় দলিল এই, যা তিনি হাদিস শরীফে ইরশাদ করেছেন–

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ

আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার হাকিকতকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে নূর দ্বারা হিসসী নূর উদ্দেশ্য হতে পারে না, যে নূর চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন চন্দ্র ও সূর্যের নূর (আলো)। এই হিসসী (বাহ্য) নূরের কোন হাকিকত নেই অদৃশ্য নূরের সামনে। কেননা, সূর্য তার নূর এবং আলো দ্বারা সুরত এবং প্রতিবিম্ব দেখাতে পারে। নূরে ইলম দ্বারা বস্তুর হাকিকত এবং মাহিয়াত তথা প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায়। এজন্য ইলমের নূর

চন্দ্র ও সূর্যের নূর হতে অনেক বেশি সুপ্রশস্ত ও শক্তিশালী। এদের নূরের কোন হাকিকত নেই।

সারকথা হলো, হক তায়ালা 'নূরে ইলমি' তথা জ্ঞানের আলো। কেমন যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তার মধ্যে ইলমের খামিরা দিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে মুজাসসাম ইলম তথা ইলমের দেহ বানানো হয়েছে।

এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত শরীয়তের প্রতিটি হুকুমে হেকমত রয়েছে। প্রতটি হেকমতের অধীনে হাকিকত রয়েছে আর প্রতিটি হাকিকত তথা মূলতত্ত্ব ও বাস্তবতার পিছনে ইল্লত বা কারণ রয়েছে, যার উপর হুকুম নির্ভর করে। তেমনিভাবে পুরো শরীয়ত ইলম দ্বারা ভরপুর। এমনকি তার মুজেযাও ইলমি দেয়া হয়েছে। তাকে হাজারো মুজেযা দেয়া হয়েছে, যেগুলোর প্রভাব আকাশে প্রকাশ হয়েছে, জমিনে প্রকাশ হয়েছে, পাথর ও বৃক্ষলতায় এবং প্রাণীজগতের মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে প্রাণীকূল ও তার নবুওয়াতের সততার সাক্ষ্য দিয়েছে। চাঁদ দু'টকুরো হওয়ার মুজেযার প্রভাব আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

মোটকথা, উক্ত মুজেযাসমূহ তো একদিকে; কিন্তু তাকে সর্ববৃহৎ যে মুজেযা দেয়া হয়েছে, তা ইলমি ও কালামি মুজেযা। আর তা হলো কুরআনুল কারীম, যা তার ফাসাহাত ও বালাগাত তথা সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্র হিসেবে এবং সমষ্টিগত আহকাম হিসেবে এক কথায় সর্বদিক থেকে একটি আজিমুশ্বান ও সবচেয়ে মর্যাদাবান মুজেযা। সুতরাং মুজেযাসমূহ ইলমি দেয়া হয়েছে, ফলে তিনি আপাদমস্তক ইলম। প্রকাশ থাকে যে, ইলম দ্বারা পৃথিবী পরিচালিত হচ্ছে। এজন্য ইলম হলো আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে উঁচু সিফাত। আল্লাহর সকল গুণই উঁচু কিন্তু ইলম সর্বোচ্চ সিফাত। কারণ, প্রতিটি সিফাত নিজেদের কাজ পরিচালনায় ইলমের মুহতাজ। উদাহরণস্বরূপ ইচ্ছার সিফাত ওই সময় পর্যন্ত করতে পারে না, যতক্ষণ না উদ্দেশ্য জানা যায়। কুদরত যতক্ষণ পর্যন্ত সহন ও ধারণ ক্ষমতা না জানা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগ করা যাবে না? অতএব ইরাদা ও কুরদত সিফাত ইলমের মুহতাজ। ফেল বা কর্ম সিফাত যতক্ষণ ইলম না হবে, ততক্ষণ কার্যকরী ও বাস্তবায়ন হতে পারে না। কিন্তু ইলম নিজ কর্ম সম্পাদনে কোন সিফাতের মুহতাজ নয়। না ইরাদার মুহতাজ না কুদরতের। উদাহরণস্বরূপ আপনি রেলগাড়িতে ভ্রমণ করছেন। পথিমধ্যে একটি বিশাল নদী পড়ল। তখন ইচ্ছা করলে জানতে পারবেন, যে এটি নদী। ইচ্ছা না করলে জানতে পারবেন না। তা নয় বরং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেনে ফেলবেন। এজন্য ইলম আপন কাজ বা ইচ্ছার মুহতাজ নয়। তেমনিভাবে কুদরতেরও

মুহতাজ নয়, যেমন উক্ত পুকুরের উপর আপনার শক্তি হলে আপনি জানতে পারবেন, এটি পুকুর, অন্যথায় জানতে পারবেন না এমন নয়; বরং যখন নজরে আসবে, তখন জানতে পারবেন এটি পুকুর।

মোটকথা, প্রতিটি সিফাত ইলমের মুহতাজ। ইলম ব্যতীত সেগুলো কর্ম করতে পারবে না। কিন্তু ইলম কোন সিফাতের মুহতাজ নয় বরং স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেননা, সকল সিফাল ও কামালাত ইলমের অনুগামী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্তায় ইলমকে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এ কথার অর্থ প্রত্যেক নবুওয়াত ও বেলায়েত তার মুহতাজ। তিনি কারো মুহতাজ নন। আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে ইলমি ও আমলি কামালাত প্রদান করেছেন, তাঁর পর যদি পৃথিবীতে একজন অলিও না হতেন, তাহলেও তার কামালাত বহাল থাকত। যদি একজন ব্যক্তিও সাহাবী না হতেন, তাহলেও তার কামালাত স্বঅবস্থায় বহাল থাকত।

সারকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমি কামালাত কোন বস্তুর মুহতাজ নয়। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটি বস্তু ইলমের মুহতাজ। যখন আপনি জানতে চাইবেন, এটি হালাল না হারাম, জায়েয না নাজায়েয, তখন তার বলে দেয়ার দ্বারাই জানতে পারবেন। মোটকথা, সমগ্র পৃথিবী তার ইলমের মুহতাজ। এমনকি সকল নবুওয়াতও মুহতাজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত হলো জাতি নবুওয়াত। আর অন্য নবীদের আ. নবুওয়াত তাঁর অনুগামী, যা বাস্তবে তারই ফয়েজপ্রাপ্ত। অতএব তার ফয়েজ ও বরকতে পূর্বে নবুওয়াত সৃষ্টি হয়েছিল এবং পরে বেলায়েত সৃষ্টি হয়েছে, যার অর্থ হলো নবীগণ আ. এবং *অলিগণ* সকলেই তাঁর মুহতাজ।

এ কারণে মেরাজ রজনীতে সকল নবী আ. তাঁর অনুসরণ করেছেন এবং তাকে ইমাম বানানো হয়েছে এবং সেই অনুষ্ঠানে নবীগণ বয়ান পেশ করেছিলেন।

হযরত আদম আ. বলেছিলেন, আমাকে আল্লাহ তায়ালা সফীউল্লাহ (বন্ধু) বানিয়েছেন, তিনি আমাকে আপন কুদরতে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে অনেক সন্ত ান দিয়েছেন। ফলে পৃথিবী আমার সন্তান দ্বারা ভরে গেছে। এগুলো হলো আমার ফাযায়েল।

হযরত মুসা আ. বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমার সাথে কালাম করেছেন, তিনি আমাকে মুকাল্লাম (কথা শ্রবণকারী) বানিয়েছেন, আমাকে কালামের (কথা বলার) তাওফীক দিয়েছেন। তুর পর্বতে আমার সঙ্গে কথোপকথন হয়েছে। আমাকে ও আমার অনুসারীদের কুলজুম সাগরে নাজাত দিয়েছেন আর

ফেরাউনকে স্বদলবলে ডুবিয়েছেন। মোটকথা, তিনি তাঁর ফাযায়ের বর্ণনা করলেন। তেমনিভাবে হযরত সুলাইমান আ. নিজের ফাযায়েল বর্ণনা করলেন যে, আল্লাহ পাক আমাকে এমন রাজত্ব দান করেছেন, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। বাতাসের উপর আমাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, প্রাণীদের উপর আমাকে কুদরত দেয়া হয়েছিল। সমস্ত প্রাণীকুল আমার রাজত্বের অধীনে ছিল। হযরত ঈসা আ. নিজের ফযিলত বর্ণনা করলেন যে, আমাকে আল্লাহ রুহুল্লাহ বানিয়েছেন। আমাকে তিনি পিতা ছাড়া আপন কুদরতে সৃষ্টি করেছেন।

সকলের ফাযায়েল বর্ণনা করার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ফাযায়ের বর্ণনা করলেন, আমাকে আল্লাহ তায়ালা 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বানিয়েছেন, 'শাফীউল মুযনিবীন' বানিয়েছেন, 'খাতিমুন নাবিঈন' বানিয়েছেন। আমার নবুওয়াতকে আসল ও মূল বানিয়েছেন। অন্যান্য নবুওয়াতকে অনুগামী বানিয়েছেন। তখন সকল আম্বিয়াগণ বলে উঠলেন, এ কারণে এবং এই বুনিয়াদে আপনি সকল নবীদের উপর উত্তম ও মর্যাদাবান।

সারকথা, প্রথম রহমত হলো এই যে, জগতের প্রতিটি কামাল তাঁর নূরের মধ্যস্থতায় সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই তাঁর কামালে পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষতি ও দোষ দ্বারা দুনিয়া পরিচালিত হচ্ছে না। আর কামালাত হলো সকল ইলমের অনুগামী। অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলম দ্বারা আযাল (সূচনা) থেকে নিয়ে আবাদ পর্যন্ত আলোচিত হচ্ছে। সুতরাং ইলম হলো তার প্রথম রহমত।

সত্তাগতভাবে রহমাতে নবীর বিশ্বব্যাপী প্রভাব

দ্বিতীয় হলো, যা হযরত হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. বর্ণনা করেছেন যে–

لَوْلَاكَ يَا مُحَمَّدُ لَمَا خَلَقْتُ اٰدَمَ

হে মুহাম্মদ! আপনাকে সৃষ্টি না করলে আদমকে সৃষ্টি করতাম না।

সুতরাং জন্ম ও অজুদ (অস্তিত্ব) মূলত তার খাতিরেই হয়েছে। আর অজুদ এবং যিন্দেগীর নেয়ামত এত বড় নেয়ামত যে দুনিয়ার কোন নেয়ামত তার মোকাবেলা করতে পারে না।

অতএব অস্তিত্ব যেহেতু সবচেয়ে বড় নেয়ামত, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাহমাতুল্লিল আলামিন হওয়ার ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। মাদ্দিগতভাবে দেখলে দেখা যায় যে, ওজুদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের তুফায়েলে। আর রূহানি নিয়ামত হিসেবে দেখলে দেখা যায় যে, কামালাতে ইলমি তাঁর তুফায়েলে সৃষ্টি হয়েছে। তাই বস্তুগত ও রূহানি উভয় হিসেবে নবীজি হলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন।

পরকালে রাহমাতে নববীর বিশ্বব্যাপী প্রভাব

পরকালে কেয়ামত দিবসে শাফায়াতে কুবরার মাকাম ও মর্যাদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করা হবে। সমগ্র নবীর নেককার উম্মতের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। হাশর ময়দানে সকল মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, জমিনে সবাই এমন থাকবে যে না নড়াচড়া করতে পারবে, না বসতে পারবে, না শয়ন করতে পারবে। আর সূর্যের তাপ হবে সর্বোচ্চ মানুষ ঘামে হাবুডুবু খাবে। এভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে। তখন মানুষের অন্তরে এ কথা উদয় হবে যে, কারো দ্বারা শাফায়াত করাও। তখন সবাই মিলে হযরত আদম আ.-এর নিকট যাবে এবং বলবে– আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাদের পিতা বানিয়েছেন, পিতার সোহাগ ও মহব্বত সকলের জানা ও নির্ধারিত। আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যাতে এই মসিবত থেকে মুক্তি পাই।

তিনি বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। আমি একটি ভুল করেছিলাম। সেটি গোনহ ও পাপ ছিল না কিন্তু একটি পদস্খলন ছিল যে, বৃক্ষের ফল আহার করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তা খেয়ে ফেলেছিলেন। গোনাহ বলা হয় আদেশের বিপরীত কাজ করা।

হযরত আদম আ.-এর কর্মটি হুকুমের বিপরীত ছিল না। শয়তান তাকে তাবীর (বাহ্যিক অর্থ পরিবর্তন করা) শিখিয়েছিল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এই বৃক্ষের ফল আহার করতে এজন্য নিষেধ করেছেন যে এই বৃক্ষের ফল আহার করলে মানুষের চিরস্থায়ী জীবন লাভ হয়। আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা সাময়িক ছিল। আপনার মাঝে তখন তার যোগ্যতা ছিল না। এখন জান্নাতে থাকতে থাকতে যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এখন আহার করলে কোন অসুবিধা নেই।

সুতরাং আদম আ. তাবীর পদ্ধতিতে আহার করেছিলেন আর তাবীল করে কোন কাজ করা হলে গোনাহ হয় না বরং চিন্তাগত ভুল হয়। আর খাতায়ে ইজতিহাদী দ্বারা গোনাহ হয় না, পাপ হয় না। কারণ, মুজতাহিদ যদি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহলে ডাবল সাওয়াব পান আর ভুল করলে এক সাওয়াব পান। অতএব পাপের কারণে কী নেকী পাওয়া যায়? এ কারণে বৃক্ষের ফল আহার করা পাপ ছিল না বরং খাতায়ে ফিকরি এবং ইজতিহাদী ছিল তা আমার থেকে

প্রকাশ পেয়েছিল। অতএব আমার মুখ এ কথার উপযুক্ত নয়, আমি আল্লাহর সামনে তোমাদের সুপারিশ করব। তোমরা হযরত নূহ আ.-এর নিকট যাও।

লোকেরা হযরত নূহ আ.-এর নিকট যাবে। তিনি আপত্তি পেশ করে বলবেন, আমি সুপারিশের উপযুক্ত নই। আমি তুফানের সময় আপন ছেলেকে ডেকেছিলাম আর আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেন–

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

যখন সে কুফুরে লিপ্ত তখন তোমার সন্তান রয়নি, তোমার সন্তান তারা যারা তোমার অনুসারী। অতএব সে তোমার অনুসারী নয় তাই সে সন্তানও নয়।

إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

আল্লাহ তায়ালা বললেন, জাহেলদের মত কথা বলো না। আমি তোমাকে নসিহত করছি। তখন নূহ আ. ততক্ষণাৎ ইস্তিগফার ও তাওবা করেন। নূহ আ. বলবেন, আমার থেকে এহেন ভুল প্রকাশ পেয়েছিল। অতএব আমি কোন্ মুখে তোমাদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আল্লাহর সকালে যাব। যদি তিনি বলে ফেলেন, তুমি নিজেই ভুল করেছিলে, তুমি কোন্ মুখে সুপারিশ নিয়ে এসেছ, তাহলে আমার কিছুই বলার থাকবে না। তোমরা ইবরাহীম আ.-এর নিকট যাও। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন এবং বলবেন, আমার থেকে অমুক পদস্খলন সংঘটিত হয়েছিল। অতএব আমি ও উপযুক্ত নই। তোমরা মুসা আ.-এর নিকট যাও। হযরত মুসা আ. বলবেন, আমি একজন কিবতিকে চড় মেরেছিলাম, তাতে তার গর্দান উড়ে গিয়েছিল। অথচ ওই ভুল ইচ্ছা করে করেনি। কিন্তু নবীর হাত এত শক্তিশালী হয়ে থাকে যে, তা ধারালো তলোয়ার থেকে বেশি কার্যকর হয়। সেজন্য তার গর্দান উড়ে গিয়েছিল, সে মরে যায়। সেজন্য আমি সুপারিশ নিয়ে কোন্ মুখে হাজির হবো? আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি হত্যা করেছিলে। তোমরা হযরত ঈসা আ.-এর নিকট যাও। তিনি বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী।

কিন্তু মানুষ যখন তার আসবে, তখন তিনিও বলবেন, আমি সুপারিশ করার যোগ্য নই। আমার জাতি আমাকে আল্লাহ ও তাঁর বেটা বলেছিল। যদি আমাকে বলা হয়, তুমি কি সেই লোক, যাকে আমার সিংহাসনে খোদা বানিয়ে বসানো হয়েছিল? তুমি কী সেই লোক, যাকে আল্লাহর বেটা বলা হয়েছিল? অথচ আল্লাহ তায়ালা বেটা ও বাপ হতে পবিত্র। অতএব আমি আল্লাহর সামনে হাজির

হওয়ার উপযুক্ত নই। তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাও। তিনি সর্বশেষ নবী।

তখন সবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন, আমি এর উপযুক্ত, আমি সুপারিশ করব। তখন তাঁকে মাকামে মাহমুদ দ্বারা সফলকাম করা হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি দীর্ঘ সাত দিন ও রাত পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকব। আর আল্লাহ তায়ালার এমন হামদ ও সানা বর্ণনা করতে থাকব, যা পৃথিবীতে আর কেউ করেনি। সেই হামদ এই মুহূর্তে আমার অন্তরে নেই, তখন ঢেলের দেয়া হবে।

কিন্তু ওই দিনগুলো এমন বেপরোয়ার হবে যে, তিনি সাত দিন পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকবেন। অন্যকিছু করবেন না। সাত দিন পর আল্লাহ পাক বলবেন–

يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ

হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও, প্রার্থনা কর, আমি দান করব, শাফায়াত কর আমি গ্রহণ করব।

সারকথা, সমগ্র জগতের সকল উম্মাতের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি এখন হিসাব-কিতাব শুরু করব। যার সেখানে ঠিকানা সে তার ঠিকানা মত স্বস্থানে পৌঁছে যাবে। মোটকথা, শাফায়াতে কুবরার মাকাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করা হবে। সেদিন সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের উপর তার ফযিলত, সর্দারি ও নেতৃত্ব প্রকাশ পাবে। তখন সকল কাফের আফসোস করবে, কেন আমরা ঈমান গ্রহণ করিনি। অতএব এটি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৃতীয় স্তরের রাহমাতে আম্মাহ, যা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়বে।

রাহমাতে নববীর চিরন্তন প্রভাব

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সর্বপ্রথম আমি জান্নাতের দরজার কড়া নাড়ব এবং বলব, দরজা খুলে দাও। তারপর সকল উম্মত প্রবেশ করতে থাকবে। কেমন যেন জান্নাতে প্রবেশ করা তাঁরই তুফায়েলে হবে। এভাবে আবাদী পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাহমত পৌঁছতে থাকবে।

রাহমাতে নববীর অনাদি প্রভাব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযালি থেকে রাহমাত, যখন আল্লাহতায়ালা সবার থেকে অঙ্গীকার নেয়ার জন্য বললেন, আমি কি তোমাদের রব নই? সমগ্র মাখলুককে হযরত আদম আ.-এর কোমর থেকে বের করে একত্র করে বললেন, আমি কি তোমাদের রব নই?

তখন সবাই পরস্পর একজন অপরজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল যে, কে কি উত্তর দেবে। কারণ, আদম আ.-এর কোমর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে আকল ও উপলব্ধি ছিল না। আর প্রশ্ন করা হয়েছে 'রব' গুণের ব্যাপারে ফলে সবাই পেরেশান; কি উত্তর দেবে। তখন সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, 'বালা' হ্যাঁ। অবশ্যই আপনি আমাদের রব, প্রতিপালক। তাঁর উত্তরের সাথে সাথে সমস্ত নবীর যবানে জারি হয়ে গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের রব। তারপর সকল মাখলুক বলে উঠল যে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের রব। আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পিতাকে সাক্ষী সাব্যস্ত করেছি, তোমরা আমার রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়েছ। এই আসমান ও জমিনকে সাক্ষী বানাচ্ছি, তোমরা আমার রবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়েছ এবং সমস্ত সৃষ্টিকে সাক্ষ্য রেখেছি। তোমরা যখন দুনিয়াতে যাবে, তখন এই স্বীকারোক্তিকে স্মরণ রাখবে এবং আমাকে রব হিসেবে মানবে এবং আমার তাকদীরের উপর রাজি থাকবে।

মোটকথা, তখন সবাই 'বালা' শব্দ গ্রহণ করেছিল আর সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অতএব রাহমাতুল্লিল আলামিন হওয়ার জন্য এর চেয়ে বড় দলিল আর কী হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার উত্তর দেয়ার যোগ্য সকলেই তখন হলো, যখন তিনি সবাইকে শিখিয়েছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তালীমের মাধ্যমে নিজের রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি করালেন। এর জন্য 'রাহমাতে আম্মাহ' তথা ব্যাপক রাহমাত হওয়ার জন্য তার চেয়ে বড় দলিল আর কী হতে পারে?

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযালেও রহমত ছিলেন, দুনিয়াতে আগমনের পরও রহমাত, বরযখেও রহমাত হবেন, মিরাজ রজনীতেও রাহমাত, কেয়ামত দিবসে শাফায়াতে কুবরা হবেন, তাও রহমাত, সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়বেন সেখানেও রাহমাত।

সারকথা প্রথম ও সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে তিনি রাহমাত হিসেবে প্রমাণিত হবেন।

যিনি সমগ্র জাহানের রহমতস্বরূপ

এ কারণে এ কথা বলা হয়নি যে, তিনি রাহমাতে আলম তথা এক জগতের রহমাত। বরং তিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন। এ কথার অর্থ হলো তিনি ফেরেশতা জগতের রহমাত, জিন্নাত জগতের রহমত, প্রাণী জগতের রাহমাত, মানব জগতের জন্য রহমাত। এক কথায় আল্লাহ পাক যতগুলো জগত বানিয়েছেন তিনি সবার জন্য রাহমাত। যখন প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব তাঁর তুফায়েলে হয়েছে, তখন প্রতিটি বস্তুই তাঁর থেকে ইহসান এবং অনুগ্রহপ্রাপ্ত। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাহমাতুল্লিল আলামিন আযালি থেকে চলে আসছে এবং আবাদী পর্যন্ত চলতে থাকবে। কেয়ামত দিবসেও খতম হবে না বরং জান্নাতেও চালু থাকবে।

হাদিস শরীফে এসেছে, হাফেজে কুরআনকে বলা হবে, তেলাওয়াত করতে থাক এবং জান্নাতের স্তর অতিক্রম করতে থাক।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনুল কারীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছে। দুনিয়ার উন্নতি কুরআন দ্বারাই হয়েছে, যা তার মাধ্যমে দুনিয়াবাসী পেয়েছে।

অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, কুরআনুল কারীমের মধ্যে যতগুলো আয়াত রয়েছে, জান্নাতের মধ্যে ততগুলো স্তর ও তলা রয়েছে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সরাসরি কুরআনুল কারীমের আয়াতগুলোই জান্নাতের মধ্যে স্তর হিসেবে প্রকাশ পাবে। এখানে (দুনিয়াতে) আয়াতগুলো ইলমি আকৃতিতে রয়েছে, এগুলো ওখানে (জান্নাতে) গিয়ে বাগান ও উৎসবের আকৃতি ধারণ করবে। উক্ত কথার অর্থ এই যে, অন্যান্য জাতি তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু মুসলিম হাফেজদের অন্তরে স্বয়ং জান্নাত চলে আসবে, যা হলো এই কুরআনুল কারীম। তার আয়াতগুলোই জান্নাতের রূপ ধারণ করবে। সুতরাং এ সবকিছুই রাহমাতুল্লিল আলামিনের শানের প্রকাশস্থল।

নির্যাসকথা, তাঁর রাহমাত অন্তর (অদৃশ্য) থেকে কাওয়ালিব (বাহ্য) পর্যন্ত, আযাল থেকে আবাদ পর্যন্ত, দুনিয়া হতে বরযখ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ কারণে তাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামিন বলা হয়েছে। রাহমাতুল্লিল আলম বলা হয়নি। কারণ, তাঁর রাহমতের মধ্যে সমগ্র জগত শামিল। আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বড় ও দামি উপহার যা মাখলুককে দিয়েছেন, তা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্তিত্ব। এ কারণে বলা হয়েছে, যখন কারো উপর কোন মসিবত

আসে অথবা কোন চিন্তা জাগে, তাহলে সে যেন আমার মৃত্যুকে স্মরণ করে। কেননা, তার চেয়ে বড় কষ্ট ও মসিবত পৃথিবীতে আর ঘটেনি, ঘটবেও না।

তাওয়াসসুল বা মাধ্যম বানানোর হাকিকত

তাওয়াযসুল দ্বারা এক উদ্দেশ্য তো এমন, যা দুনিয়াতে হয়ে থাকে, যাকে সুপারিশ করার জন্য মাধ্যম বানানো হয়, তার সম্পর্কে সেই ব্যক্তি জানে যে হাকিম বা বিচারকের উপর তার প্রভাব রয়েছে। হাকিম তার কথা শুনবে, মূল্যায়ন করবে। আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে এমন অর্থ হতে পারে না। এমনটি শিরক হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহর উপর কারো প্রভাব হতে পারে না, তিনি নিজেই সত্তাগতভাবে ক্রিয়াশীল ও প্রভাবশীল। তার উপর কেউ প্রভাবশীল হতে পারে না। এ কারণে এখানে উসিলা দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য হবে না। এখানে উসিলার অর্থ হবে, যে রাহমাত দ্বারা আপনি ওই সকল মানুষদের মর্যাদা দান করেছেন, তাতে আমাকেও অংশীদার বানান, যাতে আমাকে উক্ত রাহমাত দ্বারা মর্যাদাবান বানান হয়। এখানে উসিলা দ্বারা এমনটি উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানে উসিলা বা মাধ্যম অর্থ এই নয় যে, সে আল্লাহর উপর প্রভাব রাখে। কেননা, আল্লাহর দরবারে সবাই গোলাম এবং সবাই মুহতাজ।

আম্বিয়া আ.গণ সবচেয়ে পবিত্র ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। আর তারা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি নৈকট্যশালী মানব। কিন্তু কেয়ামত দিবসে অবস্থা এমন হবে যে, নবীগণ আ. এমনভাবে কাঁপতে থাকবেন, যেমনভাবে বৃক্ষের পাতা মাঠে পড়ে কাঁপতে থাকে।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরত জিবরাঈর আ.কে বলবেন, তাওরাত কিতাব কোথায়? তিনি আরজ করবেন, তাওরাত তো হযরত মুসা আ. নিকট পৌঁছেয়েছি। হযরত মুসা আ.কে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি তাওরাত পেয়েছেন? তিনি বলবেন, জি পেয়েছি।

আপনি তাওরাত পেয়ে কী করেছেন?

তিনি বলবেন, আমি উম্মতকে পৌঁছিয়েছি।

মোটকথা, হযরত মুসা আ.কে যখন ডাকা হবে, তখন তার অবস্থা এমন হবে যে, তিনি এমনভাবে কাঁপতে থাকবেন যেমনভাবে মাঠে পড়া পাতা কাঁপতে থাকে। এমন অবস্থা ও পরিস্থিতি অন্যান্য নবীদেরও হবে।

তেমনিভাবে কুরআনুল কারীমের ব্যাপারেও হযরত জিবরাঈল আ.কে বলা হবে, কুরআনুল কারীম কোথায়?

তিনি বলবেন, আমি তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাল্‌বে পৌঁছে দিয়েছি। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তলব করা হবে এবং তাকে বলা হবে, আপনার নিকট কুরআন পৌঁছেছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পেয়েছি।

আল্লাহ বললেন, আপনি তা কী করেছেন?

তিনি বলবেন, আমি তা উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছি।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আপনি বসে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আরশের নিচে আসন বিছানো হবে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের সমাবেশে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাবেন।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআনুল কারীমের ভিতর শব্দ রয়েছে, শব্দের মধ্যে অর্থ রয়েছে, অর্থের ভিতর হাকিকত রয়েছে, হাকিকতের ভিতর রহস্য ভেদ, মুসলেহাত ও হেকমত রয়েছে। এই সকল বস্তুকে দেহের আকৃতি দান করে প্রদর্শন করা হবে। তখন কুরআনুল কারীমকে এমন দেখা যাবে মনে হবে, একটা বিশাল বাগান ও উৎসব দাঁড়িয়ে আছে। হাজারো রঙের ফুল তাতে ফুটে থাকবে, হাজারো ঘ্রাণের ফুল ও খুশবু দ্বারা মোহিত থাকবে। তখন মানুষ বলবে, এমন কুরআন তো আমরা কোন দিন শুনিনি। এ তো দেখছি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ কুরআন।

কারণ, তখন অবস্থা এমন হবে যে, স্বয়ং আল্লাহ উপস্থিত থাকবেন, নবীগণ থাকবেন, ফেরেশতাকুল বিদ্যমান থাকবে। তাহলে সেখানে রূহানিয়্যাতের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটবে। আর তেলাওয়াতকারী হবেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাহলে রূহানিয়্যাতের মাকাম কেমন হবে?

সারকথা, যে সকল বস্তু ইলমি আকৃতিতে অন্তরে ছিল সেগুলো অবয়ব ধারণ করে প্রকাশ পাবে। তখন কুরআন একটি বিশাল বাগান ও উৎসবের সুরতে প্রকাশ পাবে। তখন সাহাবায়ে কেরামগণও বলতে থাকবেন, আজ পর্যন্ত এমন কুরআন তো শুনিনি।

যাহোক, আমি বলছিলাম, কেয়ামত দিবসে নবীদের অবস্থা এমন হবে যে, তাঁরা মসিবতের কারণে থরথর করে কাঁপতে থাকবেন। তখন আমার ও আপনার অবস্থা কেমন হবে? তাই উসিলার অর্থ এমন হবে না যে, সাহেব উসিলার প্রভাব

আল্লাহর উপর পড়বে। এমনটি সাধারণত দুনিয়ার হুকুমতের বেলায় হয়ে থাকে। আল্লাহর দরবারে উসিলার অর্থ হবে এমন যে, যে রাহমাত ও বরকত দ্বারা আপনি ওই বুযুর্গদের সম্মানিত করেছেন তাতে আমাদের মত গরিবদেরও শামিল করে নিন, যাতে আমরা কিছু অংশ পেতে পারি। এমন অর্থ হবে না যে, আমরা প্রভাবিত করব, যাতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সুপারিশে অপারগ হয়ে যান। আল্লাহর হলেন জাবের তথা বল প্রয়োগকারী, তিনি মাজবুর তথা অপারগ নন। তিনি হলেন কাহের তথা প্রভাব বিস্তারকারী, মাকহুর তথা প্রভাবিত হন না। মাকহুর ও মাজবুর হওয়া বান্দার গুণ।

এজন্য উসিলার অর্থ হবে এমন। এই অর্থ হবে না যে, আল্লাহর উপর প্রভাবিত হবে, এমনটি শিরক। আর এমন হতে পারে যে, এই উসিলার নিয়ামতের মধ্যে আমাদের গণ্য করে নাও, তাহলে এমনটি দুআ এবং অনুরোধ ও প্রার্থনা। এমনটি ইবাদত ও বন্দেগীতে শামিল। এমন উসিলা গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই। এমন উসিলা গ্রহণে শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে। উসিলার উক্ত অর্থে আপনি এখানে বসে বসে দুআ করতে পারেন এবং কোন মাজারে গিয়েও দুআ করতে পারেন। তা জায়েয। তা এখানেও জায়েয এবং কবরস্তানেও জায়েয। কোন কবর বা মাজারওয়ালাকে এ কথা বলা যাবে না যে, আপনি আমাকে অমুক কাজটি করে দিন। শরীয়ত এমন কাজের অনুমতি দেয় না। কিন্তু সেখানে গিয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট এভাবে প্রার্থনা করতে হবে যে, হে আল্লাহ! আপনি যে নেয়ামত দ্বারা তাকে সম্মানিত করেছেন, ওই নেয়ামত দ্বারা আমাকেও সম্মানিত করুন। এমন উসিলার অনুমতি শরীয়ত প্রদান করেছে।

মীলাদুন্নবী সা.-এর জলসা

ঈদে মিলাদুন্নবী নামে যে জশনে জুলুস এবং সভা-সমাবেশ হয়ে থাকে, তা সবই প্রদর্শনী মাত্র। যেমন পৃথিবীতে লোকদেখানো প্রদর্শনী হয়ে থাকে। ইসলামের মেজাজ ও কার্যকলাপে এহেন কর্মের ভিত্তি নেই। যদি এই কর্মগুলো ইসলামি মেজাজ মোতাবেক হতো, তাহলে সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরামগণ পালন করতেন। তাবেয়ীগণ করতেন, আইয়ামে মুজতাহিদগণ করতেন। কিন্তু তাদের কারো থেকে প্রমাণিত নেই। বরং এগুলো কয়েক শতাব্দি পর সূচনা হয়েছে। এই প্রদর্শনীগুলোর ব্যাপারে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, ভাই! করে নাও কিন্তু বাহ্যাড়ম্বর ও অতিরঞ্জন ইসলামি মেজাজ নয়। এগুলো অমুসলিম জাতিসমূহ থেকে আমদানি করা হয়েছে। যেমন হিন্দু ধর্মে জুলুস বের হয়। তাদের যারা

অনুসরণযোগ্য তাদের প্রতিকৃতি ও মূর্তি নির্মাণ করে উটের উপর এবং হাতির উপর রেখে প্রদর্শনী করে থাকে। ইসলাম এসেছে হাকিকত ও বাস্তবতা নিয়ে। সুরত ও প্রকৃতির প্রদর্শনী করার জন্য ইসলাম আসেনি। নিজেদের ভিতর হাকিকত সৃষ্টি করো, আড়ম্বরতা ও প্রদর্শনী নিজে নিজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ইসলামের মূল আলোচ্য বিষয় হলো আল্লাহ তায়ালার বানানো আকৃতি। এতেও বাড়াবাড়ি করা যাবে না। এ কারণে উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি সুরতের ইশক ও মহব্বতে লিপ্ত হয়, তাহলে শেষ পরিণাম ভাল হয় না। কারণ, আপনি তখন সুরতের মাঝে মত্ত থাকলেন, তাহলে সুরত হাকিকতের জন্য প্রতিবন্ধক হলো। এ কারণে ইসলামের আলোচ্যবিষয় হলো সুরতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না। বরং হাকিকতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কর, যা দায়েমী ও স্থায়ী।

আকমালে দীন তথা দীনের পরিপূর্ণতার পদ্ধতি

প্রথম প্রশ্ন : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ কুরআনুল কারীমে নিজের স্থান সর্বশেষে গ্রহণ করতে চায়, অন্যথায় তার বর্তমান স্থান ধরা হলে কুরআন অসজ্জিত ও সংকলিত হওয়া প্রমাণ করে?

উত্তর : اَلْيَوْمَ শব্দ দ্বারা নাযিল হওয়ার বিশেষ দিন উদ্দেশ্য নয় বরং সাধারণভাবে চলমান উপস্থিত যুগ উদ্দেশ্য। আর তা ব্যাপক নাযিল হওয়ার সময়কেও শামিল করবে এবং আয়াত নাযিলের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়কেও অন্তর্ভুক্ত করবে। আর তা এভাবে যে, যেমন বলা হয়ে থাকে, আজ বড় নাজুক ও ভয়াবহ যামানা অথবা আজ মানুষের ভাল কর্ম করা কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। অথবা আজ এমন হয়ে গেছে যে, বাঘ মানুষের নিকট আশ্রয় চায়। প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত বাক্যগুলো দ্বারা, বাক্যগুলো উচ্চারণের দিন উদ্দেশ্য হয় না বরং ওই যামানা ও যুগ উদ্দেশ্য হয়, যে যুগে কথাগুলো বলা হচ্ছে, সে যুগ চলমান। সুতরাং কুরআনুল কারীমেও اَلْيَوْمَ দ্বারা ওই যুগ উদ্দেশ্য, যে যুগ কুরআনের মুখাতাবরা অতিক্রম করছেন। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হায়াতে তায়্যিবার সর্বশেষ অংশ। আয়াত নাযিলের দিন উদ্দেশ্য নয়। অতএব উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার ৯০ দিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এমতাবস্থায় যদি উক্তি আয়াতের পর আরো কিছু আয়াত নাযিল হয়ে থাকে, তাহলে তা ইকমালে দীনের বিপরীত প্রমাণিত হবে না। আবার তা ইসলামি সীমা হতে বহির্ভূতও হবে না। কারণ

আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে এবং পরে সকল দীন এর মধ্যে শামিল। অর্থাৎ এই আয়াতে মধ্যস্থলে এসে যাবে, সর্বশেষে থাকবে না।

আকমালে দীনের ইশতেহার ঘোষণা

এখানে প্রশ্ন জাগে, উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সর্বশেষ সময়ে কেন রাখা হয়নি, যাতে প্রকাশ্যভাবে এই আয়াত ইকমালে দীনের ঘোষণা হয়ে যেত। এবং اَلْيَوْمَ দ্বারা সাধারণ চলমান যুগ উদ্দেশ্য নেয়া প্রয়োজন হতো না?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর এমন যে, উক্ত আয়াত দ্বারা শুধু ইকমালে দীনের কোন ইলমি বা ইতিকাদী ও ঈমানী খবর দেয়া উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ইকমালে দীনের পরিপূর্ণ ইশতেহার দেয়া উদ্দেশ্য ছিল। আর ইশতেহারের জন্য নাযিল হওয়ার দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন উপযুক্ত ছিল না। কারণ, দিনটি ছিল আরাফার দিন, যেখানে হজ্জের জন্য মানুষ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একত্রিত হয়েছিল। আর সর্বোপরি ওই দিনটি জুমুআর দিনও ছিল, যা স্বয়ং একত্রিত করার দিন। আর তার উপর তা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্জের দিন ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্জ হওয়ার কারণে তাতে এক লাখের বেশি সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং এমন সমষ্টিগত দিনে জমাকৃত সমগ্র মুসলমানের সামনে ইজতিমায়ীভাবে, ইজতিমায়ী মুহূর্তে সমবেতকারী সত্তার উপর উক্ত আয়াত নাযিল করেছেন, যাতে সমগ্র প্রাথমিক মুসলমানগণ এক সাথে ইকমালে দীনের ঘোষণা পেয়ে যান। আর উক্ত আয়াতকে প্রকাশ করে তাদের অন্তরে এ কথা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল করেছেন যে, আজ যেহেতু দীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তাহলে আজকের পর পৃথিবীতে কোনো নতুন নবী আসবেন না এবং দীনও আসবে না এবং আগাত দ্বীনে কোন প্রকার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ও রহিতকরণও হবে না। সুতরাং তা শুধু ইকমালে দীনের ঘোষণাই ছিল না বরং এর ইশতেহার ও আহ্বান ছিল। আয়াত নাযিলকে প্রকাশ করে ও সকলের সামনে তা তুলে ধরে এই সংবাদ সকলের সামনে প্রচার করলেন যে, এখন থেকে তোমাদের মুক্তির সীমাবদ্ধতা হলো দ্বীনে ইসলামের মধ্যে অন্য কোন ধর্মে মুক্তি নেই। ইরশাদ হয়েছে–

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

কেউ ইসলাম ছাড়া দীন হিসেবে অন্যকিছু তালাশ করলে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে পরকালে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আকমালে দীন সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন

উল্লিখিত বিষয়ের পাশাপাশি ব্রেইনে এ কথাও রাখা উচিত যে, যদি ইসলামের এই বুনিয়াদী (ইকমালে দীন) দাবি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর দিন সর্বশেষে নাযিল করা হতো, তাহলে তার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার না হওয়া ছাড়াও এতে একটি ক্ষতিকর সন্দেহ সৃষ্টি হতো যে, যদি উক্ত দাবি ঘোষণার মধ্যে কারো সন্দেহ সৃষ্টি হতো এবং তার নিরসনের ব্যাখ্যা না পেত, যা আয়াত নাযিল হওয়ার পর নব্বই দিন পর্যন্ত পেয়েছে, তাহলে উক্ত সন্দেহ সমাধানের কোন উপায় হতে না। আর এমন পরিস্থিতিও হতে পারত যে, নিজেদের পক্ষ থেকে ইকমালে দীনের মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করে পরিপূর্ণ ও কামেল দীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে ফেলত এবং পরবর্তীতে আবির্ভূত ত্রিশজন ভণ্ড নবী যারা হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করে নবুওয়ত দাবি করেছিল, তারা নিজেদের উদ্দেশ্য এভাবে হাসিল করে নিত যে, সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ দীন অর্থ এই নয় যে, তার পরে কোন নবী আসবে না। অথবা এই দীনের কোন ব্যাখ্যা ও বিশদ বর্ণনাও নাযিল হবে না। কিন্তু যেহেতু উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নব্বই দিন দুনিয়াতে ছিলেন এবং ইকমালে দ্বীনে হাকিকত পরবর্তী হাদিস দ্বারা আরো সুস্পষ্ট ও বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামগণ দীন কামেল ও পরিপূর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছেন। কেমন যেন এখানে সবাইকে সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, যদি দীন ইকমাল ও পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন জীবিত আছে, এখনও তাঁর নিকট ওহী আসছে নিরসন করে নিতে পার। এমন কর্মপদ্ধতি ইকমালের দাবিকে সর্বপ্রকার সন্দেহ ও আশঙ্কা থেকে পবিত্র করে দিয়েছে। অন্যথায় হাদিসে কিরতাস যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের দিন তার যবান মোবারক হতে প্রকাশ হয়েছিল, সেই হাদিসের

ব্যাখ্যার ব্যাপারে পরবর্তী লোকেরা পিপাসিত রয়েছে, আশ্বস্ত হতে পারেনি। এমনকি কিছু মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল, যা থেকে অবৈধ ফায়দা গ্রহণ করে রাফেযীরা যুদ্ধ বাঁধিয়েছিল এবং ফেতনা আবিষ্কারের উসিলা গ্রহণ করেছিল। শুধু এতটুকু কারণে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার কোন বিশদ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দিয়ে যেতে পারেননি, যা সর্বসাধারণের মুখকে বন্ধ করবে।

তেমনিভাবে ওই আয়াত যাতে ইসলামের পূর্ণতা ও মুক্তির একমাত্র উপায় হওয়ার বুনিয়াদী দাবি করা হয়েছে যদি নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত দিবসে শেষ মুহূর্তে নাযিল হতো এবং পরবর্তী ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট না হতো, তাহলে এহেন সম্ভাবনা ছিল যে, ইকমালে দীন সম্পর্কে জাতিকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা পেশ করে তাদের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করে জাতিকে ফেতনায় জড়াত। আর যুগের দাজ্জাল ও কাযযাবরা তাতে অবৈধ ফায়দা উঠাত। যেহেতু আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় নব্বই দিন দুনিয়াতে ছিলেন এবং ওহী নাযিলের ধারাও চালু ছিল, যাতে ইকমালে দীনের ব্যাখ্যা পরিপূর্ণরূপে করা হয়েছে। সেজন্য এমন প্রকারের সন্দেহের ধারা সর্বদার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

যাহোক; আয়াতের নুযুলের দীন বিদায় হজ্জে রাখা হয়েছে, যাতে একই সময়ে একই স্থানে মুসলমানদের সর্বসাধারণ ও বিশেষ পার্সনের সমাবেশে ইকমালে দীনের ঘোষণা হয়ে যায় যে, এই সমাবেশের পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হায়াতে আর কোন বিশাল সমাবেশ কায়েম হবে না। অতঃপর আয়াত নাযিলের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু দিন দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রেখে ইকমালে দীন সম্পর্কে সকল সন্দেহ ও অভিযোগকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য ছিল। যদি সরাসরি ওফাতের দিন নাযিল হতো, তাহলে এমন সন্দেহ দূর হতো না।

তারপর আবার اَلْيَوْمَ দ্বারা নির্দিষ্ট দিন উদ্দেশ্য নেয়া হয়নি এবং প্রচলিত যুগ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, যাতে পরবর্তীতে নাযিলকৃত সকল আয়াত ইকমালের বেষ্টনিতে এসে পড়ে এবং পরিপূর্ণ দীন তার সমস্ত অংশ মিলে পূর্ণতা লাভ করে। অভ্যন্তরীণভাবে কুরআনের বিন্যাস চাই নুযুল হিসেবে হোক চাই সংকলন হিসেবে হোক তাতে কোন দোষ থাকবে না।

খালক ও কাসব

দ্বিতীয় প্রশ্ন : خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ "আল্লাহর তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন।" উল্লিখিত আয়াত বান্দার উপর বাধ্যকরণ এবং সে মুজরিম ও অপরাধী না হওয়া উপর আলোকপাত করেন। কারণ, তার কুফরী কর্ম আল্লাহর পক্ষ হতে?

উত্তরঃ উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বান্দার মাজবুরি বা অক্ষমতা প্রমাণিত হয় না। কারণ, এই খাতাম ও মোহর মারা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তারই সৃষ্টি করা ও আবিষ্কার করার দ্বারা কার্যকরি হয়েছে; কিন্তু তার সৃষ্টি সংকলিত হয়েছে বান্দার কাসব ও কৃতকর্মের কারণে। অর্থাৎ বান্দা কুফরী কর্ম করতে করতে নিজের সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে ধ্বংস করে ফেলেছে। তখন আল্লাহর তায়ালার সর্বশেষ কর্ম তার উপর খাতাম বা মোহর আকৃতিতে সংকলিত হয়েছে। সুতরাং বান্দা হলো যোগ্যতা ধ্বঃসের কারণ আর আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা। আর তা শুধু আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ ফেল বা কর্ম হিসেবে হয়ে থাকে না বরং সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত এই কাসব ও খালক একত্রে চলতে থাকে। যখনই কোন বান্দা কোন ঈমানি বা কুফরী কর্ম করতে ইচ্ছা করে, আল্লাহ তায়ালা তার কর্মের অস্তিত্ব দান করেন অর্থাৎ সৃষ্টি করে দেন। সে কোন কর্মের ইচ্ছা করলে তাও সৃষ্টি করে দেন।

ইচ্ছা করার পর ওই কাজ করলে তিনি তার কর্মকে সৃষ্টি করে দেন। এক কথায় বান্দা যেমনভাবে নিজ কর্মে স্বাধীন ও মুক্ত, তেমনিভাবে তার কর্মের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরের প্রকাশে এবং কার্যক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন না। অন্যথায় বান্দার কাসব বা কর্মের উপর যদি আল্লাহর খালক ও আবিষ্কার এবং অস্তিত্ব প্রদান করা সংকলিত না হয়, তাহলে বান্দা নিরুপায় হয়ে যাবে, সে কিছুই করতে পারবে না।

এমনিভাবে তার মধ্যে যে সৃষ্টিগত ধাতু ও পদার্থ রাখা হয়েছে, তা প্রকাশ পাবে না, প্রকাশ করতে পারবে না।

প্রকাশ থাকে যে, এহেন কর্ম কৃপণতার পাশাপাশি ইনসাফবহির্ভূত এক প্রকার জুলুম ও অন্যায় যে, কোন বস্তুর মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ভাল-মন্দ ধাতু রেখেছেন; কিন্তু তা প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ দেন না। অথচ আল্লাহর দরবার কৃপণতা ও জুলুম থেকে পবিত্র ও মুক্ত। সুতরাং বান্দার অপারগতা এতে তো দূর হতে পারে যে, সে কোন কর্মের ইচ্ছা করবে আর তা প্রকাশ হবে না। তাতে তো সে নিরুপায় হবে না যে, সে যখন কোন কাজ করতে চায়, তখন সেই কর্মের

জাহেরী ও বাতেনী শক্তির উপর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা আরোপ না হলে বরং আল্লাহ তার সাহায্যের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকলে যে এদিকে সে কর্মের ইচ্ছা করবে আর তা প্রকাশ হবে না। তাতে তো সে নিরুপায় হবে না যে, সে যখন কোন কাজ করতে চায়, তখন সেই কর্মের জাহেরী ও বাতেনী শক্তির উপর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা আরোপ না হলে বরং আল্লাহ তার সাহায্যের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকলে যে এদিকে সে কর্মের ইচ্ছা করবে আর অপরদিকে হঠাৎ ওই কর্ম তার থেকে প্রকাশ পেয়ে যাবে।

অর্থাৎ বান্দার কাসবে এবং আল্লাহর খালকে কোন প্রকার বিলম্ব ও বিরতি প্রতিবন্ধক না হলে। এদিকে বান্দার কাসব হয়েছে আর অপরদিকে আল্লাহর খালক প্রকাশ পেয়েছে। এর উদাহরণ এমনভাবে বুঝে নিন যে, বিদ্যুতের আলোর মধ্যে সুইচ এবং কাঁচের গোলাকৃতি বস্তুর সম্পর্ক রয়েছে। যখনই সুইচ নিচে নামানো হবে তখনই সাথে সাথে কাঁচের গোল বাতি আলোকিত হয়ে যাবে। অতএব সুইচের নড়াচড়া বান্দার কাসবের উদাহরণ আর বাতি আলোকিত হওয়া আল্লাহর খালকের দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ যেমনভাবে সুইচদাতার আলোকিত বানান বা পাওয়ার হাউজ থেকে কাঁচের বাতিতে আলো আনয়নে তার কোন সামান্য দখল নেই। তদ্রূপ কর্ম কাসবকারী বান্দার কর্ম প্রকাশে এবং ফলাফল বিদ্যমানে তার কোন প্রকার দখল নেই। তার কাজ শুধু কর্মের ইচ্ছা করা অর্থাৎ কর্মের হরকত বা নড়াচড়া করা। উক্ত ইচ্ছা সৃষ্টি করা ও আবিষ্কার করা এবং উক্ত কর্মকে অস্তিত্ব দান স্বয়ং বান্দার কাম নয় বরং আল্লাহর কাজ। অতএব একজন বদ আমলকারী ব্যক্তি যখন অন্যায়মূলক এবং কুফরী কর্মের হরকত শুরু করে তখন আল্লাহতায়ালা সেই হরকতগুলোকে অস্তিত্ব দিতে শুরু করেন। আর যখন সে কুফরী কর্ম করতে করতে এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতা ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা ওই ধ্বংসাত্মক ও বাতিল যোগ্যতাকেও অস্তিত্ব দেন এবং সৃষ্টি করেন।

সুতরাং ওই ধ্বংসাত্মক কর্ম, আবিষ্কার ও অস্তিত্বকে খাতাম বা মোহর মারা বলে। অর্থাৎ আল্লাহ তার উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন যে, এখন তাতে ঈমান প্রবেশ করবে না।

সুতরাং ঈমান গ্রহণের পথ বান্দা নিজেই নিজের উপর আপন কর্ম দ্বারা বন্ধ করে ফেলেছে। আল্লাহ তায়ালা তো শুধু তার কর্মগুলো ওজুদে এনেছেন, অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। তিনি তার ঈমান গ্রহণের পথকে রুদ্ধ করেননি। এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, জুরম ও মাসিয়্যাত তথা পাপ ও অন্যায় হলো কাসবে শার (মন্দ কর্ম), খালকে শার (মন্দ সৃষ্টিকারী) নয়। কারণ, খালক অর্থ অস্তিত্ব প্রদান করা

এবং ওজুদে নিয়ে আসা। ওজুদ বা অস্তিত্ব প্রদান করা কোন অবস্থাতেই মন্দ ও অন্যায় পাপ হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, অস্তিত্বপ্রাপ্ত বস্তু কখনো তার সত্তা হিসেবে ভাল বা মন্দ হতে পারে। কিন্তু তাকে অস্তিত্ব প্রদান করা কোন অবস্থায় মন্দ হবে না, অন্যায় কর্ম হবে না। কেননা, ওজুদ ও অস্তিত্ব প্রদান করা কেবলই অনুগ্রহ। ওজুদের মত নেয়ামত কোন বস্তুকে প্রদান, ইনসাফই ইনসাফ যে প্রতিটি বস্তুকে আপন গোপনকৃত সৃষ্টি গত জাওহার প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া হয় এবং তার বৈশিষ্ট্যাবলি প্রকাশে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। অতএব মুজরিম বা অপরাধী হিসেবে স্বীকৃতি দিলে মন্দকর্মচারী বান্দাকেই দিতে হবে। ওই কর্মগুলোর অস্তিত্ব প্রদান আল্লাহকে অপরাধী বলা যাবে না।

সারকথা হলো, বান্দার কুফরী কর্ম নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ হতে। কিন্তু সৃষ্টিগত, কাসবগত নয়। আর মুজরিম শুধু কাসিব হয়ে থাকে। খালিক বা অস্তিত্বদানকারী নয়।

কুরআনুল কারীম তাসমিয়্যাহ্ ও তাহমীদ দ্বারা শুরু করার কারণ

তৃতীয় প্রশ্নঃ কুরআনুল কারীম তাসমিয়্যাহ (বিসমিল্লাহ) ও তাহমীদ (হামদ) দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, কুরআন আল্লাহর কালাম নয়, মানুষ তাকে তালীমের উপর ন্যস্ত করে। কিন্তু যেহেতু উক্ত তাবীলের জন্য কোন দলিল প্রমাণ নেই, সে কারণে উক্ত মতের বিরোধিতা একে মেনে নেয় না এবং অন্তরের প্রশান্তিও অর্জন হয় না।

উত্তরঃ অভিযোগটি সুস্পষ্ট নয় যে, সে মোতাবেক উত্তর দেয়া হবে। এতে অনুমান হয় যে, স্বয়ং অভিযোগকারী নিজের অভিযোগ বোঝেননি। সন্দেহযুক্ত কথা থেকে এ কথা বুঝে আসে যে, কেউ কি নিজেই নিজের নাম দ্বারা আপন কথা আরম্ভ করে অথবা কেউ কি নিজের নাম দ্বারা বরকত অর্জন করে অথবা কেউ কি নিজের নাম দ্বারা সাহায্য চায়? অর্থাৎ এমন ধরনের কালাম সর্বসাধারণের প্রচলিত নিয়মের বিপরীত। প্রথমোক্ত সন্দেহের কোন ভিত্তি নেই। কারণ, সব স্থানে ও সব জাতির প্রচলন এক হয় না– পৃথক পৃথক হয়। যদি একস্থানে এক নিয়ম না থাকে, তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে যে, তা অন্য স্থানে নিয়ম আছে। সুতরাং হতে পারে, এমনটি কুরআনের প্রচলন যে, নিজের নাম দ্বারা কালামের সূচনা করে।

তারপর এ কারণেও হতে পারে যে, অনেক সময় স্বয়ং মুতাকাল্লিম (বক্তা) নিজের নাম উল্লেখ করেন, যাতে পরবর্তী কথার পরিচয় ও সম্পর্ক উপস্থিত ব্যক্তি এবং সম্বোধিত ব্যক্তিদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন অধিকাংশ পত্র নিজের নাম দ্বারা শুরু করা হয়, যাতে প্রথম নজরে মুখাতাব বুঝে নিতে পারে যে, তা অমুকের বিষয়বস্তু। এমন জটিলতা যাতে না থাকে যে, লেখক কে বা করনেওয়ালা কে? এ কারণে ওই মূলনীতির ভিত্তিতে কালামকে আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করা অভিযোগযোগ্য হয়নি। একটু গভীর চিন্তা করলে এমন বাস্তবতা ও হাকিকত বের হয়ে আসবে যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত কালাম (কথা) কোন কোন বড় ব্যক্তিত্ব বড় নিসবত বা বড় সিফাতের দ্বারা শুরু করা শুধু উত্তমই নয় বরং উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে। আর এটি একটি স্বভাবজাত বিষয়। অতএব এ ব্যাপারে আপনাদেরও অভিযোগ থাকবে না বরং উত্তম ও যুক্তিসঙ্গত জানবেন যে, বান্দা তার কালামকে আল্লাহর নামে এবং তার প্রশংসা ও গুণাবলি দ্বারা আরম্ভ করবে, যাতে এই বিষয়টি জন্মগত স্বভাবজাত ও যুক্তিসঙ্গত হওয়া সুস্পষ্ট হয়।

প্রকাশ থাকে যে, ফিতরাত হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে, যা দ্বারা বান্দাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, সাজানো হয়েছে। সুতরাং বান্দার মাঝে প্রতিটি ফিতরাত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। এ কারণে এই পদ্ধতি যে কালাম শুরু করা কোন বড় ব্যক্তিত্বের নাম দ্বারা বা নিসবাত ও সিফাত দ্বারা করা, প্রথমত আল্লাহর কালাম হওয়া চাই। বান্দা তো শুধু তা নকল করবে। কেননা, বান্দা সে নিজে আসল নয় এবং তার অস্তিত্বও আসল (মূল) নয়। না তার জাত ও সিফাত কোনটাই আসল। প্রত্যেক বস্তুর আসল হলেন আল্লাহ। তাঁর জাত, সিফাত ও কর্ম সবই আসল। তাঁর দ্বারা যত বস্তু রয়েছে, তা সবই রূপক ও প্রতিবিম্ব। এজন্য কালামের উক্ত ঢং বা পদ্ধতি যদি ভালো ও উত্তম হয়, অবশ্যই তা উত্তম। তাহলে সর্বপ্রথম ওই পদ্ধতি কালামে ইলাহীতে হওয়া উচিত। বান্দাদের মাঝে উক্ত ঢং শুধু ছায়া ও রূপকভাবে আল্লাহ থেকে আসবে। আর বান্দা শুধু বর্ণনাকারী হবে– আসল নয়।

সুতরাং এদিকে তো এই মূলনীতি যুক্তিসঙ্গত যে, কালামের শুরুটা কোন বড় জাতের নাম দ্বারা বা সিফাত ও গুণাবলি বর্ণনা দ্বারা হওয়া উচিত। আর এ দিকে এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, আল্লাহর চেয়ে বড় কেউ নেই। নেই কারো নাম তার নামের চেয়ে বড়। তার সিফাত ও কর্ম থেকে কারো সিফাত ও কর্ম বড় নেই। নেই কারো প্রশংসাও গুণাবলি বর্ণনা আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনা করা হতে উত্তম।

এজন্য কালামে ইলাহীর মাঝে উক্ত উত্তম পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া অন্য পদ্ধতি হতে পারে না যে, আল্লাহ পাক আপন কালামকে আপন সিফাত এবং নিজেরই নাম ও নিজের প্রশংসা দ্বারা শুরু করবেন। এমনকি চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, বান্দা ও নিজের কথাকে আল্লাহর নাম, ছানা ও সিফাত দ্বারা এজন্য শুরু করেন যে, তার নামের চেয়ে বড় আর কারো নাম নেই এবং বড়দের নাম দ্বারা কথা শুরু করাই যুক্তিসঙ্গত এবং স্বভাবজাত কর্ম। এমতাবস্থায় বান্দাদের জন্যও কোন উপায়ন্তর নেই যে, তারাও নিজেদের কথা ও কাজ আল্লাহর নামে শুরু করবে। তেমনিভাবে হাদিসে নববীতে এই কাজের তালীম দেয়া হয়েছে যে–

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ

যে কর্ম আল্লাহর নাম ব্যতীত শুরু করা হয়, তা বরকতহীন হয়।

সুতরাং বড় নামে কথা শুরু করা যুক্তিসঙ্গত, শরীয়তসিদ্ধ এবং সুপ্রচলিত। সেজন্য আল্লাহর কালামের সূচনা আল্লাহর নাম দ্বারা ওই ফিতরী মূলনীতির অধীনে, যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও কথাকে বড় নামে এবং বড়দের প্রশংসায় সূচনা করাই ফিতরাত বা স্বভাবজাত কর্ম। আর তাঁর নামে চেয়ে বড় কোন নাম নেই এবং তার প্রশংসার চেয়ে বড় কোন প্রশংসা নেই এবং তার শানের চেয়ে দামি কারো শান নেই। তারপরও কী কথা শুরু করার পূর্বে চাই তার কথা হোক বা বান্দার কথা হোক, তার নাম ছাড়া অন্য নাম ব্যবহার হবে? উভয়ের মাঝে পরখ এতটুকু হবে যে, বান্দা নিজের কালামের শুরুতে আল্লাহর নাম ব্যবহার করে বরকত অর্জন করবে। আর আল্লাহ তার কালামের শুরুতে নিজের নাম ব্যবহার করে বরকত জাহের করবেন। এখানে বরকত হাসিলের প্রশ্ন নেই যে, তিনি নিজেই খায়ের ও বরকতের উৎস। আর বান্দার বেলায় বরকত জাহের করার প্রশ্ন নেই যে, বান্দা নিজের জাতের মধ্যে কোন খায়ের ও বরকত রাখেনি, যা সে প্রকাশ করবে। এজন্য আমরা বিসমিল্লাহ বলব। তখন উদ্দেশ্য হবে বরকত ও সাহায্য অর্জন করা। আর আল্লাহ বিসমিল্লাহ বললে উদ্দেশ্য হবে বরকত সাহায্য জাহের এবং প্রসার করা। এ কারণে আমরা বিসমিল্লাহকে শুধু তালিম হিসেবে ধরি না বরং আমলগতভাবে ওই ফিতরাত হিসেবে ধরি যে, কালাম শুরু করা কোন সম্মানিত নামে বা সম্মানিত গুণে তা প্রত্যেক সুস্থ মেধা এবং সুস্থ তবিয়তের চাহিদা এবং এমনটিই আসল ফিতরাত বা স্বভাবজাত কর্ম।

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

এমনটিই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। *[সূরা রোম : ৩০]*

প্রশ্ন ও অভিযোগে যেহেতু কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই, এজন্য ইজমালি বিশ্লেষণ পেশ করেছি। অভিযোগের নির্ধারিত কোন সাইড পরিলক্ষিত হলে সে সম্পর্কে আরো কিছু পেশ করতাম।

চতুর্থ প্রশ্ন :

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

পরম দয়াময় আরশে সমাসীন হয়েছে। *[সূরা তোয়াহা : ৫]*

আল্লাহর অবস্থানস্থল এবং তার স্থানের প্রয়োজন হওয়াকে বোঝায় এবং তা দেহ ও গঠনের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ হয়। আর লোকেরা একে সন্দেহযুক্তভাবে করে থাকে যে- "এ সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন।"

তখন বিশ্বস্ত অন্তর তো একে মেনে নেয়; কিন্তু যুক্তি ও দলিল অন্বেষণকারীকে কিভাবে বুঝানো সম্ভব যে, স্বয়ং মুতাকাল্লিমই সে সম্পর্কে জানেন। এমতাবস্থায় বক্তার বক্তব্যই বেকার হয়ে যাবে। আর অপরদিকে উক্ত আয়াতের তরজমা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। এটি একটি জরুরি বিষয়, যার সমাধান ও বিষদ ব্যাখ্যার জন্য জনাবকে কষ্ট উঠাতে হবে। আশা করি ক্ষমা করবেন।

অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে মুতাকাল্লিমের অধিকার

উত্তর : প্রত্যেক ব্যক্তির কালামের (কথার) উদ্দেশ্য তার সমষ্টিগত জীবন এবং তার পরিচিত মর্যাদা মোতাবেক গ্রহণ করা হয়। অতএব কালামের মাকসাদ ও উদ্দেশ্য বুঝার জন্য শুধু মুতাকাল্লিমের শব্দাবলি সামনে রাখলেই চলবে না বরং তার যিন্দেগীর অবস্থা, গুণাবলি এবং তার শান, চালচলন ইত্যাদিকেও সামনে রাখা আবশ্যক। ফেরাউনও 'আমিই রব' বলেছে এবং মানসুর হাল্লাজ ও 'আমি আল্লাহর' বলেছেন। দাবি উভয়ের একই। কিন্তু একজনকে তার দাবির কারণে আপনারা অভিশপ্ত স্বীকৃতি দেন। আর অপরজনকে তার দাবির ভিত্তিতে মাকবুল তথা গ্রহণযোগ্য বলেন। উক্ত পার্থক্য দাবি ও কালামের ভিত্তিতে নয়, যখন উভয়ের দাবি ও কালাম এক। বরং ওই পার্থক্য শুধু অবস্থার ভিত্তিতে। ফেরাউনের সমষ্টিগত হালত কুফর ও জেনে বুঝে অস্বীকার করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা ও বিরোধিতা করা। সেজন্য তার 'আমিই রব' বলাটা আল্লাহর মোকাবেলায় নিজরে স্বনির্ভরতা ও ওজুদ ও অস্তিত্বকে প্রমাণ

করা। অর্থাৎ আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং নিজেকে প্রমাণ করা। কেমন যেন ফেরাউনের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহপূর্ণ অবস্থানের দ্বারা তার দাবির উদ্দেশ্য এমন বের হয় যে, আমি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি ভিতরে ও বাইরে উভয় স্থানে শুধু আমিই আমি। না আমার ভিতরে কারো অস্তিত্ব আছে, না আমার বাইরে কারো অস্তিত্ব আছে।

আর মানসুর হাল্লাজের জীবনের লক্ষ্য হলো আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যয়ন ও মহব্বত। তার দাবির উদ্দেশ্য এমন বের হয় যে, আমি শুধুই অস্তিত্বহীন, আমার কোন প্রকার অস্তিত্ব ও সুবুত নেই। বাহ্যিক ও বাইরে নজরে তো আমি কিছু নই এমনকি ভিতরগতও আমি কিছু নই। ওজুদ ও অস্তিত্ব বলতে কিছু থাকলে একমাত্র তিনিই (আল্লাহ) চিরস্থায়ী বলতে তিনিই অন্য কেউ নয়। অর্থাৎ আমি ভিতর ও বাহির কোন অবস্থায় কিছু নই, সবই তিনিই তিনি। অতএব ফেরাউনের 'আমিই রব' বলার দ্বারা বাতিল প্রমাণিত হয় এবং হক নফী হয় আর মানসুরের আনা বলার দ্বারা হক সাবেত হয় এবং বাতিল নাফী হয়।

কিন্তু জানা থাকা জরুরি যে, উভয়ের কালামের মাঝে এই আজিমুশ্বান তফাৎ শব্দাবলি এবং দাবির তফাৎ নয় বরং শুধু তাদের অবস্থা ও চালচলনের তফাৎ, যাকে সামনে রেখেই তাদের কথা ও দাবির উদ্দেশ্য ও অর্থ গ্রহণ করতে পেরেছি। একই কারণে মুসলিম ও কুফফারদের কার্যাবলি বিশেষ জীবন যাপনের কর্মকাণ্ডগুলো সম্পূর্ণরূপে একই রকমের হয়। তারাও আহার ও পান করে এবং জীবনোপকরণ সঞ্চয় করে। মুসলমানরাও করে। কিন্তু এক দলের সকল কর্ম মকবুল এবং সাওয়াব বৃদ্ধির কারণ হয় আর অপর দলের সমস্ত কর্মকাণ্ড অভিশপ্ত এবং গোনাহ ও পাপ বৃদ্ধির কারণ। এখানে শুধুই অবস্থার পার্থক্য। সুতরাং কারো কথা হোক বা কর্ম হোক তার অর্থ ও উদ্দেশ্য নেয়ার সময় ওই ব্যক্তির অবস্থাদি সামনে রেখে নিতে হবে। একজন নেককার মানুষ যার স্বাভাবিক অবস্থা হলো নেকী ও তাকওয়ার। যদি ঘটনাক্রমে কখনো কোন ভুল হয়ে যায়, তাহলে তার ব্যাখ্যাও সুন্দর গ্রহণ করা হয়। আর একজন বদকার ব্যক্তি যার মাঝে বদকর্ম ও অন্যায় কর্ম প্রবল থাকে। ঘটনাক্রমে কোন নেকী কর্ম করলে তাকেও স্বার্থপরতা এবং বদনিয়তের প্রতি ব্যাখ্যা করা হয়। তার ভিত্তি ওই মূলনীতি যে, কারো কালাম এবং এর উদ্দেশ্য, তার অবস্থা, চালচলন এবং শান ও গুণাবলিকে সামনে রেখে নিতে হবে।

ঠিক তেমনিভাবে বুঝে নিন, আল্লাহর শান এমন যে, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ কারো বানানোর দ্বারা তিনি পয়দা হননি। বরং নিজে নিজেই হয়েছেন। অস্তিত্ব

একমাত্র তাঁরই- অন্য কারো নয়। এজন্য কোথাও কিছু হলে তাঁর বেষ্টনির ভিতরেই হবে, তাঁর বাইরে হবে না। সে কারণে অবশ্যই তার ওজুদও সীমাহীন হবে। যদি তিনি সীমাবদ্ধ হন, তাহলে যার সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তার সীমার বাইরে অন্যজনের ওজুদ ও অস্তিত্ব হবে। তাহলে ওজুদ ও অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস থাকবে না এবং অজুদদাতা শুধু তিনিই থাকবেন না, অন্যরাও অজুদদাতা হতে পারে। ফলে অনেক সৃষ্টিকর্তা তৈরি হবে। (নাউযুবিল্লাহ)! এ কারণে আসল ওজুদ যদি একমাত্র তিনিই হন, তাহলে তাকে সীমাহীন মানতে হবে এবং প্রতিটি বস্তু তাঁরই ওজুদে বিদ্যমান এবং তার ওজুদের বেষ্টনীর ভিতরে রয়েছে তা স্বীকার করতে হবে। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে অন্যান্যের ওজুদ এমন শানওয়ালা হবে না যে, তাদের ওজুদকে টুকরো করে অন্যদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। অন্যথায় টুকরো হওয়ার পর তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা এসে যাবে। তখন তার সীমাহীনতা অবশিষ্ট থাকবে না, যা তার নিজের জন্য আবশ্যক ছিল। বরং অন্যরা যখন তার থেকে ওজুদ পাবে, তখন বিষয়টি একবোরে এমন হয়ে যাবে, যেমন সূর্যের আলো থেকে পৃথিবীবাসী আলো অর্জন করে থাকে। অর্থাৎ সূর্যের আলো পড়ার সাথে সাথে আলোকিত হয়ে যায় আর সূর্যের আলো তার জাতের মধ্যেই কায়েম থাকে।

আর আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, কারো বানানোর দ্বারা অস্তিত্বে আসেননি। তার অস্তিত্বই আসল অস্তিত্ব- কারো দান করা নয়। আর ওজুদে আসলি যেহেতু সবাইকে বেষ্টন করে নেয়, তাহলে তিনি সর্বদা আছেন এবং সর্বত্র আছেন। অর্থাৎ লা মাহদুদ তার দ্বার অন্যান্যরা ওজুদ ও অস্তিত্ব পায়। অতএব স্বয়ং তার ওজুদ টুকুরো হতে পারে না, যা তার দেহ এবং আকৃতি হতে মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার নিদর্শন। কারণ, স্বয়ং ওজদু একটি অতি সূক্ষ্ম বস্তু, যা চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নিজে নিজে হওয়া এবং সবকিছুকে বেষ্টনকারী হওয়া, দেহ না হওয়া, এগুলো তার আসল শান ও গুণাবলি। এখন যদি اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى এর কালাম সামনে আসে, তাহলে ওই পূর্বের মূলনীতি মোতাবেক এই কালামের উদ্দেশ্য ও অর্থ শুধু শব্দাবলি দ্বারা নেয়া হবে না বরং আল্লাহ তায়ালার সকল শান ও সিফাত সামনে রেখে উদ্দেশ্য স্থির করতে হবে। আর তাঁর শান হলো এই যে, তিনি মাহদুদ নন, তাঁর দেহ নেই, না তিনি কারো বেষ্টনিতে আছেন, না তিনি কারো আয়ত্তে আছেন বরং সবকিছু তার বেষ্টনিতে। তাহলে اسْتَوٰى দ্বারা তাঁর দেহ ও অবয়ব কিভাবে প্রমাণিত হবে এবং তাঁর গঠন কিভাবে অনুভব হবে?

হ্যাঁ, তখন হতে পারে যে, এই পবিত্র মুতাকাল্লিমের কালামের শুধু শব্দাবলিকে সামনে রেখে এবং তার প্রমাণিত সকল শান ও গুণাবলি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে اسْتَوٰى এর অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি শব্দাবলির সঙ্গে তার অবস্থাদিকে মিলানো হয়, যা বর্ণিত মূলনীতির ভিত্তিতে আবশ্যক, তাহলে اسْتَوٰى এর দ্বারা দেহবিশিষ্ট হওয়া এবং গঠন হওয়ার সাথে দূরতম সম্পর্কও রাখবে না।

আরশ হল বিশেষ রহমতের পাত্র

গভীর চিন্তা করলে দেখা যাবে, যদি আরশ দ্বারা কিছু সাবেত হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালার একটি সিফাত অর্থাৎ রহমতে বিশেষ সম্পর্ক সাবেত হয়। তাঁর জাত ও সত্তা সাবেত হয় না। আর তাও পাত্র হিসেবে ব্যবহার হয়। কেননা, এখানে اللهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى বলা হয়নি বরং اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى বলা হয়েছে। এর সারনির্যাস হলো এই যে, আরশের উপর আল্লাহ তায়ালার সিফাতে রহমত ছড়িয়ে আছে। আর সেখানে তাঁর এই বিশেষ শানের (রহমতের) প্রকাশস্থল এবং তাজাল্লিগাহ তথা উদ্ভাসিত হওয়ার স্থান। আর এর রহস্য হলো এমন যে, আরশ হলো পরিচালনার স্থান এবং সেটি একটি শাহী সিংহাসন, যাতে সালতানাতে ইলাহীর দরবার চলে এবং জগৎসমূহকে পরিচালনা করা হয়।

সুতরাং এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, সমগ্র সালতানাত রহমতপূর্ণ, রহমত ও করম এবং সহানুভূতি ও অনুগ্রহের উপর ভিত্তি। গযব গোস্বা বা অলস সাংবিধানিক চালবাজির উপর ভিত্তি নয়। অন্য কথায় বলা যায়, কায়েনাতের প্রতিটি বস্তু আমার রহমত ও করমের উপর পরিচালিত হচ্ছে। এহেন বাস্তবতাকে আল্লাহ তায়ালা উপলব্ধিগতভাবে প্রকাশ করে এভাবে বলেছেন যে, আরশকে তো সমগ্র জগতের উপর পরিবেষ্টন করেছি যে, এর বাইরে কোন জগত নেই এবং আরশের উপর রহমত গুণকে বেষ্টন করে দিয়েছি। ফলে রহমত সমগ্র জগৎসমূহেকে বেষ্টন করে নিয়েছে।

এতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আমার সালতানাতের ভিত্তি প্রভাব ও শাসনের উপর নেই বরং রহমত ও অনুগ্রহের উপর। এ কারণে মানুষ রাত-দিন সর্বদা কুফরী ও পাপে লিপ্ত; কিন্তু রিযিক ও রহমতের বর্ষণ বন্ধ হয় না। তবে কখনো বিশেষ সময় বান্দারা যখন জুলুম ও অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন করে ফেলে, তখন সতর্কতামূলক শাস্তি দেয়া হয়। পরিণামে এরও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে রহমত ও দয়া।

যাহোক, আরশ শব্দের উপর اسْتَوٰى এর অর্থ শারীরিক অবস্থান হিসেবে প্রমাণিত হয়নি, যা আল্লাহ তাঁর শান ও হালসমূহের তাকাজা এবং সমাসীন হওয়া আল্লাহর সত্তা হয়নি বরং তাঁর রহমত সিফাতের পরিবেষ্টন হয়েছে। অতএব তা দ্বারা আল্লাহ দেহবিশিষ্ট হওয়া বা মাহদুদ হওয়া বা গঠন আকৃতি হওয়ার কি সম্পর্ক রয়েছে? উক্ত সন্দেহ আয়াতের উপর আরোপিত হবে।

'ইসতাওয়া'র কাইফিয়্যাত অজানা

হ্যাঁ, এই শানে রহমত আরশের উপর ছড়িয়ে আছে। তার অবস্থা অজানা যে, এর পরিমাণ কতটুকু এর ধরন কেমন। রহমতের অবস্থা না জানার কারণে 'এর অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন' বাক্যটি বলা হয়ে থাকে যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাই অধিক জ্ঞাত। আর اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ এর অর্থ অজানা নয়। اسْتِوَاء عَلَى الْعَرْشِ হলো আল্লাহর সিফাতের রহমত। আর এই ইসতাওয়া সমগ্র আরশকে বেষ্টন করে আছে। কারণ, দেহ ও আকৃতি হিসেবে আরশ সমগ্র জাহানসমূহকে বেষ্টন করে আছে। তাই সিফাতে রহমত ও মহিতুলকুল তথা সর্ববেষ্টন সাবেত হয়। কিন্তু এমন অনুমানে যেমন আমাদের রূহ আমাদের সমগ্র দেহকে বেষ্টন করে আছে, দেহের কোন অংশ ও রূহের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নেই; কিন্তু এত কিছুর পরও আমরা রূহের ওই কাইফিয়্যাতকে জানতে পারি না যে কাইফিয়্যাতে রূহ দেহে ছড়িয়ে আছে এবং যেভাবে সে দেহের সমস্ত কায়েনাতকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু এতে এই উদ্দেশ্য হয় না যে আমরা রূহের বেষ্টন ও সীমানা জানি না অথবা একে ইয়াকিনী ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি না। রূহের সম্পর্ক ও বেষ্টনকে ইয়াকিনী জ্ঞান করে যদি অজ্ঞতা প্রদর্শন করি, তাহলে তার কাইফিয়্যাত ও বেষ্টনের ধরন হতে অজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে, আসল ও মূল সম্পর্ক হতে অজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

সুতরাং আমরা ঈমানগতভাবে জানি এবং বিশ্বাস স্থাপন করি যে, শানে রহমত আরশের উপর এবং আরশের মধ্যস্থতায় সমগ্র জাহানের দেহে এবং রূহের উপর পরিবেষ্টিত আছে। কিন্তু আমরা ওই বেষ্টনের কাইফিয়্যাত ও ধরন জানি না। (আল্লাহ ভাল জানেন) বলে আল্লাহর উপর হাওলা ও সমর্পণ করে দেই। সুতরাং আমরা যতটুকু জানি এবং জানতে পারি, সেই হিসেবে উক্ত আয়াতে আমাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং ততটুকুর উপর ঈমান আনয়নকে আবশ্যক করা হয়েছে। আর যা জানতে পারি না, তার হাওলা আল্লাহর উপর করে দেয়ার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। আমাদের এমন কর্ম জরুরি

নয় যে, আমরা তার ধরন ও প্রকারভেদকে তালাশ করে আসলত্বের অনুসন্ধান করব। এ কাজ আমাদের আয়ত্তে ও সাধ্যে নয়। অতএব আল্লাহ তায়ালার এটিও শানে রহমত যে, তিনি আমাদের সাধ্য মোতাবেক শরীয়তের মুকাল্লাফ বানিয়েছেন– সাধ্যের বাইরে মুকাল্লাফ বানাননি।

[ইলম ও হেকমতের উপকারিতা প্রসঙ্গে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সময়ের বয়ান ও লিখনী হতে পরবর্তী অংশ সংকলিত। –অনুবাদক]

প্রসঙ্গ কথা

জনাব মুহতারাম ও মুকাররাম দামাত বারাকাতুহুম![১]

সালামে মাসনুন পর আবেদন। আপনার মেহেরবানি যে, পত্র ৪ঠা মুহাররামুল হারাম ১৩৭৩ হিজরি দিবসে পৌঁছেছে। আপনার (মুন্সি আবদুর রহমান খান, মুলতান) সংকলন দাস্তানে আমল ও আখলাক আদব নামক দুটি পুস্তিকা উপকারী এবং মূল্যবান কিতাব সংযোজনের কথা শোনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। উক্ত দু'কিতাবে দু'জন সম্মানিত আলেমের ভূমিকা সংযোজনে নূরুন আলা নূর তথা আরো উজ্জ্বল এবং পাঠকদের জন্য খুশি ও আনন্দের মিসদাক হয়েছে। আর মুহতারাম লেখক এই আহকারের কয়েকটি বাক্যের উদ্ধৃতি টেনে তার উপর প্রবৃদ্ধি ও ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করেছেন, যাতে মাওলানা খায়ের মুহাম্মাদ সাহেব দা. বা.-এর ইরশাদও অন্তর্ভুক্ত। আপনার ইঙ্গিতও তো কম নয়, আপনার ইশারার দ্বারা আরো ভারী বোঝা ঘাড়ে চাপল। এই দুর্বল কাঁধের উপর বোঝা অত্যধিক ভারী হওয়া সত্ত্বেও হালকা মনে হয়েছিল যে, তৎক্ষণাৎ তা পালন করে ফেলব। তারপরও যতটুকু বিলম্ব হয়েছে, তা আমার বিভিন্ন স্থানে সফরের ব্যস্ততার কারণে হয়েছে। জনাবের সম্মানিত পত্র দেওবন্দে এমন মুহূর্তে পৌঁছেছে, যখন আমি বোম্বে ছিলাম। ওখান থেকে ফিরে এসে তৎক্ষণাৎ লাক্ষৌ সফর করতে হয়েছে। সেখান থেকে ফিরে আসার পর মজলিসে শুরার দারুল উলূম দেওবন্দের বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব পড়ল। তা শেষ করার পর আলীগড় ও কানপুর সফর করতে হল।

উক্ত কারণে আজ ফিরে এসে রাতেই ঈশাবাদ যা কিছু মস্তিষ্কে এসেছে, হুকুম পালনার্থে নিম্নের লাইনগুলো লিখলাম এবং পুনরায় দেখা ব্যতীত পাঠালাম। ভাল মনে করলে আপনি অথবা হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ সাহেবের দ্বারা সংশোধনী করে নিবেন। এই আলোচ্য বিষয় মূলত আমার ওই তিন বাক্যের ব্যাখ্যা, যা আপনি নকল করে পাঠিয়েছেন। এ কারণে বিষয়ের সূচনা নিম্নের শিরোনামে করা হয়েছে–

---

[১] মুলতানের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুন্সি আবদুর রহমান খান সাহেবের উদ্দেশ্যে।

১. ইলমের উদ্দেশ্য হলো আমল,

২. ইলমের মূর ধাতু হলো তাকওয়া,

৩. ইলমের অলংকার হলো আদব-সাহিত্য।

কবিদের আদব

শব্দের জগতে বিচরণকারী কবিদের নিকট আদবের অর্থ স্বচ্ছ ও সাবলীল কথোপকথন এবং ভাষার অলংকার বর্ণনা করা। আর আদবের পুঁজি হলো কবিতা, শব্দ এবং নাম ও পরিভাষাসমূহ মুখস্থ করা। কবিতা আবৃতি বা স্বরচিত গল্প পাঠন এবং উপযুক্ত বাক্য গঠনের শিল্পকর্ম ওই আদব জগতের শুভ ও কল্যাণকর প্রচেষ্টা। কল্পনা সৃষ্টি এবং কল্পনার ময়দানকে অংকন করা ওই আদবের মূলধাতু। সরাসরি প্রকৃত বা বাস্তবতা বর্ণনা করা কবিদের উদ্দেশ্য নয়। বরং শুধু কাল্পনিক কারগুজারি এবং কল্পনা সৃষ্টিই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। এ কারণে কবিতা ও কাব্যিকতার ব্যাখ্যাসমূহে কখনো বাস্তবতা থাকে, কখনো থাকে না। শব্দজগতে এহেন কাজকে সাহিত্য (আদব) এবং এ ধরনের কাব্যিককে আদীব বা সাহিত্যিক বলা হয়। এমন আদবের উদ্দেশ্য ও মাকসাদ অধিকাংশের বেলায় দৌলত অন্বেষণ হয়ে থাকে। আর শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়ানো এবং প্রশংসা কর্মে প্রশংসাকারীদের প্রসংসা ও উপহার গ্রহণ এমন সাহিত্যের সর্বোচ্চ সোপান।

প্রকাশ থেকে যে, এই আদব ওই আদব হতে পারে না, যাকে ইলমের অহংকার বলা হয়েছে। তা এক প্রকার চরম পর্যায়ের বেয়াদবী এবং ইলম হতে বঞ্চিত হওয়া। এমনকি একজন ফাসিক ও ফাজির নিজের মেধা ও মস্তিষ্ক এবং উত্তম তবিয়ত দ্বারা সাবলীল কথা বলতে সক্ষম হয়। অথচ তার মধ্যে কোন ধরনের ইলমি জাওহার নেই। আরবের একজন মূর্খ-অশিক্ষিত উঁচু মাপের কবি, লেকচারার, তাৎক্ষণিক কথক এবং বাকপটুতা ও বাগ্মীর প্রতিমা ছিল। তখনকার যুগে পৃথিবীতে তাদের সাহিত্য ও ভাষার অলংকার বর্ণনায় কোন তুলনা ছিল না। সেজন্য তারা নিজেদের ছাড়া জগতের অন্যদের জন্য আজম তথা বোবা উপাধি নির্ধারণ করেছিল। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও তারা জাহেল ছিল। এমনকি তাদের নজিরবিহীন মূর্খতার ভিত্তিতে তাদের যুগের নাম পর্যন্ত জাহেলী যুগ দেয়া হয়েছিল। ইলম ও জ্ঞানের সাথে তাদের সামান্যতম সম্পর্ক ছিল না। তাই আদব ও তাকওয়া কোথা হতে পাবে।

কাব্যসাহিত্যের হাজারো সাহিত্যিককে আমীর ও রাজা-বাদশাদের দরবারে পাওয়া যেত, যারা কাসীদা পাঠ করে নিজের জীবনোপকরণ অর্জন করতো। ভাষা ও ভাষার শব্দাবলির বদৌলতে তাদের জীবন পরিচালিত হতো।

বর্তমান পৃথিবীতে রাজদরবার নেই। আছে গণতন্ত্র। এখন জাতিগত স্টেজে এবং সর্বসাধারণের বৈঠকখানা বা আসরে কাব্য সাহিত্যের পতাকাবাহী হাজারো সাহিত্যিক, মর্সিয়া পাঠ বা জাতীয় সঙ্গীত পাঠ করে জীবিকা নির্বাহে ফিকির করে যাচ্ছে। এতে সুস্পষ্ট হয়ে গেল, এহেন সাহিত্য ইলমের সৌন্দর্য ও অলংকার নয়। কেননা, এহেন আদবের জন্য কোন প্রকার ইলমের প্রয়োজন হয় না। ইলমের অলংকারের প্রশ্ন তো দূরের কথা এমন সাহিত্যের নির্যাস হলো স্বার্থপরতা, প্রতারণা বা আপন খায়েশ পুরো করা এবং সম্বোধিত ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এর নির্যাস ও সারকথা কুরআনি শব্দাবলি দ্বারা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ

তারা মুখে (ভাষাশৈলী দ্বারা) তোমাদের সন্তুষ্ট করে কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, ফাসিক। *[সূরা তাওবা : ৮]*

এ কারণে আল্লাহ তায়ালা এই সাহিত্য এবং এর উৎসস্থল থেকে নবীদের দূরে রেখেছেন এবং বলে দিয়েছেন, কাব্য সাহিত্য পয়গম্বরদের জন্য সৌন্দর্য নয়। এই সাহিত্যের সারকথা হলো কল্পনা ও অবাস্তবতা। আর পয়গম্বরদের আলোচ্য বিষয় ছিল হাকিকত ও বাস্তবতা প্রদর্শন এবং হাকিকাতুল হাকায়েক অর্থাৎ আল্লাহর জাত পর্যন্ত রাহনুমায়ী করা। আরেফ ও কামিল কবিগণ যেমন আরেফ রুমি, শেখ সাদী, সাত্তার (রহ.) এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্যান্য আকাবির কবিগণের ব্যাপারে অন্তরে যে আযমত রয়েছে, তা তাদের কবি হওয়ার কারণে নয়। বরং মারেফাতের বদৌলতে অর্থাৎ তাদেরকে কবি হিসেবে সম্মানিত মনে করা হয় না বরং বাতিনী কামাল হিসেবে করা হয়। এজন্য ওই সমস্ত আকাবিরের উপর উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কোন প্রভাব পড়েনি।

সর্বসাধারণের শিষ্টাচার

সর্বসাধারণের পরিভাষায় আদব বলা হয় ইহতেরাম ও তাযীম করা। কিন্তু তা তাদের প্রচলিত কথা ও কর্মসমূহ এবং তাদের স্থিরীকৃত প্রথা এবং নিয়মসমূহে

হতে হবে। তাদের প্রচলিত ও প্রথাগত তাযীমের সঙ্গে যখন কেউ আসবে, তখন তাকে বা-আদব এবং ভদ্র বলা হবে। অন্যথায় বেয়াদব এবং অভদ্র বলে রাগান্বিত হয়ে যাবে। ভাই ও বন্ধুদের সমাবেশে, বংশীয় উৎসবে বা সাধারণ দেখা সাক্ষাতে ছোটদের মাথা নুইয়ে হাত দ্বারা পায়ে সালাম করা অথবা মাথা কোলে ঠেকিয়ে দেয়া বা পরিভাষাগত শব্দাবলি দ্বারা তাযীম ও তাসলিম (মেনে নেয়া) এবং শিষ্টাবার প্রদর্শন করা, অথবা অর্ধদেহ ঝুঁকিয়ে সামনে নুয়ে পড়া বা হাত জড়ো করে সটান দাঁড়িয়ে থাকা অথবা বাবাজান বা ভাইজান সম্বোধন দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিদের মনোনিবেশ করানো তাদের নিকট আদব এবং ওই সকল শব্দ ও নিয়মকে আদব আর আদবওয়ালা ব্যক্তিকে মুয়াদ্দাব বা আদীব বলা হয়। চাই তার অন্তরে উপস্থিত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কষ্ট পেয়ে থাকুক এবং ভ্রাতৃত্বের অসমতার কারণে ঝগড়া-বিবাদ এবং পক্ষপাতিত্বের জযবা অন্তরে লালন করুক, যা সময় মত যথেষ্ট উত্তেজনার সাথে উথলে ওঠে এবং মহব্বতের স্থলে শত্রুতার জযবা অন্তরের সর্বকোণে লুকিয়ে থাকে, যা সময়সাপেক্ষে ফেটে পড়ে। কিন্তু তার পরও রসমি ভ্রাতৃত্ব ও প্রথা মোতাবেক তাকেও মুয়াদ্দাব বলা হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এমন আদবও ওই আদব হবে না, যাকে ইলমের অলংকার বলা হয়েছে। এহেন রসমপূজার জন্য ইলমের তো প্রয়োজন হয় না বরং এক প্রকার মূর্খতার প্রয়োজন হয়। এহেন আদবের সারকথা দুনিয়াদারী এবং বাহ্যাড়ম্বরতা, যাতে বাস্তবতার কোন নাম-গন্ধ নেই। এমন আদবের আত্মা, স্বার্থপরতা এবং সন্তুষ্টি তালাশ ব্যতীত অন্য কিছু নয় বরং ভ্রাতৃত্বের সাধারণ ভর্ৎসনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে নিজের অংশীদারিকে বিশ্বাস করানোর জন্য কোশেশ করা এবং যুগের প্রথা মোতাবেক কপটতা এবং বানোয়াটির মাধ্যমে নিজেকে সম্মানিত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রকাশ করা বই নয়। উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রকৃত আযমত ও সম্মান প্রদর্শনের কোন প্রশ্ন ওঠে না যখন ভ্রাতৃত্বের ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে অন্তরে খারাবি ভরপুর থাকে। এহেন বাহ্য ও রসমী সৌন্দর্য এবং বাহ্যাড়ম্বরতার হাকিকত ও বাস্তবতা কুরআনি ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর থেকে গাফেল। *[সূরা রুম : ৭]*

আদবের বেশ ধারণ

ইলমের দাবীদার যাদের যবান ইলম ও ভাষা দ্বারা সজ্জিত কিন্তু অন্তর খুশু ও বিনয় হতে খালি, তাদের নিকট আদবের অর্থ অবশ্যই শাব্দিক ও শৈল্পিক নৈপুণ্য অথবা সর্বসাধারণের মাঝে প্রচলিত রুসুমের বাধ্যবাধকতা নেই। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আকাবিরে দীন ও দুনিয়ার ইহতেরামের জন্য শরীয়তপ্রদত্ত কর্মাবলি ও চিত্রাবলি এবং সুস্পষ্ট বিধানে বাতলানো আমলের পাবন্দী করা। শর্ত হলো, সেগুলো সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট শব্দে কোন হুকুম মিলে যায়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আদবের জন্য এটি একটি পবিত্র এবং উন্নত ও উত্তম মাপকাঠি, যাতে শরয়ী আকৃতির পাবন্দী রয়েছে। কিন্তু যখন এমন প্রকারের ইলমের দাবিদাররা শুধু ইলমের শব্দাবলি মুখস্থ করে। সেই ইলমের হাকিকী কাইফিয়্যাত তাদের অন্তরে নেই এবং সাথে সাথে আত্মার রিয়াজত থেকে বেপরোয়া থাকার কারণে অন্তরে জন্মগত ও স্বভাবজাত চরিত্র, ভারসাম্যহীনতা ও লোভ-লালসা প্রবল থাকে আর জৈবিক চাহিদাও জাগ্রত থাকে। তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওই শরয়ী কর্মকাণ্ডের পাবন্দী সত্ত্বেও তাদের অন্তরের ওই অন্ধকার কাইফিয়্যাত আবশ্যিকভাবে জ্বলে ওঠে, যা তার আত্মার জাওহার বা মূল ধাতু। তারা প্রকাশ্যভাবে শরয়ী আদবের পাবন্দী করেও নিজেদের ভিতর ঈর্ষা, হিংসা ও মনোঃকষ্ট পালন করে।

প্রকাশ থাকে যে, এমতাবস্থায় জৈবিক চাহিদা এবং স্বভাবজাত মনোবেদনার মিশ্রণের সাথে শরয়ী প্রথার পাবন্দী তাদের রেওয়াজ ও রসুমের পাবন্দীর মত শুধু প্রথাগত এবং প্রদর্শনীর মত থেকে যায়। এমনটি সর্বসাধারণের অভ্যাস ছিল। পার্থক্য এতটুকু হবে যে, সাধারণরা রেওয়াজ ও রসুমের পাবন্দ হবে আর এই সাধারণ আহলে ইলমরা শরয়ী রসুমের পাবন্দ হবে। এমন আহলে ইলম রসুম পালনের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণ থেকে উন্নত এবং প্রশংসার যোগ্য হবে। কিন্তু দুনিয়াদার ব্যক্তি যেমনভাবে অন্তর নষ্টের সাথে লোকদের প্রকাশ্য আদব প্রদর্শন করেও ভিতরগতভাবে বেয়াদবী ও অবাধ্য হয়, তেমনিভাবে এই ইলমের দাবিদারও অন্তরে খুশু না থাকার কারণে শরয়ী আদবের ব্যবহারকারী হয়েও লোকদের জন্য বেয়াদব এবং অবাধ্যকারী বলার অধিকারী হবে। এ কারণে সাধারণত দেখা যায়, এমন ধরনের আহলে ইলম মনের আস্থা ও বিশ্বাস, জযবায়ে ইশক ও মনের আকর্ষণ এবং হাকিকী আগ্রহী ও বিনয়ী না হওয়ার কারণে, প্রকাশ্য শাব্দিক বাহ্য আদব ও ইহতেরাম এবং প্রথাগত আদব ও তাযীম হতে বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু তাদের আদবের রীতিনীতিতে অহংকার ও গর্বের কাইফিয়্যাত অবশ্যই দাখেল হয়। ফলে কখনো কখনো তাদের মৌখিক

কথায় কার্যকরী বড়ত্ব এবং আপন ইলম ও আদবের উপর অহংকারী বাক্য এসে পড়ে, প্রকাশ পায়। কেমন যেন সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং তাদের নাম জপার উপর খোটা দিচ্ছেন, উপকার করে বলে বেড়াচ্ছেন যে, সে তাদের কত আদব দেখায় এবং কখনো তারা ওই সম্বোধিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে যাদেরকে আদব দেখানোর জন্য যবান ও প্রথাগত আদব প্রদর্শনের দাবিদার ছিল, বেয়াদবী, অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্য বিনিময় এবং অমান্যমূলক কথা থেকে রেহাই পায় না।

সুতরাং প্রকাশ্যে তা আদব কিন্তু অদৃশ্যে তা বেয়াদবী। কারণ, প্রকাশ্যে তা শরীয়তের রীতিনীতির অনুসরণ হয় কিন্তু তাতে বেয়াদবীর নমুনা অন্তর্ভুক্ত আছে, তা প্রকৃত ও বাস্তব ইত্তেবা নয় বরং বেদায়াত। কেননা, সাহেবে শরীয়ত এহেন রঙে শরীয়ত পালনকে ইত্তেবা বলে না বরং শরীয়ত যেমনভাবে আহকামের তালিম দিয়েছে, তেমনভাবে সেগুলোর ব্যবহারের রং এবং নমুনাও বলে দিয়েছেন, যেগুলোকে তারা পরিবর্তন করে তাতে নিজেদের নতুন রং লাগিয়ে দিয়েছে। এহেন কর্ম যদিও হুকুমের বিদআত নয় কিন্তু রং ও ধরনের হুকুমের বিদআত অবশ্যই হয়।

যাহোক এমন হঠকারী ও অহংকারী রং এবং আত্মপূজারী ও লোকদেখানো ঢং-এর শরীয় রীতিনীতি পাবন্দী প্রকৃত আদব ও তাযীম নয়। বরং বিনয়ের সুরতে অহংকার এবং তাকওয়ার আদলে ফাসিকী কর্ম। ফলে সে ধোঁকায় থেকে আদব ও তাকওয়া মনে করে। কিন্তু সে তাকওয়ার আশপাশেও থাকে না। অতএব তা আদবের স্থলে নিরেট ধোঁকা ও প্রতারণা। এমনকি পৃথক একটি ফাসাদ কর্ম, যার ফলে হাজার হাজার সরলমনা সাধারণ মানুষ পথহারা হয়।

হিদায়া গ্রন্থের প্রণেতা এহেন আহলে ইলম সম্পর্কে বলেছেন–

> পৃথিবীতে ওই আলেম সবচেয়ে বড় ফাসাদ সৃষ্টিকারী, যে নির্লজ্জ ও বেয়াদব হয়। আর তার চেয়ে ওই মূর্খ যে ইলম ও জানা ব্যতীত ইবাদাত করে (মনগড়া বিদআতে লিপ্ত)। তারা উভয়ে দুনিয়াতে একটি বড় ফেৎনা প্রত্যেক ওই ব্যক্তিদের জন্য যারা দীনের ব্যাপারে তাদের পথ নির্দেশনা গ্রহণ করে এবং প্রমাণ দেয়।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেছেন–

> দু'প্রকার মানুষ থেকে বেঁচে থেকো। এক. ওই আলেম. যে লোভ-লালসায় লিপ্ত। দ্বিতীয়. ওই দুনিয়াদার যাকে দুনিয়া অন্ধ বানিয়ে রেখেছে।

প্রকাশ থাকে যে, এমন আদবের সঙ্গে ওই আদবের কোন সম্পর্ক নেই, যে আদব ইলমের জেওর বা অলংকার। কারণ, এহেন আদবে তাকওয়ার সুরত পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু তাকওয়ার ভিতরগত তাকওয়া পাওয়া যায় না। কেননা, তাকওয়ায়ে বাতেন থাকলে আমিত্বের দাবি, দম্ভ, অহংকার, গর্ব ও ইলমের উপর গর্ব ইত্যাদি থাকে না। বরং অস্তিত্বহীনতা, নিমগ্নতা, পরিপূর্ণ বিনয়, নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং অপরকে আযমত ও সম্মান করার জযবা আত্মার মাঝে পুঞ্জিভূত হয়। উক্ত কারণহেতু এগুলো আদবের রং হতে খালি এবং আদরের রুচি হতে মুক্ত। অর্থাৎ সুরত বা বাহ্যিক আদব– প্রকৃত আদব নয়। অথচ সুরতে আদবের সঙ্গে যাওকে (রুচি) আদব এবং প্রথাগত আদবের সঙ্গে কাইফিয়্যাতে আদব থাকা জরুরি।

পরিপূর্ণ আদব

কিন্তু আদবের শরয়ী নিয়মনীতির সাথে যদি তার প্রকৃত অবস্থাও অন্তরে বিদ্যমান থাকে এবং এই সুরতে আদব আত্মাবিহীন ডাইশ না হয় বরং রীতিনীতির অবস্থা সম্বলিত হয়, তাহলে এমন আদবকে হাকিকী বা প্রকৃত আদব বলা হবে। আদবের উক্ত কাইফিয়্যাতের প্রবলতার পর আদীব এবং মুতাআদ্দী শুধু শ্রোতাদের কর্ম ও আহকামকে সামনে রাখবে না বরং তাদের মানশা ও সৌন্দর্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে এবং এমন আদীবগণ শ্রোতাদের শুধু পদমর্যাদাকেই লক্ষ্য করেন না বরং তাদের ব্যক্তিগত আযমত-সম্মান ও মর্যাদার প্রতিও লক্ষ্য রাখেন। ফলে তার আদবের দায়িত্ব রসুমের সীমা থেকে অতিক্রম করে হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন সেই ব্যক্তি শুধু যবান বা দেহ দ্বারাই আদব প্রদানকারী থাকেনি বরং তার অন্তর ও দেমাগ এবং আত্মা ও রূহ দ্বারাও আদব ও সম্মানের প্রমাণ দেন। সাথে সাথে উক্ত মাকাম লাভের কারণে তার উপর আদব ও আযমতের এমন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম মারেফাত প্রকাশ পায়, যা সাধারণ এবং ইলমের দাবীদার থেকে শুধু শব্দের মধ্যে দেখা যায় না। বরং সেই মারেফতধারীর উপরই জাহের হয়, উদ্ভাসিত হয়। ইন্দ্রিয়গতভাবে আযমতওয়ালা শ্রোতা যদি এমন আদীব থেকে একটি ফুল প্রার্থনা করে, তাহলে সে একটি পুরা বাগান দিয়ে দিতে তৈয়ার হয়ে যাবে। শ্রোতারা বাহ্য আদব

প্রার্থনা করলে তিনি রূহ বা আধ্যাত্মিক আদবও দিবেন। আর কর্মসমূহের আদব চাইলে তিনি তবিয়ত ও আখলাকের আদবের নমুনা পেশ করবেন।

অর্থাৎ জাহেরী ও বাতেনীভাবে এমন আদবদাতা বনে যাবেন যে, তার রুচি পর্যন্ত আদবের ডাইশ বনে যাবে। এমনটি ওই কামালে আদবের মাকাম (স্থান), যা বিশেষ ব্যক্তিদের নসীব হয়। তাকেই আমরা দীনদার ও আলেমদের আদব বলে থাকি। তা ইলমের দাবীদারদের আদব নয়। সুতরাং আলেম ও দীনদারের নিকট আদবের হাকিকত শাব্দিক কারুকার্য বা শব্দ ও অবস্থার শিল্পকর্ম নয় বরং বাতেনী বিনয়ী, আত্মত্যাগ ও তবিয়ত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শরয়ী আদবের ডাইশকে গ্রহণ করা এবং আহকাম পাবন্দীর পাশাপাশি আহকামের সর্বশেষ এবং কুদরতি সীমাকে, যা যাওকে সালীম তথা সুস্থ রুচিবোধ এবং শরীয়ত অনুশীলন দ্বারা অর্জন হয়, প্রকাশ পায় সেগুলো সর্বদা দৃষ্টিতে রাখা। আর তা এভাবে যে, শুধু দাবিদার হওয়া না অহংকার না গর্ব ও আত্ম অহমিকা, না নিজ সম্মান প্রদর্শন, না অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান ও অসম্মান, না বর্ণনা ও হেকায়েত বরং অস্তিত্বহীনতাও আত্মত্যাগ এবং অনাসক্তির সঙ্গে আল্লাহর রেজামন্দীর জযবাত কাজ করে। সুতরাং এটি ওই আদব, যাকে ইলমের জেওর ও অলংকার বলা হয়েছে। অতএব যেমনভাবে একটা সুন্দর চেহারা সুন্দর অলংকার দ্বারা সজ্জিত হয়ে ডবল সুন্দর হয়, তেমনিভাবে ইলমে হাকীকির সুন্দর জেওর আদব দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে হাজারো গুণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়।

সারকথা এই বের হলো যে, আদব ওই (সতর্কতামূলক) কর্মসমূহ এবং তাকওয়ামূলক আমলসমূহের নাম, যা আমলে শরয়ীর চূড়ান্ত সীমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। অতএব আদবের প্রাথমিক স্তর হলো নসুসে শরইয়্যার তথা শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের ইবারাত ও বক্তব্যের উপর আমল করা। আর এর সর্বশেষ স্তর হলো ওই বিশেষ বস্তু, যা তার উপর আমলেরও চর্চা ও বারংবার করার দ্বারা ওই নসুসের দালালাত ও ইশারাত এবং তাকাজা থেকে মস্তিষ্ক প্রকাশ পায়, খুলে যায়। নসুসের ব্যাখ্যাগত হুকুমকে যদি ফতোওয়া বলা যায়, তাহলে প্রয়োজনীয় নিদর্শনগত ও প্রমাণ ও ইশারাগত হুকুমকে তাকওয়া বলা যাবে। সুতরাং সঠিক অর্থে একজন আদীব তখনও আদবদাতা হতে পারেন, তখন আমলি ও কার্যকরীভাবে তার সামনে আদবের সকল জাহেরী ও বাতেনী ফতোয়াগত ও তাকওয়াগত বিধিবিধান ও সীমারেখা বিদ্যমান থাকে। আর অন্তরের আসক্তি, অনুরাগ ও কামনা দ্বারা তাতে আমল করা হয়। এমনকি পরিণামে আদবের রুচিগত সীমারেখা ও তার উপর প্রকাশ পেয়ে যায়, উদ্ভাসিত হয়ে যায়।

ইলমের অলংকার

অর্থাৎ তিনি (মুযাদ্দাব) নসুসের (সুস্পষ্ট বিধানের) সূক্ষ্ম ও দুঃসাধ্য সহনশীলতা পর্যন্ত নিজের আদবী প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করার অভ্যস্ত হয়ে যান। অর্থাৎ আদবের মাঝে বিলীন হয়ে যান। এমনটিই ওই আদব, যাকে ইলমের জেওর এবং তাকওয়ার জাওহার বা মূল ধাতু বলা হয়েছে। কোন নেক কর্মে ওই পর্যন্ত নূর আসে না, যতক্ষণ না তার আদব তাতে শামিল হয় এবং ওই সতর্কতা ও তাকওয়ামূলক বিধান আমলে না আসে, যার সঙ্গে সেই আমলের প্রকৃত সম্পূরক এবং তার বাস্তবিক কামাল ও সৌন্দর্য জড়িত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আদবই ইলমের জেওর এবং জাওহার, আদব ব্যতীত আমল বস্ত্রবিহীন এবং সৌন্দর্যহীন মূর্তি বা চিত্রের ন্যায়, যার প্রতি আসক্তি ও আকর্ষণের দৃষ্টি পড়ে না। এ কারণে অতি সহজে বোধগম্য হয় যে, আদববিহীন আমল কুবুলিয়াতের মাকাম পর্যন্ত পৌছতে পারে না এবং তার প্রকৃত ফলাফল এবং প্রতিদান আদব ব্যতীত পাওয়া যায় না, প্রকাশ হয় না।

সুতরাং যেমনভাবে প্রত্যেক শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর পরিশেষে ওই শিল্পের সর্বোচ্চ ও উন্নত যোগ্যতা মোতাবেক উদ্ভাসিত ও প্রকাশ হয়, যা শিক্ষাকালে কিতাবসমূহ থেকে হাসিল হয়নি। এমনিভাবে শরয়ী আদবসমূহের প্রাথমিক আমলি হুদুদ (সীমারেখা) তো নুসুসে শরয়ীর শাব্দিক ব্যাখ্যাসমূহ ও বক্তব্যের মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু তার উপর লাগাতার আমলি চর্চার দ্বারা যখন যাওকে আদব, বিনয়ী ও আত্মত্যাগের যোগ্যতার দৃঢ় ও মজবুতভাবে অন্তরে সৃষ্টি হবে, তখন আদবের ন্যায় রুচিবোধও অন্তরে খুলে যাবে, পয়দা হবে, যা ওই নুসুসের ইবারাত হতে বের হয়ে তার দালালত ও ইমারাতের মাঝে লুকায়িত থাকে। তারপর মানুষ আদবকে ব্যবহার করে না বরং আদব মানুষকে ব্যবহার করতে থাকে। ফলে সে আদবের মাঝে নিমজ্জিত ও বিলীন হয়ে সর্বাঙ্গ আদব বনে যায়। তারপর তার থেকে এমন আদবসমূহের নমুনা বের হতে থাকে, যা সর্বসাধারণের নজরে আসে না, দেখতে পায় না। এই আদব এক ও অর্ধশরয়ী হুকুমের জন্য নয় বরং সমগ্র শরীয়তের সীমাবদ্ধতা ওই আদবসমূহ দ্বারাই করা হয়েছে। যদি ওই আদবের হুদুদুকে ভেঙ্গে দেয়া হয়, তাহলে শরয়ী নিযামের বুনিয়াদসমূহ অটুট ও কায়েম থাকতে পারবে না। কারণ, শরয়ী কর্মকাণ্ডসমূহে একত্রিত অংশ হলো আদেশাবলি, যেগুলো পালন করার হুকুম করা হয়েছে। আর অপর অংশ নিষেধাবলি, যেগুলো থেকে বেঁচে থাকার হুকুম করা হয়েছে। এই মামুরাতের উপর জমে থাকা, আকড়ে ধরা এবং মানহিয়াত থেকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু সতর্কতামূলক সীমারেখা রাখা হয়েছে। সেগুলোর বাউন্ডারিতে

সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আসল মামুর ও মানহী মা সংরক্ষিত থাকে। আর ওই সতর্কতামূলক হুদুদের নাম 'আদাবে শরঈয়্যাহ' বা শরয়ী শিষ্টাচার।

এ কারণে এই আদবাবলিই আমর ও নাহী তথা আদেশ ও নিষেধের শরয়ী নিযামকে অবশিষ্ট এবং মাহফুজ রাখার কফিল এবং জামিন্দার ও দায়িত্বশীল। যতক্ষণ পর্যন্ত ওই আদবাবলির উপর জমে থাকবে এবং স্থির থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আসল আহকাম ও বিধিবিধানের উপর আঁচড় লাগবে না। আর যখন ওই আদবাবলির পার্শ্ব ভেঙ্গে যাবে, তখনই আহকামের আসল মাকসাদের দুর্গ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

আদবের সীমারেখা

অবশ্য এই আদবসমূহের হুদুদ কিছু তো সুস্পষ্ট, যা শরয়ী ইবারাত দ্বারাই বুঝে আসে। আর কিছু হলো রুচিগত, যা সঠিক ও সুস্থ মেধার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়, প্রকাশ পায়। কিন্তু এখানে যাওকি অর্থ উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত নয় বরং যা রুচি থেকে অর্জন হয়। এগুলো কিতাব ও সুন্নাতের নুসুসের দালালত ও ইশারাত বা তাকাজা দ্বারা বুঝে আছে। তবে ওই বুঝের জন্য সাধারণ যাওক যথেষ্ট নয় বরং যাওকে সালীম তথা সুস্থ রুচিবোধ ও সহীহ মেধার প্রয়োজন, যা একদিকে তো জন্মগত সুস্থতা থাকে এবং অপরদিকে শরয়ী অনুসরণ, সুন্নাতের ইত্তেবা এবং মহব্বতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইশকে মাওলা একে ঘষে মেজে আরো পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করে, যার পরিষ্কার করা গ্লাসে এই সূক্ষ্ম আদবসমূহের প্রতিচ্ছবি হতে থাকে। সুতরাং এই সূক্ষ্ম আদবও শরয়ী হয়ে থাকে। কিন্তু শরীয়ত থেকে একে বের করা, আবিষ্কার করা সবার কাজ নয়। বরং ওই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার অন্তরের কাজ, যা শরয়ী যাওকের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব রাখে। এজন্যই কুদরতিভাবে অবুঝ, স্বল্প বুদ্ধিমান বা সাধারণ আহলে ইলেমদের এমন আদবাবলি গভীর ইলমের অধিকারী আলেমদের ইত্তেবা ব্যতীত নসীব হয় না। সুতরাং ওই আদবসমূহ এবং এর হুদুদকে একজন মজবুত আলেম নিজের যাওকি ইজতেহাদ দ্বারা এবং একজন সাধারণ মানুষ নিজের যাওকি ইত্তেবা দ্বারা অর্জন করতে পারে এবং সেগুলোর মাধ্যমে নিজেদের দীনি নিযামের হেফাজত করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ মানহিয়াতে শরীয়তে ব্যভিচারকে হারাম করা হয়েছে। এখানে শরীয়ত শুধু যিনা কর্ম হতে বাধা দেয়ার উপর যথেষ্ট করেনি; বরং যিনার আসবাব (কারণ) ও উৎস হতে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছে। চাই তা

জাতিগত নিষিদ্ধ না হোক; কিন্তু আসবাবে যিনা হওয়ার কারণে সেগুলোও যিনার হুকুমে এসে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন গাইরে মাহরাম মহিলার প্রতি দৃষ্টি দেয়া, তার আওয়াজ শোনায় কর্ণপাত করা, তার সুঘ্রাণে নাসিকা খাড়া করা, তার দিকে ধাবিত হওয়া, তাকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়ানো ইত্যাদি। এহেন সতর্কতামূলক হুদুদকে যিনা বর্জনের আদব বলা হয়। যদিও যিনা কর্মকে কবিরা গোনাহ বলা হয়েছে। তবে যিনার এই আসবাব ও উৎসসমূহকে সগীরা গোনাহ বলা হয়েছে। এগুলোর মাঝে গোনাহ ও পাপ হওয়ার শান যিনার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে এসেছে। অন্যথায় এগুলো জাতিগতভাবে নিষিদ্ধ কর্ম ছিল না।

এখানে প্রকাশ থাকে যে, ওই সতর্কতামূলক হুদুদের কঠোর ও কঠিনভাবে আমল করতে থাকলে মানুষ শুধু যিনা থেকেই বেঁচে থাকবে না বরং তার অন্তরে এক ধরনের এমন সতর্কতামূলক যাওক সৃষ্টি হয়ে যাবে, যা তাকে গাইরে মাহরাম মহিলার কবজা থেকেও বাঁচিয়ে রাখবে এবং সে বুঝে নিবে, আমার জন্য গাইরে মাহরামের সৌন্দর্যের প্রতি ধ্যান-খেয়াল ও চিন্তা-ফিকির চালানোও জায়েয নেই। বরং ওই জাহেরী হুদদের পাবন্দী এজন্য করা হয়েছে, যাতে ওই জাহেরী প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে, আমার বাতেন ও যিনা থেকে পবিত্র থাকে। বাতেনের আমল যখন ফিকির ও কল্পনা, তখন বাতেনের যিনা মূলত অপরিচিত গাইরে মাহরাম মহিলার ধ্যান ও খেয়াল। আমাদের জন্য তা নিঃসন্দেহে হারাম কর্ম। প্রকাশ থাকে যে, এহেন ধ্যান ও কল্পনাকে শরীয়ত প্রকাশ্যভাবে বিরত থাকার কোন ফতোওয়া প্রথমে দেয়নি।

যেহেতু শরয়ী বিধান জাহেরের উপর প্রয়োগ করা হয়। তাই কালবের অবস্থার উপর জাহেরী হুকুম প্রয়োগ করার কোন অর্থ ছিল না। কিন্তু রুচিগত সতর্কতা এবং জাহেরী হুদুদের দায়েমী পাবন্দীর প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব এমন হয় যে, মানুষ জাহেরী আমল থেকে বাতেনী আমল করার অধিক অভ্যস্ত হয়ে যায়। যখন জাহেরী আমলের অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে তার বাতেনেও আমলের যোগ্যতা এবং মাদ্দার শিকড় জন্মে মজবুত হয়, তখন জাহেরী গোনাহ থেকেই নয় বরং খেয়ালী ও কল্পনার গোনাহ হতেও বেঁচে থাকে। ইন্দ্রিয় প্রকৃতির বাতেনের এই মেধাগত আমল যে মানুষ যিনার খেয়াল ও চিন্তা থেকেও বেঁচে থাকবে, একে আমল বা শরীয়ত অথবা শরয়ী হুদুদ থেকে সম্পর্কহীন বলা যাবে না। বরং এমন আমলকে একটা বাতেনী সীমানা কল্পনা করতে হবে।

আর যখন ওই বাতেনী শিকড় হতে জাহেরের উন্নয়ন হয়, তখন একে শরয়ী নিষিদ্ধ বস্তুর ভিত্তি হিসেবে তার চেয়ে অধিক নিষিদ্ধ বলা জরুরি হবে। সুতরাং শরয়ী আদবসমূহ অন্যস্থান থেকে ভাড়া করে এনে শরীয়তের মাথার চপেটাঘাত

করা হয় না বরং শরীয়ত হতেই বের করে শরয়ী নিযামে তার অবস্থান অনুযায়ী গোপন করে রাখা হয়েছে।

তাহাফফুজে দীনর তবিয়তগত নিযাম

তেমনিভাবে মদ নিঃসন্দেহে হারাম। কিন্তু তা থেকে বাঁচানোর জন্য ওই পাত্রটি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা দ্বারা মদপান করা হয়েছে আর যার ব্যবহার দ্বারা অহেতুক শরাবের কথা মনে হয়, যাতে পাত্রটি সামনে না থাকার কারণে মদের কথা স্মরণ না আসে। সুতরাং শরীয়ত হারামের মাধ্যমকে নিষেধ করে আসল মাকসাদ (মদ পরিহার করা)কে হিফাজত ও মজবুত করবে।

প্রকাশ থাকে যে, এহেন মাধ্যম হতে বেঁচে থাকার অভ্যস্ত ব্যক্তি শুধু শরাব পান থেকেই বেঁচে থাকবে না বরং এর খেয়াল আসার সাথে সাথে লা হাওলা পড়বে। অথচ প্রকাশ্যভাবে এহেন খেয়াল নিষিদ্ধ বা পাপ মনে হয় না। কিন্তু যখন তা আসল নিষিদ্ধ এবং কবিরা গোনাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার স্বভাবজাত রাস্তা এবং মাধ্যম হয়, সেজন্য এই যাওকি হুকুম (খেয়াল পরিহার করা)কেও রাহে শরীয়ত হতে সম্পর্কহীন বলা যাবে না। বরং শরীয়ত নিযামের লাইনে একে ইহতিয়াতী সতর্কতামূলক বিধান বলা হবে, যার জন্য যদিও ফতোওয়া শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, তবে তাকওয়া শব্দ প্রয়োগ করা যাবে।

বাহ্যপূঁজারীর দৃষ্টিতে তাকওয়ার এই হুদুদ চাই কল্পনাপূজারী হিসেবে দেখা যাক বা সংকীর্ণমনা দেখা যাক কিন্তু দূরদর্শীদের দৃষ্টিতে এই সতর্কতামূলক হুদুদ তাহাফফুজে দীনের (দীন হেফাজতের) একটি তবয়ী এবং বৈজ্ঞানিক নিয়াম হিসেবে দেখা যাবে, যা মাহারিমে (নিষিদ্ধ) শরীয়তের শাহী চারণভূমির জন্য বালতি বাঁধার হুকুম রাখে, যাতে অসতর্ক রাখাল ওই বালতি বাঁধার বাইরে বাইরে থাকে এবং আসল চারণভূমি পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। সুতরাং যুক্তিগতভাবে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট কোন নিষিদ্ধ উদ্দেশ্য হতে ফিরানোর পদ্ধতি এ ছাড়া দ্বিতীয়টি হতে পারে না যে, সেই জিনিসের সকল মাধ্যম এবং দূরতম উসিলা ও বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্যথায় আসল উদ্দেশ্য থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। সেজন্য এই সূক্ষ্ম হুদুদের আমলকেও যা কিতাব ও সুন্নাহের শব্দাবলিতে প্রকাশ্য রূপে পরিলক্ষিত হয় না। সেগুলো কিতাব ও সুন্নার অর্থের অংশ বনে মামুরাত ও মানহিয়াতের অংশ বলা হবে।

যাওকে আদবের ফলাফল

ফুকাহা ও মুজতাহিদগণ (রহ.) নিজেদের ইজতিহাদের আলোকে এ সকল গোপন হুদুদকে প্রকাশ করেছেন, যে কারণে এগুলো কে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত বলা হয় অথচ তাদের চেয়ে বেশি অনুসরণকারী অন্য কেউ নেই। তারা প্রকাশ্য হুদুদের পাশাপাশি বাতেনী হুদুদকেও শরীয়তের ভিতর ও গভীর থেকে বের করে অনুসরণ করেছেন এবং করিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ যিনা ও মদের শাখাগত মাসয়ালাগুলোর ফুকাহাগণ বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি আপন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করার প্রাক্কালে কোন অপরিচিত আজনবী মহিলার ধ্যান ও খেয়াল করে নেয়, তাহলে উক্ত সঙ্গম কর্ম তার জন্য অবৈধ হয়ে যাবে। কারণ, সে যদিও কর্ম দ্বারা বা কার্যকরীরূপে যিনা করেনি কিন্তু খেয়ালি যিনা করেছে। সুতরাং যদিও কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট নসে প্রকাশ্য শব্দে এহেন খেয়ালি যিনার নিষিদ্ধ হুকুম উল্লেখ নেই, তবুও উতম হুকুমকে ফুকাহাদের আবিষ্কৃত হুকুম বলা যাবে না। বরং যিনা নিষেধের সুস্পষ্ট হুকুমের সিলসিলার এটি একটি অবশ্য কর্তব্য হুকুম বলা হবে, যা আদবাবলির কার্যকরী ক্রিয়া হতে নির্গত হওয়া যাওকে আদব এবং যাওকে তাকওয়ার একটি স্বভাবজাত নতিজা, যেগুলো ফকীহগণ হুকুম আকৃতিতে প্রকাশ করেছেন। কেমন যেন তা ওই নিষিদ্ধ যিনার একটি সর্বশেষ গোপন সীমানা, যা আহকাম নাতিদীর্ঘ এবং সংকলিত ধারাবাহিকতার সাথে স্টেপ বাই স্টেপ মিলিত হয়। যেগুলোকে সাধারণ চোখে দেখা যায় না কিন্তু বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মানদের নজরে পড়ে যায়।

অথবা যেমনভাবে ফুকাহাদের খুঁটিনাটি বর্ণনা করল যে, যদি কোন ব্যক্তি রঙিন শরবত পানকালে (যা নিঃসন্দেহে পবিত্র) মদ পানের খেয়াল করে যে, সে যেন মদের জাম-শরবত পান করছে তাহলে তার শরবত পান করাটা খেয়ালি ধারণাগত মদপান হওয়ার কারণে হারাম হয়ে যাবে। কেননা, সে বাস্তবে ও কার্যত যদিও মদপান করেনি; কিন্তু খেয়ালিভাবে তো অবশ্যই পান করেছে এবং যদিও তার উপর প্রকাশ্য শরীয়তে মদখোরের হুকুম আরোপ করা হবে না। তবে দিয়ানাতান হাকিকী শারেঈ (রাব্বুল ইজ্জত) এর পক্ষ হতে তার বাতেনকে অবশ্যই মদ খুব বলা হবে।

গোপন গোনাহের গোপন শাস্তি

তারপর যেমনভাবে যিনাকর্ম ও মদখুরির উপর শরয়ী হদ-শাস্তি এবং তাযিরাত (লঘু শাস্তি) জারি হবে, তেমনিভাবে এই বাতেনী হুদুদের বিপরীত কর্মের কারণে

মানুষ ধরপাকড় ও শাস্তি হতে রেহাই পাবে না। প্রকাশ্য বিধানে পাবে না কিন্তু দীনদারী হিসেবে পাবে। যদিও আফাকী প্রকাশ্য শাস্তি দেয়া হবে না তবে নফসী আত্মার শাস্তি দেয়া হবে। যিনা ও মদখুরী কর্মের উপর যদি প্রস্তরাঘাত এবং দুররা মারার হদ জারি হয়, তাহলে মেধাগত যিনাকারী এবং মদখুরির উপর নফসী রোগ-আত্মার রোগ, বিপদ আপদ, চিন্তা, কষ্ট, পেরেশানি ও ব্যাকুলতা, ফেতনা এবং বিভিন্ন পেরেশানি বাতেনে ভিড় করবে, একের পর এক আসতে থাকবে। আর এগুলোর চেয়ে আরো বড় শাস্তি হলো অন্তরের নূর দূর হয়ে তাতে অন্ধকার ও মলিনতার বাদল উছলে পড়বে বা তার অন্তরের প্রশান্তিকে দূর করে কাল্‌বের বড় বড় রোগের দরজা উন্মুক্ত করে দেবে। অন্তরের অসুস্থতার ন্যায় অসুস্থতা আর নেই।

সুতরাং শরয়ী রঙের শাস্তি হবে না। প্রকাশ্য অস্ত্র দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে না, তবে বাতেনী অপ্রকাশ্য মাধ্যম দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। কেননা, এই অপরাধগুলো বাতেনী যেগুলো বাতেনী অস্ত্র (খেয়াল ও ফিকির) দ্বারা কার্যকরী হয়েছে। এর প্রকাশ্য শাস্তি আল্লাহর জন্য থেকে ছিল, আর এর গোপন শাস্তিও যা গোপন হবে তাও আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে। যাহোক, জাহেরী হোক বা বাতেনী হোক যার থেকে মদখুরি ও যিনাকারীর কর্ম প্রকাশ পাবে, সে কোন প্রকার শাস্তি হতে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ–

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

তোমাদের মনের কথা যদি যবান ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ কর বা অন্তরে গোপন কর, আল্লাহ তায়ালা উভয় অবস্থায় তোমাদের কাছ থেকে হিসাব নেবেন। অতঃপর কুফুর ও শিরক ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। *[সূরা বাকারাহ : ২৮৪]*

সারকথা হলো, কানুনে ইলাহী দীনি রাজত্বের কানুনের মত মানুষের শুধু জাহের এবং দেহের উপরই পরিচালিত হবে না বরং দেহ হতে অন্তরে এবং নিয়তের উপরও প্রয়োগ হবে। সুতরাং প্রকাশ্য শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মদ ও যিনা তো কবিরা গুনাহ ছিল। আর তার প্রকাশ্য মাধ্যম হলো সগীরা গোনাহ, যেগুলোর উপর জাহেরী হুদুদ তাযিরাত জারি হতো। কিন্তু প্রকৃত হাকিম আল্লাহ তায়ালার আযমত ও জালাল এবং জাহের ও বাতেনে তার হাজির-নাজির হওয়ার মর্যাদার কারণে এই খেয়ালি যিনা ও মদ ও আহলে বাতেনদের নিকট

আকবারুল কাবায়ের তথা কবিরা গোনাহ বলা হবে, যার উপর বাতেনী শাস্তি সংকলিত হবে, প্রয়োগ হবে।

ওসায়েলে (মাধ্যম) ইবাদতের উপর সাওয়াব প্রদান

আদবসমূহের সিলসিলায় আলোচনায় মানহিয়াতের দুটি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। তেমনি মামুরাতের বেলা একই অবস্থা যে, তাতেও আদবের সিলসিলা রয়েছে, যা আসল মাকসাদ আমল সংরক্ষণের যিম্মাদার। উদাহরণস্বরূপ নামাজ কর্ম আসল মাকসাদ যা প্রকৃত ইবাদত। কিন্তু এর সহজকরণ এবং তাহাফফুজের মাধ্যম এমনকি এর আহ্বানকারীদের মধ্যে যেমন জামাত, যা নামাজ পাবন্দীর কারণ মাধ্যম এবং সাওয়াব ও প্রতিদান উন্নতির কারণ। তাই একে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তারপর জামাত তৈরির জন্য আযানের খোঁজ ও তালাশ এবং ইজারাতে মুয়াযযিন (অর্থাৎ আযানের বাখ্যাবলি শ্রবণ করা এবং সাথে সাথে আপন যবান দ্বারা সেগুলোর পুনঃ উচ্চারণ করা)কে মুস্তহাব বলা হয়েছে, যা দ্বারা জামাতে শরিক হওয়ার গুরুত্ব সৃষ্টি হয়। অতঃপর ইজাবাতে আযানের জন্য তৈরি প্রস্তুত হওয়ার মাধ্যম হলো পবিত্রতা এবং মানবিক প্রয়োজন তথা পেশাব-পায়খানা হতে ফারেগ হওয়া যাতে প্রশান্তমনে ইজাবাতে মুয়াযযিন এবং মসজিদে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক হয়। তাই এ কর্মগুলোর তাকীদ ও উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

মোটকথা, ক্রমান্বয়ে ও ধাপে ধাপে পবিত্রতার গুরুত্ব ইজাবাতে মুয়াযযিনের মাধ্যম। আর ইজাবাতে মুয়াযযিন উসিলা হয় মসজিদের প্রতি মনোনিবেশ করার। আর মসজিদের প্রতি মনোনিবেশ মাধ্যম হয় জামাতের উদ্যোগ নেয়ার। আর জামাতের উদ্যোগ উসিলা হয় নামাজের পাবন্দির যা আসল ও মূল মাকসুদ। সেজন্য নামাজের সাওয়াব ও প্রতিদানের সাথে সাথে তার মাধ্যমগুলোর সাওয়াবকে জড়িত করা হয়েছে। পবিত্রতাকে অর্ধ ঈমান এবং পাপ মোচনকারী স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আর ইজাবাতে মুয়াযযিনের শেষ সময়কে দুআ কবুলের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। মসজিদে উপস্থিত হওয়ার পদক্ষেপকে প্রতি কদমে কদমে একটি গোনাহ মোচন এবং একটি নেক লেখনের ওয়াদা করা হয়েছে। আর মসজিদে উপস্থিত এবং নামাজের অপেক্ষাকে নামাজের হুকুমে ধরা হয়েছে। জামাতে অংশগ্রহণে সাতাশ গুণের অধিক সাওয়াব ও প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদা করা হয়েছে। আর আসল নামাজকে নূর এবং ঈমানের লিখিত সনদ বলে একে অন্যায় ও নির্দিষ্ট কর্ম থেকে নাজাতের মাধ্যম বলা হয়েছে,

যাতে মানুষের আত্মা পাকসাফ এবং সুসজ্জিত ও সংস্কার হয়ে যায়। সুতরাং আসল মাকসুদ তো নামাজ কর্ম, কিন্তু এই সমস্ত বিষয়াবলি যেহেতু তার সঞ্চয় ও পরিপূর্ণ করার মাধ্যম এবং হুদুদ। সেজন্য এগুলোকে নামাজের আদব বলা হয়েছে। যদি এগুলোর গুরুত্ব দেয়া হয়, তাহলে নামাজ কায়েম থাকবে, অন্যথায় ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে মানুষের নামাজের পাবন্দী নসিব হবে না।

আদব পরিহারকারী শরীয়ত পরিহারকারী

সুতরাং আদবের সারকথা এমন বের হলো যে, তা মামুরাত বিষয়ে তো ফারায়েযের মুহাফেজ বা সংরক্ষক। আর মানহিয়াত বিষয়ে মুহাররিমাতের প্রতিবন্ধক। আর ফারায়েযের আদবসমূহকে ইমতিছালী তথা নির্দেশ মেনে নেয়ার হুদুদ বলা হবে এবং মুহাররিমাতের (নিষিদ্ধ বস্তু) আদবাবলিকে বেঁচে থাকার হুদুদ বলা হবে। মুহাররিমাতের আদবসমূহ পালন করার দ্বারা মুহাররিয়াত বস্তু থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে। আর ফারায়েযের আদবাবলি পালন করার কারণে ফারায়েযের মধ্যে জমে থাকার সহজতা অর্জন হবে। ফারায়েয আদবের পাবন্দী ফারায়েযের মহব্বত অন্তরে জাগ্রত করবে। আর মুহাররিমাত আদবের পাবন্দী দ্বারা মহাররিমাতের ঘৃণা অন্তরে পয়দা হবে। এ কারণে ফারায়েযের আদবসমূহ বাস্তবে সজ্জিত হওয়ার মাধ্যম যা দ্বারা মানুষের আত্মা সুসজ্জিত হয় আর মুহাররিমাতের আদব হলো পরিত্যাগের মাধ্যম যা দ্বারা নফসের জন্মগত দোষ-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দূরীভূত হয়।

তেমনিভাবে আদবসমূহের বর্জনীয়যোগ্য প্রকারসমূহ নফসকে ঘষে-মেঝে পরিষ্কার করে আর গ্রহণীয় আদবসমূহ নফসকে বার্নিশ করে তাকে উজ্জ্বল ও চমকদার করে। ইন্দ্রিয়গতভাবে প্রকাশ যে, ওই আদবসমূহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে না ফারায়েয টিকে থাকবে, না মুহাররিমাত থাকবে। কেমন যেন আদব পরিহারকারী মূলত ফারায়েজ ও মুহাররিমাত পরিত্যাগকারী। আর অন্য শব্দে বলা যায়, সে শরীয়ত তরককারী। এজন্যই কিতাব ও সুন্নাত ওই আমলগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছে এবং শরীয়তের প্রতিটি অধ্যায় আদবের একটি বিশাল বড় পুঁজি স্তূপ পেশ করেছে। যেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আদব কুরআন ও হাদিসের ইরাবাতে প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আর কতক দালালাত ও ইশারাত এবং তাকাজার মধ্যে লুক্কায়িত আছে, যা ফুকাহায়ে মিল্লাত এবং হুকামায়ে উম্মতের সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত সর্বসাধারণের সামনে আসতে পারে না। এ কারণে আমরা উদাহরণস্বরূপ মেধাগত ও কল্পনাগত

গোনাহের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি যাতে ওই প্রকার আদবের প্রতিও মানুষের অন্তর মনোনিবেশ থাকে। আর তা ফুকাহায়ে উম্মাতের আঁচল ধারণ করা ব্যতীত অর্জন হবে না, সহজে পাবে না।

ফুকাহাদের মারেফতের মাকাম

একজন বাহ্যপূজারী এবং অজ্ঞ লোক যে শরয়ী পাবন্দীসমূহ তথা বাধ্যবাধকতার জোয়ালকে কাঁধ থেকে খুলে দূরে নিক্ষেপ করতে চায় অথবা শরয়ী পরিভাষার আড়ালে কমপক্ষে নিজের অন্তরকে শরীয়তের বাতেনী বাধ্যবাধকতা থেকে নিজেকে মুক্ত স্বাধীন দেখতে পছন্দ করে, তার ব্যাপারে সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে ফুকাহাদের ওই দাকায়েক তথা সূক্ষ্ম বিষয়াবলি শিরক ফিন নবুওয়াত ইত্যাদি ইত্যাদি অপছন্দনীয় শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করে, তাদের ইলমি অনুসন্ধানকৃত বিষয়কে এবং রিয়াযতের তাওফীক অবমূল্যায়ন করবে। কিন্তু একজন হাকিকত অবগত চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যিনি শরয়ী হুকামা দার্শনিক এবং দীনি ফ্যালোসুফীর বুলন্দ মাকাম সম্পর্কে সামান্যতম অবগত ও জ্ঞান রাখেন, তিনি জানেন, ওই ফুকাহাগণ তারা শুধু শরীয়তের বিধিবিধানকেই বুঝেনি, বরং তারা আহকামের জাহেরী ও বাতেনী উভয় সিলসিলার বিষয়াবলি বুঝতেন।

আর সেজন্য তারা শুধু শরয়ী হুকুম বয়ান করায় তুষ্ট থাকবেন না, এমনকি সেই হুকুমের সাথে জড়িত সমস্ত জাহেরি ও বাতেনী মুর্তবার আহকাম এবং সেগুলোর সর্বশেষ হালত এবং সতর্কতামূলক হুদুদকে দেখিয়ে দিতেন, যা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে শরয়ী ব্যাখ্যাসমূহে দেখা যেত না। কিন্তু সেগুলোর অর্থ ও মাদলুনাত তথা বোধগম্য বস্তু এমনভাবে মিশে ও জড়িয়ে থাকতো যেমন 'আলিফ' 'বা' এর ত্রিশ শব্দে হাজারো শব্দ ও ইমারাত মিশে আছে এবং যেমনভাবে 'আলিফ' 'বা' থেকে অতিক্রমকারী চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ত্রিশ অক্ষরের সংযোজন ও বিয়োজন দ্বারা বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারেন যেগুলোকে কায়দায়ে বুগদাদী পাঠকারীগণ বুঝতে সক্ষম হয় না। তেমনিভাবে শরয়ী পরিভাষার অর্থ জ্ঞাত চক্ষুষ্মান ব্যক্তি শরীয়তের পরিপূরক ব্যাখ্যাসমূহ দ্বারা সেগুলোর মধ্যে লুক্কায়িত বিভিন্ন হুদুদ এবং গোপন আহকামকে আপন আলোকিত বোধশক্তি ও গভীর যাওক দ্বারা নির্গত করে আনতে পারে। যে পর্যন্ত প্রাথমিক ছাত্র এবং ইলমের দাবিদারদের দৃষ্টিও পৌঁছতে পারে না। সুতরাং ফুকাহায়ে উম্মতগণ কোন অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ডাক্তারের ন্যায় কোন রোগী সাক্ষাতের পর স্রেফ ঔষধ বলে দেয়া বা বেশি বেশি রোগের আলামত দ্বারা রোগের ধরন বলে দিয়ে ব্যবস্থাপত্র লেখে

দেয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেন না বরং উম্মতের রোগ-ব্যাধি জানার পাশাপাশি সেগুলোর কারণ ও দোষ তারপর সেগুলোর প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বা পরিণাম সম্পর্কে জ্ঞাত থেকে প্রত্যেক শরয়ী প্রতিশোধকের বৈশিষ্ট্য এবং সেগুলোর প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের পরিণামকেও জানতে পারেন।

আর তা শুধু উপরি উপরিভাবে বা ভাসাভাসা নয় বরং রোগ বিশ্লেষণ ও পরখ করার পর ঔষধাবলিকে পরখ করে রোগের প্রতিটি অংশ নিরুপণ এবং ঔষধ ও রোগের মাঝে সামঞ্জস্য দেওয়ার ক্ষমতাও রাখেন। ফলে তাদের এই চিকিৎসাপদ্ধতি সর্বকালের জন্য অব্যর্থ তীর তথা কার্যকরী প্রমাণিত হয়। আজও আধুনিক যুগে জগদ্বাসী নিজেদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা তাদের মূলনীতি ও কানুনের ভিত্তিতে করে যাচ্ছেন, যাতে দোস্ত ও দুশমন কেউ তাদের গ্রহণযোগ্য প্রচেষ্টা হতে স্বনির্ভর হয়ে নিজেদের ঈমানকে কায়েম রাখতে সক্ষম নয়।

ফুকাহায়ে কেরামদের এই উদ্ভাবন ও সৃষ্টি আহকামে শরি হয় না যে, আহকামের অনুমোদনকে সন্দেহে করা হবে এবং তা মারি এবং শরীয়তের গভীর মারেফাত যা দ্বারা জাহেরী (প্রকাশ্য) শরীয়তের পাশাপাশি বাতেনী শরীয়ত অদৃশ্য শরীয়ত ও তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। আর তারা তা প্রদর্শন করেন এ কারণে এমন মজবুত আলেমগণ আহকাম অনুমোদন ও বৈধকারী নন বরং আহকাম প্রকাশকারী। তারা আহকাম আবিষ্কার করে নন বরং উদঘাটন করেন। সেজন্য তাদের অনুসরণ মাধ্যমে শরীয়তেরই অনুসরণ করা হয়। এজন্য আদবে শরয়ীর সিলসিলায় কিতাব ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট আদবাবলির সঙ্গে সঙ্গে ইজমা ও কিয়াসের প্রকাশ করা আদবের পুঁজি কেউ সামনে রাখতে হবে। অন্যথায় জাহেরী নুসুসকে গ্রহণ করে বাতেনি নুসুসকে পরিত্যাগ করা এবং ফুকাহাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উদঘাটিত ইলম থেকে ফায়দা না গ্রহণ করা, শুধু বঞ্চিত হওয়া নয় বরং ধ্বংসও।

রুচিগত আদব

অতএব শরীয়তের চারটি মূলনীতির হুজ্জতসমূহের আদব দ্বারা মুতায়াদ্দাব বনে এবং যাওকে আদবের অভ্যস্ত হয়ে স্বয়ং ওই মুতায়াদ্দাবের উপর আদবের অনেক যাওকি পথ খুলে যায়, যা অন্যদের জন্য চাই হুজ্জত না হোক কিন্তু স্বয়ং সাহেবে যাওকের জন্য কিছু না কিছু হুজ্জতের শান অবশ্যই হয়, যা তার উপর কারো বলার দ্বারা নয় বরং তার অবস্থা ও হাল থেকে প্রকাশ পায়। তখন সে শুধু হাকিমের হুকুমের সামনে মাথানত করে না বরং হাকিমের মানশার সামনেও

আদবের মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলে। সে শুধু হাকিমে হাকীকি আল্লাহ তায়ালার পবিত্র জাতেরই আদব করে না বরং যে বস্তু বা ব্যক্তি তার নামে খ্যাত ও প্রসিদ্ধ হয়, সে তাদেরও সামনে আদবের ঘাড় নত করে ফেলে। তেমনি যদি কোন স্থান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে খ্যাত হয়, সে তাকেও আদব প্রদর্শন করে যেমন বাইতুল্লাহ ও বাইতুর রাসূল বা কোন আহলুল্লাহর স্মৃতি ও তার উপস্থিতির স্থান। যদি কোন ব্যক্তির নামের সঙ্গে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম যুক্ত হয়, তখন সে তাকেও আদব করে। যেমন রাসূলুল্লাহ, নায়েবে রাসূলুল্লাহ। যদি কোন কাগজ বা পাতার আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়, তখন সে তারও আদব করে, সম্মান করে। যেমন, কুরআনুল কারীম, হাদিসের কিতাব ও ধর্মীয় কিতাব। মোটকথা, আদবকে শরয়ী নিয়মাবলি অনুযায়ী পাবন্দীর ফলে অনেক রুচিগত আদব তার উপর উদ্ভাসিত হয়ে যায় আর সে নিজের কালবের আহবানে সেগুলোর উপর আমল করার জন্য আনুগত্য ও উৎসাহের সঙ্গে ঝুঁকে যায়। কেমন যেন প্রকাশ্য শরীয়তে এমন আদবাবলির পরিভাষা পাওয়া যায় না।

মদিনায় হিজরতকালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি.-এর গৃহের নীচতলায় অবস্থান করেছিলেন আর সাহাবী ও তাঁর পরিবারবর্গ উপর তলায় বসবাস করতেন। হযরত আবু আইয়ুব রাযি. সারারাত ঘরের এমন কোণে জড়সড় হয়ে বসে থাকতেন, যেখানে তার দৃঢ় বিশ্বাস হতো যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বরাবর নিচে অবস্থান করছেন না। অথচ প্রকাশ্য শরীয়তে এ সম্পর্কে কোন আদেশ ছিল না, না ছিল ঘরের মধ্যস্থলে থাকা নিষেধ। কিন্তু যাওকে আদব আমলের এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে তাঁকে বাধ্য করেছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধি লিপিবদ্ধ করার প্রাক্কালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধিপত্র থেকে নিজের নাম মোবারক 'রাসূলে খোদা' শব্দটি মুছে ফেলার জন্য হযরত আলী রাযি.কে আদেশ দিলেন। কিন্তু হযরত আলী রা. প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট আদেশ সত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম মোবারককে কেটে ফেলার দুঃসাহস প্রদর্শন করেননি। এখানে তাঁকে তার যাওকি আদব হুকুম পালনে বাধা দিয়েছিল, যা হাজারো হুকুম পালন থেকে বড় আনুগত্য ও হুকুম পালন ছিল। ইমাম আবু হানিফা রহ. মদিনা যিয়ারতকালে সেখানে ১১ দিন অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু তিনি এগার দিন যাবত পেশাব ও পায়খানা করেননি। শুধু এমন জযবায়ে আদবের কারণে যে, মদিনার পবিত্র ভূমি যেখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসস্থান ও অবস্থান ছিল, সেখানের জমিন কে

কিভাবে আমি মলিন ও নাপাক করব। প্রকাশ থাকে যে, এই কাজ শরীয়তভাবে নিষিদ্ধ ছিল না; কিন্তু তা ছিল আদবে হাল, রসমি উক্তি ছিল না। ইমাম মালিক রহ. যিনি মদিনায় হিজরতকারী ইমাম ছিলেন। তিনি সারা জীবন মদিনায় অতিবাহিত করেছেন এবং সেখানকার পবিত্র মাটিতে সমাধিস্থ হয়েছেন। কিন্তু তিনি সারা জীবন মদিনার অলিগলিতে জুতা পায়ে চলাচল করেননি যে, ওই স্থানে আমার জুতা লেগে যাবে, যেখানে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পা মোবারক পড়েছে। সুস্পষ্টত এমনটি ছিল ইমাম রহ.-এর আদবের জোশ, যা যাওকিভাবে, হাল হিসেবে অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল। প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান শরীয়তে কোথাও উক্ত আদেশের শব্দ উল্লেখ নেই।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ রহ. মক্কায় হিজরত করে আজীবন কালো রঙের জুতা পরিধান করেননি যে, কাবার গেলাফের রং কালো; আমি তাকে পায়ে কিভাবে লাগাব? প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তগতভাবে তা নিষেধ ছিল না। কিন্তু তার মধ্যে আদবের একটি হাল ছিল, যা আদেশ থেকে উন্নত ছিল। দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসেম সাহেব নানুতুবী রহ. হযরত সাবের কলিরী রহ.-এর সাক্ষাতের জন্য কলিরী শরীফ যেতেন। তখন তিনি পাঁচ মাইল দূর থেকে জুতা খুলে খালি পায়ে হাঁটতেন। প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তের নুসুসে এমন প্রকার বিষয়ের হুকুম বিদ্যমান নেই। কিন্তু হুকুম পালনকারীদের যাওকি রুচিবোধ এবং মেধাগত জযবা যা তাদের জাত ও সত্তাকে পর্যন্ত উক্ত আদব প্রদর্শন মজবুর ও অক্ষম করে।

শরয়ী কার্যাবলি অনুশীলনে তবয়ী ফলাফল

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর রাওযায়ে আকদাসের কোলারীর ঝাড় ও পরিষ্কারকরণের মাধ্যমে জমাকৃত খড়কুটো ও মাটি ইত্যাদি হস্তগত হয়। তিনি সেগুলোকে পিষে নিজের সুরমার সঙ্গে মিলিয়ে নেন এবং আজীবন সুরমার শলাকার মাধ্যমে চোখের ভিতর লাগাতে থাকেন। বলা বাহুল্য যে, এমন পদ্ধতি শরয়ী আহকাম ছিল না, যাওকি জযবাতে আদব ছিল, যা শরয়ী আদবের চর্চা দ্বারা যোগ্যতা হিসেবে অন্তরে শিকড় গেড়ে ছিল এবং ওই রকম বিভিন্ন অবয়বে প্রকাশ পাচ্ছিল। নিঃসন্দেহে এগুলো তাকলীদ ও ইত্তেবা অথবা দাওয়াত দেয়ার বিষয় বা বস্তু নয় কিন্তু শরয়ী আদবের অনুশীলন দ্বারা যোগ্যতা হিসেবে অন্তরে মজবুতভাবে শিকড় গেড়েছিল এবং ওই বিভিন্ন প্রকৃতিতে প্রকাশ পাচ্ছিল। নিঃসন্দেহে এগুলো তাকলীদ ও ইত্তেবা অথবা দাওযাত দেয়ার বস্তু নয়; কিন্তু আদবসমূহে অভিজ্ঞ এবং সাহেবে হাল হওয়ার

দরুন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমলে আসার বস্তু, যা থেকে বাধা প্রদান করারও কারো অধিকার নেই। কেননা, এমনটি আমলে শরীয়ার মশ্‌ক ও চর্চার তবয়ী ফলাফল। সেজন্য তা শুধু ওয়াজিবুল ইহতেরাম (সম্মানযোগ্য) এবং প্রশংসাযোগ্যই নয় এমনকি হাল ও অবস্থার স্থলে অনুসরণীয়।

সারকথা হলো, যে সমস্ত আদব নিয়ে উলামায়ে ইসলাম উঠেছেন, যেগুলোর দাওয়াত ইসলামি শরীয়ত দেশে করেছে, চাই তা শরয়ী ইবরাতে প্রকাশ্য পরিভাষায় প্রকাশ্যমান হোক অথবা শরীয়তের দালালত ও ইশারাসমূহে গোপন থাকুক অথবা আহলুল্লাহদের পবিত্র যাঁওক ও মেধা থেকে বের হোক, তা শাব্দিক আদব এবং বাহ্য রসুম নয় যে, বাক্য গঠনের শিল্পকর্ম, সুন্দর বর্ণনাভঙ্গি, শব্দের শালীনতা এবং তাৎক্ষণিক উত্তর অথবা রসমি আদব ও রেওয়াজি রীতিনীতির উপর শব্দ ও বর্ণনার নির্ধারিত বাক্যাবলি উচ্চারণ করা বা মাথানত করা নয় বরং তা হাকিকী আদব, যার গঠন-উপাদান ফিকির ও নজর তথা চিন্তাধারার সাথে সাথে শরয়ী নুসুসের অতি দূরতম সম্ভাব্য বিষয়ের অনুসরণ, সতর্কতামূলক হুদুদের উপর আমল করা, তাহযীবে আমলের সঙ্গে সঙ্গে তাহযীবে খেয়াল ও ধ্যান ও রিয়াযতে নফসের কল্পনা, আমলে মুজাহাদা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শিষ্টাচার, আত্মশুদ্ধি, অন্তর পবিত্রকরণ এবং খালিস ও নিরেট আল্লাহর রেজামন্দির জন্য খায়েশ ও লজ্জত ও জৈবিক স্বাদ পরিহারকরণ। এটা ওই আদব, যা আম্বিয়াগণ আ. ইখতিয়ার করেছিলেন, সালেহীনগণ নিয়েছিলেন, সিদ্দিকীনগণ আপন করে নিয়েছিলেন। আর এরই মাধ্যমে নিজেদের দীন ও দীনদারীকে মাহফুজ ও মজবুত বানিয়েছিলেন।

আদবের উৎস

আদবের উক্ত মাকামে পৌঁছার পর না থাকে ইবারাত বা লাইন সজ্জিতকরণ, না থাকে শব্দ ও বাক্য সৌন্দর্যকরণ, না থাকে বাক্য প্রাঞ্জলকরণের জযবা, না থাকে অনর্গল বর্ণনার যোগ্যতা, না থাকে প্রচলিত রসুম-রেওয়াজের অবস্থা ও অবয়ব, না অবশিষ্ট থাকে বানোয়াটি তাযীম ও সম্মান প্রদর্শন। বরং বাকি থাকে সাদাসিধে ও সরলতা ও অকৃত্রিমতার সাথে হাকিকী আযমাত ও আদব এবং প্রকৃত ও বাস্তব মনের ভাব প্রকাশ, যাতে বাহ্য সৌন্দর্যের স্থলে খুলুসিয়্যাত, সাজসজ্জার স্থলে নিঃশেষ হওয়া ও বিলীন হওয়া অবশিষ্ট থাকে।

এমনকি ওই মাকামে পৌঁছে পরিপূর্ণ কালাম ও বয়ানকে হাদিসে নববী নেফাক দ্বারা আর বয়ানের অক্ষমতাকে (যখন হকের আযমতকে গোলক ধাঁধায় ফেলে

যবানকে বোঝা বানিয়ে ফেলে) ঈমান দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ইশ্‌কও মহব্বতের জন্য যবানের ভাষার প্রয়োজন নেই। তা নিজেই আপন মাকসাদকে প্রকাশ করতে পারে। এখানে আদবের ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন নেই যে, সে স্বয়ং নিজেই পৃথক একটা আদব এবং আদবের উৎসস্থল। কবি বলেন–

ফার্সি বলা যদিও সজীবতা ও প্রফল্লতা দেয় কিন্তু ইশ্‌কের
হাজারো ভিন্ন ভিন্ন ভাষা রয়েছে।
তার কথায় প্রেমাস্পদ চার টুকরো হয়ে যায়, তার সকল ভাষা
পেরেশানি দূর করে।

রস্‌মি ইলম ও আদবকে হাদিসে নববীর ভাষয় সাজসজ্জা এবং দেহের সৌন্দর্য বলা হয়েছে। কেয়ামতের বড় বড় নিদর্শনাবলি হতে এটি একটি বড় আলামত যে, লোকেরা আপন ইলম দ্বারা জৌলুস, বিলাসিত ও সৌন্দর্য অর্জন করতে থাকবে। যেমনভাবে সে মনোমুদ্ধকর মনোলোভা কাপড় ও বস্ত্রাদি এবং সজ্জিত বাড়িঘর দ্বারা সৌন্দর্য লাভ করবে। তেমনিভাবে ইলম ও আদব না স্রেফ মাহফিল-সমাবেশের আলোক উজ্জ্বল সামগ্রী বনে যাবে, না বাতেনের সৌন্দর্য হতে, না বাতেনী নফসের মধ্যে প্রকৃত আদবের শিকড় প্রসারিত হবে।

সুতরাং এমন আদবে যখন অজ্ঞাতসারে শুধু রসমি শরয়ী নীতিকে রেওয়াজসুলভ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, তখন শরয়ী রুসুম বাকি থাকে। কিন্তু হাকিকত শরীয়ত একেবারেই হারিয়ে যায়। এ কারণে শাব্দিক ও রসমি আদবের এই প্রাণহীন নকশা, একটা লাশের ন্যায় হয়ে যায়, যার উপকারিতা ও লাভ না ইহজগতে প্রকাশ হবে, না পরজগতে জাহের হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এহেন শাব্দিক আদব ও প্রচলিত সম্মান না কোন আহলুল্লাহর আদব, না কোন দিলদার ব্যক্তির আদব এবং না তাদের কোন আমলের মূল ধাতু বলা যাবে, যাকে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশংসা করা যেতে পারে। জাওহারে আমল এবং রূহে তাকওয়া এমন আদবকে বলে, যা ওই প্রচলিত আদব হতে উর্ধ্বে থেকে নিজের ভিতর আদবের প্রকৃত আত্মা ধরে রাখে এবং কাব্যগত, সাধারণত, প্রথাগত, অহংকারমূলক এবং কপটতা ও প্রতারণামূলক রসমি আদব হতে বাঁচিয়ে রেখে পায়গম্বরসুলভ আদব ও আখলাক এবং অহংকারমূলক রুসুম ও হুদুদের মধ্যে লিপ্ত করবে, যাতে মানুষের মাঝে আত্মত্যাগ ও রেযায়ে মাওলার জযবা আন্দোলিত হয় আর মানবাত্মা সঠিক অর্থেক সৌন্দর্য এবং রব্বানি তথা আল্লাহ ভক্ত বনে যায়। ফলে তার আসল কল্যাণ অর্জন হয় এবং কুকর্ম ও শয়তানি থেকে বেঁচে আসল প্রকৃত মুক্তিকে আলিঙ্গন করতে পারে।

নামাজ পুরো ইসলামের মাপকাঠি

নামাজে ইবাদতের দিক

শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদত বলা হয় সর্বোচ্চ যিল্লতি প্রকাশকরণ অর্থাৎ সর্বোচ্চ যিল্লাত অপদস্থতা ইখতিয়ার করা, যারপর যিল্লতির আর কোন স্তর অবশিষ্ট থাকে না। নামাজ নামক ইবাদাতে বুনিয়াদী বস্তু দু'টি। একটি যিকিরসমূহ, যা যবানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। অপরটি হলো অবস্থা, যা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্ক রাখে। যিকিরসমূহে ছানা হতে সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা পর্যন্ত, তারপর তাসবীহাত থেকে তাশাহহুদ পর্যন্ত নিজের দাসত্ব, গোলামি ও উৎসর্গ বা আল্লাহর বড়ত্ব, সীমাহীন বুযুর্গি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা নেই। আর হাইয়াত হিসেবে প্রার্থনাকারী হিসেবে সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো, অতঃপর রুকুতে মাথা নত করা, পরিশেষে নিজের সবচেয়ে ইজ্জতওয়ালা স্থান-কপালকে আপন মাবুদের সামনে মাটিতে ঠেকিয়ে দেয়া এবং তার ইজ্জতের সামনে আপন যিল্লতের কার্যকরি ও অবস্থাগত স্বীকৃতি প্রদান করা যা ইবাদতের আসল ও মৌলিক উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সামনে নিজের সর্বোচ্চ যিল্লত ও অপদস্থতা প্রকাশ করা।[২]

নামাজ সমগ্র কায়েনাতের সমষ্টি ও পরিপূরক

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ

---

২. হযরত হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব রহ. মুলতানের মাদরাসায়ে খাইরুর মাদারিসের বারতম সালাম জলসা ১৩৬১ হিজরি সনে দার্শনিকসুলভ নামাজের শিরোনামে একটি পরিপূরক বয়ান দিয়েছিলেন, যা বড় মাপের একশত পৃষ্ঠায় ছেপেছিল। আমি পাঠকদের উপকারার্থে সেই বয়ানের সারনির্যাস পেশ করেছি। সেগুলো হযরতের বয়ানের চিন্তা করা হয়েছে। [মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল সাহেব]

প্রত্যেকে নিজের নামাজ এবং তাসবীহ জানে।

হযরত শাহ আবদুল আযিয সাহেব রহ. তার কোন এক রচনাবলিতে বিশদ বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিটি বস্তুর নামাজের অবস্থা তার সৃষ্টিগত অবস্থা অনুযায়ী রাখা হয়েছে, যাতে সেই বস্তুর নামাজ তার জন্মগত গঠন ও আকৃতি দ্বারা স্বভাবগতভাবে আদায় হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বৃক্ষের নামাজ কিয়াম দাঁড়ানো অবস্থায়, বৃক্ষের আকৃতির ধরন এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, ওরা নিজেদের ধড়ের উপর দাঁড়িয়ে কিয়ামের সঙ্গে নামাজ আদায় করছে। চতুষ্পদ প্রাণীর নামাজ হলো রুকু, কেমন যেন ওরা সর্বদা আল্লাহর রুকু অবস্থায় ঝুকে আছে যা থেকে বিচ্যুতি ও অবাধ্য হতে পারে না।

অতঃপর জমিনের পোকামাকড় যারা হামাগুড়ি দিয়ে এবং পেটের শক্তিতে চলে, যেমন সাপ, কিচ্ছু, ছাপকুলি বা টিকটিকি এবং ক্ষীরা-মকড়ার নামাজ হলো সিজদার হালতে। এদের সৃষ্টিগত অবস্থা নামাজের সিজদার ন্যায় বানানো হয়েছে যে, সর্বদা অবনত মস্তকে থাকে। কেমন যেন তারা আল্লাহর সামনে সর্বদা মস্তককে সিজদার অবস্থায় অবনত করে রাখে। পাহাড়-পর্বতের নামাজ হলো তাশাহহুদ বা বৈঠক অবস্থায়। কেমন যেন ওরা হরহামেশা জমিনের উপর দু'জানু হয়ে দু'পা বিছিয়ে বসে আছে এবং সর্বদা তাশাহহুদের ভিতর আছে। তারপর উড়ন্ত পাখিদের নামাজ ইন্তিকালাত তথা উপর থেকে নিচে এবং নিচে থেকে উপরে স্থানান্তরিত হওয়া। যেমনভাবে মানুষ দাঁড়ানো হতে বসা এবং বসা হতে দাঁড়ানোর দিকে রূপান্তর হয়। ওদের ইন্তেকালাত-ই ইবাদাতের মধ্যে গণ্য হয়। তারপর গ্রহ-তারকারাজি এবং আকাশমণ্ডলের নামাজ হলো ঘূর্ণয়মান এবং চক্রাকারে পরিভ্রমণ যে, এক গন্তব্য হতে ঘুরে পুনরায় সেই গন্তব্যে ফিরে আসা। যেমনভাবে একজন নামাযি এক রাকাত পড়ে পুনরায় ফিরে আসে। অতঃপর ভূমির নামাজ হলো সৃষ্টিগত জমাট এবং স্থির অবস্থান। কেমন যেন চুপচাপ ও নীরব হয়ে আপন কেন্দ্রে জমে রয়েছে, যা সর্বোচ্চ যিল্লত প্রকাশ ও খুশু প্রদর্শন।

আর জান্নাত ও জাহান্নামের নামাজ হলো প্রার্থনা করা যে, হে আল্লাহ! আমাদের স্থানকে পূর্ণ ও ভরপুর করে দিন। আর ফেরেশাতাকূলের নামাজ হলো ইছতেফাত তথা কাতারবন্দী থাকা যে তারা কাতার কাতার একত্রিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ইবাদতে মগ্ন রয়েছে। অতঃপর ওই সকল অবস্থা-আকৃতি যা ওই জড়পদার্থ ও উদ্ভিদজগত, প্রাণীজগত এবং ফেরেশতাকূলে বণ্টন করা হয়েছে। সেগুলোকে বনি আদম এবং দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কোন জাতির নামাজ শুধু দাঁড়ানো, কোন জাতির নামাজ

ফাইমে কিয়াম উভয় পায়ের হাঁটু দ্বারা সিজদা করা। কোন জাতির নামাজ স্রেফ রুকু, কোন জাতির নামাজ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়া অর্থাৎ সিজদা। কোন জাতির নামাজ সমস্ত জাতির সমষ্টি অবস্থা হিসেবে বৃক্ষের ন্যায় কিয়াম, চতুষ্পদের মত রুকু, ফেরেশতাদের মত কাতারবন্দি, আকাশ ও গ্রহের মত ঘূর্ণয়মান, পাহাড়ের ন্যায় বৈঠক। আর আযকার হিসেবে প্রত্যেক মাখলুকে তাসবীহ। আর যিকির সকলের সৃষ্টি এবং যোগ্যতা হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন। একজনের যিকির অপরজন বুঝতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসা করে থাকে কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না।

তেমনিভাবে প্রত্যেক জাতিকে তাদের মুনাসিব যিকির শিখিয়েছেন। কোন জাতির আউযুবিল্লাহ পড়ার হুকুম ছিল, কারো উপর প্রার্থনা ও দুআর অধিক হুকুম ছিল। যেহেতু খাতিমুন নাবীঈনের দীন পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে সেজন্য মুসলমানদের নামাজ এ সমগ্র জাতির নামাজের সমষ্টি করে দেয়া হয়েছে। যেগুলোকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জাতিসমূহে বিভিন্ন নামাজে বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

সময়সমূহের সমষ্টি পরিপূরক

আওকাতে নামাজও পরিপূরক অর্থাৎ যে সময় জন্মগতভাবে রূহের তবিয়ত ধাবিত হয় অথবা নফসের তবিয়তগত অবাধ্যতা রয়েছে বিপথগামিতা রয়েছে, ওই সকল সময়কে নামাজ নিজের ভিতর মাশগুল ও লিপ্ত করে নিয়েছে। সকলের পছন্দনীয় সময় যা রূহ বা আত্মার জন্য আনন্দদায়ক ছিল, তাই ফজরের নামাজ তাকে নিয়ে নিলো। দুপুরের সময়টা সহজের জন্য ছিল, আরামের জন্য ছিল, যোহরের নামাজ তাতে গতি পয়দা করেছে, কর্মক্ষমতা সৃষ্টি করেছে। আসরের সময়টি ঘোরাফেরার জন্য ছিল, আসরের নামাজ ওই গাফলত ও অলসতাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। মাগরিবের সময়টি সূর্য পরিবর্তনের ছিল, তখন মাগরিবের নামাজ রাত পরিবর্তনের প্রতি ঝুঁকিয়ে দিল। এশার সময়টা ছিল পরিসমাপ্তির, তাই এশার নামাজ তাকে খাতিমা বিল খাইর শেষ পরিণাম ভাল

করে দিল। অতঃপর নফল নামাজসমূহ অন্যান্য সময়ের বৈশিষ্ট্যের অধীনে সেগুলোকে ইবাদাতের মধ্যে মশগুল করে দিয়েছে।

সারকথা, একজন মানুষ সমস্ত যিকির ও আনুগত্যের স্থলে শুধু নির্ধারিত ওয়াজিব ও নফল সময়গুলোতে যদি নামাজের গুরুত্ব দেয়, তাহলে সে কখনো গাফেল হবে না। নামাজের মধ্যে রোজা, ইতিকাফ, হজ্ব ও যাকাতের হাকিকত বিদ্যমান।

রোজার হাকিত হলো সুবহে সাদীক হতে খাওয়া, পান করা এবং বিবিদের থেকে উপকার অর্জন হতে বেঁচে থাকা। এই সকল বস্তু নামাজের মধ্যেও নিষেধ। এমনকি নামাজের মাঝে সেগুলো ব্যতীত সালাম, কালাম, মহিলাদের স্পর্শ করা, হাসি দেয়া, কথা বলা, চলাফেরা করা এবং সাধারণ নড়াচড়া সবই নিষিদ্ধ। এ কারণে নামাজের ভিতর রোজা তার আপন সর্বোচ্চ আকৃতির সাথে বিদ্যমান রয়েছে। রোজার ইতিকাফে বিছানার প্রয়োজনীয়তা পুরো করা, ঘুমিয়ে থাকা, শুয়ে আরাম করা, খাওয়া ও পান কর ইত্যাদি কাজের অনুমতি আছে। কিন্তু নামাজে ওই সমস্ত কর্ম নামাজ ভঙ্গের কারণ। এমনকি মসজিদে টহল দেয়া, ঘুরাফেরা, নড়াচড়া করার অনুমতি নেই। এ কারণে নামাজের ইতিকাফ বেশি পরিপূর্ণ রোজার ইতিকাফের তুলনায় এবং নামাজের ইতিকাফ পরিপূরক এবং পরিবেষ্টনকারী।

হজ্বের হাকিকত হলো বাইতুল্লাহ ও হেরেম শরীফের তাযীম করা। নামাজের মধ্যে তাযীমে বাইতুল্লাহর অবস্থান এরূপ যে, কিবলামুখী হওয়াকে নামাজ সহীহ হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। তাছাড়া নামাজই হবে না। তারপর তাওয়াফের মধ্যে যেভাবেই বাইতুল্লাহর সামনে হাত উত্তোলন করে তাওয়াফের চক্কর শুরু করা হয়, তেমনিভাবে নামাজের মধ্যে বাইতুল্লাহর প্রতি মুখ করে সম্মানার্থে হাত উত্তোলন করে নামাজ আরম্ভ করা হয়। তারপর তাওয়াফের মাঝে যেমনভাবে যিকির ও দুআ ভরপুর, তেমনিভাবে নামাজের মাঝে প্রত্যেক প্রকার যিকির (তেলাওয়াত, দরূদ শরীফ, তাসবীহাত ইত্যাদি) বিদ্যমান রয়েছে। হজ্বের মধ্যে যেমনভাবে হেরেম শরীফের সীমানা ভিতর থেকে আল্লাহর স্মরণে ও ইবাদাতে মশগুল থাকে।

আরাফাত ও মুজদালিফার ময়দানে আল্লাহর স্মরণে মাশগুল থাকে, তেমনিভাবে মসজিদের হেরেমের সীমানায় থেকে যিকরুল্লাহ ও নফল নামাজে লিপ্ত থাকে। অতঃপর হেরেম শরীফে যেমনভাবে শয়তানের প্রভাবকে পাথর মেরে দুর করা হয়। তেমনি হুবহু নামাজের মাধ্যমে শয়তানি খারাবিকে অদৃশ্য হাতিয়ার দ্বারা প্রতিহত করা হয়। আর হজ্বের মধ্যে যেমনভাবে তাওয়াফে বিদার মাধ্যমে ছুটি

চাওয়া হয়। তেমনিভাবে হুবহু নামাজের মধ্যে সালাম ও দুআ করে দরবারে ইলাহী হতে বিদায় নেয়া হয়।

মোটকথা, হজ্বের পরিপূর্ণ হাকিকত আপন গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর সাথে হুবহু বা সেগুলোর মত বিধান নামাজের মধ্যে বিদ্যমান। যাকাতের হাকিকত হলো তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মপবিত্রকরণ অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত থেকে অন্তর পবিত্র করা। নামাজের মধ্যেও তাযকিয়ায়ে নফস এবং তাযকিয়ায়ে রূহ রয়েছে যে, নফস আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে বেযার ও অসন্তুষ্ট হয়ে স্রেফ আল্লাহ তায়ালার জন্য হয়ে যায়। এভাবে যাকাতের হাকিকত নামাজের ভিতর রয়েছে। আর যাকাতের সুরত হলো এমন যে, নামাজের জন্য মসজিদ, চাটাই, কার্পেট ও হাউজ ইত্যাদি কর্মে আল্লাহর ওয়াস্তে মাল-সম্পদ ব্যয় করতে হয়, যেমনভাবে যাকাতের মধ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে মাল-সম্পদ ব্যয় করতে হয়।

নামাজ দ্বারা নফসের আমিত্ব দূর হয়

নামাজের মাধ্যমে আমিত্ব ও অহংকার দূর হয়, যা হাজারো বদ চরিত্র এবং বদআমলের উৎস। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত আত্ম অহমিকা অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজ ব্যতীত অন্য কারো আযমত অন্তরে প্রবেশ করবে না। নামাজ দ্বারা আল্লাহ পাকের আযমত ও মহব্বত অন্তরে পয়দা হয়। আর যখন কারে আযমত অন্তরে এসে যায়, তখন তাতে অহংকার ও গর্ব উপস্থিত হতে পারে না।

নামাজের মধ্যে তাসাউফের আলোচ্য বিষয় রয়েছে

তাসাউফ ইলমের আলোচ্য বিষয় হলো তাহযীবে নফস তথা নফসের খারাবি দূর করা এবং ফাযায়েল অর্জন করা। নামাজের মধ্যে দুটি বস্তু সামনে থাকে– নফস ও রব। নামাজ যখন নফসের তুচ্ছতা ও বেইজ্জতি করে, তখন সে মরে যায় এবং তার প্রভাবও মিটে যায়। আর নামাজ রবের আযমতকে সামনে নিয়ে আসে, তখন রবের দান ও অনুগ্রহ মুতাওয়াজ্জুহ হয় এবং তিনি আপন ফাযায়েল দ্বারা সম্মানিত করেন। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, নামাজ তাহযীবে নফস এবং ইসলাহে নফসের জন্য তথা আত্মশুদ্ধির জন্য উত্তম মুজাহাদা এবং উন্নত ও সর্বোচ্চ মাধ্যম।

রূহানী ও আখলাকী মাকামসমূহ

নামাজ যেহেতু তাযকিয়ায়ে নফস করে দেয়, তারপর আধ্যাত্মিক অবস্থা ও মাকামসমূহ পবিত্র এবং উন্নত ও শ্রেষ্ঠতম হয়ে যায়। এর মাধ্যম হলো নামাজ। কিন্তু কোন কিছুর মাধ্যম ব্যতীত স্বয়ং নামাজের মধ্যে তামাম রূহানি ও আখলাকী মাকাম বিদ্যমান আছে, সেগুলো নামাযি ব্যক্তির ভিতর মজবুতভাবে বসে, তখন মানুষ উন্নতমানের হয়। শোকরকে ধরা হলে দেখা যাবে, নামাজের রুহ ও আত্মাই হলো আলহামদ তথা শুকরিয়া জ্ঞাপন। সবরকে দেখা হলে দেখা যাবে যে, মানুষের জন্য নামাজের মধ্যে একটি স্বাদ রয়েছে যে, সে সবর করে বসে থাকে। নামাজের রোজা সমস্ত রোজা হতে অধিক পরিপূর্ণ। ইখলাসকে নেয়া হলে দেখা যাবে নামাজের রূহ হলো ' اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যার হাকিকত হলো গাইরুল্লাহকে পরিহার করে আল্লাহর দিকে দৌড়ানো, ধাবিত হওয়া।

বিনয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নামাজে যিল্লতে নফস আসল উদ্দেশ্য তাই এখানে তাওয়াজুর কোন হাকিকতই নেই। রিযাবিল কাজা তথা আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি তালাশ করা হলে দেখা যাবে যে নামাযি তার সকল লজ্জত ও স্বাদ নামাজে অর্পণ করে ফেলে এবং ধৈর্য ধারণ করে। বাহাদুরী ও বীরত্বের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নামাজের মধ্যে কঠিন মোকাবেলা হয়, নফসের সঙ্গে এবং নফসের চাহিদার সঙ্গে। আর প্রকাশ থাকে যে, অন্যের সঙ্গে লড়াই করা সহজ কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়াই করা মুশকিল ও দুরূহ।

হায়াতুন্নবী প্রসঙ্গে বিতর্কের অবসান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সম্মিলিত মাসলাক

হামদ ও সালাতের পর। আলমে বারযাখে আম্বিয়া কেরামগণের হায়াতের বিষয়টি সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত এবং সকল আলেমের ঐকমত্যের মাসয়ালা। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, তারা কবরজগতে জীবিত রয়েছেন। উলামায়ে দেওবন্দ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা ও বিশ্বাস অনুযায়ী আলমে বরযখে আম্বিয়া আ.গণ জীবিত আছেন। তারা এই ব্যাখ্যাসহ সাব্যস্থকারী যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামগণ আ. ওফাতের পর নিজ নিজ পবিত্র কবরে স্বশরীরে জীবিত আছেন এবং তাঁদের দেহের সঙ্গে তাদের মোবারক রূহগুলোর তেমনি সম্পর্ক রয়েছে, যেমনটি দুনিয়ার জগতে ছিল। তাঁরা ইবাদাতে লিপ্ত, নামাজ পড়েন, তাঁদের রিযিক দেয়া হয়। আর তাঁরা তাদের রওজায়ে পাকে উপস্থিত ব্যক্তির দরূদ ও সালাম শুনতে পান ইত্যাদি ইত্যাদি।

উলামায়ে দেওবন্দ উক্ত আকিদা কিতাব ও সুন্নাত থেকে পেয়েছেন। আর এ সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও গবেষণার পদ্ধতিটিও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। যখন ব্রেলবী গ্রুপের পক্ষ থেকে তাদের উপর এই অপবাদ আরোপ করা হলো যে, দেওবন্দিরা আলমে বরযখে হায়াতে আম্বিয়ার আ. অস্বীকারকারী আর উক্ত মিথ্যা অপবাদ দ্বারা হারামাইন শরীফাইনের আলেমদের মাঝে তাদের ব্যাপারে কুধারণা সৃষ্টি করিয়ে এবং ধোঁকা দিয়ে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে ফতোয়াও নিয়ে নেয়। কিন্তু যখন হারামাইনের আলেমদের নিকট উক্ত ধোঁকা ও প্রতারণার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেল এবং তারা এমন প্রকারের সকল মাসয়ারা সম্পর্কে নিজেদের পক্ষ থেকে একটি বিস্তারিত ফতোওয়া চাওয়ার পাণ্ডুলিপি সংকলন করে উলামায়ে দেওবন্দ হতে উত্তর চাইলেন, যেগুলোর মধ্যে হায়াতে আম্বিয়া

আ.-এর প্রশ্নও ছিল, তখন হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহেব মুহাদ্দিস সাহারানপুরী রহ. একটি বিস্তারিত জবাবী ফতোওয়া সংকলন করে উলামায়ে হারামাইনদের নিকট পাঠালেন, যাতে হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হায়াতে আম্বিয়া আ.-এর মাসয়ালাটি ব্যাপারে উলামায়ে দেওবন্দের চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে এবং সুস্পষ্ট বাক্যে লিখে দিয়েছেন, যার সারনির্যাস এমন ছিল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সমস্ত নবীগণ আ. আপন আপন পবিত্র কবরে জীবিত আছেন। আর কবরে তাঁদের হায়াত হলো দুনিয়ার হায়াত।

তিনি উক্ত চিন্তাধারা ও আকিদা বিশ্বাসকে আরো সুস্পষ্ট এবং মজবুত ও শক্তিশালী করার জন্য দারুর উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী রহ.-এর সংকলিত 'আবে হায়াত' পুস্তিকার হাওলা দিয়েছেন, যা উক্ত বিষয়ে পৃথক এবং পরিপূর্ণ হাকিকত ও মারেফতসম্বলিত একটি কিতাব, যার উদ্দেশ্য উক্ত মাসয়ালার শক্তিশালী সত্যায়ন ব্যতীত এও ছিল যে, উলামায়ে দেওবন্দের হায়াতুন নবীর আকিদা ও চিন্তাধারা তাদের আকাবির ও পূর্বসুরীদের থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছেন। এটি কোন ব্যক্তিগত বা সাময়িক এবং হাঙ্গামি ফতোওয়া নয় যে, যা কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার কারণে ঘটনাক্রমে সামনে এসে পড়েছে।

ভুল বোঝাবুঝির ভিত্তি

অতঃপর উক্ত মাসয়ালা এবং সে সম্পর্কে হযরত নানুতুবী রহ.-এর পুস্তিকার রেফারেন্সের সত্যায়নে তখনকার সময়ের সকল আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের সত্যায়ন ও স্বীকৃতিমূলক দস্তখত ও সত্যায়নপত্র সংযোজন করলেন, যার দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করা উদ্দেশ্য ছিল যে, হায়াতে আম্বিয়া আ. সম্পর্কে উল্লিখিত আকিদা শুধু তাদের পূর্বসূরীদেরই ছিল না বরং উত্তরসূরীদের মধ্যে একই আকিদা রয়েছে, যা তাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে ছিল। আর হায়াতুন্নবীল মাসয়ালাটি পূর্বসূরীদের থেকে উত্তরসূরীদের পর্যন্ত একইভাবে সর্বস্বীকৃত এবং সর্বসম্মত রয়েছে; রদবদর হয়নি। আর এটি সকল উলামায়ে দেওবন্দের ঐকমত্যের মাসলাক, যা থেকে কোন ব্যক্তি বিচ্যুতি হয়নি।

তবে এমনটি হতে পারে যে, কতক উলামায়ে দেওবন্দ বা পরবর্তীদের কারো বর্ণনায় সেই সম্পর্কে কিছুটা অস্পষ্টতা বা কাল্পনিক ধারণা থাকতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের কোন সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার শব্দ পাওয়া গেলে তাকে তাদের

অস্পষ্টতা বা সংক্ষিপ্ততাকে সুস্পষ্ট ইবারাতের অনুগামী করে অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু যদি শুধু অস্পষ্ট ইবারতই থাকে, যার ফলে মাসয়ালার উভয় দিক উদ্দেশ্য হতে পারে অথবা সুস্পষ্ট হতে পারে। কিন্তু যদি বিপরীত দিক পরিষ্কার এবং প্রকাশ হয়, যাতে তাবীল ও ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। তাহলেও নিজেদের মর্মকে সামনে রেখে বিপরীত দিক গ্রহণকারীদের উপর এমন অস্বীকার করার সুযোগ হবে না, যা বিপরীত দিক বুঝা সম্ভাবনা হওয়ার ক্ষেত্রে করা যেতে পারে। কারণ, এমতাবস্থায় এহেন বিস্তারিত বা অবস্থাগত ইখলাফ মূলত একটি ইলমি ও চিন্তাধারার ইখতেলাফ হবে, যাকে মাসলাকি ইখলাফ বলা যাবে না। যার অর্থ হলো এমন যে, মাসয়ালার বিস্তারিত বর্ণনার মাঝে এমন মতানৈক্যের সুযোগ রয়েছে, যা সাধারণত উলামাদের মধ্যে হয়ে থাকে। তবে সর্বসাধারণের সাথে উক্ত ইখতেলাফের কোন সম্পর্ক নেই। তারা শুধু আসল মাসয়ালা এবং সামান্য অংশীদারিত্বের মুকাল্লাফ সাব্যস্ত হবে, যা মাসলাকের বুনিয়াদ। এজন্য হায়াতুন্নবীর মাসয়ালার মধ্যে নিম্নের মুসলেহাত এবং পরস্পর সন্দেহের বুনিয়াদকে, বিস্তারিত মাসয়ালার ইখতিলাফী দিক হতে পৃথক রেখে মূল মাসয়ালার মধ্যে সামান্য অংশীদারিত্বের উপর রাখা হয়েছে, যা উভয় গ্রুপের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে যেমনটি আগত সন্দেহযুক্ত ইবাদত দ্বারা সুস্পষ্ট হবে।

সম্মিলিত ক্ষতি

ভাগ্য ও ঘটনাক্রমে সময়ের কিছু ফুযালায়ে দেওবন্দ উক্ত মাসয়ালার বিস্তারিতকরণে এমন কিছু মতভেদের জন্ম দিয়েছেন, যেগুলোর ভিত্তি হলো পূর্বসূরীদের এমন ইবারাত বা নুসুসের মাদলুলাতের এমন প্রকার ব্যাখ্যাসমূহ, যেগুলো থাকাবস্থায় ইখতেলাফী রায় একেবারে রহিত হয়ে গেছে বলার সুযোগ থাকে না, যার আত্মপ্রকাশ বিগত তিন-চার বছর পূর্বে ঘটেছে। এহেন মতভেদ ক্ষতিকর। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে এই ইখতেলাফ স্টেজে বা প্রকাশ্য ময়দানে চল এসেছে আর এতে রদ ও তিরস্কার বা নিন্দাবাদ বর্ণনার অবস্থা তৈরি হয়েছে। সর্বসাধারণদের মাঝে এ বিষয়ে চিত্তাকর্ষক সৃষ্টি হয়েছে। পরিশেষে এই মাসয়ালার আলোচনা উলামাদের সীমা থেকে অতিক্রম করে সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে।

ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত মতানৈক্য পরস্পর ঝগড়া ও বিবাদের রূপ ধারণ করেছে। ফলে দলাদলি শুরু হয়েছে। আর পরিণামে উক্ত আলোচনা দলীয়

ফেতনার রূপ ধারণ করে, যার ফলে উক্ত মাসয়ালা তো এক পার্শ্বে রয়ে যায়; কিন্তু ঝগড়া ও ফাসাদ আগে বেড়ে যায় এবং স্বয়ং দেওবন্দি জামাতে অনৈক্য ও ধ্বংসের আলামাত প্রকাশ পেতে থাকে। উভয় গ্রুপের পক্ষ থেকে পুস্তিকা রচনা করা হয়, আলোচনা ও সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে দেওবন্দি জামাতের জামাতি শক্তিতে অনেক ক্ষতি সাধিত হয়।

প্রশংসিত চেষ্টা-প্রচেষ্টা

এহেন পরিস্থিতি লক্ষ্য করে এবং সংবাদ মাধ্যম ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে তর্কবিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদের সংবাদ পেয়ে অন্তর ভারাক্রান্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছিল। আর ফেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে চিন্তাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অন্তরে আশা ছিল, যে কোন উপায়ে উক্ত ফেতনা ও ঝগড়া-তর্কের পরিস্থিতি বিলুপ্ত হোক। সৌভাগ্যক্রমে ২৬ এপ্রিল ১৯৬২ ঈসায়ীতে আমার পাকিস্তান উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হয় এবং সেই মাসেই লাহোর অবস্থানকালে জনাব মুহতারাম মাওলানা গোলামুল্লাহ খান সাহেব ও মুহতারাম মাওলানা সৈয়দ ইনায়েতুল্লাহ শাহ বুখারী সাহেব আহকারের অবস্থানস্থলে সাক্ষাতের জন্য আসেন। সাক্ষাতকালে ওই তর্ক বিতর্ক ও ঝগড়ার অভিযোগ করে এহেন পরিস্থিতির ক্ষতিকর প্রভাবের প্রতি মনোনিবেশ করলাম এবং বললাম, যে কোন উপায়ে এহেন পরিস্থিতির নিঃশেষ হওয়া উচিত। যেহেতু এই বিষয়টি কোন ভিত্তিমূলক বিষয় নয় যে, একে একটি ভিন্ন আলোচ্য বিষয়ে স্টেজে ও জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে আর তার কারণে অনৈক্য ও তর্কবিতর্ক এবং ধ্বংসের ওই ক্ষতিকর প্রভাব ও আলামতকে প্রত্যক্ষ করতে থাকব। কতই না ভাল হতো যদি উক্ত মাসয়ালাটি আলোচনায় না আসত অথবা ঘটনাক্রমে এসে গেলেও তার শিরোনাম ঝগড়াটে ও সমালোচনামূলক না হতো।

উক্ত কথা কয়েকটি বলার পর উভয় বুযুর্গ অত্যন্ত বিনয়াবনত এবং দরদের ভঙ্গিতে বললেন, এহেন পরিস্থিতির কারণে আমরা নিজেরাও বিব্রত এবং মনের সংকীর্ণতা অনুভব করছি, মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছি। হায়! আপনি যদি উভয় গ্রুপের মধ্যস্থলে পড়ে উক্ত ঝগড়া খতম করে দিতেন। আমরা মনে করি, একমাত্র আপনি ব্যতীত উক্ত ঝগড়া ও ইখতেলাফ খতম করতে অন্য কেউ সক্ষম হবে না। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত আপনার বিগত দিনের রচনাবলি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেগুলোকে উভয় গ্রুপ অত্যন্ত সম্মানের নজরে দেখেছে। এখনও সে সম্পর্কে আপনার প্রচেষ্টা সম্মান ও গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিতে দেখা হবে। উক্ত ইখলাসপূর্ণ বাক্যগুলো শ্রবণে উক্ত ঝগড়া

খতম হওয়ার যথেষ্ট আশা সৃষ্টি হয় এবং প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ় সংকল্প করে ফেলি যে, উভয় দলের দায়িত্বশীল আলেমদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরস্পর সমঝোতার কোন সুরত বের করতে হবে।

আমি তাদের আবেদনের উত্তরে বললাম, হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ সাহেব শাইখুল হাদিস মাদরাসায়ে খাইরুল মাদারিস মুলতানের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই ব্যাপারে কোন অভিমত ঠিক করে নেব। করাচী পৌঁছে এ সম্পর্কে মাওলানা গোলামুল্লাহ খান সাহেবকে চিঠিপত্র প্রেরণ করতে থাকি, যাতে উক্ত বিষয়ের প্রাথমিক ভিত্তি ও বিশ্বাস অতিক্রম করতে পারি। প্রকাশ থাকে যে, কোন দীনি মাসয়ালায় মুফাহামাতের অর্থ এমন হতে পারে না যে, দীনদারী বিরোধী অভিমত পরিবর্তন করে দেব অথবা মাসয়ালাকে কমবেশি ও কাটছাট করে কোন ঐক্যবদ্ধ চিন্তাধারায় উপনিত হব। সে কারণে সমঝোতার পদ্ধতি এবং উভয় গ্রুপের জন্য ঐ সম্মিলিত চিন্তা মেধাতে এমনটি এল যে, প্রথমত উক্ত বিষয়টি সর্বসাধারণের মাঝে বর্ণনা করা হবে না। যদি বয়ানের সুযোগ এসে যায়, তাহলে সে সম্পর্কে সামান্য কিছু বলে, তার বিস্তারিত এবং মতানৈক্যের বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেয়া হবে না বরং সর্বসাধারণকে এ কথা বুঝাতে হবে যে, এ ব্যাপারে গভীর বৈশিষ্ট্য তালাশে পড়া যাবে না। তাহলে কমপক্ষে সর্বসাধারণ থেকে ঝগড়াটে পরিস্থিতির অবসান হবে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তারপর আলেমদের মাঝে যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় কিছুটা মতানৈক্য অবশিষ্ট থাকে, যার সাথে সর্বসাধারণের কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহলে দলাদলির ক্ষতিকর প্রভাব খতম হয়ে যাবে, যা মূলত ফেতনার কারণ। এ কারণে আপন ইলম ও অভিজ্ঞতা অনুসারে উক্ত মাসয়ালার সম্পর্কিত একটি শিরোনাম প্রস্তাব করে মাওলানা গোলামুল্লাহ খান সাহেবকে লিখলাম, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত প্রকাশ করুন, যাতে অন্যদের অভিমত লাভ করতে পারি।

উক্ত আরজিনামার উত্তর আমি মুলতানে মাদরাসায়ে খাইরুল মাদারিসে পৌঁছে পেলাম, যাতে তিনি আমার শিরোনামকে রদ ও পরিবর্তন না করে নিজের পক্ষ থেকে পৃথক একটি শিরোনাম লিখে পাঠালেন। সেখানে হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ সাহেব মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব জলন্ধরী এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন। তাদের সামনে আমার পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা এবং উক্ত দুই শিরোনাম বাদ দিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, মুলতান অবস্থানের সামান্য সময় উক্ত মাসয়ালার জন্য যথেষ্ট নয় এবং কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বও এখানে উপস্থিত নেই।

সেজন্য উক্ত বিষয়ে আলোচনাকে জাহলম অবস্থানকালের জন্য রাখার সিদ্ধান্ত হলো। ওখানে এই কাজের জন্য একটি পৃথক দিন ধার্য করা হবে। পাশাপাশি মুলতান হতেই আমার বয়ানসমূহে উক্ত পরিকল্পনার জন্য অবস্থান তৈরি করার কাজ শুরু করে দেয়।

মুলতান, জাহলাম, সারগুধা ও রাওয়ালপিন্ডির সমাবেশগুলোতে বিশেষ করে উক্ত মাসয়ালা সম্পর্কে সংশোধনী শিরোনাম ইখতিয়ার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ সাহেব, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী সাহেব সারগুধবী এবং মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব জলন্ধরী সাহেবকে জাহলম আগমনের জন্য অনুরোধ করলাম। উল্লিখিত হযরতগণ একে সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং নির্ধারিত তারিখে সকলেই জাহলমে একত্রিত হলেন। সেখানে হায়াতুন্নবীর মাসয়ালাটি সম্মিলিত চিন্তায় এলো এবং এমন সিদ্ধান্ত হলো যে, কমপক্ষে উক্ত বিষয়ে এতটুকু বিস্তারিত ব্যাখ্যা হওয়া উচিত, যার ফলে উক্ত বিষয়ের প্রতিটি বুনিয়াদী কোণ উদ্ভাসিত হয়, ফুটে উঠে আর সর্বসাধারণ আকিদা হিসেবে তা বুঝতে সক্ষম হয়। সুতরাং উক্ত আলোচনার পর একটি পরিপূরক ব্যাখ্যা আহকার রচনা করে এবং ইচ্ছা করে যে, রাওয়ালপিন্ডিতে এই সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এবং দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা গোলামুল্লাহ খান সাহেব, মাওলানা কাজী নূর মুহাম্মদ সাহেব, মাওলানা কাজী শামসুদ্দীন সাহেব এবং মাওলানা সৈয়দ ইনায়েতুল্লাহ শাহ বুখারী সাহেবকে একত্রিত করে উক্ত প্রস্তাবনা, পরিকল্পনা এবং উক্ত প্রস্তাবিত শিরোনামে আলোচনা করব।

সম্মিলিত অংশীদারিমূলক বিষয়

সুতরাং ২২ জুন ১৯৬২ ঈসায়ী রোজ শুক্রবার উভয় পক্ষের ওইসব বুযুর্গ আলেমগণ আমার অবস্থানস্থল মাদরাসায়ে হানাফিয়্যাহ উসমানিয়্যাহ-এ মিলিত হলেন। উক্ত মজলিসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত রিপোর্ট ও বিবরণ পেশ করে উক্ত মাসয়ালার বিবাদ মীমাংসাকরণে সম্মিলিত প্রস্তাবনা উভয় পক্ষের দায়িত্বশীলদের সামনে পেশ করলাম। আলোচনা অত্যন্ত বন্ধুত্বসুলভ এবং নিষ্ঠাপূর্ণ পরিবেশে চলল এবং বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ উক্ত পরিবেশ কায়েম ছিল। না তাতে হার-জিতের জযবা ছিল, না জয় ও পরাজয়ের কল্পনা ছিল। সকলের মাঝে মাসয়ালার সমাধান এবং মিটানোর জযবা পরিলক্ষিত ছিল। পরিশেষে ফলাফল এমন হলো যে, উভয় পক্ষের লোকজন

আমার পেশকরা সম্মিলিত প্রস্তাবনার শিরোনামকে গ্রহণ করে নিলেন। আর ওই সম্মিলিত লিখিত স্মারকের উপর, যা আমি আপন দস্তখত দ্বারা পেশ করেছিলাম, তাতে সবাই দস্তখত কররেন।

স্মারকের মূল ইবারাত বা শব্দাবলি নিম্নরূপ–

> সাধারণ মুসলিম জনগণকে তর্কবিতর্ক ও ঝগড়ার ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্য উচিত হবে যে, হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসয়ালার ধারাবাহিকতায় উভয় গ্রুপের দায়িত্বশীল নিম্নলিখিত ইবারাতে দস্তখত করবেন আর তা সকলের অংশীদারিমূলক হবে। প্রয়োজন হলে একে সর্বসাধারণদের মাঝে পেশ করা হবে, বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রতি জোর দিবে না। ইবারাত ছিল নিম্নরূপ ওফাতের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র দেহ বরযখ তথা কবর শরীফে রূহের সম্পর্কের সঙ্গে জীবিত আছেন। আর সেই হায়াতের কারণে রাওজায়ে আতহারে উপস্থিত ব্যক্তিদের দরুদ ও সালাম তিনি শুনতে পান।
>
> –আহকার মুহাম্মদ তৈয়্যব, অবস্থানকারী রাওয়ালপিন্ডি, ২২ জুন ১৯৬২ ঈসী।
>
> –মাওলানা কাজী নূর মোহাম্মদ, খতিব, জামে কিল্লা দীদার সঙ্গ।
>
> –আহকার মাওলানা গোলামুল্লাহ খান।
>
> –মাওলানা মুহাম্মদ আলী জলন্ধরী।

এই সংক্ষিপ্ত ইবারাতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা

যেহেতু কাজী শামসুদ্দীন সাহেব ভ্রাতা মাওলানা কাজী নূর মুহাম্মদ আলী সাহেব জলন্ধারীর নিকট পাঠিয়েছিলেন, সেজন্য উক্ত ইবারাত তার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। এ কারণেই ইবারাতে তার দস্তখত করানো প্রয়োজন মনে হয়নি। উপরে ইবারাতকে তার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মনে করা হবে।

সত্যবাদী ও ইনসাফ পছন্দকারী

উক্ত বৈঠকে যেহেতু হযরতগ মাওলানা সৈয়দ ইনায়েতুল্লাহ শাহ বুখারী রাওয়ালপিন্ডি অসুস্থতার দরুন তাশরীফ আনতে পারেনি, সেজন্য আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং প্রস্তাবতা পেশ করার কারণে হযরত মাওলানা কাজী

নূর মুহাম্মদ সাহেব এবং মাওলানা গোলামুল্লাহ সাহেব তার সম্পর্কে নিম্নলিখিত লেখা দস্তখতসহ বান্দাকে (আমাকে) দান করলেন, যার মূল ইবারাত নিম্নে বর্ণিত হলো–

আমরা (মাওলানা কাজী নূর মুহাম্মদ সাহেব এবং মাওলানা গোলামুল্লাহ খান সাহেব) পুরোপুরি প্রচেষ্টা করব যে, মাওলানা সৈয়দ ইনায়েতুল্লাহ সাহেবকেও উক্ত লিখিত প্রস্তাবনার উপর দস্তখত করাব, যার উপর আমরাও দস্তখত করেছি। যদি তিনি এতে সম্মত না হন, তাহলে আমরা হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই মাসয়ালা যা এখানে লিখা হয়েছে এ ব্যাপারে তার থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা করে দেব। সাথে সাথে আমাদের মাহফিলগুলোতে তার দ্বারা হায়াতুন্নবী বিষয়ে বক্তৃতা করাব না। আর এই মাসয়ালা সম্পর্কে তিনি যদি কোন মুনাযারা ও তর্কবিতর্ক করেন, তাহলে আমরা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করব না।"

নূর মুহাম্মদ, খতিব, কিল্লা দিদার সঙ্গ, আহকার গোলামুল্লাহ খান (২২ জুন ১৯৬২ ঈসায়ী) উক্ত লিখাতে দস্তখতকারী বুযুর্গদ্বয় সত্যবাদী এবং সত্য পছন্দী হিসেবে খ্যাত। এতদসত্ত্বেও সৈয়দ ইনায়েতুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে তাদের মজবুত সম্পর্ক এবং ইখলাসপূর্ণ বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা কোন পক্ষপাতিত্বমূলক কাজ করেননি, যার দ্বারা তাদের ইনসাফপ্রিয়তা এবং দীন সম্পর্কে নির্ভেজাল ও খাঁটি প্রমাণিত হয়।

নীরব থাকাই বিচক্ষণতা

আমি জনাব সৈয়দ ইনায়েতুল্লাহ সাহেব সম্পর্কে যতটুকু জানি, তাতে তার সম্পর্কে একথা পেশ করা সংকোচবোধ করি না যে, তিনি আলমে বরযখে নবীদের হায়াতে জেসমানিকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করেন না, শুধু এর কাইফিয়্যাত এবং ধরনের ব্যাপারে কথা বলে থাকেন। তেমনিভাবে তিনি রাওজায়ে আতহারে উপস্থিত ব্যক্তিদের দরূদ ও সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রবণশক্তিতে পৌঁছা এবং তা শোনা সেই ব্যাপারটি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তা চিরস্থায়ী এবং সর্বদা হওয়ার সাব্যস্তকারী নন। আর তার এহেন অসম্পূর্ণ স্বীকৃতি যেহেতু তার নিজস্ব বোধগম্য দলিল থেকে নেয়া, সেজন্য এ ব্যাপারে তাকে অস্বীকারী বলা যাবে না বরং মূল ও আসল মনে করতে হবে।

তবে তার এহেন ব্যাখ্যা জুমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) আলেম, আহকার এবং দস্ত খতকারী উক্ত দু'জন বুযুর্গের তুলনায় কিছুই নয় এবং তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু উল্লিখিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পরও যখন তার ইখতেলাফ হুজ্জত ও প্রমাণসিদ্ধ, তাই তাকে মৌলিখ দোষারোপ ও ভর্ৎসনা বা তিরষ্কার করা ইনসাফ ও সঠিকের কাছাকাছি হবে না তথা ঠিক্ হবে না, বিশেষ করে তিনি যেহেতু অন্যান্য মাসয়ালার ব্যাপারে আহলে দেওবন্দ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পতাকাবাহী ও খাদেম, সেগুলোর ব্যাপারে তাদের সঙ্গে একমত, সেই কারণে তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়ে নীরবতা পালন করাই বিচক্ষণতার কাজ হবে এবং উভয়ের উপকারী প্রমাণিত হবে।

সাথে সাথে আমরা মুহতারাম সৈয়দ সাহেবের নিকট আশাবাদী যে, হায়াতুন্নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসয়ালাতে ওই ব্যাখ্যাগুলোর ব্যাপারে জুমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাসলাক (মতাদর্শ-চিন্তাধারা) এর সম্মান ঠিক রাখার জন্য নিজের ব্যক্তিগত বুঝকে (চাই তা তার জানা এত বা ধারণা এত উক্ত মর্মার্থ্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের হোক) কিন্তু সেগুলো জুমহুর আলেমদের নিকট তার ব্যক্তিগত মর্ম বলে গণ্য হবে। আর চাই তা যতই দীনদারীর ভিত্তি হোক না কেন তার প্রচার জরুরি মনে না করে চুপ থাকাকে কথা বলা উপর প্রাধান্য দিবেন। কারণ, উক্ত মাসয়ালাটি এমন কোন ভিত্তিমূলক এবং বুনিয়াদী আকিদাগত বিষয় নয় যে, তাতে চুপ থাকা জায়েয হবে না।

শাখাগত বিষয়ে ইখতেলাফের অবস্থান

তেমনিভাবে সাধারণ মুসলমানদের নিকট আবেদন ও আহ্বান হলো যে, যারা ওই মাসয়ালা এবং তাতে উলামাদের শাখাগত ও আংশিক মতানৈক্যকে তর্কবিতর্ক এবং ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যম বানাবে না। এমন ধরনের ইখতেলাফ ও মতভেদকে উম্মতের সহজতর মাধ্যম বানানো হয়েছে। ঝগড়া ও বাদানুবাদের মাধ্যম বানানো হয়নি। এ কারণে বিশ্বাস ও কার্যকারীরূপে জুমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের আঁচলকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে অন্যান্যদে সাথে মিল-মহব্বত গ্রহণ করবে এবং যুদ্ধ করা এবং করানোর কু-অভ্যাস সৃষ্টি করবে না।

আজ উম্মতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বুনিয়াদী মাসায়েল বা সমস্যা রয়েছে, যেগুলো উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করে। আর তা তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন এমন ধরনের শাখাগত মতভেদে গ্রুপিং সৃষ্টি করে ধ্বংস না করা হয়।

আনন্দের ঢেউ

পরিশেষে আমি উভয় পক্ষের বুযুর্গদের এবং বিশেষ করে উভয় গ্রুপের খ্যাতিমান আকাবিরদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তারা এই নাচিজের আবেদনকে পূর্ণ মনোনিবেশ এবং মনযোগের সাথে গ্রহণ করার নিয়তে শ্রবণ করেছেন আর জাতিকে অনেক ক্ষতি ও ফাসাদ হতে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন আমার পক্ষ থেকে এবং সকলদের পক্ষ থেকে।

সংশোধনের এই নব কৌশলের সবচেয়ে বেশি নয়নাভিরাম মুযাহারা হলো অনৈক্যের পর কোন বিষয়ে ঐকমত্য হওয়া। রাওয়ালপিন্ডির এই আযিমুশ্বান সাধারণ সমাবেশ, যা আমার বয়ান পেশ করার জন্য মাদরাসায়ে হানাফিয়্যাহ উসমানিয়ার তত্ত্বাবধানে হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ সাহেব শাইখুল হাদিস মাদরাসায়ে খাইরুল মাদারিস মুলতানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আমাকে কাব্য দ্বারা অভিনন্দনের মাধ্যমে মাহফিল শুরু করা হয়। আমার বয়ান আরম্ভ হওয়ার পর আনুমানিক আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত জারি ছিল। বয়ানের শেষ প্রান্তে সর্বসাধারণকে সম্বোধন করে উক্ত বিতর্ক ও ঝগড়া নিঃশেষ হওয়ার সুসংবাদ বিস্তারিতভাবে শোনালাম। ফলে আম-জনতার মাঝে আনন্দের নিয়ন্ত্রণহীন তরঙ্গ শুরু হয়ে যায়। তখন হাজার হাজার মানুষ অকস্মাৎ শুভ কামনা ও অভিনন্দন প্রকাশের ধ্বনি দিতে লাগল, ফলে সারা মাঠ গুঞ্জরিত হতে লাগল।

ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি

বয়ান সমাপ্ত করার পর একদিকে মাওলানা গোলামুল্লাহ খান সাহেব অপর পার্শ্বে মাওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব জলন্ধরী, নিজেদের বয়ানের মাধ্যমে আমার বয়ানকে সত্যায়ন ও সমর্থন করলেন এবং অত্যন্ত প্রশস্ত মনে এবং ইখলাসপূর্ণ ভাষা ও ভঙ্গিতে বললেন, দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম সাহেব উক্ত মাসয়ালার ঝগড়াটে পরিস্থিতিকে নিঃশেষ করে দিলেন। যে জিনিস আমরা অসম্ভব ভাবছিলাম, তা এই ব্যক্তিত্বের মাঝে আসার কারণে শুধু সম্ভবই হয়নি বরং বাস্তবায়িতও হয়েছে। আমরা খোলা মনে এ কথার স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজকে একমাত্র দারুল উলুমের মুহতামিম সাহেবই সমাধা দিতে পারেন, যার মাঝে একদিকে দেওবন্দের এত ইলমি ও ধর্মীয় মার্কাযের

পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্ক রয়েছে, যা আমাদের সকলের অন্তরের মার্কায। অপরদিকে দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবী রহ.-এর কাসেমী সম্পর্ক রয়েছে, যা সকল কাসেমী ভ্রাতৃত্বকে তার উপর একত্রিত করেছেন। আমরা মনে করি, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এমন গুরত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিতে পারতেন না।

আনন্দের জযবা

যাহোক আমরা ঝগড়া খতম করতে পেরেছি এবং আমরা এ সম্পর্কে সর্বধারণকে নিশ্চিত করতে পারি যে, আর ঝগড়া ও তর্কবিতর্ক হবে না। তাদের দু'জনের বয়ানের পর হাজার হাজার মানুষ এর বিশাল সমাবেশ আনন্দে ফেটে পড়ল এবং তারা আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করতে লাগল যে, মুহতামিমে দারুল উলূম জিন্দাবাদ, দারুল উলূম জিন্দাবাদ, উলামায়ে দেওবন্দ জিন্দাবাদ। বেশ কয়েক মিনিট পর্যন্ত সারা মাঠ প্রকম্পিত হতে থাকল। আর সমাবেশে আনন্দ ও উৎসাহের এমন একটি আশ্চর্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, ফলে সমাবেশকে সাগরের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মনে হচ্ছিল এবং স্লোগানধ্বনির কারণে বয়ান বন্ধ হয়ে যায়।

পরিশেষে মর্যাদপূর্ণ কামিয়াবীর সাথে সমাবেশ সমাপ্ত হয়। আর আমার লেখনীর আন্দোলন করাচী থেকে শুরু হয়ে মূলতান, সারগুধা এবং জাহলামের বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করে রাওয়ালপিন্ডি এসে পূর্ণতায় পৌঁছে। মহা শক্তিমান আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকর যে, চার বছরের ধূলিধূসরিত পরিবেশ পরিষ্কার হলো এবং তার বেদনাদায়ক প্রভাব-আলামত দূরীভূত হলো। প্রথমে ও শেষে আল্লাহর শোকর।

আল্লাহ তায়ালা যেন এই একতাকে চিরস্থায়ী ও অটুট রাখেন আর মুসলমানদের তাওফীক দান করেন, যেন তারা দীন ও জাতির গুরুত্বপুর্ণ কাজকে শাখাগত কাজের পরিবর্তে গুরুত্ববহ মনে করে তাদের দলীয় ও জাতিগত শক্তিসমূহ তাতে প্রয়োগ করে।

মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.)
২৪ জুন ১৯৬২ ঈসায়ী]

হযরত মাওলানা মাদানী রহ.

আহ! শত আহ, শত আফসোস! কতকাল যাকে আমরা মাওলানা মাদানী মা. জি, বা দা.বা. বলে ডাকতাম, তিনি আজ তাকে মাওলানা মাদানী কুঃ ছিঃ বা রহ. বলছি। মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. ৮১ বছর বয়সে ইহজগৎ ত্যাগ করে পরজগতে যাত্রা করেন এবং আত্মীয়-স্বজন ও দোস্ত-আহবাবদের চিন্তা ও বেদনায় ব্যাকুলতা অবস্থায় ছেড়ে আপন সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করেন।

হযরত শায়খ এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান শায়খ, জমিয়তে উলামা হিন্দের প্রধান এবং দেওবন্দি জামাতের বড় আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক ছিলেন। তিনি দেওবন্দি জামাতের শত বছর ইতিহাসের ঊনবিংশ শতাব্দির সর্বশেষ শক্তি ছিলেন, সিপাহসালার ছিলেন। ১৮৫৭ সালে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যে তালিমী, দীনি ও রূহানি এবং সামাজিক আন্দোলন ও জামাতবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, দেওবন্দের সকল বিপ্লব এবং কালের আবর্তনের পূর্ণতা মাওলানা মাদানী রহ.-এর সত্তার উপর অতিক্রম করে ১৯৫৭ সালে এসে শেষ হয়েছে। আর ১৮৫৭ সাল হতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত শত বছরের সময়ে উক্ত আন্দোলনের এক শতাব্দি পূর্ণ হয়ে খতম হয়ে গেছে।

পরিপূর্ণ, সর্ববিষয়ে পারদর্শী

হযরত মাদানী রহ.-এর ওফাত ঊনবিংশ শতাব্দির সবচেয়ে বড় দুর্বিপাক ও দুর্ঘটনা এবং স্মরণকালের সর্ববৃহৎ ক্ষতি, যার পূরণ প্রকাশ্য আসবাবে সম্ভব নয়। অল রাউন্ডার ব্যক্তিত্ব অনেক দেরিতে সৃষ্টি হয় এবং চলে যায়। তখনকার স্থান অনেক দীর্ঘকাল পর্যন্ত খালি পড়ে তাকে।

হযরত মাদানী রহ.-এর হাসতী দুর্লভ, কর্মঠ, দৃঢ়তা ও অটলতা, দুঃসাহসী পুরুষোচিত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি এবং ঈমানী বিচক্ষণতা ইত্যাদির একটি গতিশীল মূর্তিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বর্তমান ধর্মহীন বস্তুবাদের যুগে যে দীনি, আখলাকী ও ইলমি মূলনীতিসমূহের পরিধি বিশেষ ও সাধারণদের জন্য সুপ্রশস্ত করেন এবং মানবতার সম্মানকে আলোকিত করেন পৃথিবী আজীবন তাকে নিয়ে গর্ব করবে।

শাইখুল ইসলাম রহ. ইসলাম জ্ঞান ও মারেফতের এবং বস্তুগত বিষয়ে জ্ঞান ও সাহিত্যের পতাকাবাহী ছিলেন। আর তার হিম্মতে জাহেরী ও বাতেনী থেকে

দেশ ও দেশের বাইরে হাজারো উলামায়ে কেরাম তার ইলমি আমানতের আমানতদার বনে যায়। যারা এই ইলমের মার্কায দারুল উলূম হতে হযরতের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ছাত্র অবস্থায় তাঁর আসাতিজা ও শায়েখদের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং মন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। তাঁর সকল আকাবির ও শায়েখগণ তাঁকে বুকভরা আশার নজরে দেখতেন। সেজন্য তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ উস্তাদ ও শায়েখদের ইলমি ও আমলি স্মৃতিস্তম্ভ ছিলেন। কুরআন ও হাদিস, ফিকাহ ও তাফসীর সাহিত্য ও লেখনি, মানতিক ও ফ্যালোসুফি ইত্যাদি ইলমের অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা তার কথা ও কাজে ফুটে উঠত।

হযরতের এই সর্ববিষয়ের অভিজ্ঞতা ইলমি জগত যে উপকৃত হয়েছে, তা কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত কাজে আসবে এবং জগত তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে।

বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক লাইনে তাঁর সংযমতা, আত্মার পবিত্রতা, তাকওয়া ও পরহেজগারি, সময়ের সংরক্ষণ, নিত্যদিনের আমলের পরিপূর্ণতা দীনি ও জাতীয় বিভিন্ন কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও সর্বদা যেগুলোর পাবন্দী করা তার জন্য সহজসাধ্য কর্ম ছিল। তিনি সেগুলো অনায়াসে করে যেতেন। মাতৃভূমির ভালবাসা তার নিকট শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না বরং ইলমি ও আখলাকি এবং স্বয়ং তার শব্দাবলিতে একটি দীনি জযবার মর্যাদায় তার আত্মার জাওহার ও মূল পদার্থ ছিল এবং দীনের এই শিক্ষা যে 'একজন ভাল মুসলমান একজন ভাল নাগরিক' এ কথা তার মোবারক সত্তাতে কার্যকরীরূপে সর্বদা প্রকাশ পেত।

একটি সুন্দর সমন্বয় ও মিশ্রণ

বস্তুজগত আরাম-আয়েশের সামগ্রী সাথে সাথে পৌছাতে পারে; কিন্তু মানবাত্মাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সাইন্স বা বিজ্ঞান ভাল ও সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করতে পারে; কিন্তু ভাল মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। যতক্ষণ না ঈমানী বিজ্ঞান তাদের পথ প্রদর্শক ও মুরুব্বী না হয়। হযরত মাদানী রহ. উভয় সাইন্সের একজন মধ্যমপন্থী সমন্বয়কারী ছিলেন। তিনি এক সময় জাগতিক বস্তুবাদের প্লাটফর্মসমূহে এবং রাজনৈতিক মঞ্চগুলোর সমাবেশে যদি প্রকাশ পেতেন, তাহলে অন্য সময় যিকরুল্লাহর নির্জনতায়, দরসে হাদিস ও কুরআনের মসনদের উপর আত্মপ্রকাশ করতেন। তিনি উভয় লাইনে পরিপূর্ণ শক্তিমত্তার সঙ্গে দ্রুত চলতে পারতেন। উভয় জগতে তাঁর সফর পদচারণা ছিল। এক শাখা থেকে অন্য শাখায় গমন তার মনোনিবেশের পূর্ণতাকে বিক্ষিপ্ত করতে পারতো না।

দীনি জিন্দেগীর সাথে জাতীয় জিন্দেগী, ইসলামি যিন্দেগীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক যিন্দেগী, নিজেদের তরবিয়তের সাথে সাথে অন্যদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, নিজেদের থেকে হিসাব গ্রহণের সাথে অন্যদের জন্য অবকাশ প্রদান তার কাজের মূলনীতি ছিল। এ কারণে তিনি দরস ও তাদরীস বাতেনী তরবিয়ত এবং আধ্যাত্মিকতার পবিত্র পেশার পাশাপাশি জাতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার ময়দানকেও জয় করে নিয়েছিলেন এবং কার্যকরীরূপে বিপরীতমুখী উভয় কাজকে একত্রিত ও সমন্বয় করে দেখিয়েছেন। এই সমন্বয়ের মূলনীতিকে তিনি দেশের কোণে কোণে ছাড়িয়েছেন। তার হাজার হাজার শাগরেদ ও কর্মী যারা হিন্দুস্তানে এবং বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল, তারা এর উপর (সমন্বয়) কাজ করেছেন। এ কারণে তাঁর দেশের প্রত্যেক শ্রেণী এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ছিল। এমনকি যারা তাঁর মতের বিরোধিতা করতেন, তাদের অন্তরে হযরতের ইজ্জত, আযমাত ও মহব্বতে ভরপুর ছিল এবং তারা তাঁর জাহেরী ও বাতেনী কামালাতের স্বীকৃতি দিতেন।

শাইখুল আরব ওয়াল আজম

হযরত মাদানী রহ.-এর ফাইযান (বিশাল দান) শুধু ভারতবর্ষের চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং আরব ও আজমে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ হতে ইলম অর্জন সমাপ্ত করার পর হরমে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দরসে কুরআন ও হাদিস এবং অন্যান্য ইলম ও বিষয়ে দরস প্রদান শুরু করেন। তিনি সুদীর্ঘ আঠার বৎসর যাবত ইলমে নববীর উৎসস্থলে বসে উলুমে নবুওয়াতের খেদমত আঞ্জাম দেন। ফলে আরব ও আজমের মানুষ পরিতৃপ্ত এবং তার ছাত্র এশিয়া ভূখণ্ড থেকে ইউরোপ ও তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পরিশেষে জীবনের শেষাংশ সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর যাবত দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান তাদরীসের পদে সফলকাম হয়ে পূর্ব পশ্চিমের লোকদের ইলমের আবে হায়াত দ্বারা সয়লাব করেছেন।

রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি

উক্ত দীনি সিলসিলার সাথে সাথে হযরত মাদানী রহ. একজন বড় মাপের রাজনৈতিক রাহনুমা এবং শক্তিশালী বৈপ্লবিক মুজাহিদ ছিলেন। যিনি কঠোরতাহীন মূলনীতির উপর ভারতবর্ষে বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা-প্রচেষ্টায় নেতৃত্বসুলভ অংশ নিয়েছেন তথা নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে হুজ্জুতুল

ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী রহ.-এর ঐতিহাসিক দর্শন ও হিকমতের আমানতদার এবং আপন উস্তাদ হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব রহ.-এর বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাপূর্ণ তেজোদীপ্ত কর্মের পতাকাবাহক ছিলেন। যে কারণে সমগ্র জাতি তাকে জানেশীনে শাইখুল হিন্দু (স্থলাভিষিক্ত) মেনে নিয়েছিলেন, স্বীকৃতি প্রদান করে ছিলেন। পরিশেষে তাকে জানশীনে শাইখুল হিন্দু উপাধিতে স্মরণ করতে থাকে। হযরতের চিন্তাধারা এমন ছিল যে, ইলমের পরিণাম দুনিয়াবিরাগ নয় বরং ইলম ও রাজনৈতিক মাঠে পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত। তা দ্বারা ইসলাম ধর্ম হিসেবে এবং মুসলমান জাতি হিসেবে পদমর্যাদা টিকে রাখতে পারবে।

পাশাপাশি তাঁর চিন্তাধারা এও ছিল যে, ভারতীয় মুসলমান নিজেদের জাতিগত মান-মর্যাদা হেফাজতের সাথে সাথে ভারতীয় জাতীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতি। এমন সম্মিলিত চিন্তা-চেতনার সাথে সাথে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা তাদের নিকট প্রতিটি প্রিয় বস্তু থেকে সবচেয়ে প্রিয় ছিল, যার জন্য তাঁরা তাদের প্রিয় ও মহব্বতের বস্তুর কুরবানি পেশ করেছেন। এই স্বাধীনতা শুধু দেশের স্বাধীনতা হিসেবে প্রিয় ছিল না বরং সেজন্য প্রিয় ছিল যে, ভারতীয় মুসলমানগণ ভারতের স্বাধীনতাকে এশিয়া মহাদেশ এবং প্রাচ্যদেশগুলোর যারা লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত ও দুর্বল তাদের স্বাধীনতার অগ্রদূত ও দ্বার মনে করতো, যার মধ্যে প্রবেশ করা ব্যতীত এশিয়ার স্বাধীন প্রাসাদে বা দুর্গে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। অতএব হিন্দুস্তান স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে রাশিয়া এমনকি প্রাচ্যের অনেকগুলো ছোট ও বড় রাষ্ট্র একের পর এক স্বাধীনতার দৌলত দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে, স্বাধীনতা লাভ করেছে। অতঃপর ওই উন্নত স্বাধীনতার আত্মা যা তাঁর আত্মার সাথে সংযুক্ত ছিল তা শুধু বাহ্য ও উপুরি উপুরি আযাদী ছিল না। বরং তা ছিল পৃথিবী থেকে বৃটিশদের আধিপত্য এবং কর্তৃত্ব নিঃশেষ করা ব্যতীত দুনিয়াতে ছড়িয়ে থাকা ধর্মহীনতা, নাস্তিকতা, বদদীনি ও লাগামহীনতা যা প্রাচ্য দেশের আধ্যাত্মিক বাগানকে উজাড় এবং চারিত্রিক নির্মাণ অনাবাদ বানিয়ে ফেলেছে তা কখনো মিটবে না। আর উক্ত নষ্ট ও খারাপ মাদ্দার (ধাতু) মূলোৎপাটন ব্যতীত পৃথিবীর প্রকৃত সুস্থতা এবং তার আসল সুখ ও শান্তি কখনো ফিরে আসবে না, আসতে পারে না। নিঃসন্দেহে তাদের এই অনুভূতি ছিল যে, এই ব্যাপক পরিষ্কারকরণ এবং বিরেচক ঔষধে নষ্ট অঙ্গ বা অংশের সাথে আসল অংশের উপরও আঘাত পড়বে। কিন্তু পরিষ্কারকরণের তবিয়তগত চাহিদা হলে যদি তা প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে ওই আংশিক বঞ্চিত হওয়ার উপর সবর করাও জরুরি।

যাহোক, তার আযাদীর চেষ্টা-প্রচেষ্টা রাজনৈতিক ছিল এবং তার আত্মা ছিল চারিত্রিক। এজন্য যেখানে স্বাধীনতা যুদ্ধে তার ক্ষমতার প্রভাব ছিল সেখানে চারিত্রিক উন্নয়ন দ্বারা অন্তরের তরবিয়ত এবং আল্লাহ তায়ালার দান করা হুদুদ ও সীমানার বাউন্ডারিতে তাদের সীমাবদ্ধ ও আটকে রাখার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা তার আমলের আরেকটি ভিন্ন ময়দান ছিল। তিনি জানতেন, পূর্ব ও পশ্চিমের লোকদের মেজায ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সামরিক কর্তৃত্বের প্রবলতা প্রাচ্যের মেজাযকে নষ্ট করে ফেলেছে। যদি উক্ত অসুস্থতা দূর হয়ে যায়, তাহলে কিছু দিনের মধ্যে তাদের আসল ও প্রকৃত সুস্থ মেজায ফিরে আসবে। এমনটিই ছিল মাদানী রহ.-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, যার উপর শাইখুল ইসলাম রহ. আপন বুযুর্গদের জাহেরী ও বাতেনী রাহমুনা অনুসারে কাজ করতেন এবং ইলম ও সঠিকতার একজন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।

এই শক্তিশালী মূলনীতি ও চিন্তাধারার অধীনে ভারতীয় মুসলিমগণ সর্বদিক হতে চক্ষু বন্ধ করে পশ্চিমা শক্তির উপর শক্তিশালী হামলা করে। ফলে উক্ত পরীক্ষা ও সংঘাতের ফলাফল এমন হলো যে, চারিত্রিক শক্তিগুলো জাগ্রত হয় এবং এশিয়া ও প্রাচ্যদের মেজাযে পরিবর্তন আসে। দুর্বল রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে এবং স্বাধীনতাকামীদের হিম্মত বেড়ে যায়। আজ পশ্চিমা শক্তি সম্পূর্ণরূপে না ভাঙলেও তাকে ভাঙনকারী এবং উক্ত চিন্তাধারা নিয়ে অগ্রগামী ব্যক্তি অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে।

যাহোক, হযরত শাইখুল ইসলাম রহ.-এর আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতা, এশিয়া মহাদেশের স্বাধীনতা, পরিশেষে আখলাক ও মানবতার স্বাধীনতা। এমন চিন্তাধারা তাঁর আকিদাগত ছিল। তিনি তা উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর শায়েখদের পক্ষ থেকে পেয়েছেন যে, পশ্চিমাদের মাদ্দি শক্তিসমূহ টিকে থাকার সুরতে আখলাকী শক্তি এবং মানবতার জন্মগত সম্মানের কখনো উন্নতি হবে না।

সম্মিলিত চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি

এ কারণে তিনি একদিকে যদিও কংগ্রেসের একজন পরিশ্রমী সদস্য ছিলেন, অপরদিকে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রধানও ছিলেন। আর তিনি যদিও কংগ্রেসের বিশেষ রাজনৈতিক প্লাটফর্মের একজন সক্রিয় সিপাহী হিসেবে কাজ করতেন, তো অপরদিকে জমিয়তের উলামার ফর্মে একজন সক্রিয় দীনি নেতা হিসেবে আবির্ভূত হতেন। উভয় প্লাটফর্মের সক্রিয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা কেন্দ্রবিন্দু

হওয়ার পাশাপাশি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান উস্তাদের মসনদে বসে শরয়ী উলূম এবং কিতাব ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসারে একইভাবে নিমগ্ন থাকতেন। আর এগুলোর সাথে সাথে আপন খানকারও প্রধান আসনে আসীন ছিলেন। যেখানে মুরিদ ও শাগরেদদের ইলমি এবং চারিত্রিক সংশোধন ও তরবিয়াত এবং তাদের সঠিক অর্থে একজন মুসলিম ইবাদাতগোজার বানানোই তাঁর চিন্তাধারা ও মূল উদ্দেশ্য ছিল।

অন্ধ ও জাগতিক রাজনীতির জন্য কংগ্রেস প্লাটফর্মই যথেষ্ট ছিল। আর খালিস দীনদারির জন্য মাদরাসা ও খানকার চার দেওয়ালকে যথেষ্ট করে নিতেন। কিন্তু উল্লিখিত সবগুলো প্লাটফর্ম একসঙ্গে পুরে রাখার অর্থ এ ছাড়া অন্যকিছু হতে পারে না যে, হযরতের চিন্তাধারা ছিল সম্মিলিত ও সমন্বয়কারী, যার উপরিভাগ ছিল রাজনীতি আর প্রকৃত অবস্থা ছিল আখলাকি। এই সমন্বয়কে সামনে রেখে যারাই তাঁর সম্পর্কে অভিমত পেশ করেছেন, তাদের মতামতই সঠিক ও বাস্তব হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

আলোর উজ্জ্বল মিনারা

হযরত মাদানী রহ. নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার যুগে আলোর একটি মিনার ছিলেন।

আমির আমানুল্লাহ খান (সাবেক বাদশা, আফগানিস্তান) বলেছিলেন, 'শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ. একটি নূর ছিলেন। আর শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. ছিলেন ওই নূরের কিরণ ও চমক। এই নূর তাঁর থেকে বিচ্ছুরণ হয়ে তাঁর পরিবেশ ও দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তার আমরে বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারে অনুগ্রহ ও দয়ার মাদ্দা কার্যকর হতো। মুনকারাতকে জালাল ও ক্রোধের সাথে প্রত্যাখ্যান করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, ওই জোশ ও ক্রোধ সত্ত্বেও না তার ভালবাসার মাঝে কোন ছেদ আসত, না উদ্দেশ্যের মাঝে পরখ পড়ত। বরং ভর্ৎসনাকারী নিজের কাজ করে যেত, যা উপরিভাগের মূল উদ্দেশ্য হতো আর তিনি নিজের কাজ করে যেতেন, যা হাকিকতের আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ শক্তির সঙ্গে জারি থাকত।

৫ ডিসেম্বর ১৯৫৭ ঈসায়ী দ্বিপ্রহরের শুরুতে এই সমন্বয়কারী সম্পদ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং বেলা ২টার সময় তাঁর আত্মা মাটির দেহ ত্যাগ করে চিরস্থায়ী জগতপানে যাত্রা করে। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। তাঁর জীবনও ভালভাবে অতিবাহিত হয়েছে এবং মরণও পবিত্র অবস্থায় হয়েছে।

মৃত্যুর পর চেহারার উপর অস্বাভাবিক নূরানী চমক ছিল। চেহারায় এত পরিমাণ আলোর চমক, দীপ্তি ও সৌন্দর্য ছিল যে, মানুষের নজরসমূহকে তৃপ্ত হতে দিত না। ওষ্ঠাধরে আশ্চর্য ধরনের মুসকি হাসি ছিল, যার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, যা অবশ্যই হযরতের আল্লাহর নিকট মাকবুল হওয়া এবং সাথে সাথে মৃত্যুকালীন সময়ে তার প্রফুল্লতা ও আরাম ও প্রশান্তির প্রকাশ্য বা সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল। যে মাকবুলিয়াত বা গ্রহণযোগ্যতা জিন্দেগীতে ছিল, তা মৃত্যুর পরও বহাল রইল। তাঁর মাযারে সর্বদা যিয়ারতকারীদের জ্যাম লেগে থাকত। এমনকি রাত একটার সময়ও তার মাযারে গিয়ে লোক পাওয়া যেত।

ওই ভালবাসার নমুনা হিসেবে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ সাথে সাথে বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রগুলো রেডিও মারফত হযরতের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করে এবং হিন্দুস্তান ও বহির্বিশ্ব থেকে শোকবার্তা, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের মাধ্যমে অনবরত আসতে থাকে। ইন্তিকালের পর রাত একটা পর্যন্ত আল্লাহই ভাল জানেন যে, জনস্রোত কোথা হতে ভেঙ্গে পড়ল যে, দারুল উলুমের প্রশস্ত মাঠ লোকারণ্য হয়ে গেল। ফলে জ্যাম ও জানাযা কন্ট্রোল করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। মানুষ যে ব্যক্তিকে জীবদ্দশায় তার চতুর্পার্শ্বে পঙ্গপালের ন্যায় জমে থাকত, আজ তার প্রকাশ্য আলামাতস্বরূপ তার লাশের পাশে পঙ্গপালের মতো একত্রিত হয়েছিল।

বাস্তবতা হলো, হকপন্থী এবং দরাজদিল ব্যক্তিত্বের জীবন এবং মরণ উভয় অবস্থায় মাহবুব থাকেন। অন্য কথায় আসলে আল্লাহওয়ালারা মরেন না। শতাব্দির পর শতাব্দি অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের আত্মা দৌড়াতে থাকে এবং তাদের ভালবাসা যথারীতি কায়েম থাকে। এরই ভিত্তিতে তাদের মরদেহ হ মাটির সঙ্গে মিশে যায় না। বরং বাতেন বা অদৃশ্য হয়ে যায় যা কখনো ধ্বংস হবে না। সেজন্য মৃত্যু তাদের উপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া করতে পারে না, তারা মরেও জীবিত থাকে।

বাতেনী বা অদৃশ্য সঙ্গ

আজ আমাদের মাঝে হযরত মাদানী রহ. বিদ্যমান নেই। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এমন যে, তিনি আমাদের মাঝে অবিদ্যমানও নন যখন তাঁর মিশন বিদ্যমান, তাঁর আমলের নমুনা বিদ্যমান, তাঁর ইলম বিদ্যমান, তাঁর জিহাদী কর্মকাণ্ড বিদ্যমান, তাঁর ভালবাসা বিদ্যমান। সেজন্য আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য যেখানে অনুভূতিগত বিচ্ছেদ একটি বড় মসিবত, ওখানে তাঁর বাতেনী

সঙ্গের কারণে প্রশান্তি ও তৃপ্তিও রয়েছে। এজন্য আত্মীয়-স্বজনদের জন্য হাজারো দুঃখ-বেদনা সত্ত্বেও নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। তাঁর বাতেনী অস্তিত্ব বিদ্যমান, তা থেকে ফায়দা গ্রহণ করতে হবে এবং তার ফায়দা পথের সাথী ও বন্ধু হতে পারে। অন্তরের প্রশান্তির জন্য সবচেয়ে বড় বস্তু হলো কুরআনুল হাকীম, যা যবানে জারি হয়ে অন্তরের জন্য প্রশান্তি ও তৃপ্তির কারণ হয়। আর ইসালে সাওয়াবের জন্য মাধ্যম তা মরহুম হযরতের জন্য আনন্দ ও প্রফুল্লতার কারণ হবে। সেজন্য কুরআন তেলাওয়াত ব্যথিত মানুষের অন্তরের জন্য এবং হযরতের জন্য প্রশান্তি ও আরামের মাধ্যম হতে পারে।

এই ইহজগৎ থেকে অতিক্রমকারী লোক যত বড়ই ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোন না কেন, তারপরও তিনি তাঁর প্রিয়ভাজন এবং আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি আশাবাদী থাকেন, কে তাকে দুআ ও ইসালে সাওয়াবের মাধ্যমে স্মরণ রাখে। এ কারণে কষ্ট ভোলা ও হযরতের আশাকে পুরা করার পদ্ধতি শুধু চিন্তা করা এবং চিন্তার জন্য বসে থাকা নয় বরং দুঃখ ভুলে তার উদ্দেশ্য পূরণে চেষ্টা করা এবং কাজে লেগে যাওয়া।

আল্লাহ তায়ালা হযরত রহ.-এর মর্তবা ও মর্যাদাকে বুলন্দ করুন এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে সমাসীন করুন আর তাঁর শোকাহত আত্মীয়-স্বজনদের সাবরে জামিল (উত্তম সবর), উত্তম প্রতিদান এবং আমলের রুচি দান করুন।

এই কয়েকটি বিক্ষিপ্ত লাইন হযরত মাদানী রহ.-এর প্রশংসা বয়ান করার জন্য লেখা হয়নি যে, এই কয়েকটি লাইনে তার প্রশংসা করা সম্ভব নয়। বরং স্রেফ চিন্তা-দুঃখ এবং মনকে হালকা করা এবং সাথে সাথে একজন পবিত্র হাসতী পবিত্র আলোচনা এবং স্মরণ দ্বারা "তোমাদের মৃতদের ভাল গুনে স্মরণ কর।" কথার তাকাজাকে পূরণ করার জন্য পেশ করেছি।

আশা রাখি, হিন্দুস্তানের দীনি মাদারিস এবং দীনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসালে সওয়াবের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে এবং মরহুম হযরতের সর্বশেষ খেদমতের ব্যাপারে কেউ কোন মনোব্যথা রাখবে না।

সাক্ষাৎকার

[হযরত হাকীমুল ইসলাম (রহ.) এর এই ইন্টারভিউটি লাহোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক মাশরিক পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। তিনি মাশরিক পত্রিকার প্রতিনিধি জনাব আহমাদ কামরান সাহেবের প্রশ্ন উত্তর দিয়েছিলেন। শিরোনাম বৃদ্ধিকরনের জন্য দৈনিক মাশরিক পত্রিকার কৃতজ্ঞতার সাথে ইফাদাতে ইলম ও হেকমত আংশে মিলানো হয়েছে।]

পথের প্রদীপ

মানবীয় মর্যাদা ও সম্মানের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার মধ্যে বিস্তর ও কঠিন মতানৈক্য রয়েছে। কেউ সম্পদশালী ব্যক্তিকে বড় মনে করে। কারো নিকট রাজনীতিজ্ঞ এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বওয়ালা ব্যক্তি বড় মানুষ। কেউ বড় বড় ডাক্তার ও ডিপ্লোমা অর্জনকারী ব্যক্তিদের বড় মনে করে। মোটকথা, প্রত্যেক ব্যক্তি আপন মেধার যোগ্যতা অনুসারে আযমতের মানদণ্ড নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু বড়ত্বে যে মানদণ্ড মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেবকে দেখে হস্তগত হয়, তা এত পরিপূরক ও সুস্পষ্ট যে, তারপর আযমত বুঝার জন্য ব্যাখ্যা দিতে হয় না, পরিষ্কার বুঝে এসে যায় যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর যে ব্যক্তি যত নিকটবর্তী হবে, সে তত বড় মানুষ। কারণ, তার সম্পর্ক এমন এক হাসতীর সাথে, যিনি সবচেয়ে বড়, যিনি অদ্বিতীয় এবং চিরস্থায়ী কখনো ধ্বংস হবেন না।

হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যব (রহ.) ইশকে ইলাহীর ছবি এবং আল্লাহর সৃষ্টজীবের হেদায়েতের পথ প্রদর্শনের জন্য নূর বা বাতি। তিনি ইলম ও আমলের জীবন্ত কিংবদন্তি। দীনি উলুমের উপর তাঁর পরিদর্শন শুধু আলেমসুলভ নয়, সম্মানিত ও পবিত্র সুলভও ছিল। কুদরত তাঁকে কুরআন বুঝার অসাধারণ যোগ্যতা দান করেছেন। ইলমে হাদিসে তাঁর বুৎপত্তির সূর্য দ্বিপ্রহরের মত সুস্পষ্ট ও উদ্ভাসিত। ইতিহাসের রৌদ্রছায়া সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। যুগ ও জীবনের সকল উত্থান-পতন সম্পর্কে তিনি জানেন এবং নতুন ও প্রাচীন সকল দৃষ্টিভঙ্গি তিনি চিনেন, বোঝেন। বক্তৃতা তাঁর অনুগামী, লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে বয়ান শুরু করার পর সারা সমাবেশ এমন নিশ্চুপ ও শ্রবণকারী হয়ে যায়, যেমন অনেক দূরদূরান্তেও কোন নিঃশ্বাস গ্রহণকারী নেই। যে কোন বিষয়বস্তু হোক

তিনি তাঁর ইজতিহাদী অভিজ্ঞতা দ্বারা অনায়াসে বয়ান করতে থাকেন, আর ফিকির ও নজরের বাতায়ন উন্মুক্ত করতে থাকেন।

এমন সৌন্দর্যাবলি কারণে তিনি শুধু দারুল উলূম দেওবন্দের জন্য নয় বরং সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য পথের প্রদীপ হওয়ার মর্যাদা রাখেন।

–ইসলাম পাকিস্তানের নিয়তি।

–পাকিস্তান ইসলামের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

–ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনবিধান, যা পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আমাদের মাদ্দী ও রূহানি চাহিদাগুলো পুরা করতে পারে।

–যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম বাস্তবায়িত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপমাণিত অবস্থায় থাকব।

ইসলাম বাস্তবায়নের শ্রেণীবিন্যাস

এটি এবং একই ধরনের আরো ধ্যান-ধারণার প্রকাশ অনেক দিন পূর্ব থেকে সকলের মাঝে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আসল ও প্রকৃত প্রশ্ন হলো, ইসলাম কীভাবে এবং কোন বিন্যাসে বাস্তবায়িত হবে? তা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রশ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সৌভাগ্যক্রমে কারী মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব কিছু দিন পূর্বে পাকিস্তানে আগমন করেছেন। তখন চিন্তা করলাম, উল্লিখিত প্রশ্নের ব্যাপারে হযরতের ইলম, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপকৃত হবো।

উল্লিখিত খায়েশ আমাকে টানতে টানতে কারী সাহেব পর্যন্ত নিয়ে গেল, তিনি মুলতান রোডের একটি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তার আশপাশে অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী বসেছিলেন। আমি হযরত ক্বারী সাহেবের নিকট নিজের দাবি পেশ করলাম। তিনি অত্যন্ত দয়াদ্রতা ও সংকোচহীনতার সাথে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করতে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। ইসলামি বিধান বাস্তবায়নে কর্মপদ্ধতি কেমন হবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, বর্তমান যুগে ইসলামি বিধান বাস্তবায়নের ভিত্তি দু'টি বিষয়ের উপর।

১. ইজতেমায়ীভাবে বর্তমান হুকুমত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, চলতি কানুনসমূহ সংবিধানসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করবে এবং ওই সমস্ত কানুন (সংবিধান) আইন এক সাথে রহিত করে ফেলবে যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহের বিপরীত বা পরস্পরবিরোধী। পাশাপাশি এমন সংবিধান প্রণয়ন করবে,

যেগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে প্রকাশ্যভাবে দীন বাস্তবায়ন এবং তার উপর সকল কর্মাবলি পরিচালনা করা।

২. ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত মুসলমানের উপর আবশ্যক কর্তব্য হলো, তারা নিজেদের জীবনকে ইসলামের প্রদর্শনীস্থল বানাবে। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও আল্লাহর সমস্ত বিধানের উপর আন্তরিকভাবে আমলকারী ও অনুসারী হবে। চালচলন, বিবাহশাদী, আনন্দ, কষ্টে ক্রয় ও বিক্রয়, লেনদেন মোটকথা যিন্দেগীর প্রতিটি শাখায় ইসলামি বিধানের পাবন্দী করবে, আল্লাহ তায়ালা যেগুলোর তাকিদ ও আদেশ করেছেন এবং ওই সকল জিনিস হতে বিরত থাকবে সেগুলোর তিনি নিষেধ করছেন।"

দীনি ইলমকে ব্যাপক করা আবশ্যক

উক্ত দুটি বিষয়কে বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইসলামের বুনিয়াদ ইলমের উপর। এ কারণে প্রথম এবং এই মুহূর্তে প্রয়োজন হলো, দীনি ইলমকে এমন ব্যাপক ও সহজসাধ্য করা, যাতে কেউ দীন সম্পর্কে অপরিচিত না থাকে। প্রত্যেকের বড় আলেম হওয়া জরুরি হয়, শুধু এতটুকু জরুরি যে, দীনি ফারায়েয পুরা করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণরূপে অবগত থাকবে। আর যদি কেউ কোন মুয়ামালা সম্পর্কে ইলম না রাখে, তাহলে সে আহলে ইলম তথা আলেমদের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং মুয়ামালা বিষয়ে তাদের থেকে হেদায়েত গ্রহণ করবে।

কুরআনুল কারীমের সতের পারায় উক্ত হাকিকতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে–

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

যদি তোমরা না জান, তাহলে আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস কর।

এখন প্রয়োজন হলো প্রত্যেক মুসলমানদের মাঝে এমন মনোযোগ ও মহব্বত সৃষ্টি করা যে, তারা দীনি শিক্ষা করবে, যখন তা অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন তারা অবশ্যই আলেমে দীনের প্রতি ধাবিত হবে। যখন তারা দীনি তাকাজাগুলোর ব্যাপারে অবগত হবে, তখন তা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করার যোগ্য হবে। তেমনিভাবে পরিবেশ ও সমাজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধনের প্রবণতা ও অনুরাগ সৃষ্টি হবে। আর উক্ত প্রবণতা ও অনুরাগই কল্যাণের ফল ও পাতা উৎপন্ন করবে। স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হায়াতে সাহাবাদের আমলের পদ্ধতি ছিল এমন যে, তারা যে বিষয়ে অজ্ঞ

থাকতেন, সেই বিষয়ের প্রতিটি দিক ও অংশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জেনে নিতেন। অতঃপর একে জীবনের রক্ষাকবচ বানাতেন। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, জনাব কারী সাহেব বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ ঠিক না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি আইন বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা সম্ভব হবে না। আর পরিবেশ এমন অবস্থায় সংশোধন হতে পারে, যখন পূর্ণ শক্তি এবং মুক্কামাল ফরজ (দায়িত্ব) অবগত হওয়ার মাধ্যমে কাজ করা হবে। তিনি বলেন, পরিবেশ উন্নত করার শুরুটা নিজের ঘর থেকে শুরু হবে। প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক, তারা নিজেদের সংশোধন এবং দীনের উপর আমলকারী হওয়ার কাজ সর্বপ্রথম নিজের সত্তা এবং আপন ঘর থেকে শুরু করবে।

কোন মহল্লার যদি একটি ঘর কার্যকরীরূপে ইসলামি শিক্ষার দোলনা বনে যায়, তাহলে সেই ঘর পথের বাতি হবে, যার আলো দ্বারা প্রতিবেশীরাও আলোকিত হতে থাকবে। নেক ও কল্যাণের বাতি আস্তে আস্তেই প্রজ্বলিত হয়। যখন একঘর ইসলামি তালীমাতের বরকতের প্রদর্শনী হবে, তখন অন্যান্য ঘর এর প্রভাব গ্রহণ করা ছাড়া থাকতে পারবে না। এভাবে অলিগলিতে পাড়া-মহল্লায় গ্রামে গ্রামে এবং শহরে শহরে দীনের আলো ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি সারা পরিবেশ এবং সমাজ দীনি রঙে অতিবাহিত হয়ে পবিত্র ভূমি বনে যাবে।

ইসলামি নিযাম বাস্তবায়নে ব্যক্তিগত দায়িত্ব

হযরত বলেন, ইসলামি আইন বাস্তবায়ন কর্মে প্রত্যেক কাজের যিম্মাদারী রাষ্ট্রের স্কন্ধে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। ঘরোয়া, পারিবারিক এবং বংশীয় জীবনে ইসলামি শিক্ষার বিপ্লব ঘটানো প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথক দায়িত্ব। তাতে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জাত ও বংশে ইসলামি বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করার ইচ্ছায় অটল অবিচল থাকে, তাহলে কে তাদের হাতে ধরবে অথবা তার পথে জ্যাম ও বাধা হয়ে দাঁড়াবে? এ কারণে ইসলামের কার্যকরী বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও বুনিয়াদী দায়িত্ব হলো ব্যক্তির উপর।

হযরত মুহতামিম সাহেব বলেন, আজকাল শত আফসোসের বিষয় এই যে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে নসিহতকারী'।

মানুষ নিজেরা তো নেক কাজ করে না; কিন্তু অন্যকে নসিহত করার ব্যাপারে অনেক তৎপরতা দেখায়। নেক আমল হতে দূরে থাকা, নেক কাজে শুধু মৌখিক তাবলীগ কর্ম কল্যাণকর হয় না। কেননা, শুধু কথায় প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হয় না,

আসল ও ক্রিয়াশীল হলো আমলের শক্তি, শুধুই আমল। এ কারণে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আবশ্যক হলো প্রথমে তারা ইসলামিক সমাজ, ইসলামি আকিদা এবং ইসলামি চিন্তা চেতনার ইলম অর্জন করবে, তারপর সেগুলোর কার্যকরী নমুনা বনে যাবে। হালাল আহার্য আপন যিন্দেগীর জন্য আবশ্যক জ্ঞান করবে, আর হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকবে। এভাবে ইসলামি নিযামের বাস্তবায়নের পথ নিজে নিজেই সুগম হবে। আর মুসলমান যখন ভালরূপে দীনি রঙ্গের রঙিন হবে, তখন রাষ্ট্রের কাজ কমে যাবে, সাধারণ থেকে যাবে। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র থেকে সবকিছু চাওয়া একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। রাষ্ট্র তো সামাজিক জীবনে দীন কায়েমের পদক্ষেপ এবং পরিচালনা করতে পারে। প্রাথমিক যিম্মাদার সাধারণ মুসলমান যে তারা নিজেদের মধ্যে ঘর পরিবারের মধ্যে, আপন খান্দান ও ভাইদের মধ্যে এবং আপন কবিলাকে দীনি সামাজিকতার সত্যিকারের নমুনা বানাবে।

ইসলাম বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের কর্মপদ্ধতি

রাষ্ট্রের কার্যাবলির সম্পর্ক সামাজিক পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে। তো প্রথম কথা হলো আইনের উৎস শুধু কুরআন ও হাদিসকে মনে করতে হবে। সর্বসাধারণ কানুনের উপর চলে। সুতরাং এমন কোন কানুন বহাল রাখা যাবে না এবং ভবিষ্যতের তৈরি করা যাবে না, যার ভিত্তি নিষিদ্ধ কর্মের উপর অথবা কুরআন ও সুন্নাতের বিধানকে নিষেধ করে। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এমন শিক্ষানীতির প্রচলন ঘটাবে, যাতে প্রাথমিক পর্যায়ে দীনি আকাইদ, আখলাক ও মুয়ামালাতের পরিপূর্ণরূপে শিক্ষা দেবে। প্রাইমারি ও হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের এমন দুআসমূহ শেখাবে এবং সেগুলোর অর্থ শেখাবে, যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিত্যদিনের আমল ছিল। যদি প্রতি চার দিনে একটি করে দুআ মুখস্থ করায়, তাহলে ছয় মাসে সকল দুআ ভালরূপে শিখে ফেলবে। উক্ত দুআগুলোর প্রাথমিক ও আবশ্যকীয় বরকত এই হবে যে, তাদের ভিতর কার্যকরী তাওহীদের (একত্ববাদের) রং প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আমাদের নতুন প্রজন্মের অন্তরে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশের জযবা প্রথম থেকেই মজবুত হয়ে যাবে। ইসলামি নিযাম কায়েম করার জন্য এ জিনিসগুলো বুনিয়াদী হওয়ার গুরুত্ব রাখে।

মৌলিক অধিকার ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

মানবজীবনের বুনিয়াদী প্রয়োজনাদী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী এমন প্রশ্নের উত্তরে মুহতামিম সাহেব (রহ.) বলেন, ইসলাম মানুষের বুনিয়াদী প্রয়োজনসমূহের পরিপূর্ণ সমাধান পেশ করেছে। শাইখ জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. নিজ রচিত গ্রন্থ আলবুদূরুর-এ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক হাদিসের উদ্ধৃতি বা রেফারেন্স দিয়েছেন, যাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ রয়েছে, জীবন যাপন করার জন্য তিনটি বস্তু আবশ্যকীয়ভাবে প্রয়োজন।

১. كسرة خبز রুটির টুকরো।

২. قطعة ثوب দেহ আবরণের বস্ত্র।

৩. قطعة ارض বসবাসের এক টুকরো ভূমি।

ইসলাম কোন ব্যক্তিকে উক্ত বুনিয়াদী প্রয়োজন হতে বঞ্চিত দেখতে চায় না। মানুষদের খাদ্য পৌঁছানোর ইসলামি নিযামের অবস্থা হলো এমন যে, হযরত উমর ফারুক রাযি. কোমরের খাদ্যের বোঝা নিয়ে অভাবীদের ঝুপড়িতে পৌঁছে দিতেন। সর্বোচ্চ সমতা যা হতে পারে তন্মধ্যে তা একটি বিরল নমুনা। ইসলাম একটি সাম্য এবং মধ্যমপন্থী ধর্ম। ইসলাম কাউকে সীমাতীত ধনবান ও দরিদ্র হতে পছন্দ করেন না। এই ব্যাপারে ইসলামের উদ্দেশ্য এমন যে, যে ব্যক্তি সম্পদশালী হিসেবে অনেক উঁচু হয়ে যাবে, তাকে কিছুটা নিচু করা আর যে ব্যক্তি দরিদ্রতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে, তাকে কিছুটা উপরে ওঠানো। এমনভাবে সমতা এবং মধ্যম পন্থার পরিবেশ সৃষ্টি করাই ইসলামের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি।

মুসলমানদের একতা

মুসলমানদের পরস্পর একতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর আপন চিন্তাধারা প্রকাশ করতে গিয়ে হযরত বললেন–

মুসলমানদের সকল গ্রুপ ও ফেরকার মাঝে পরস্পর গভীর ও মজবুত একতা অত্যন্ত প্রয়োজন। আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতভেদের কারণে মুসলমানদের মাঝে পরস্পর কোন প্রকার ক্ষোভ রাখা অত্যন্ত পরিতাপ ও অবৈধ বস্তু। কারণ, আমাদের দীন আমাদেরকে মিল-মহব্বত তথা একতার শিক্ষা দেয়। বিভক্ত ও

বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করে। এ কারণে ইসলাম ধর্মে একতার আসবাব অগণিত, সীমাহীন। ইসলাম আপন অনুসারীদের থেকে প্রথম চাওয়া এই যে, তোমরা পরস্পর মোকাবেলা ও ঝগড়া কর না। অতএব আবশ্যক হলো প্রত্যেক ফেরকা ইতিবাচক এবং সর্বসম্মত বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং মুসলিম জাতির সম্মিলিত মিশনে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। প্রত্যেক ফেরকাগুলোর মাঝে পরস্পর যে দুরত্ব রয়েছে, তা মূলত আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতভেদের কারণে। এ ক্ষেত্রে নিজ নিজ মতাদর্শের পরিধির উপর আমলকারী থেকে দীন শক্তিশালীকরণে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

উক্ত কাজের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এই যে, নেতিবাচক চিন্তা পরিত্যাগ করে কুফরের দ্বার বন্ধ করতে হবে। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মনীতি তো এমন ছিল যে, তিনি নিকৃষ্ট দুশমনদের সাথেও অত্যন্ত খোলা মন এবং প্রশস্ত অন্তরের প্রমাণ দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উন্নত মানসিকতার অবস্থা ছিল, কুরাইশ সর্দারদের সম্মানে আপন চাদর মোবারক বিছিয়ে দিতেন। যখন আমাদের আকায়ে নামদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফেরদের সঙ্গে এমন ব্যবহার ছিল, তখন আমাদের আপন ভাইদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত তা বলাই বাহুল্য। ইসলামি নিযাম কায়েমে পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের পদক্ষেপগুলোর ব্যাখ্যা চাইলে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বা যে সরকার ইসলামকে কার্যকরীরূপে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাবে, সে বা তারা সর্বাবস্থায় সম্মানযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আকাবিরে দেওবন্দের মিশন

তিনি আরো বলেছেন, দীনের বুনিয়াদ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহব্বত করা। হাদিস শরীফে এসেছে– "তোমাদের কেউ কামেল মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে আপন সন্তান, মাতাপিতা ও সকল মানুষ থেকে অধিক মহব্বত করবে।" তিনি আরো বলেন, আকাবিরে দেওবন্দের মতাদর্শ ও মিশন এমনই ছিল, যার জন্য তারা সারা জীবন অনুসরণ করে গেছেন। এমনকি তারা আপন জীবন উক্ত মিশনের পিছনে কুরবান করে দিয়েছেন।

ভারতীয় মুসলমানরা উন্নতির রাজপথের উপর রয়েছে

ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে হযরত কারী সাহেব রহ. বলেন, ধর্মীয় প্রাধান্য এবং ইসলামি সম্ভ্রম মর্যাদাধের দিক থেকে তারা দিন দিন উন্নত হচ্ছে, আগে বাড়ছে। তাদের স্লোগানে একতা ও স্বনির্ভরতার কণ্ঠস্বর প্রকাশ পায়। মুসলমানদের একতার ফলাফল এই যে, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, আমরা মুসলিমদের পার্সোনাল ল' এ কোন পরিবর্ধন করব না। আলোচনা না আগে বাড়লে তিনি বললেন, ভারতের মুসলমানগণ পাকিস্তানিদের উন্নতি ও কামিয়াবীর জন্য দুআ করে। পাকিস্তানের মুসলমানদের সঙ্গে তাদের মহব্বত কুদরতিভাবে রয়েছে। এর একটি কারণ তো এই যে, মুসলিম জাতি হিসেবে ভারতীয় মুসলমানরা সারা মুসলিম জাহানের জন্য দরদের জযবা রাখে। আর পাকিস্তান হলো মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। পাকিস্তানের সাথে তাদের মহব্বতের আরেকটি কারণ এই যে, এখানে এবং ওখানে উভয় দেশে একে অপরের আত্মীয়তা জন্ম থেকেই রয়েছে। এজন্য তারা আপন ভাইদের সুখী জীবনের দুআ করে যাচ্ছে। তারপর পাকিস্তানের জন্য তাদের হিতকামনার একটি কারণ এ-ও যে, পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান উভয়টি অত্যন্ত পাশাপাশি ও প্রতিবেশী দেশ। আর দুটি স্বাধীন ও স্বনির্ভর প্রতিবেশী দেশ যে চালচলন এবং চরিত্রে থাকা উচিত, তার স্বয়ংক্রিয় চাহিদা হলো এই যে, তারা উভয়ে একে অপরের জন্য হিতাকামনার জযবা তাজা এবং জাগ্রতগ রাখবে।

হযরত মাদানী রহ. ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

মনে হয়, অনেক মানুষ এই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয় যে, কারী তৈয়্যব সাহেব আপন মুর্শিদ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী রহ.-এর চিন্তাধারার অনুসারী হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। অতীতের কিছু তিক্ত কথা উঠলে লেখক মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রহ.-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারার আলোচনা করেন এবং হযরত মুহতামিম সাহেব-এর নিকট আর্জি পেশ করেন, মাওলানা মাদানী রহ. ও মাওলানা আবুল কালাম রহ. নিজেদের দীনদারী ও পদমর্যাদা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে তারা আমাদের অতীত ইতিহাসের উজ্জ্বল তারকা। কিন্তু একথা ভেবে অত্যন্ত হতাশ হয় যে, এমন মহান মর্যাদাবান ব্যক্তিদ্বয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন কেন?

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে হযরত বললেন, চিন্তাগত ও ধারণাগত মতানৈক্য যে কোন বিষয়ে হতে পারে। নিঃসন্দেহে হযরত মাদানী রহ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন না বটে; কিন্তু যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন হযরত মাদানী রহ. বললেন, এখন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করতে হবে। তিনি বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদ নির্মাণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মতানৈক্য হতে পারে। মসজিদের আকৃতি, নির্মাণ এবং স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত হতে পারে। কিন্তু যখন মসজিদ নির্মাণ হয়ে যায়, তখন তার পবিত্রতা ও সম্মানের খেয়ালা সর্বদা আবশ্যক। তখন মসজিদ বানানো এবং না বানানোর উপর আলোচনা করা হয় না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি এমনই। হযরত মাদানী রহ. বলতেন, এখন যেহেতু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে সুতরাং এ ব্যাপারে আমার অভিমতের মতানৈক্য ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ ঈসায়ী সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন আল্লাহ তায়ালা পাকিস্তানকে শক্তিশালী ও সুখী বানান।

মাওলানা আযাদ রহ. ও পাকিস্তান

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রহ. ভারত বিভক্ত হওয়ার পর পাকিস্তান সম্পর্কে কেমন জযবা রাখতেন? এ সম্পর্কে জনাব মুহতামিম সাহেব একটি মনোমুগ্ধকের ঘটনা শুনিয়ে বললেন, একবার হযরত মাওলানা আহমাদ সাঈদ সাহেব মারফত সংবাদ পেলাম, মাওলানা আবুল কালাম সাহেব আমাকে স্মরণ করছেন। আমি দিল্লীতে পৌঁছে সরাসরি তাঁর অফিসে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি তাঁর চিরাচরিত চরিত্র মোতাবেক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে সামনে এলেন। আমি তাকে বললাম, হযরত আমাকে কেন স্মরণ করছেন? তিনি বললেন, এখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমি চাই ভাল ও উপযুক্ত ব্যক্তিরা পাকিস্তান চলে যাক এবং এই সম্মানিত মর্যাদাবান রাষ্ট্রের সংবিধানকে সাহায্য করে একে আপন পায়ের উপর দাঁড়ানোর উপযুক্ত বানাক। অর্থাৎ স্বনির্ভর ও শক্তিশালী বানাক।

উক্ত কথাগুলো বলার পর মাওলানা রহ. আমাকে বললেন, যদি আপনি পাকিস্তান যেতে চান, তাহলে আমি সানন্দে আপনাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। এ সম্পর্কে সংকোচহীনভাবে আপনার খায়েশ প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিতাপের যে, পাকিস্তান যাওয়ার জন্য গোপনীয়ভাবে বারবার পাকিস্তান হাইকমিশনের সাথে সাক্ষাৎ করা হবে।

মুহতামিম সাহেব বললেন, মরহুম মাওলানার উক্ত কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম এবং তাকে বললাম, এমনটি অকাট্য ভ্রান্ত ও মিথ্যা অভিযোগ। উক্ত কথা শ্রবণে তিনি চিন্তায় ডুবে গেলেন। আমি তাকে বললাম, সিআইডি জেনে-শুনে আমাদের ব্যাপারে হুকুমতকে আমাদের অজ্ঞাতসারে উক্ত ভুল তথ্য প্রদান করেছে। প্রকৃত ঘটনা এমন যে, দারুল উলূম দেওবন্দের কালেক্টার ও চাঁদা আদায়কারী চাঁদা আদায়ের জন্য পাকিস্তান যেতে চাচ্ছিলেন। তিনি সেই সুবাদে পাকিস্তানী হাইকমশনারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছিলেন। সিআইডির লোকেরা উক্ত কথার শোভা বর্ধনের জন্য নিজের থেকে বাড়িয়েছে এবং এই কল্পকাহিনী বানিয়েছে যে, আমি পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হতে চাই।

কারী সাহেব রহ. বললেন, যখন প্রকৃত ঘটনা মাওলানার ইলমে এলো, জানতে পারলেন, তখন অনেক আফসোস করলেন এবং গোয়েন্দাদের কাজের উপর অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন আর বলতে লাগলেন এই সিআইডিতে মিথ্যাবাদী লোক ছিল, যারা আমাদের সম্পর্কে ইংরেজদের ভুল তথ্য সরবরাহ করত। তারা শুনতো একটা আর বলতো আরেকটা।

আল্লাহ্ হাফেজ

হযরত কারী সাহেব রহ. কথায় কথায় চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির এবং ইলম ও খবরের ফুল ছিটাচ্ছিলেন। বিশেষ করে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছিল, রাতের অন্ধকার বেড়ে চলছিল। তখন লেখক চলে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। হযরত তাকে দয়াদ্রতা ও স্নেহের একটি দুর্লভ স্পর্শের সঙ্গে তার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং অনেক মূল্যবান দুআ দিয়ে খোদা হাফেজ বললেন। আর আমি এ কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম যে, হযরত কারী সাহেব ৮৬ বছর পর্যন্ত দিন রাত দেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা এমন মহান এবং উপকারী ব্যক্তিত্বকে অনেক দিন দীর্ঘকাল যিন্দা রাখুক এবং বরকতের কারণ বানিয়ে রাখুক। আমীন।

অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত